"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

বর্ষসূচী

৫৬ম বর্ষ

(১৩৬০ মাঘ হইতে ১৩৬১ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
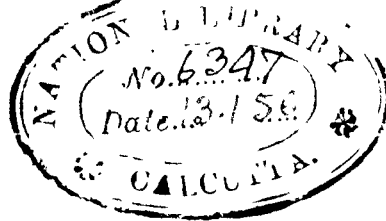
উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

বার্ষিক মূল্য ৫৲

প্রতি সংখ্যা ৷৹

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(বর্ণানুক্রমিক)

(মাঘ, ১৩৬০ হইতে পৌষ, ১৩৬১)

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি স্মৃতি	স্বামী শান্তানন্দ	৫৭৪
শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য স্মৃতি	শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ	৫৩৮, ৬৫৪
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-দর্শনে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬০৮
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীস্বামীজী	শ্রীপি শেষাদ্রি আয়ার	৯৮
শ্রীশ্রীসারদাষ্টকম্	অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্-এ সাহিত্যশাস্ত্রী	৬২৫
শ্রীশ্রীসারদা সরস্বতী (কবিতা)	শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী	১২০
শ্রীশ্রীসারদা-স্বরূপ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস, বিদ্যাবিনোদ	৫৫৯
সব পেয়েছির স্বপ্ন	কানাই সামন্ত	১৩৯
সমন্বয়বিধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী	৭৮
সময় ও সুকৃতি	জ্যোতির্ময়ী দেবী	৫৫১
সমালোচনা		১০২, ১৫৯, ২১৮, ২৮০, ৩৯০, ৪৫০, ৫৬৩, ৬১৭,
সাধ ও সাধনা (কবিতা)	'বৈভব'	৩১
সাম্প্রদায়িক ঐক্যের গোড়ার কথা	অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল্	৪৭৫
সুখ কি এবং কোথায় ?	শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ. বি-এস্-সি, এল্ এল্-বি	২১৬
সুখের সন্ধানে	বেলা দে	১৩৫
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র	...	৩০২
স্বামী অম্বিকানন্দজীর দেহত্যাগ	...	১০৬
স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর দেহত্যাগ	...	৬৬৮
স্বামীজীর স্মরণে (কবিতা)	শ্রীশৈলেশ	২২
স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি	আইডা আন্‌সেল, অনুবাদক : শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস	২৬১
স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি	স্বামী বাসুদেবানন্দ	১৩৭
স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ	শ্রীনৃত্যগোপাল রায়	৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি	স্বামী বাসুদেবানন্দ ও নির্মলকুমার ঘোষ	৪১
স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ	অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম্-এ	৩২৬
স্মরণে	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ, বি-এল্	৪৪৬
স্রষ্টা ও সৃষ্টি (কবিতা)	শ্রীতারাকালী বসু, এম্-এ	২০৩
হরিনাম টহলগান	শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ. বি-কম্	২৬৯
হারা গান (কবিতা)	'বৈভব'	১৪৫
হে রামকৃষ্ণ—সাথী (কবিতা)	শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী	৮

স্বামী বিবেকানন্দ

উপায় আছে

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ

সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।

যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং

তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষো-

র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।

যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য

মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ॥

---শ্রীশঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি—৪৩,৪৬

হে শ্রেয়স্কামী সুধী, ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই ; সংসারসিন্ধু পার হইবার উপায় রহিয়াছে। যে পথে চলিয়া নির্মলচিত্ত সাধকগণ উহাকে অতিক্রম করিয়াছেন সেই পথেরই সন্ধান তোমায় বলিয়া দিব।

বেদবাণী বলেন, মুমুক্ষু ব্যক্তির অজ্ঞান-মোহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার প্রত্যক্ষ উপায় হইতেছে শ্রদ্ধা—গুরু এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাক্যে (শাস্ত্রে) বিশ্বাস ; ভক্তি—জীবনের পরম আদর্শের উপর গভীর ভালবাসা আর ধ্যানযোগ—অন্তরতম চৈতন্য-সত্তায় মন সমাধান করিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্য-বোধের চেষ্টা। এই সাধনসমূহ যিনি অবলম্বন করিয়া চলেন অজ্ঞান-কল্পিত দেহবন্ধন তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। (দেহে থাকিয়াও তিনি জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মসত্যের জ্ঞান লাভ করেন। ইহারই নাম মোক্ষ।)

কথাপ্রসঙ্গে

পশ্চাতে ও সম্মুখে

উদ্বোধনের ৫৬ তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

পত্রিকার এই নূতন বৎসরের প্রারম্ভে সকল পাঠক-পাঠিকার সহিত আমরা শ্রীভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। বাক্যের মধ্য দিয়া, অবশেষে বাক্যকে অতিক্রম করিয়া আমাদের বচনাতীতকে ধরিবার সাধনা—মননকে সহায় লইয়া, পরিশেষে উহাকে স্তম্ভিত করিয়া 'সর্বচিন্তা-সমুত্থিত' 'দুর্দর্শ অতিগম্ভীর সাম্য'[1]-রূপ পরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা। বাক্য ও মনন উভয়েই উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উদ্দেশ্যকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়া থাকি, লক্ষ্যের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততায় যদি কোন ফাঁকি না ঢুকিয়া থাকে, তাহা হইলে কথা ও পর্যালোচনার প্রচুর সার্থকতা আমরা দেখিতে পাইব। পুরাতন বিষয়ও আমরা নূতন করিয়া ভাবিতে শিখিব—ভাবিয়া নূতন শক্তি, উদ্দীপনা লাভ করিতে পারিব।

ভাবগুলিকে কর্মে রূপ দেওয়াই তো আসল কথা। আদর্শকে জীবনে ফুটাইয়া তোলাই আমাদের প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে কত কথাই তো শুনিয়া আসিয়াছি, বলিয়া চলিয়াছি—জীবন ভোর কত চিন্তা ও আবেগরাশির সহিত পরিচিত হইয়াছি—কিন্তু কয়টি বাণীকে আমরা আমাদের জীবন-বাণী করিতে পারিলাম? কয়টি শুভ চিন্তাকে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া দিতে সমর্থ হইলাম? ইহাই আমাদের দুর্বলতা, ব্যর্থতা। বাক্যের মর্মশক্তি আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া যায়, কল্পনার দূর-প্রসারী মঙ্গল সম্ভাবনা আমাদের আলস্য ও ঔদাস্য দেখিয়া বেদনায় মুখ ঢাকে। কবে আমাদের ঘুম ভঙ্গিবে? কবে বাক্যকে সত্য করিতে আসিবে চিত্তের একতানতা, কল্পনাকে বাস্তব মূর্তি দিতে উদগ্র আগ্রহ, লক্ষ্যের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ, শ্রেয়ঃকে অনুসরণ করিবার জন্য নির্ভীক অধ্যবসায়?

১ গৌড়পাদ, মাণ্ডূক্যকারিকা—৩।৩৭, ৪।১০০

পঞ্চান্ন বৎসর আগে এমনই এক দিনে (১লা মাঘ, ১৩০৫) আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে পশ্চাতে ও সম্মুখে তাকাইবার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। আফশোষ করিয়া বলিয়াছিলেন[2]— "ইউরোপ, আমেরিকা যবন (প্রাচীন গ্রীক)-দিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।" কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাসও অবিচলিত ছিল যে—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

এই 'পৈতৃক শক্তির পুনঃস্ফুরণের' জন্য পশ্চাতে দৃষ্টিপাত অপরিহার্য। আর্যসংস্কৃতির উপর অন্ধ অনুরাগ নয়—উহার মধ্যে যাহা বলিষ্ঠ, যাহা চিরন্তন তাহা বিচার করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহসের সহিত অনুশীলন। ইহা শুধু ভারতবাসীর নিজেদের জন্যই যে প্রয়োজন তাহা নয়, সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন। ভারতের এই 'পৈতৃক শক্তি' সত্যই এক অমূল্য সম্পদ। অতীত কালে ভারতবর্ষের এই সম্পদের ভাগ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জগতের অন্যান্য নরনারীও কমবেশী পাইয়া আসিয়াছে। এখন আবার ব্যাপকভাবে সেই ভাগ দিবার সময় উপস্থিত। সারা বিশ্ব ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

২ নিম্নের এবং এই নিবন্ধের পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলিও উদ্বোধনের প্রথমবর্ষের প্রথমসংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত 'প্রস্তাবনা' হইতে।

কিন্তু 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'র—ভস্মকে সর্বাগ্রে অপসারণ করিতে হইবে। তবে তো 'বহ্নি' সকলের কাজে লাগিবে। ভস্ম কি?—তামসিকতা।

"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রুরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে: সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

পঞ্চান্ন বৎসর পরে আজ চিত্র কিছুটা বদলাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও প্রচুর পরিবর্তন বাকী। এই পরিবর্তনের জন্য স্বামীজী আমাদিগকে "পশ্চাদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি" আনিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহের "উদ্যম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভর, কার্যকারিতা, একতাবন্ধন, উন্নতিতৃষ্ণা" চরিত্রে সঞ্চার করিবার কথা বলিয়াছিলেন। এই 'সম্মুখে'র সাধনাই জাতিকে সবল করিবে—সেই সবল জাতিই নিজস্ব উত্তরাধিকারকে পরিমার্জিত, পরিরক্ষিত ও পরিপ্রসারিত করিতে পারিবে।

সম্মুখ ও পশ্চাতকে এই ভাবে সমন্বিত করিতে পারিলেই 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—স্বামীজীর উক্তি সার্থক হইতে পারে। আমরা গত পঞ্চাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ধরিয়া এই পশ্চাত ও সম্মুখের মিলনের চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। নূতন বৎসরেও ইহাই থাকিবে আমাদের অকুণ্ঠিত ব্রত। সম্মুখের দিকে পরম উৎসাহে আমরা আগাইয়া যাইব কিন্তু পশ্চাতের ধ্রুব প্রশান্তি সম্মুখের কর্মচাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রিত করুক—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ সংসারের দিকে আমরা চোখ বুজিয়া থাকিব না কিন্তু অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুভূতি ইন্দ্রিয়গোচরকে ধরিয়া রাখুক—যাহা বাক্যমনাতীত তাহা আমাদের বাক্য ও চিন্তা-রাশিকে পরমলক্ষ্যের দিকে চালাইয়া লইয়া যাক।

স্বামীজীর জন্মদিনে

আগামী ১২ই মাঘ, (২৬শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার) পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মদিন। প্রতি বৎসর ভারতের নানাস্থানে এই সময়ে স্বামীজীর নামে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জনৈক লেখক একবার 'ক্লাসিক্‌স্' শব্দটির সংজ্ঞা, রহস্যচ্ছলে এই ভাবে দিয়াছিলেন,—'ক্লাসিক্‌স্' সেই জাতীয় গ্রন্থ যাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অন্ত নাই, কিন্তু যাহা কেহ পড়ে না! মহাপুরুষদের সম্বন্ধেও বোধ করি এই কথা খানিকটা খাটে। মহাপুরুষ তিনি যাঁহাকে আমরা পূজা করি কিন্তু যাঁহার কথায় কর্ণপাত করি না! স্বামীজীকেও যদি আমরা এই পর্যায়েরই মহাপুরুষের মধ্যে ফেলি তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কথা। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পাওয়া উচিত অতন্দ্রিত জনসেবায়—পুষ্পমাল্যে, ধূপদীপে, স্তুতি-বক্তৃতায় নয়। তিনি ভারতের সাধনার রূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন দুটি ছোট কথা দিয়া—ত্যাগ ও সেবা। দশের জন্য, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ—নিজের ক্ষুদ্র অভিমান, ভোগলিপ্সা বর্জন আর ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ জ্ঞানে আর্ত, বুভুক্ষিত, অশিক্ষিত জনগণের বৈষয়িক ও পারমার্থিক অভাবমোচনের চেষ্টা। এই কার্যপন্থাদ্বয় রাজনীতি-নিরপেক্ষ, দল-মতবাদ-সম্প্রদায়-ধর্মের সহিত জড়িত নয়। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীকে স্বামীজী ইহাও তারস্বরে শুনাইয়াছিলেন যে, এই দুটি কর্মরীতিই

এ যুগের সর্বজনীন 'ধর্ম'। গভীর বিশ্বাস লইয়া যাহারা এই ধর্মের অনুশীলন করিবে তাহাদের ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ সাধনার ফল লাভ হইয়া যাইবে।

স্বামীজী স্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই—কিন্তু পরাধীন ভারতের স্বাতন্ত্র্য-লাভের সম্ভাবনাসম্বন্ধে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আরও সংশয় ছিল না ভারতের আগামী ভবিষ্যৎসম্বন্ধে। ইতঃপূর্বে ভারত বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীতে ভারতের যে পতন হইয়াছিল, স্বামীজী বলিতেন, তাহা অতি মর্মান্তিক। তবে আশার বিষয় এই যে, ভারতের ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। অমানিশা কাটিয়া যাইতেছে। ভারত আবার উঠিতেছে—আবার তাহার সম্মুখ-যাত্রা শুরু হইয়াছে। এই যাত্রা সহজে থামিবে না। অনাগত দূরবর্তী শতাব্দীগুলিকে প্রজ্ঞানেত্রে নিমেষে যেন সমীপাগত দেখিয়া স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

"এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।"

(ভাববার কথা—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ)

এই ভবিষ্যতকে সত্য করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রহিয়াছে আমাদের বর্তমানকালীনগণের উপরই। স্বাধীন ভারতে জনসেবার কী বিপুল ক্ষেত্র চারিদিকে পড়িয়া! কে সঙ্গে আসিল, না আসিল সেদিকে না তাকাইয়া স্বামীজীর দেশাত্মবোধ ও ভারতপ্রীতির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া শরীর মনের সামর্থ্যানুযায়ী যে কোন সেবার ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়া যুবকগণ কাজে নামিয়া পড়িবেন, স্বামীজীর অশরীরী প্রেরণা তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে। যত শীঘ্র ভারতের ঐহিক দুর্গতি, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষার অবসান ঘটিবে ততশীঘ্র তাহার প্রকৃত জীবন—আত্মিক জীবনের বিকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইবে। ঐ জীবনের 'সমুজ্জ্বলতার' ইঙ্গিতই স্বামীজী দিয়াছিলেন।

নিরুপায়?

গত ১১ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) হায়দরাবাদে ভারতীয় সমাজ-সেবা-সম্মেলনের এক অধিবেশনে ভারতসরকারের তপশীলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনার শ্রী এল এম শ্রীকণ্ঠের ভাষণের শেষাংশ বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি বলিতেছেন—

"বিভিন্ন উপজাতির উপর খৃষ্টান মিশনারীদের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আসামই উপযুক্ত ক্ষেত্র। লুসাই পাহাড়ে শতকরা প্রায় ৮০ জন উপজাতি ধর্মান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শতকরা ৩০ জন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। আসামের অন্যান্য স্থানে উপজাতিদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজ এখনও চলিতেছে। বিহার ও মধ্য-প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ। * * আসামের উপজাতিরা তাহাদের সঙ্গীতে ইংরেজী সুর মিশাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চার্চে যাওয়ার সময় নিয়মিত ভাবে বিদেশী পোষাক পরিতেছে। উপজাতিরা যে ধর্ম পরিবর্তনের প্রতি গভীর আগ্রহহেতু ধর্মান্তরিত হইতেছে, তাহা নহে। অর্থ, পদ, জীবন ধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াও তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করা হইতেছে। নৃতত্ত্ববিদ্ বা অন্যান্য লোকে এরূপ ধরণের প্রচারকার্য পছন্দ করুন বা না করুন, ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এইরূপ প্রচারকার্য বন্ধ করা সম্ভব নয়।"

শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ মহাশয়ের উক্তিতে যেন একটা নিরুপায়তার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বড় করুণ সুর! ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত জিনিস সন্দেহ নাই—ভারতবাসী কেহ যদি আপন রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতের মাটির বাহির হইতে আমদানী করা কোন ধর্মকে স্বেচ্ছায় বরণ করে তাহাতে চিরকাল পরমতসহিষ্ণু হিন্দুদের বলিবার কিছু নাই।

কিন্তু "অর্থ, পদ, জীবনধারণের উচ্চমান প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া" ধর্মান্তরিতকরণের সক্রিয় প্রতিরোধ হিন্দুদের তো বটেই—শতকরা ৮৫ জন হিন্দু জনসংখ্যাযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রচালকগণেরও অপরিহার্য কর্তব্য। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হউক ভাল কথা, কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মের রক্ষকত্বের দায়িত্ব এড়াইবে কি করিয়া ? রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী পর্যন্ত কেহই খ্রীষ্টান গির্জার অনাহূত অবাঞ্ছিত প্রভাবকে সমর্থন করেন নাই।

শ্রীকণ্ঠজী উপসংহারে বলিয়াছেন—

"আমার ইচ্ছা, আমাদের দেশের যুবকগণ যেন খৃষ্টান মিশনারীদের জনসেবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং দুর্গম স্থানের অবহেলিত অধিবাসীদের নিকট আশা ও আনন্দের বাণী প্রচার করেন। আমার মনে হয়—এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ এবং দেশভক্ত ব্যক্তিগণ সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন।"

খাঁটি কথা।

ছন্দে উপাসনা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কৈশোর হ'তে কবিতা লিখ্‌ছি, প্রভু এক তুমি ছাড়া
যাহা কিছু ছিল বিষয়বস্তু সব করিয়াছি সারা।
তাই বন্ধুরা কয়,
এখন কেবল পুনরাবৃত্তি হয়।
নিজেরো আমার ভাল লাগে নাক আর
একই কথা শুধু বলি আর কত বার ?
এক তুমি আছ বাকী,
বন্ধুরা বলে তোমাকে লইয়া কবিতা হয় না নাকি !
না হোক কবিতা, কারো কথা শুনিব না,
তোমার কথাই ছন্দে রচনা হোক মোর উপাসনা।
ভক্তি কোথায় পাব ?
ভক্তিমন্ত্র লইতে কোথায় যাব ?
এক বাজিকর, বাজি ছাড়া তার কিছুই ছিলনা পুঁজি,
বাজি দেখাইয়া জননী মেরীরে, মুক্তির পথ খুঁজি
পেয়েছিল শুনি, সেই সরলতা তার
কোথা পাব আমি ? মোর চারিপাশে ঘিরে আছে সংসার।
নাই মোর তপ, নাই মোর জপ, নাইক তত্ত্বজ্ঞান,
জানি না তোমার ধ্যান,
ছন্দোরচনা আছে মোর সম্বল,
আর শুধু আছে নয়নে অশ্রুজল,
ছন্দসূতায় গাঁথিয়া অশ্রুকণা
উদ্দেশে তব নিবেদিব প্রভু, তাই মোর উপাসনা।

'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি বড় কথা। কত শাস্ত্রে কত মহাপুরুষের বাক্যে জন্মমৃত্যু-চক্রের দূরপ্রসারী বিপদনিচয়ের ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ফলে ঐ চক্রের প্রতি নিঃশ্রেয়সকামীর চিত্তে দারুণ বিতৃষ্ণা অনুভব করিবার প্রেরণা আসিয়াছে! আলোকহীন আশাহীন সহায়হীন পথে যখনই অনিশ্চিততার সংশয় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে তখনই চোখের সম্মুখে নিত্য-ঘটিয়া-যাওয়া জন্মমৃত্যুর নিষ্ঠুর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া অজানা অপাওয়া আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের প্রতি মানুষের ঘুমাইয়া-পড়া ক্ষীণ উৎসাহ পুনরায় সতেজ হইয়া উঠিয়াছে—পুনরায় অন্তরের মুমুক্ষুটি দৃঢ়স্বরে জপ করিয়া চলিয়াছে—'জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, জীবন দুঃখ—সর্বং দুঃখম্।' নিরাশাবাদ!—কিন্তু ভালমন্দ বিচার যতদিন আছে, 'জানি, জানি, আরও জানি,' 'যাই যাই, সত্যের পথে আরও আগাইয়া যাই'—এই আবিষ্কার ও অগ্রগতির স্বপ্ন যতদিন রহিয়াছে ততদিন এই বাদের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বোধ করি কঠিন। মানুষের ভিতর একটি নিদ্রাহীন বৈরাগী চিরদিনই বুঝি জাগিয়া আছে!

তবুও কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের কোন পথচারীই একদিন বলিয়া উঠেন—'জন্মমৃত্যু মোর পদতলে'*—চলিতেছি, কিন্তু জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে পার পাইবার জন্য নয়—উহাদের বিভীষিকা চিত্তে আর সন্ত্রাস জাগায় না—জন্মিতে ভয় পাই না, মরিতেও নয়, প্রয়োজন হইলে বহুবার জন্মাইতে পারি, মরিতে পারি।

ইহা একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ—যেখানে সংসারের ঝড়বিপদ দুঃখকষ্টগুলি অন্তরের অপর এক বৃহৎ সংপ্রাপ্তির অনুভূতিতে একান্তই তুচ্ছ হইয়া যায়, মনে হয় এতবড় লাভ যখন অধিকারে আসিয়াছে তখন তাহার জন্য সামান্য একটু দুঃখ সহিতে পারিব না? আসিলই বা আধি ব্যাধি হতাশা প্রবঞ্চনা অপমান আঘাত ক্ষতি মৃত্যু। যে অক্ষয় ধন নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে তাহার এক তিল দিয়া ঐ দুঃখগুলিকে কিনিয়া লইতে পারি, যে অপরিসীম শক্তি সমস্ত আত্মাকে বেড়িয়া আছে উহার এককণা দিয়া যতই কেন প্রচণ্ড অভিশাপ আসুক প্রতিরোধ করিতে পারি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী 'প্রেম'-এর দৃষ্টিভঙ্গী—ভগবান মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হইয়া মানুষদেহ ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি—তাই তাঁহার ব্রত আমারও জীবন-ব্রত; তিনি যদি জন্ম-মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করিতে পারেন আমিই বা উহাদের ভয়ে মুষড়াইয়া থাকিব কেন? তাঁহাকে যে আপনার জন বলিয়া পাইয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্মভারের অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি—ইহাই তো অমূল্য সম্পদ, অপরাজেয় সামর্থ্য।

অধ্যাত্ম-রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়—

সুগ্রীব বানরগণকে সীতান্বেষণে পাঠাইয়াছেন। দিকে দিকে বনে বনে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একমাস কাটিয়া গেল—কোন

---

* "আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে,
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্ম-মৃত্যু মোর পদতলে।"
—স্বামী বিবেকানন্দ, 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'

সন্ধান মিলিল না—শরীর ক্লান্ত, প্রাণ নিরুৎসাহ। তখন বানরদের একদল জল্পনা করিতে লাগিল, কেন আমরা এই বৃথা পরিশ্রম করিয়া ফিরিতেছি? রাম আমাদের কে? ঘর সংসার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া তাঁহার জন্য এই খাটিয়া মরিয়া কোন্ পুরুষার্থ আমরা লাভ করিব? নেতা মহাবীর হনুমান তখন ঝঙ্কার দিয়া বুঝাইলেন—

অন্যদ্ গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সুত।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥
সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী॥

শুন শুন অতি গূঢ় কথা বলি। সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ রামরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন—সীতা তাঁহারই মহাশক্তি—মহামায়া।

আর আমরা?

বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্যৈব মায়য়া—

তাঁহারই মায়ায় আমরা বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

বয়ন্তু তপসা পূর্বমারাধ্য জগতাং পতিম্।
তেনৈবানুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্ষদত্বমুপাগতাঃ॥

পূর্বে জগৎ-পতিকে তপস্যা দ্বারা ভজনা করিয়াছিলাম। আমাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া তিনি অমূল্য ধন দান করিলেন—তাঁহার পার্ষদত্ব—যুগকার্যে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও স্বেদ মোক্ষণ করিবার দুর্লভ অধিকার।

তাই তো আসিয়াছি—তাঁহারই জন্য কাঁটার মুকুট পরিয়াছি। তাঁহার কাজ যতদিন না শেষ হইবে ততদিন ছুটি নাই—অতন্দ্রিত অকুণ্ঠিত কর্ম-ব্যাপৃতি—সঙ্কট ব্যথা বেদনা—মৃত্যু, হয়তো বার বার মৃত্যু। তহাতেই বা ভয় কি?

ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া।
পুনর্বৈকুণ্ঠমাসাদ্য সুখং স্থাস্যামহে বয়ম্॥

তাঁহার সেবায় যদি দেহ যায় সে তো পরম মঙ্গল। নিত্য বৈকুণ্ঠে তাঁহার সাহচর্যে নিত্য সুখ—সে ভবিষ্যৎ তো সুস্থির রহিয়াছেই।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ শ্রমণগণ 'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায়'—এই উপদেশ সাধিতে পারিয়াছিলেন কোন্ সামর্থ্যে? ভগবান তথাগতের উপর ভালবাসার সামর্থ্যে—তাঁহার জীবন-ব্রত উপলব্ধির গরিমায় নয় কি? যীশুখ্রীষ্টকে যাঁহারা মানব-দরদী ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া মানবসেবার কথা মনে পড়ে। তাঁহারাও কি গাহিতেন না 'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে'?

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভক্তি-মুক্তি লাভ করিবার উপদেশ লইতে যত ব্যক্তি জমা হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নরেন্দ্রের—ভাবী বিবেকানন্দের মতো যোগ্য অধিকারী আর কেহই ছিলেন না। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণই বহু বার বহু লোককে বলিয়া গিয়াছেন। তবুও সেই নরেন্দ্রেরই সমাধি-কক্ষের চাবিকাঠি ঠাকুর লুকাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, মায়ের কাজ করিতে হইবে। কাজ শেষ হউক, তাহার পর ঘর খুলিয়া দিব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সারা ভারত ঘুরিয়া এই 'মায়ের কাজের' স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেন। অপর শ্রীরামকৃষ্ণানুগগণের কাছে তিনি যখন উহা ক্রমান্বয়ে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অশিক্ষিত চাষা-ভূষাদের, জেলে মালাদের ইস্কুল করিব তো নিজের ধর্ম কর্ম শিক্ষা হইবে কখন? মরণপথগামী পীড়িতের মুখে জল সাগু ঔষধ দিতে বসিব তো আপনার মৃত্যু-জয়ের সাধনা করিব কোন্ অবসরে? মায়ার সংসারের দশটা ঝামেলা লইয়া মাথা ঘামাইব তো চিত্তকে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সুশান্ত করিব কোন্ ক্ষণে? স্বামীজীকে এ সকল সংশয়ের উত্তর দিতে অনেক কথা বলিতে হইয়াছিল, অনেক তর্ক করিতে, অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল, পরিশেষে ৩৯ বৎসর-পরিমিত অমূল্য জীবন খাটিয়া

শেষ করিয়া দিয়া অবিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখাইতে হইয়াছিল। বেলুড় মঠের দ্বিতলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষটির মেঝেতে ১৯০২ খ্রীঃর ৪ঠা জুলাই ভূমিশয্যায় শায়িত প্রাণ-হীন নিস্পন্দ বিবেকানন্দ-দেহের মুখখানিতে যে স্মিত প্রশান্তি অঙ্কিত ছিল তাহার মৌন ভাষায় কি এই গানই ঝঙ্কৃত হয় নাই—'জন্ম মৃত্যু মোর পদতলে' ?

ঐ গীতিই এ যুগের শ্রেয়ঃকামীদের জীবন-গীতি। আত্ম-মুক্তি নয়—বিশ্বমুক্তি. বন্ধনকে ভয় নয়—প্রেমের দ্বারা জয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী ভারতের তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আর একটি নূতন ঠাকুর রূপে প্রচার করিতে চাহেন নাই—তাহা যদি চাহিতেন তাহা হইলে যাঁহাকে তিনি 'অবতার-বরিষ্ঠ' বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন তাঁহারই ঘটিত মর্মান্তিক অপমান। স্বামীজীর ধ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মানব-সভ্যতার আদি জননী ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের ভাব-মূর্তি—আবার ভারতের আগামী কালের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যাহা 'মিশন'—উহাকে যদি ভালবাসিয়া থাকি তো সেই ভালবাসার পরিচয় দিব কি করিয়া? শুধু 'আহা উহু' করিয়া, 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' বলিয়া—না, জন্ম মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই 'মিশন' এর জন্য নিঃশেষে আত্ম-বলিদান করিয়া ?

হে রামকৃষ্ণ-সাথী

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

মর্তের নরলোকে
নরের শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ আসিলে বঙ্গ-বুকে।
ভগবান ভজি মানব কেমনে দেবতারে জয় করে,
গুরু-গৌরবে লঘু কৈতব নিমেষে কেমনে হরে
গুরু অনুসরি' লোক-সমক্ষে দেখাইলে তাই এঁকে।
হে বীর সাধক কৃতী,
অভেদের দেশে ভারতে আবার গেয়ে গেলে প্রেম-গীতি।
শিব-জ্ঞানে জীবে সেবা দিয়ে তুমি আর্য-সাম্যধারা
বহালে শুষ্ক নীতি-মরুভূমে, দেখিল বিশ্ব সারা ঃ
ভারত আজিকে গরবে বহিবে তোমার পুণ্যস্মৃতি।
তুমি অপূর্ব ত্যাগী ;
ছিলে লোকালয়ে, ছিলে না ক তুমি গুহাবাসী সন্ন্যাসী।
আপন শোণিত গণিতে সবার ধমনীর লোহ্ধার,
আপামর তাই ভাবিতে আপন ঃ মেথর চর্মকার—
কেহ নহে পর, সকলেই তব ছিল অন্তরবাসী।
হে রামকৃষ্ণ-সাথী,
যেথা দেখি যত আলোকপুঞ্জ, সে তোমারি অনুভাতি ঃ
পৃথিবীর এই পান্থনিবাসে যতটুকু প্রেম আছে,
মূলধন তার তোমারি সাধন, প্রাপ্ত তোমারি কাছে।
ভারত আজিকে করিবে গর্ব আমরা তোমার জাতি ॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

কর্মযোগ সাধনমার্গের অন্যতম। কিন্তু কর্ম বলিতে কি বুঝিব? কোন কাজ কর্ম, আর কোন কাজ কর্ম নয়—অর্থাৎ যোগ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর পাই গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে—'মা ফলেষু কদাচন।' অর্থাৎ কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু আসক্তি থাকিবে না। কথাটা বলা খুব সহজ—শুনিতেও বেশ, কিন্তু মানুষের পক্ষে অভ্যাস করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। তাই গীতার এই উক্তি যুগ যুগ ধরিয়া উপদেশের পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশমত অন্যান্য সাধনপথগুলি—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি বরং মানুষ অভ্যাস ও অনুসরণ করিয়াছে এবং ঐ পথে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সব যোগের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু কর্মযোগ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া শাস্ত্রের বাণী ও ভগবানের উপদেশেই রহিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিবার পূর্বেও নাকি গঙ্গানদীর অস্তিত্ব ছিল—ব্রহ্মার কমণ্ডলুতেই হউক, বা স্বর্গের মন্দাকিনীতেই হউক, বা হিমালয়ের পাষাণ-বক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায়ই হউক। তারপর ভগীরথ তাঁহাকে নিয়া আসিলেন পৃথিবীর বুকে, মানুষ পাইল জীবনের সন্ধান—গঙ্গার পূত স্পর্শ, তৃষ্ণার জল, আর শ্যামলশস্যরূপ আশীর্বাদ! অনাসক্ত কর্মযোগও তেমনি ছিল শাস্ত্রের কমণ্ডলুতে লুক্কায়িত। স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম তাহাকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া দিলেন। একথার মধ্যে একবিন্দু অতিশয়োক্তি নাই। পুরাকালে মুনি ঋষিরা যাগযজ্ঞ করিতেন যতখানি মানুষের কল্যাণের জন্য, তার বেশী করিতেন নিজের মুক্তির জন্য। পরবর্তী কালে প্রজাদের হিতের জন্য রাজা ও জমিদারগণ জলাশয়-খনন, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করিতেন প্রধানতঃ পরপারের পাথেয়-সংগ্রহের জন্য। পাশ্চাত্যের মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া অনেক পার্থিব উপকার করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের ধর্মমত-প্রচার, মানুষের কল্যাণ-সাধন একটা গৌণ ব্যাপার। তাঁহাদের কাজ বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার ফলে অনাসক্ত বা নিষ্কাম কর্মের পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই। কর্তব্যবুদ্ধিচালিত হইয়াও অনেকে সৎকর্ম করিতেন। কিন্তু তথাকথিত কর্তব্যপালনে কামনা নিহিত থাকে বলিয়া সে কাজও সকাম। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কেহ কেহ জীবনে মাঝে মাঝে দুচারিটা নিষ্কাম কর্ম করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম কর্মযোগের সমষ্টিগত প্রয়োগ দেখাইলেন। কর্মের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত করারূপ অনাসক্ত ও নিষ্কাম কর্মের গঙ্গাপ্রবাহ আনিলেন স্বামীজী। তিনি যে দিন কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'আমি চাই না মুক্তি, চাই না ভগবান, একটি কুকুরের মুক্তির জন্য আমি সহস্রবার জন্মপরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত'—সেদিন কি পৃথিবী নূতন কথা শুনিল না? নিজের কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া নয়, নিজের পার্থিব আর দশটা কাজের পাশাপাশি নয়, অন্তর্গূঢ় কোন উদ্দেশ্যের জন্য নয়—কর্মের জন্য নিষ্কামভাবে সম্পূর্ণভাবে তিনি আত্মনিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন—'যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা

অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখ নরকে যাব।'

স্বামীজী এইরূপ উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পৃথিবীর বুকে ব্যাপকভাবে কর্মযোগের প্রবর্তন করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। তিনি তখন সদলবলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রোগাক্রান্তদের সেবায়—নারায়ণজ্ঞানে সেবায়। ঘোষণা করিলেন, এই কাজের জন্য প্রয়োজন হইলে বেলুড়মঠ-স্থাপনের জন্য ক্রীত জমি বিক্রয় করিবেন। তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয় হইতে উত্থিত এই ঘোষণা গম্ভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। আসক্তিহীন কর্মপ্রেরণার এইরূপ দৃষ্টান্ত ইহার পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। দেশে তিনি কর্মের বান আনিলেন। মুর্শিদাবাদে, আর অন্যান্য নানাস্থানে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের সেবকার্য সুরু হইল। সেবার পথে কর্ম, মুক্তির জন্য নয়—নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবা। উচ্চারণ করিলেন নবমন্ত্র, দুঃস্থিত জীবের নবপরিচিতি—'দরিদ্রনারায়ণ'।

স্বামীজী যে কর্মযোগের প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফলে, একমাত্র সেই প্রেরণার ফলেই আজ দেশব্যাপী নানাপ্রকার জনহিতকর কর্মের অভিযান চলিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশ সেই ত্যাগী সন্ন্যাসীর বাণীর প্রধান সুরটি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। যন্ত্রযুগে যন্ত্র আসিয়া মানুষের স্থান দখল করিয়াছে। কর্মও ফলে হইয়া দাঁড়াইয়াছে যান্ত্রিক। মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে যেন কোন তফাৎ নাই। তাই জীবপ্রেমের মন্ত্র মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে। আসিয়াছে দলের জন্য বা দলাদলির জন্য কাজ—মতবাদ-প্রচারের জন্য কাজ এবং ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির জন্য কাজ। এইরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জনহিতকর কাজকে আর যাহাই বলা যাক্, কর্মযোগ বলা যায় না।

কেন এমন হইল? অর্থাৎ সাধনার পথ ছাড়িয়া কর্মের ধারা কেন একটা যান্ত্রিক বা হুজুগের পথে প্রবাহিত হইল? ইহার কারণ এই যে, সাধনার মূলকেন্দ্র মানুষ বা জীবের প্রকৃত সত্তা কি তাহাই ভুলিয়া গিয়া আমরা কর্ম করিতে মাতিয়া উঠিয়াছি। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত সত্তা বা পরিচয় কি তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু তাহার তথাকথিত secular (বৈষয়িক) রূপটি দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া আছি। এই অন্ধ secularism (বৈষয়িকতা)-এর মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাই ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে আর দার্শনিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া আমরা দেখিতেছি বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া, তথাকথিত secular দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা। তাই আমরা ভাবি শুধু মানুষের জঠরের বুভুক্ষার কথা—ভুলিয়া গিয়াছি তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধাকে। অথচ এই ক্ষুধা আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য প্রাণী হইতে বিশিষ্টতর। আত্মার বুভুক্ষা জাগিয়াছে বলিয়াই মানুষ আজ হইতে পারিয়াছে স্রষ্টা, পাইতেছে জ্ঞানের আলোক, দার্শনিক দৃষ্টি ও সত্যের সন্ধান। চরম বিশ্লেষণে বিবর্তনের পথে মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রধানতঃ আত্মচেতন জীব। এই প্রকার উন্নততর জীব মানুষ লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে secularismই যদি সর্বকর্মের ভিত্তি হয় তাহা হইলে আমাদের কাজকে তুলনা করা যায় শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে। অর্থাৎ সমগ্র মানুষটির সেবা না করিয়া করিতেছি তাহার শবদেহের সেবা। কিন্তু মানুষ বলিতে একদিকে যেমন বুঝায় রক্তমাংসের প্রাণী, তেমনি আবার বুঝায় চৈতন্যের প্রতীক আত্মচেতন জীব। এইরূপ মানুষের সভ্যতা বলিতে শুধু কলকব্জার আবিষ্কার এবং দৈহিক ও সামাজিক সমস্যার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাধানই বুঝায় না। স্বামীজী বলিতেন, জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চৈতন্যের আবিষ্কারই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। সত্যের সন্ধান করিতে করিতে বিজ্ঞানও আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে

সেখানেও কি এই ইসারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না? জড়ের চরম সত্তা আবিষ্কার করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্যের আভাস পাইতেছেন, তাহাকে আর তাঁহারা নিছক জড় বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কারই যদি মানুষের ধর্ম হইয়া থাকে, তবে সেই মানুষের যাবতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন secularism-এর ভিত্তিতে হইতে পারে না। মানুষকে সর্বতোভাবে secularism-এর নাগপাশে বাঁধিয়া তাহার অন্তরতম চৈতন্যের সন্ধানকে ব্যাহত করিবার প্রয়াস পাইলে মানুষ ক্রমবিবর্তনের পথে প্রচণ্ড বাধা পাইবে। তাই তাহাকে এই নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে হইবে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কারের সাধনার পথে। মহত্তম পূর্ণতার যাত্রাপথে আপন অন্তর্নিহিত দেবত্বের অভ্যুদয়ে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। ইহাই কর্মযোগীর শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই কর্ম যান্ত্রিক কর্ম নয়, ইহা সাধনা। এই সাধনার জন্য সত্যিকারের কর্মযোগীর প্রয়োজন, যন্ত্রের নয়। কিন্তু secularism-এর শিক্ষায় আমরা যন্ত্রে পর্যবসিত হইতে বসিয়াছি। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, এই সাধনার জন্য প্রকৃত কর্মযোগী গঠন করিতে। এইরূপ কর্মযোগী তৈরী করাকেই তিনি বলিতেন মানুষ তৈরী করা।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, ত্যাগী, চরিত্রবান কর্মী, যাহারা 'পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবে;' 'উদ্ধারকর্তারূপে নহে, সেবকরূপে অন্নবস্ত্র, বিদ্যা, জ্ঞান লইয়া জনসাধারণের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত কর্ম করিবার জন্য দৃঢ়হৃদয় কর্মী।'

শিক্ষাদানব্রত স্বামীজীর কর্মপ্রণালীর অন্যতম প্রধান সাধনা। তিনি বলিয়াছিলেন 'মানুষ গড়ে তোলাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হোক্। মনে রেখো, এই আমাদের একমাত্র সাধনা।' স্বামীজী-প্রবর্তিত কর্মযোগের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তাঁহার এই সাধনার কথা সর্বোপরি মনে রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপর্যয়ে মানুষের সেবা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এইরূপ কর্মের তিনিই প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সেবা করাই চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। মানুষের মত মানুষ তৈরী করিতে পারিলে অনেক সমস্যারই আপনা হইতে মীমাংসা হইয়া যাইবে। তখন সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যাধি ও বিপর্যয় দূরীভূত হইলে মানুষ মহত্তম পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। মানবজাতির এই অগ্রগতিতে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সেই জন্য চাই যথার্থ কর্মী গঠন করা। ইহাই ছিল স্বামীজীর কর্মযোগ।

পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ত্যাগী বীরহৃদয় আত্মবলিদানে প্রস্তুত কর্মীর জন্য স্বামীজী যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, দেশ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। সেই সাড়ার ফলেই দেশে দেখা দেয় নবজাগরণ। এইরূপে স্বামীজীর আহ্বানে জাগরণ আসিয়াছিল বলিয়াই—পরবর্তী কালের নেতৃবৃন্দের আন্দোলন সম্ভব হইয়াছিল। আজ সেই আন্দোলনের ফলে দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে। স্বাধীনতা আসিয়াছে সহস্র সহস্র নির্ভীক নরনারীর ত্যাগ ও আত্মবলিদানের পথে। এইরূপ আদর্শ কর্মী গঠনের যাদুমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু মানুষ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ হয় নাই; বরং সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতালাভ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মহাবিপ্লবের সূচনামাত্র। ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। জ্ঞানের জন্য, আলোকের জন্য, শান্তির পথনির্দেশের জন্য অনেকেই আজ স্বাধীন ভারতের দিকে চাহিতে সুরু করিয়াছেন। আজ

আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অদ্ভুত ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসহায়ে এই কর্মযোগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

পৃথিবীর ভাবরাজ্যে যে বিপ্লব আসিবে, তাহার পরিণতি হইবে ভারতীয় আদর্শের জয়াভিষেকে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য, ইহাকে মহত্তম পূর্ণতার পথে চালিত করিবার জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা জগৎ জয় করিয়া ভারতকে আবার জগতের নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে—ইহাই ছিল স্বামীজীর কর্মযোগের লক্ষ্য। তাই তিনি মানবজাতির পরমকল্যাণকর কর্মযোগ বিশ্বে প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ ধর্মমত প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; ভৌগোলিক সীমানায় তাহার নির্দেশিত কর্মযোগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। এই কর্মযোগের প্রবর্তন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিবার গুরু দায়িত্ব স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের উপর দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের এই গুরু দায়িত্ব যেমন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনই আবার এইদিকে তাহার সীমাহীন সুযোগ ও সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ইঙ্গিত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মপিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে; ইহাকে মিটাইতে পারে একমাত্র ভারতবর্ষ।

যান্ত্রিক বুভুক্ষা ও আত্মিক বুভুক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। সেই সংঘর্ষে একদিকের কাণ্ডারী হইবে ভারতীয় আদর্শ, অপরদিকে পাশ্চাত্য জড়বাদ। সেই সংঘর্ষে মানবকল্যাণকর ভারতীয় আদর্শের পতাকা বহন করিবার জন্য স্বামীজী বারবার কর্মিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিবার সময় আসিয়াছে। প্রয়োজন হইয়াছে একনিষ্ঠ কর্মযোগীর যাহারা জড় ও চৈতন্যের সংঘর্ষে চৈতন্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সমগ্র মানবজাতির মহত্তম পরিণতির যাত্রাপথে নেতৃত্ব করিবে। এই অভিযানে কর্মযোগীর দায়িত্ব অসীম। পথ বন্ধুর, সংগ্রাম প্রচণ্ড। তাই কাণ্ডারী হুশিয়ার।

প্রার্থনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রীপুত্র-সংসার ল'য়ে দিনগুলি যায় বয়ে,
দুঃখে সুখে আলোয় আঁধারে।
এবার করুণা ক'রে পথে নিয়ে যাও মোরে,
ছড়াবো নিজেরে দুইধারে।
আপনারে বিস্তারিয়া যে-আনন্দ পায় হিয়া
সে আনন্দ অনির্বচনীয়!
নিজেরে একই ঠাঁই বেঁধে রাখা যাতনাই,
মরণ সে—জানিও, জানিও।
গণ্ডী টানি চারিধারে কেন আছো কারাগারে?
কেন রহো বৃক্ষের সমান

শিকড়ে আঁকড়ি মাটি? কামনার গুটি কাটি
নীলাকাশে হও ধাবমান।
পুঁথি পড়া হোলো ঢের! লভিলে কি অসীমের
অমৃত-রসের আস্বাদন?
পেলে কি শাশ্বত শান্তি? ঘুচিল মনের ক্লান্তি?
মিটিল কি মর্মের কাঁদন?
বুদ্ধিরে সারথি ক'রে কত দূর যাবি ওরে?
বিচারের প্রান্তে অন্ধকার!
ও পথে গিয়েছে যারা—ফিরে এসে বলে তারা;
হালে, ভাই, পানি পাওয়া ভার।

শ্যাম্পেনে মোটরে হায়, প্রাণের শূন্যতা যায় ?
রূপসীর অধরের সুধা—
ক্ষণিকের ছায়া সে তো ! ছায়া দিয়ে মেটে না তো
অন্তরের অনন্তের ক্ষুধা।
খ্যাতি সে তো মরীচিকা ! রঙ তার হয় ফিকা !
জ্ঞানী তারে করে না কামনা।
জ্বালা যায় মালা দিয়ে ? অচল আধুলি নিয়ে
হাটে ফেরা—সে তো বিড়ম্বনা !
ভেঙে দাও, ভেঙে দাও খেলা-ঘর, নিয়ে যাও
ঐ মুক্ত আকাশের তলে।
মেঠো পথ আঁকা-বাঁকা, দিগন্ত স্বপন-মাখা,
তরী চলে 'জলঙ্গী'র* জলে।
দিগন্তবিস্তারী মাঠ, কোথাও বা খেয়াঘাট,
কাদাখোঁচা পুচ্ছটী নাচায় ;
ওড়ে নীলকণ্ঠ পাখী, পল্লব-আড়ালে থাকে
আরণ্যকপোত গান গায়।
বন-মল্লিকার গন্ধ প্রাণে ঢালে কী আনন্দ !
সমীরণে মধু, শুধু মধু !
রাখাল বাজায় বাঁশি, ঘাটে শুনি মিষ্ট হাসি,
ঘট ভরে কিষাণের বধূ।
হাতে বই কবিতার, নির্জন নদীর ধার,
দূরে দূরে চরিতেছে ধেনু।
বসি সেথা কিছুক্ষণ কাব্যপাঠে দিই মন,
মর্মে বাজে কি মধুর বেণু।
এই ভালো, এই ভালো ; পথে চলো আর ঢালো
আপনারে সকলের মাঝে !
ঘনায়ে আসিছে রাতি, ঘরে ঘরে জ্বলে বাতি,
কুটীরে কুটীরে শঙ্খ বাজে।
আদরে যে লয় ডাকি তার ঘরে মাথা রাখি,
ক্রমে আসে যত নর-নারী ;
কথামৃত করি পাঠ, বসে আনন্দের হাট,
পর নয়, সবাই আমারই।
শেষ রাত্রে উঠে পড়ি, যাত্রা ফের সুরু করি,
দিগন্তে কাহার হাতছানি ?
রামকৃষ্ণপদাশ্রিত কার ভয়ে তুই ভীত ?
কণ্ঠে তোর ঠাকুরের বাণী।

* নদীয়ার নদী ; পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে।

শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্

স্বামী আদিনাথানন্দ

জীব অসীমপ্রত্যাশী। জীবের চিত্তবৃত্তিমাত্রই সীম পিপাসায় হা হুতাশের মধ্য দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া চলিয়াছে। আরও জানিতে, আরও ভালবাসিতে, আরও পাইতে, আরও ধর্মকর্মা সত্যসঙ্গ হইতে জীবের কি প্রয়াস চলিতেছে। যেন সে এক অব্যক্ত পূর্ণতাকে ব্যক্ত করিয়া এক বিরাট ভূমিকায় আবির্ভূত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে। এই অব্যক্ত প্রেরণাটি কি বস্তু ? উপনিষদের ঋষি আবিষ্কার করিলেন এই হাড়-মাংসের খাঁচার মধ্যে এক চিন্ময় সত্তা—যিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা হইয়া 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—। এই সত্তাই জীবকে কোথাও সীমাকে স্বীকার করিতে দিতেছে না। এ যেন বহির্দেশে কুঞ্জাভিসারী করিবার জন্য বংশীবদনের নিত্য বংশীর আহ্বান। আণ্ডারহিল্ (Underhill) তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ইহাকেই "His innate tendency to that Absolute spiritual weight" (জীবের সর্বনিরপেক্ষ অধ্যাত্মসত্তার তাৎপর্য-অনুভবের এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্তর প্রয়াস)

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই চূড়ান্তলক্ষী প্রত্যাশাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তন-সাধন করিতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সেই আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে। নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাকপ্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেতো। সীমাবদ্ধ সৃষ্টিতে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু তার মন বলছে এই সমস্তের সত্য রয়েছে সীমার অতীতে।'

জীবের মন জ্ঞান-অনুভব-ক্রিয়ারূপ ত্রিমুখী বৃত্তি লইয়া আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। এই ত্রিতয়বৃত্তিশীল মন লইয়াই মানুষ বিশ্ব-সংসারকে ধরিতে, বুঝিতে, ব্যাখ্যা করিতে, উপভোগ করিতে চাহিতেছে। এই প্রচেষ্টা হইতেই জন্ম নিয়াছে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যসাধনা ও সৌন্দর্যচর্চা।

বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণকে এই মনটুকু দিয়াই ধরিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহার পরিচয় পাই ঋগ্বেদের ঋষিগণের গানে, স্তবে, ও বিভিন্ন সূক্ত-গুলিতে। ঐ যুগে আর্যমনীষা কবিত্বানুরাগী ছিল। ঋষিগণ আবেগভরা অনুভূতি লইয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

ক্রমে বিশ্বপ্রকৃতির লীলাসন্দর্শন করিয়া তাঁহারা সহজাত কার্য-কারণ-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মহাশক্তির কল্পনা করিলেন। শুদ্ধির উচ্চস্তরে আরূঢ় হইয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অনুভব করিলেন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া এক পরম দ্যুতিময় সত্তা বিরাজ করিতেছে। গায়ত্রীমন্ত্র এই তত্ত্বের প্রকাশক। এই সর্বব্যাপক চিন্ময় সত্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্সু,
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
ওষধীষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

ইতঃপূর্বে যে সকল বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া বলিলেন—একই তত্ত্ব বিভিন্ন দেবদেবীর শক্তিরূপে সৃষ্টি-তন্ত্রে প্রকটিত হইতেছে। সৃষ্টিপ্রকটিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তাঁহারা এক 'ভাগবত সৌন্দর্যের' পরিপ্রকাশরূপে অনুভব করিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই তত্ত্ব 'মহাদেবী'-রূপে ব্যাখ্যাত হইল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহাকেই চরম কৃষ্ণতত্ত্বরূপে উপস্থাপিত করিলেন। ইঁহাদের মতে জড়দেহবাসী জীবের কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণের অর্থই হইতেছে প্রকারান্তরে এই অপ্রাপ্ত প্রেমসুন্দরের টান। কারণ সেই অমৃত-স্বরূপ রসঘন, জ্ঞান-ঘন পরমাত্মাই জীবজগতে জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমরূপে লীলায়িত এবং কাব্যানু-ভূতির মাধ্যমে রসতত্ত্বরূপে প্রকটিত হয়।

কিন্তু আর্যমনীষা এই 'একেশ্বরবাদ' (Mono-theistic)-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তৃপ্ত রহিল না। বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক, কার্য-কারণ-বুদ্ধিদ্বারা উপস্থাপিত দৃষ্টিভঙ্গী চরম বলিয়া প্রতিভাত হইল না। তাই দেখিতে পাই সংহিতোত্তর কালে দর্শনচিন্তা আরও গভীরভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এখন হইতে শুরু হইল অন্তর্জগতের বিশ্লেষণ, জ্ঞান-ভূমির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করিয়া জগৎ ও জীবনের রহস্যের কেন্দ্রানুসন্ধান। এই যুগে ঋষিগণ বিশ্ব-প্রকৃতির সামনে দাঁড়াইয়া ভীত বা বিস্ময়বিহ্বল নহেন। আদিকারণকে মানুষীকৃত করিয়া (anthropomorphism) সন্তুষ্ট করিতে এবং অভীষ্টলাভের জন্য যজ্ঞরত বা প্রার্থনাপরায়ণ নহেন। ধ্যানের গভীরতায় নিবিষ্ট বুদ্ধিসহায়ে সৃষ্টির তাৎপর্য উদ্ঘাটনে নিরত হইলেন। এখন হইতে পথ হইল epistemological (জ্ঞানবিশ্লেষণমূলক) এবং subjective (জ্ঞাতৃনিষ্ঠ)। এই নূতন ভঙ্গিমায় বিচার করিয়া এবং পরিশেষে 'ধ্যানযোগাৎ'—সূক্ষ্মবুদ্ধি-সহায়ে সৃষ্টির নিদান আত্ম-চৈতন্য কেন্দ্রে

অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ ঘোষণা করিলেন 'অয়মত্মা ব্রহ্ম', 'নেদং যদিদমুপাসতে'। কারণ, যাহা জ্ঞেয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং কল্পনার বিষয় তাহা চিরন্তন সত্য নহে। তাঁহারা জীবের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করিয়া দুইটী অবিসংবাদী পদার্থ পাইলেন—একটী নিত্য স্থির অবাধিত জ্ঞান বা চেতনা, অপরটি 'জ্ঞেয়'—যুষ্মৎপ্রত্যয়-বিষয়যোগ্যত্ব যাহার ধর্ম। আমরা যাহাকে 'বিষয়জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি উহা চিত্তের মধ্য দিয়া প্রকটিত নিত্যজ্ঞান। কিন্তু চিত্তমূল বলিয়া বিনাশ-ধর্মী, মর্ত্য এবং তদ্ধেতু হেয়। জড়জগতের যাবতীয় বস্তু চিত্ত-স্পন্দনের মধ্য দিয়া প্রমাতা আমি' বিষয় হয়—অন্য ভাষায় 'আমার চেতনা'র নিকট দৃশ্য হয়। তাই চিত্তবৃত্তির অবস্থানকালীন দৃশ্যস্থানীয় বস্তু সত্তা লাভ করে এবং তদভাবে উহা অন্তর্হিত হয়। এই জন্যই জ্ঞেয়রূপী জগৎ এবং চিত্তের বৃত্তিস্থ যাবতীয় অনুভূতিই পরিবর্তনশীল বলিয়া অবস্তু। নিত্য সাক্ষি-ভূতজ্ঞানই বস্তুকারণ, ইহার সত্তা অবাধিত। এই জন্যই বিবেকী পুরুষগণ বিভিন্ন অনুভূতির অধিষ্ঠানস্বরূপ জ্ঞানকেই আত্মস্বরূপ জানিয়া অবস্থান করেন। উপনিষদের ঋষিগণ এই 'জ্ঞান'কেই সর্বব্যাপক ভূমা আখ্যা দিলেন। কারণ এই 'জ্ঞানের' কোন পরিধি থাকিতে পারে না। যে সত্তা দেশ কাল ও নিমিত্তের স্বপ্রকাশ অববোদ্ধা, উহা সীমাতীত ভূমিতে অনন্ত কাল অবস্থিত থাকিয়াই সব বস্তুর অবভাসক হয়। আমরা দেখিতে পাই ঐ যুগে কতিপয় দার্শনিক ঋষি বিভিন্ন চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া এই মহান আত্মতত্ত্বে উপনীত হইলেন। বৃহদারণ্যক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই চিন্তাধারার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। জীবের প্রাত্যহিক জীবনের জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাত্রয় বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, আমাদের সত্তার এমন দিক আছে যাহার বিস্তার আরও অন্তরের দিকে—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ চিত্তের স্পন্দন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গণ্ডীর অতীতে যাহার স্থিতি। তাই তাঁহারা বলিলেন 'যদা বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্'—অর্থাৎ বুদ্ধির যাবতীয় বিক্রিয়া উপশান্ত হইলে যে নিশ্চল জ্ঞান, এই ভাব ও অভাবের দ্রষ্টা উহাই জীবের স্বকীয় সত্তা এবং ঐ অবস্থায় স্থিতিলাভই পরম শান্তির উপায়। আমাদের চেতন মন ও অবচেতনার ওপারে স্বকীয় সত্তার মধ্যেই একটি সুসূক্ষ্ম নিভৃত লোক আছে যাহাকে বলা যায় তুরীয়। সেই তুরীয় ভূমিতেই জীবের সত্যকারের আবাস। এই ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বরেণ্য ঋষি বলিলেন, "অহংপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" তাঁহারা আরও বলিলেন, "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ। এষোঽস্য পরমো লোকো এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥"

ভারত ও আমেরিকা*

শ্রীগগনবিহারী এল্ মেহতা

এক ভাবে—সম্ভবতঃ বিপরীত ভাবে, বলা যায় যে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক সুরু হয় কলাম্বাসের আবিষ্কার থেকে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে তিনি যেন দৈবাৎ আমেরিকায় এসে পড়লেন। অবশ্য বলতে পারা যায় যে, কলাম্বাস যদি আমেরিকা আবিষ্কার না করতেন তাহলে অন্য কেউ করত, কিন্তু সে যাই হোক, তিনি খুঁজছিলেন ভারত কোথায়। পরবর্তী বহু বছর ধরে ভারত বৃটিশ, পর্তুগীজ, ডাচ্, ফরাসী প্রভৃতি

* আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীমেহতা কর্তৃক নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে ১৭।১।৫৩ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত

পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে তাকে ইংরেজ-শাসনাধীনে আসতে হল বলেই ইংলণ্ড বা সংযুক্তরাজ্যের সঙ্গে তার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অনেক দিক দিয়ে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল। আমেরিকা-দেশের সঙ্গে আমাদের সরাসরি যোগ খুব কমই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—১৮১০, ১৮৩০ ও এরই কাছাকাছি কোন সময়ে কয়েকজন আমেরিকান মিশনারী ভারত পরিদর্শনে আসেন এবং সেই থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। এঁদের কাজ ছিল জনসেবা ও বিশেষ করে যাদের বলা যেতে পারে 'অধিকার-বঞ্চিত' হেয়, ও নগণ্য, তাদের সামাজিক অভাব পূরণ করা। বহু আমেরিকান পর্যটক মাঝে মাঝে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন এবং ভারত-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। কেউ বা ভারতের ধর্মভাবে, কেউ বা তার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্যবিভবে মোহিত হয়েছেন; আবার অন্যে তার দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট ও অন্যান্য বিভিন্ন অবস্থা দেখে কিছুটা হতাশও হয়েছেন।

এদেশে বহিরাগত ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, কিন্তু সেই প্রথম যাঁরা এদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে আমি যথার্থই বলতে পারি ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক দূত। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দেন এবং তাঁর কথায় ও লোকেদের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি যে বাণী বহন করে এনেছিলেন তার গভীর ছাপ রেখে যান। এর পরেই এই শহরে প্রথম একটি বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ আর একবার এদেশে আসেন। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাক্ষাৎ-ভাবে সাংস্কৃতিক সংযোগ-স্থাপনের যত সুযোগ এসেছিল এইটি তার মধ্যে প্রাচীনতম। অবশ্য এ ছাড়াও কয়েক জন আমেরিকান মনীষী ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করছিলেন এবং ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিতও হয়েছিলেন। এমার্সন ও ট্রানসেনডেন্টালিষ্টরা এইভাবে হিন্দু চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কয়েকটি আমেরিকান লেখক ও গ্রন্থকারের লেখা অনুসরণ করে চলতেন। এমার্সন তাঁদের মধ্যে একজন। এঁদের মধ্যে আরও পড়েন কবি হুইটম্যান ও লঙ্‌ফেলো, কয়েকজন ঔপন্যাসিক, মার্ক টোয়েনের মত হাস্যরসিক। একথা অনেকেই জানেন, যে সব গ্রন্থকাররা মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করেন, থোরো (Thoreau) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। থোরো একবার বলেছিলেন যে, অন্যায় যখন প্রবল হয় তখন কয়েদখানাই হল ন্যায়বানের প্রকৃত স্থান; গান্ধীজীর চিন্তার সঙ্গে এটা খুব মিলে যায়।

এও সত্যি যে আমাদের দেশের কয়েকজন বিখ্যাত লোক এদেশে এসেছিলেন এবং এখানের লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের লেখাও পড়েছেন। সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, দু'জন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন; একজন সাহিত্যে, অপরে পদার্থবিদ্যায়। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই অল্প। তবুও সাহস করে ঐ বিষয়ে যদি কিছু বলি তাহলে বলতে হবে যে আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত শ্রেষ্ঠ কবি জন্ম নিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি এদেশে এসেছিলেন ও তাঁর অনেক বই, কবিতা ও উপন্যাস আজও এখানে পঠিত হয়। আর একজন মহিলা কবি তথা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বক্তা সরোজিনী নাইডু যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন ও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার কারাবাসও করেছিলেন এবং যিনি একাধিকবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করেন ও স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের একটি রাজ্যের রাজ্যপাল

হন—তিনিও এদেশে এসে নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও গান্ধীজী, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের লেখা এখানকার লোক আগ্রহ-ভরে পড়ে থাকেন।

সম্প্রতি আমি পশ্চিম আমেরিকার মধ্যাংশে ভ্রমণ করে এসেছি। সাধারণতঃ এই অংশটিকে আমেরিকার এক বিচ্ছিন্ন অংশ বলেই ধরা হয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে দেখেছি যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শুধু অন্তর্জাতীয় সমস্যা-সম্বন্ধে নয়, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া-সম্বন্ধেও জানবার এক প্রবল আগ্রহ রয়েছে। আরও দেখলাম, কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা নয়, ব্যবসায়ীরাও গান্ধীজী ও নেহেরুর লেখাগুলি পড়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ভারত ও আমেরিকার সাংস্কৃতিক সংযোগ সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের এগারটি শাখা অনুরূপ কার্যধারায় ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করে আসছেন। তা ছাড়া কয়েক বছর ধরে একদল ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় থেকে পড়াশোনা করছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে খুব কম ভারতীয় ছাত্রই এদেশে এসেছিল। তার আংশিক কারণ এই যে, আমেরিকা আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে—ভূমণ্ডলের সেই অপর পৃষ্ঠে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে একে পাতাল বলেছে (অনুগ্রহ করে এ কথাটায় দোষ নেবেন না, কেননা যে অর্থে এ শব্দটি আমরা ব্যবহার করি অন্যত্র তা নয়) এবং আমার এখানে আসার কথা যখন ঘোষিত হল, তখন কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি পাতালে যাচ্ছি নাকি! যদি আপনারা একটি ভূমণ্ডলের মানচিত্র নিয়ে তার মধ্য দিয়ে পেন্সিল চালান তাহলে দেখবেন ভারতের ঠিক বিপরীত দিকে সম্ভবতঃ রয়েছে ফ্লোরিডা বা টেক্সাস্। এতটা দূরত্ব নিঃসন্দেহে একটা সমস্যা হয়েছিল। তা ছাড়া ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকায় সরকারী চাকরী বা আইন বা চিকিৎসা-বিষয়ে আমাদের দেশে ব্রিটিশের দেওয়া উপাধিই গ্রাহ্য হত, যন্ত্র-শিল্পে ও রাসায়নিক ব্যবসায়ে ব্রিটিশ যে কর্মমান ও কর্মসূচী অবলম্বন করত আমাদের দেশে সেইটাই স্বীকৃত হত। ফলে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এদেশে আসার জন্যে খুব একটা তাগিদ ছিল না। প্রায় ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে শিল্পবিজ্ঞান, পূর্তবিদ্যা ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার সাফল্যের কথা ক্রমশঃ বেশী বেশী করে জানা যেতে থাকে, আর তদবধি ভারতীয় ছাত্ররা দলে দলে এ দেশে আসতে লাগল। শিল্পবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে বহু ভারতীয় ছাত্র যখন দেশে গিয়ে বেশ প্রসার লাভ করল, তখন স্বভাবতই তাদের উন্নতি দেখে আরও অনেকের উৎসাহ জাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে শিল্পক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নতিতে শুধু যে ইউরোপ মুগ্ধ হয়েছিল তা নয়, সারা জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল; সে জন্যেই দেখা যায়, নানান বৃত্তির সাহায্য নিয়ে দলে দলে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় ছাত্ররা এদেশে আসতে সুরু করেছে।

আজ আমেরিকায় প্রায় ১৫৭০ জন ভারতীয় ছাত্র আছে। তারা যন্ত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। এ ছাড়া এদের অনেকে আবার সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, পৌরশাসন-বিজ্ঞান, ব্যবসা-নির্বাহ প্রভৃতি মানবতান্ত্রিক বিষয়েও অধ্যয়ন করছে। এদের মধ্যে প্রায় এক শতের বেশী মহিলাও আছেন। তাঁরা চিকিৎসা, শিক্ষণরীতি, শিশুমনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত ও ডলারের সঞ্চয় কম থাকার দরুণ, ভারত সরকার বিদেশে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া সংকোচ

করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এদেশের কয়েকটি বৃত্তি-ব্যবস্থার বদান্যতায় বহু ছাত্র এখানে আসতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ফোর্ড, রকফেলার, ফুলব্রাইট প্রভৃতি বৃত্তি উল্লেখযোগ্য। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত যত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় এসেছে তাদের সংখ্যার তুলনায় এই ১৫৬০ কি ১৫৭০ সংখ্যাই সর্বোচ্চ হবে। এদের মধ্যে অনেকে নিজের খরচায় এলেও বেশীর ভাগ আসতে পেরেছে শুধু এই সব বৃত্তি এবং অর্থ নৈতিক সাহায্য ছিল বলে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক যোগ্য ছাত্রকে ব্যক্তিগত বৃত্তি দেওয়ার ফলে তাদের এখানে আসা ঘটেছে। সত্যি এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, আমেরিকার বিশেষ কোন কোন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা নিজেদের পকেট-খরচা বা একদিনের খাবার বাঁচিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের এখানে আনতে সক্ষম হয়েছে।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, অন্তর্জাতীয়তা এখনও শুধু আশামাত্র, বাস্তব কিছু নয়, তাঁদের এ সব ঘটনা অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। কারণ, প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি যাই করুক না কেন, অজ্ঞাত-পরিচয় নরনারীরা, যারা অনগ্রসর বা নগণ্য ও অপরিচিত তারা এ সব ক্ষেত্রে সক্রিয় সংযোগিতা করছে। পক্ষান্তরে ফুলব্রাইট এ্যাক্ট, ফোর্ড ফাউনডেশন প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-সংস্থার সাহায্যে বহু আমেরিকান ছাত্র ও শিল্পী ভারতে যেতে সক্ষম হয়েছে। গত বছর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'ইণ্ডিয়া প্রোজেক্ট' নামে একটি কর্মসূচী রচনা করেন। তার ফলে সাত আট জন আমেরিকান ছাত্র ভারতীয় পরিবেশে বাস ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করবেন এবং হাতে নাতে ভারতের সমস্যা-সম্বন্ধে অবহিত হবেন বলে ভারতে গিয়েছেন। এ বছর (১৯৫৩) মিনেসোটা (Minnesota) ও সাইরাকিউস (Syracuse) বিশ্ববিদ্যালয়ও ঐ পথ অনুসরণ করেছেন। এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় জানবার জন্যই যান— যেমন শ্রমিকদের অবস্থা, ভূমি-সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী-আন্দোলন, শিশু-আন্দোলন ইত্যাদি। এ সব প্রচেষ্টাকে খুবই প্রশংসা করতে হয়, কারণ, এটাও সত্যি যে, সব ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে এদেশে আসা সম্ভব নয় বা সব সময় বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবার জন্য আমরা বেশ কিছু টাকা খরচ করি ; এদেশে ১৬০০ ও ইংলণ্ডে ১৬০০ ছাত্রের শিক্ষা নেবার বন্দোবস্ত আমাদের করতে হচ্ছে। জগতের খুব কম দেশই বিদেশে ৩০০০।৪০০০ ছাত্রের পড়ার জন্যে এতটা খরচ করে থাকে। আমার বিশ্বাস যে, যদি চীন ও কানাডার ছাত্রদের ধরা না যায় তবে আমেরিকায় সম্ভবতঃ ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী হবে।

তাই সংবাদপত্রের চমকপ্রদ শিরোনামা বা অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে ভারতকে না জেনে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীদের উচিত ভারত যথার্থতঃ যেমন, তেমন করে তাকে জানা। শুধু তার সম্বন্ধে সুখ্যাতি ও অত্যুক্তিটি দেখলেই চলবে না, মানুষ হিসেবে আমাদের দোষত্রুটি ও বাধা-বিপত্তির দিকটাও দেখতে হবে। অতি বিনীতভাবে আমি বলতে চাই যে, আমরা গত ছ'বছর ধরে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের দেশকে গড়তে চেষ্টা করছি, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে চেষ্টা করছি এবং বহু পুরানো দোষ-ত্রুটির সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছি। তা সে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা বা সামাজিক কুপ্রথা যে বিষয়েই হোক না কেন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারত একটা বৃহৎ সাহসিক কাজ ও পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে লোকেরা যদি আমাদের দেশ দেখতে আসেন, সে আরও ভাল ; কেননা আমাদের লুকোবার কিছুই নেই, কিছুই গোপন নেই। ভারতে বই ও পত্রিকাদি প্রকাশ করার আগে সেগুলি প্রকাশযোগ্য কিনা তা সরকারী

কর্মচারী দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হয় না, ছাপাখানা ব্যাপারেও কোন বাধানিষেধ নেই; লোকে সব জায়গায় ঘুরতে পারে ও যা খুসী তাই দেখতে পারে, দেশকে জানতে পারে। ভারতের স্থপতি-বিদ্যা, ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ বা নানাবিধ রহস্য-বিদ্যাসম্বন্ধেই যে শুধু যথেষ্ট জানবার আছে তা নয়, সেখানকার সাধারণ নরনারী কি ভাবে জীবন-যাপন করে তাও জানবার যোগ্য।

এ সব সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা ছেড়ে দিলেও এই দুই দেশের মধ্যে বহুদিন থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংযোগও রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে যে কতখানি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগ আছে একটু পরেই আমি তা বলছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে ভারত এ দেশের বেশ বড় একটা জনমতের নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে; তাদের মধ্যে শুধু যে বিশিষ্ট জননেতা ও পণ্ডিতেরা ছিলেন তা নয়, বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকেরাও ছিলেন: আর ছিলেন তাঁরা, যাঁরা কংগ্রেস ও দেশশাসন-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের অগ্রগামী রাজনৈতিক দল যখন দাবী করল যে, যে গণতন্ত্র ও স্বাধিকার-রক্ষার নীতিতে এই যুদ্ধ চালিত হচ্ছে, সে নীতি ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের অধীন লোকদের প্রতিও যেন প্রযুক্ত হয়, তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব জোর দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বলেছিলেন—ভারতের সঙ্গে যেন একটা রাজনৈতিক মিটমাট করে নেওয়া হয়, কারণ কোন দেশের জনসাধারণের সমর্থন না পেলে একটা সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা করা চলে না। আমার মনে হয়, আজ আবার যখন 'নিষ্ক্রিয় যুদ্ধে'র মহড়া চলেছে তখনও সে কথা মনে রাখা উচিত। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত-সরকার বিদেশে প্রথমেই যে কয়টি দূতাবাস স্থাপন করেছেন, ওয়াশিংটনেরটি তা'র মধ্যে অন্যতম। এটা শুধু যে ওয়াশিংটনের আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে সম্মান দেবার জন্য তা নয়, বরং জাতীয় সংগ্রামের দিনে আমেরিকার জনসাধারণ ভারতের জনগণের প্রতি যে সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেছিল তারই সমাদরের জন্য।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে বহুদিক দিয়ে এই যোগাযোগ সংরক্ষিত ও বর্ধিত হয়েছে। আমেরিকা ও ভারতের প্রতিনিধিগণ মিলেমিশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এবং বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্রে কাজ করে আসছেন এবং আরও কয়েকটি দিকে এই ভাবে সংযোগের ফলে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাপারের প্রত্যেকটিতে যে সম্পূর্ণ ঐক্য এসেছে তা নয়; বস্তুতঃ স্বাধীন জাতিগুলোর মধ্যে এমনটি আশা করাও ঠিক নয়। জগতের স্বাধীন জাতিগুলি ও যাদের বলা হয় একনায়কচালিত জাতি তাদের ভেতরে মূল পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত জাতিগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সহজেই তাদের বিভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে, ন্যায়তঃ এই সব পার্থক্যগুলোর সম্মুখীন হতে পারে, আবার সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য সহ-যোগিতাও করতে পারে। উদ্দেশ্যের ঐক্যের জন্য মতের মিলের প্রয়োজন নেই, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের মোটামুটি একই। ভারত ও আমেরিকা এই দুই দেশের লক্ষ্য ও যে সব সাধারণ প্রেরণায় তাদের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত, তা হল শান্তি, গণতান্ত্রিক জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং এই ক'বছরে এই সব উদ্দেশ্যের সংসাধনে ভারত-সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার অতীত ঘনিষ্ঠতা আজকের মত ছিল না। তার আংশিক কারণ এই যে, তখন ভারতীয় অর্থনীতির সারা কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশের সংযোগ দ্বারাই প্রভাবিত ছিল। আরও একটা কারণ এই যে, গত শতাব্দীতে আমেরিকা নিজেই স্বকীয় অর্থনীতি গড়তে ব্যস্ত ছিল। তাই তেলের মত বিশেষ মাল ছাড়া সে যে বিদেশে টাকা খাটাতে পারে, এ কথা

নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্য কেউ বড় বেশী জানত না। তা হলেও কিন্তু এটা বেশ লক্ষণীয় যে, আমেরিকার শিল্পবিদরা বেশ কিছু বছর ধরে ভারতীয় অনেকগুলি বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টায় সাহায্য করে এসেছেন। আমাদের দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানাটির নাম হল টাটা আয়রন্ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। এটাকে শুধু প্রাচ্যের নয়, জগতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারখানা বলা যায়। এখান থেকে ৭৫০,০০০ টনেরও বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হয়। এক কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠান ছিল বৃহত্তম ও আজও প্রাচ্যে তা বৃহত্তম আছে। পেরিন মাবস্থাল এ্যাণ্ড কোম্পানী নামে এক আমেরিকাস্থ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সুরু থেকেই এই কারখানার পরামর্শ-দাতা ছিলেন। তাঁরাই এই কারখানা ও জামসেদ-পুর নগরের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন।

আমি এই সেদিন জেনেছি যে, ১৯০৭ খৃঃ হতে এই কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছে জেনারেল ইলেকট্রিক কোং। বোম্বাইতে টাটার জল থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের একটা ব্যবসা আছে। প্রথমে এই দেশ থেকেই তার যন্ত্রপাতি-সম্পর্কীয় পরামর্শ প্রদত্ত হয়। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি যে, আরও একটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র খাড়া করে তুলতে আমেরিকা থেকেই মূলধনের কিছু অংশও পাওয়া গিয়েছিল। ঐ কেন্দ্র থেকে বোম্বাইএর কাপড়ের কল ও শাখা-ট্রেনগুলি (আমেরিকায় যাকে 'কমিউটার' ট্রেন বলে) তাদের বিদ্যুৎসরবরাহ পেয়ে থাকে। পরে অবশ্য ভারতে আরও কয়েকটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ; তবে আমি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনায় যেতে ইচ্ছুক নই। আজ পর্যন্ত ভারতে নিয়োজিত আমেরিকার মোট মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী নয়, মাত্র ৪।৫ কোটি ডলার, কিন্তু বোম্বাই ও ভারতের পূর্ব-উপকূল বিশাখাপত্তনম্-এ ষ্টাণ্ডার্ড ও ক্যালটেক্স নামে দুই আমেরিকান তৈলব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি দুটি তৈল-শোধনাগার স্থাপন করার ফলে এই টাকার পরিমাণ বেড়েছে। এদের টাকা ধরলে আমাদের দেশে নিয়োজিত আমেরিকান মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় ১০ কোটি ডলার।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে কয়েকটি আমেরিকান শিল্প-সংস্থা নিজেরা ও ভারতীয় ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিলে রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

গত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। যুদ্ধের আগে, ভারতের মোট বৈদেশিক ব্যবসার শতকরা সাত ভাগ ছিল আমেরিকার সঙ্গে। আজ সেটা শতকরা ২৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫২ খৃঃ বিদেশে আমাদের মোট রপ্তানীর শতকরা ১৭ ভাগ হয়েছে এ দেশের জন্য, তেমনি আবার আমাদের মোট আমদানীর শতকরা ৩৫ ভাগ এদেশ থেকেই গেছে। আমেরিকার সঙ্গে ধাতবদ্রব্য, যানবাহন প্রভৃতি, কলকব্জা, তেল ইত্যাদি অনেক জিনিসের ব্যবসা যুদ্ধের আগের চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেড়ে গেছে। আমরা আশা করি যে, এই সব ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আরও বেড়ে যাবে এবং এখানের 'টি কাউনসিল' প্রভৃতি প্রতিনিধিদের মারফৎ যে সংযোগ রয়েছে তা আরও বিকাশ প্রাপ্ত হবে ও আমেরিকায় আজ পাটাদির তৈরী মোটা চাদর আমদানী করার যে প্রচেষ্টা চলছে সেটাও ক্রমশঃ বেড়ে যাবে।

এ ছাড়া একটি প্রধান ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আরও সহযোগিতা দেখতে পাওয়া গেছে। আমাদের দেশ দু বছর আগে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন এখান থেকে ১৫০ কোটি ডলার মূল্যের গম ধার দেওয়া হয়। সেই দুঃসময়ে যখন আমাদের গম ও বহি-র্বাণিজ্যের শক্তি সীমাবদ্ধ, তখন এই সাহায্যের ফলে

আমরা ভয়ংকর একটা সংকট এড়িয়ে গিয়েছি। এই গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রতিটি পাই আমাদের দেশের উন্নতিবর্ধক কাজ, কৃষি ও জলসেচের জন্য ব্যয়িত হবে বলে আলাদা করে রাখা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল যে, আমাদের প্রধান অসুবিধা হল অর্থের অভাব। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মত অনুন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান বাধা এই যে, সেখানে যদিও প্রচ্ছন্নরূপে অনেক সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু তাকে কার্যকরী করতে গেলে প্রথমে হাতে-নাতে কিছু টাকার দরকার হয়।

ভারত হল পরস্পরবিরুদ্ধ অবস্থার দেশ, তাও আবার বহুদিক হতে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে জগতের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেষ্ট ভারতে অবস্থিত এবং এই পর্বতমালার পাদদেশে আছে বিস্তৃত সমতলভূমি; ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে দুই থেকে চার ইঞ্চি বারিপাত হয়, আবার চেরাপুঞ্জিতে হয় বার্ষিক ৪০০ ইঞ্চি। কিন্তু এগুলিই শুধু একমাত্র বিপরীত অবস্থা নয়। ভারতের সবচেয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব এই যে, দেশটা সম্পৎ-শালী, কিন্তু দেশের লোকেরা গরীব। যতদিন না আমরা দেশের সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি, এবং ঠিক ঠিক ভাবে জীবনে সমান ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারছি, ততদিন আমাদের অর্থনীতি গড়তে পারব না। তাই প্রথমেই নির্দিষ্ট কিছু অর্থ চাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে গত তিন চার বছরের মধ্যে আমরা ১০৯,০০০,০০০ ডলার ধার পেয়েছি এবং আমাদের ৪.৩ বিলিয়ন ডলারের মত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না যদি আমরা অন্যান্য দেশ থেকে কিছুটা ধার না করি। ১৯৫২খৃঃ ভারত ও আমেরিকা সরকারের মধ্যে ইণ্ডো-আমেরিকান টেকনিক্যাল করপোরেশন এগ্রিমেণ্ট নামে এক চুক্তি হয়েছে, যার ফলে কমিউনিটি ডেভোলাপমেণ্ট প্রজেক্টস্ নামে কথিত খাতে ও গ্রাম-সেবার আকারে আমেরিকা-সরকার প্রায় এক শত লক্ষ ডলারের মত খরচ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এখানেও আমি খুব বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, কিন্তু এটুকু বলব যে কমিউনিটি ডেভোলাপমেণ্ট প্রজেক্টের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আমাদের দেশের মূল ভিত্তি চাষের ক্ষেত্রে অধিক ফসল ফলান, জলসেচ, মাছের চাষ, গ্রামের বাড়ী-ঘরদোরের উন্নতি, সংবাদ-আদান-প্রদান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটীর শিল্পের উন্নতি-বিধান করা। আমাকে আরও বলতে হচ্ছে যে, এই অর্থভাণ্ডারের প্রতিটি ডলারের জন্যে ভারত-সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বা সাত ডলার এবং অন্যান্য ব্যাপারে নয় পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে। এটা হওয়াই উচিত, কেন না কোন দেশ যদি নিজে চেষ্টা না করে তা হলে কোন বিদেশী সাহায্য তা সে যত বেশীই হোক না কেন, তাকে রক্ষা করতে পারে না। 'নিজে চেষ্টা করলে ভগবান সাহায্য করেন' এবং নিজের চেষ্টা ব্যতীত কোন দেশও মুক্তি লাভ করতে পারে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয়রাই এই কার্যসূচী নির্ধারণ করেছে, তারাই একে কাজে লাগাচ্ছে এবং প্রধানতঃ তারাই এতে টাকা যোগাচ্ছে; তবে খুব একটা সংকট-সময়ে ভারত উপরোক্ত বহিঃসাহায্য নিয়েছিল। তা ছাড়া এই দেশ থেকে ক্রমাগত পরামর্শ ও শিল্প-সংক্রান্ত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। পয়েণ্ট ফোর প্রোগ্রাম নামে আর একটা কাজ চলেছে। তার সব শেষ হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৭০ জন শিল্পবিদ ভারতে গেছেন, আর এদেশে এসেছেন ৮০ জন এখানকার চাষবাস ও জলসেচ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা-গ্রহণ করবেন বলে। এইভাবে শিল্পক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে একটা বিরাট সহযোগিতা চলছে। কিছু গোপন না করেই বলতে পারি যে, আজ পর্যন্ত যাঁরা ভারতে গিয়ে এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করছেন তাঁদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ বা ভুল বোঝাবুঝি হয় নি।

বক্তব্য শেষ করবার আগে আমাকে অবশ্যই

বলতে হবে যে, যদিও এই সব নানান দিকের গুরুত্ব আছে, তবুও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হল এই যে কি মনোভাব নিয়ে এই সব কাজ হচ্ছে। একদিকে যদি মাতব্বরী করবার ভাব থাকে আর অন্য দিকে যদি অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব জাগে, তা হলে শুধু আর্থিক সাহায্যে এ সব সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সত্য, খাদ্য মানুষের খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষ শুধু খাদ্য পেয়েই বাঁচতে পারে না; তাই যে মনোভাব এই দুই জাতির মধ্যে কাজ করছে তা জানা সত্যিই খুব দরকারী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দুই জাতির বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে কোন মতবাদ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না. কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বোঝার ভুল, একটু ধৈর্যের অভাব এবং পরমত-সহিষ্ণুতার অভাব বাধা সৃষ্টি করে। জীবনযাত্রার পথ যেখানে এত বিভিন্ন, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, খাপ খাইয়ে নেওয়া দরকার। বক্তৃতা করার সময় এটাকে হয়ত আমরা খুবই সহজ বলতে পারি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা ততটা সহজ নয়। আমি এদেশে থেকে বুঝেছি যে এখান থেকে যে একটি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণীয় সেটা হল—হতাশ না হওয়ার শিক্ষা, উদ্যম, আশাবাদী ও সাহসী হবার শিক্ষা। এখানকার সাধারণ লোক মনে করে যে সুযোগ পেলে সে না করতে পারে এমন কিছুই নেই। এমন কোন সীমান্ত নেই, তা জ্ঞান বা কর্ম যে দিকেরই হোক, যা সে পার হতে পারে না। আর দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি হল মূল গণতন্ত্র রাজনীতিতে নেই, আছে মানুষ ও মানুষের সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে শ্রমের মর্যাদা দেবার দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমার মনে হয়, এই দুটি প্রধান শিক্ষা এদেশ থেকে আমাদের শিখতে হবে। ভারতীয় আমরা কাজের চেয়ে ধ্যানেই বেশী অনুরক্ত; আমেরিকান আপনারা সম্ভবতঃ ধ্যানের চেয়ে কাজেই বেশী অনুরক্ত। এই দুই মনোভাবের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া সম্ভব। আমাদের ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন--'ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই, করণীয় কিছু নেই, আকাঙ্ক্ষা কিছু নেই, তবুও আমি অনবরত কাজ করে থাকি।' কেন? সৃষ্টির আনন্দের জন্য। বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক যখন কোন কিছু আবিষ্কার করেন বা কোন চিত্রকর কোন ছবি আঁকেন, তখন সে জন্য যে টাকা তিনি পুরস্কার পান বা যে সম্মান পান, সেটা তাঁকে আনন্দ দেয় না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির আনন্দে তিনি হন আনন্দিত এবং এটাই হল বৈজ্ঞানিক বা চিত্রকরের যথার্থ পুরস্কার। আর কেবল জাগতিক সুখসুবিধার দিকটা না শিখে লোকে অন্য দেশ থেকে এই অধ্যাত্মভাবটাও শিখতে পারে।

স্বামীজীর স্মরণে

শ্রীশৈলেশ

সযতনে সংগোপন করেছিলে তুমি
তোমার আপনে
ছাই চেপে আগুনের প্রভার ঝলক্‌
লুকাবে কেমনে?
তোমারে বাঁধোনি তুমি গন্ধ-রূপ-রাগে
এ জগৎ সনে,
প্রস্ফুটিত কুসুমের রূপ-মধু-বাস
ভ্রমর যে চিনে!

তোমারে আঁকোনি তুমি রঙ্গিন রেখায়
আলেখ্যের মত,
রামধনু-সাত রংয়ে তবু আছ আঁকা
তুমি অবিরত!
কাহারে কহোনি তুমি রাখিবারে ধরে
অনন্ত স্মরণে
তবুও সকাল সাঁঝে অন্তরের প্রীতি
নিত্য জাল বোনে।

ব্যক্তির মুক্তি

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্‌-এ

অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'ব্যক্তির মুক্তি' কথাটির অর্থ কি দাঁড়ায়? চূড়ান্ত অদ্বৈতমতে তো ব্যক্তি অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তিমাত্র—ব্যক্তির কোন অস্তিত্বই নাই। ব্যক্তিরই যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে মুক্তিই বা কি, বন্ধনই বা কি—মুক্তিই বা কার, বন্ধনই বা কার? চূড়ান্ত অদ্বৈতমত চিন্তার অতীত একটি মতমাত্র—তাহা নিয়া কোন আলোচনাই চলে না।

কিন্তু সাধারণ মানবমন অনেক অদ্বৈতের পিয়াসী—সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সত্তাকে সে খুঁজিয়া পাইতে চায় এবং সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাহী অদ্বৈতে সে একটা সমাধান ও শান্তি পায়। ঋষিকল্প ব্যক্তিদের উপলব্ধির কথা বাদ দিলেও সাধারণ মানুষের এই চাওয়া হইতেই তাহার ঈশ্বর সম্বন্ধে একেশ্বরবাদের জন্ম, যে মতবাদ ঈশ্বরকে এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সমষ্টিচৈতন্যরূপে ভাবনা করে।

মানুষের উপলব্ধি বা ধারণার এই অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়া ব্যক্তিমানুষের মুক্তির অর্থ কি দাঁড়ায় তাহাই চিন্তা করা যাক্।

এই অদ্বৈতের স্বরূপ কি? তিনি 'সর্বব্যাপী', অর্থাৎ সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী—তাঁর এই সর্বগ্রাহিতা এবং সর্বগ্রাহিতার ভাবটিই ব্রহ্মশব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী'—কথাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই অনন্ত অচিন্ত্য বিরাট বিশ্বই তাঁর দেহ—আমাদের কল্পনায় এমন স্থান চিন্তিত হইতে পারে না যাহা তাঁহার সেই সর্বব্যাপী দেহের অংশ নয়—তাই তিনি 'বিশ্বরূপ'।

তাঁহার যে বিশ্বরূপ তাহা শুধু আজকের বা এ মুহূর্তের বিশ্বকে লইয়া গঠিত নয়—তাঁহার এই বিশ্বরূপ অচিন্ত্য অনাদি অতীত, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে দোলায়মান বর্তমান এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকে লইয়া। তেমনি অনাদি অনন্ত কালের মনঃসমষ্টি ও বোধ লইয়া তাঁহার মন ও বুদ্ধি, এই ভাবে স্থূল সূক্ষ্ম সর্বকালের সব অস্তিত্বের সমষ্টি লইয়া সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের রূপ।

এই বিরাট বা ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? তাঁহাকে যখন ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন ব্যক্তি অংশ ছাড়া আর কি হইতে পারে, যে অংশ তাঁকে বাদ দিয়া নয় এবং যাহা তাঁর একত্বকে অস্বীকার করিয়া নয়?

কিন্তু 'এক'ই যদি থাকে, আর কিছু যদি না থাকে, তবে অংশের কল্পনাই বা আসে কি করিয়া? অংশ কখন কল্পিত হইতে পারে? অংশের কল্পনায় তিনটি অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে হয়: (১) যার অংশ, (২) যে অংশ, (৩) যে এই অংশের দ্রষ্টা বা কল্পয়িতা। এই তিনকে স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতকে স্বীকার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ঐ তিন বা ঐ তিনকে উপলক্ষ করিয়া বহুর কল্পনাও ঐ অদ্বৈতের স্বরূপেই আছে। সেই অদ্বৈতই নিজেকে তিন এবং বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—এই তিন, এই বহু এবং এই সব লইয়াই সেই অদ্বৈত।

একের এই বহুরূপে প্রকাশ যদি একটা ভ্রান্তি হয় তবে এই ভ্রান্তিও তাহার স্বরূপেই অবস্থিত, ইহাও তাহাকে বাদ দিয়া নয়—তাই চণ্ডীতে তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই। তবে ব্যক্তির মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ব্যক্তি-অংশই হোক আর যাহাই হোক, ব্যক্তির যে দুঃখ আছে তাহা কে

অস্বীকার করিবে? এই দুঃখই ব্যক্তির বন্ধন—ইহার হাত হইতে মুক্তিই ব্যক্তির মুক্তি। কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি দুঃখবোধ হইতে মুক্ত হন তাঁহার মুক্তিই বা কেমন এবং অপর ব্যক্তিদের 'মুক্তি' বা বন্ধনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধই বা কেমন?

দুঃখবোধ হইতেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—জড়ের দুঃখবোধ নাই এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও নাই। এই দুঃখবোধেরও তারতম্য আছে। দুঃখ ব্যক্তিরই, কিন্তু অহংবোধসম্পন্ন এই ব্যক্তি এই দুঃখবোধের সীমাকে সংকীর্ণ বা প্রসারিত করিতে পারে। এই দুঃখবোধ সংকীর্ণতম অর্থে সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহ-সম্পর্কে সীমাবদ্ধ হইতে পারে, আবার পরম উদার অর্থে সমস্ত বিশ্বমানব বা বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্বন্ধবোধে বা একত্ববোধে প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু যেরূপই হোক্ না কেন এই দুঃখবোধ ব্যক্তিরই এবং ইহা 'অহংবুদ্ধি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গৌতমবুদ্ধ বিশ্বের জরাব্যাধির দুঃখকেই আপনার দুঃখ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন—তাই বুদ্ধের মুক্তির সাধনা ছিল বিশ্বমুক্তির সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে বা শাস্ত্রে এই ব্যক্তির দুঃখবিমোচন বা মুক্তিপথেরই সাধনার নির্দেশ।

এই মুক্তির জন্য ব্যক্তির দিক হইতে প্রথম প্রয়োজন দুঃখ বা বন্ধন-সম্বন্ধে চেতনা—নতুবা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বা আসিবে কেন? এই দুঃখবোধের যে তারতম্য আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জড়জগতে এই দুঃখবোধ প্রায় সুপ্ত, প্রাণিজগতেই এই দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এখানেও সর্বত্র দুঃখসম্পর্কে সমান চেতনা নাই, কারণ মনের বিকাশ নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে অত্যন্ত ক্ষীণ। এই দুঃখবোধ এবং দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতির আকাঙ্ক্ষা মানবজগতেই সুস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের মধ্যেও এই চেতনার যথেষ্ট তারতম্য ব্যক্তিভেদে লক্ষিত হয়। ব্যক্তিমানুষের অহংবোধের ধারণা ও গণ্ডী বিভিন্ন ধরনের, তাই দুঃখবোধের প্রকৃতি ও পরিমাণের তারতম্য। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষেই এই অহংবোধের পূর্ণচেতনা সম্ভব।

প্রশ্ন এই—বিশ্বের মুক্তি বাদ দিয়া কি ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব এবং উহা কি একটি ভ্রান্তি বা আত্ম-প্রতারণামাত্র নয়? মানুষ নিজের দুঃখ-সম্বন্ধে যদি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখে তবে সে দুঃখের পরিধি কি তাহার দেহাত্মবুদ্ধিতে সীমায়িত সংকীর্ণ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায় না? নিজ আত্মীয়-স্বজন, পরিবার, বন্ধু—তাহাদেরও দুঃখবিমোচন বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি স্বাভাবিক নয়? যদি না মানুষ তাহার মুক্তিসাধনার আরম্ভেই কাপুরুষের মত আত্মপ্রতারণা ও অবিশ্বাসের পথে চলে?—'অবিশ্বাস' কি সে? —অবিশ্বাস অপরের মুক্তিতে, অপরের দুঃখবিমোচনের ক্ষমতায়, খুব উচ্চাঙ্গের সাধকও অনেক সময় এই আত্ম-প্রতারণার পথেই চলেন। সংকীর্ণ অর্থে তাঁর ব্যক্তিজীবনে এবং দুঃখজয়ে হয়ত তিনি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, সংযম, বীরত্ব এবং অবস্থার উপর আধিপত্য ও দুঃখজয়ের পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি সংকীর্ণ এবং তথাকথিত ব্যক্তিগত সাম্য ও শান্তিতে মনকে বলপূর্বক একটা সাময়িক ও কৃত্রিম তৃপ্তিদান করেন না কি? আপনার জন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কল্পনা করিয়া মুক্তির চিন্তা তাহাই নয় কি? এই 'অসত্য' কি ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের পথে তাঁর কাছে কোন দিন প্রকাশিত হইবে না, এই মিথ্যার ফাঁকিটুকু কি সত্যের চিরন্তনত্ব দাবী করিতে পারে? তাহা মনে হয় না—মিথ্যার ভুল সত্যের সাধকের নিকট জীবনে বা জীবনান্তরে কখনো প্রকাশিত হইবে, ইহাই অনুমান করা যায়।

ব্যক্তির দুঃখবোধ যেমন ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া ব্যক্তিরই আপনজনে পরিব্যাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, ব্যক্তির মুক্তিসাধনাও তাহাই এবং সেক্ষেত্রে সেই 'আপনার সকলে'র মুক্তিতেই ব্যক্তির মুক্তি।

ব্যক্তির আপনবোধেরও তেমনি ছোটবড় আছে। এই পরিবার-বোধ, ব্যক্তিবোধের পূর্ণ এবং প্রকৃত অভিব্যক্তিতে শুধু বিশ্বমানব নয় বিশ্বজগৎকে আপনার করিয়া লইবে, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। 'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পের মধ্যে ব্যক্তির তৃপ্তি খুঁজি, কিন্তু সেই তৃপ্তি স্থায়ী হয় না—ব্যক্তির প্রসার হয়, তাহার আকাঙ্ক্ষার প্রসার হয় এবং ব্যক্তির আপনত্ববোধ সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে চায়। তাই সংকীর্ণতর মুক্তি একটা আত্মপ্রতারণার মুক্তি হইতে পারে—ব্যক্তির নির্ভীক দৃষ্টির কাছে তাহার সংকীর্ণতার প্রাচীর ভাঙিয়া যাইবে এবং প্রশস্ততর আকাঙ্ক্ষা প্রশস্ততর মুক্তির দাবী করিবে, নূতন ও মহত্তর দুঃখের সৃষ্টি করিবে, নূতন ও বৃহত্তর মুক্তির পথ খুঁজিবে। কিন্তু এই মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? সংকীর্ণতর অর্থে আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ দুঃখের কাল্পনিক অব্যাহতি তবু সাময়িকভাবে সম্ভব, যতদিন না জ্ঞানচক্ষু উহার সংকীর্ণতাটুকু দেখাইয়া দিয়া বৃহত্তর দুঃখ ও বৃহত্তর মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে। কিন্তু এই কাল্পনিক ও সাময়িক তথাকথিত ব্যক্তিমুক্তিতে ব্যক্তিমুক্তির মহত্তম আকাঙ্ক্ষা কি করিয়া মিটিবে? বিশ্বমুক্তিই তবে ব্যক্তিমুক্তি। কিন্তু বিশ্বমুক্তি কি আদৌ সম্ভব? তবে এই অসম্ভবের সাধনায় সংকীর্ণতর অর্থে যে ব্যক্তিমুক্তির সাধনা (যাহার ফল পরীক্ষিত), তাহাকে ছোট করায় লাভ কি? লাভ কি কে জানে? যাহা সত্য তাহাই বলা চলে। সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তিমুক্তির সাধনা যে অলীক তাহাই দেখান হইল—সেই উদার বা মহান অর্থে ব্যক্তি-সাধনার সিদ্ধি সম্ভবই হোক আর অসম্ভবই হোক না কেন, উহাই প্রকৃত ব্যক্তিমুক্তির সাধনা। সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু ঐ সাধনাই যে ব্যক্তির প্রকৃত অন্তরের সাধনা তাহাই দেখান হইল। বুদ্ধদেব সাধনার এই অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াও বলিয়াছিলেন: যতদিন বিশ্বের একটি প্রাণীও অজ্ঞানজনিত দুঃখে পীড়িত হইবে ততদিন আমি আত্মমুক্তির শেষস্তরে পদার্পণ করিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। হিন্দুদের গায়ত্রীমন্ত্রের প্রার্থনায় দেখি, ব্যক্তিসাধক প্রার্থনা করিতেছেন বহুবচনে··· 'ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—বহুর মুক্তির সাধনা সিদ্ধ হোক আর নাই হোক, ব্যক্তিহৃদয়ের উহাই অন্তরতম প্রার্থনার সত্য।

উপনিষদের ঋষিদের প্রতি মঙ্গলপাঠে দেখি এই বিশ্বমুক্তির উদার বাণী। হিন্দুর প্রাতঃ-স্মরণীয় প্রার্থনা:

সর্বে চ সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

বিশ্বের জন্য এই প্রার্থনা শুধু উপনিষদ বা হিন্দুর নয়, সমস্ত ব্যক্তিমানবেরই ইহা অন্তরতম অন্তরের প্রার্থনা ও সাধনা। এই মুক্তিসাধনায় কাম্যের বিশালতা উপনিষদের ঋষিকে সংশয়ান্বিত করিতে পারে নাই। অন্তর-দেবতাকে ঋষি এই প্রার্থনা, অন্তরের এই সত্যকেই জানাইয়াছেন—ফল তাহারই হাতে রাখিয়াছেন, কারণ ফলদাতা তিনিই। 'মা ফলেষু কদাচন'—ফল-সম্বন্ধে সংশয় আর্যঋষির মুক্তিসাধনাকে মিথ্যার স্পর্শে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই। ব্যক্তির মুক্তিসাধনা বিশ্ব-মুক্তিরই সাধনা, সংকীর্ণতর সাধনা আত্মপ্রতারণা-মাত্র, উহা ব্যক্তির অন্তরের শেষ কথা নয়।

ভয় নাই আর ভয় নাই

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

ভয় নাই আর ভয় নাই !
আমার সঙ্গে আজিকে আমার হয়ে গেছে পরিচয় ভাই।
দেখেছি আমার অতি অপরূপ
সত্যিকার সে নিত্য স্বরূপ
জেনেছি আমারে, চিনেছি আমারে, বুঝেছি আমার ক্ষয় নাই,
দুঃখে দহিতে ধুঁকিতে জরায়
জন্ম আমার হয়নি ধরায়
ভাগ্যে আমার লিখে নাই বিধি জয় ছাড়া পরাজয় ভাই।
ভয় নাই আর ভয় নাই !

দিগন্তরের প্রান্ত ছুঁয়েছে আমার মহিমা-গৌরব,
পবন-প্রবাহে উছলি ছুটেছে পুণ্যের সুধা-সৌরভ ;
আকাশে ঠেকেছে উন্নত শির,
পৃথিবীর চেয়ে আমি গম্ভীর,
সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল আমি জ্ঞান-আনন্দময় ভাই ;
'সত্য' আমার অমর ভূষণ
'সুন্দর' মোরে করেন পোষণ
শিয়রে 'শিবের' অভয় হস্ত নিত্য জাগিয়া রয় ভাই,
ভয় নাই আর ভয় নাই !

আপনার প্রভুশক্তিতে আমি স্বরাট্, সদা শুভঙ্কর,
চিত্ত আমার অধীন ভৃত্য ছয় রিপু চির-কিঙ্কর।
ইচ্ছা আমার অপ্রতিহত
শক্তি সাহস করতল-গত
বিঘ্ন বিপদ সভয়ে সতত পদতলে নত রয় ভাই ;
সিন্ধু আমার করে সম্ভ্রম
পথ ছেড়ে দেয় গিরি দুর্গম
'অসম্ভব' এ কথাটি আমার অভিধানে লেখা হয নাই ;
ভয় নাই আর ভয় নাই !

হেলায় জিনিয়া নিতে পারি আমি বিশ্বের যত সম্পদ,
সাধনা-মূল্যে কিনে নিতে পারি অমরাবতীর রাজপদ
স্নুমেরুশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া
রাখিতে পারি এ মুঠায় ভরিয়া
লুটে নিতে পারি আমি চক্ষের নিমেষে কুবেরালয় ভাই ;
চন্দ্র, সূর্য, তারকা-নিকর
আমার ভুবনে এনে দেয় কর
গ্রহগণ মোর দৃষ্টিপ্রসাদ নিত্য মাগিয়া লয় ভাই ;
ভয় নাই আর ভয় নাই !

আমাতে বিরাজে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সকল গীর্বাণ
ধরা দিতে আসে চতুর্বর্গ, শান্তি পরম নির্বাণ—
সংহিতা গীতা বেদাদি আমার
স্বভাবে স্বরূপ লভে অনিবার
ভক্তি কর্ম জ্ঞান জীবনের চিরসাথী হয়ে রয় ভাই ;
আমি নির্মল, আমি নির্দোষ
সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ
মানুষেরে আমি ভালবাসি সদা মনুষ্যত্বের জয় গাই।
ভয় নাই আর ভয় নাই !

কুম্ভস্নান

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

পুরাণে আছে প্রাচীন কালে দেবতা ও অস্থরগণ মুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতকুম্ভ প্রাপ্ত হন। ঐ অমৃত ধিকার করিবার জন্য দেবাসুরের মধ্যে বারদিন বারতর যুদ্ধ হয়। উক্ত বারদিন অমৃত-কলসটি লোকে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী—এই ার স্থানে রাখা হইয়াছিল। সেই সময়ে কলস ইতে কিছু অমৃত ঐ সব স্থানে পড়িয়া যায়। দবতাদের বার দিন মানুষের বার বৎসর। এই কারণে ঐ চার স্থানে প্রত্যেক বারবৎসর পরে কুম্ভ-মেলা ও স্নান হইয়া আসিতেছে। যে তিথি, রাশি ও নক্ষত্রে অমৃত-কলস রাখা হইয়াছিল ঠিক ঐ সময়েই কুম্ভযোগের মুহূর্ত হইয়া থাকে। ঐ শুভক্ষণে সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থী—সকলেই স্নান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে। মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তিতে হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে, মকর-সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রয়াগের

ত্রিবেণী-সঙ্গমে, চাতুর্মাস্যে নাসিকের কুশাবর্ত ঘাটে এবং বৈশাখী পূর্ণিমাতে উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে স্নান হয়। এই উপলক্ষে দশনামী সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মহাসম্মেলন হইয়া থাকে। প্রতি ছয় বৎসর পরেও এই স্নানের যোগ হয়, উহাকে অর্ধকুম্ভ যোগ বলে। ইহা একমাত্র হরিদ্বার ও প্রয়াগেই হয়।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসিগণকে সম্প্রদায়-ভুক্ত করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের দ্বারা জগতের উন্নতিসাধন হইবে ভাবিয়া ভারতের চারিদিকে চারিটি সন্ন্যাসীদের মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরে বদ্রিনারায়ণ-ক্ষেত্রে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে দ্বারাবতী-ক্ষেত্রে সারদা মঠ এবং পূর্বে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রধান চারজন শিষ্যকে পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত করেন। আচার্য শঙ্করানুগ সন্ন্যাসিবৃন্দকে দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া ঐ চার মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ সময় হইতেই সন্ন্যাসিগণ চার মঠের অন্তর্গত দশনামী সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

মুসলমান রাজত্ব কাল হইতে ইংরেজের সময়াবধি এই সন্ন্যাসিবৃন্দ নানা ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশকে ও সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ধর্মের রক্ষার জন্য কখনও কখনও তাঁহাদিগকে বৈদেশিক অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত যুদ্ধও করিতে হইয়াছে। মধ্যযুগে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য 'আস্তানা' নির্মাণ করিয়া কিছু জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঐ সব আস্তানাই এক একটি 'আখড়া' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এই সব আখড়াতে দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে নাগা ও পরমহংস এই দুইটি সংস্কারের প্রথা আছে। আবার পরমহংসগণ পৃথক ভাবে মঠ বা আশ্রম করিয়া পূজার্চনা ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। এখনও আখড়াবাসিগণ দেশে দেশে ঘুরিয়া প্রচারকার্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের 'রমতাপঞ্চ' সন্ন্যাসীদেরই বলা হয়। আখড়া-পরিচালনার জন্য কয়েকজন নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদেরও পঞ্চ বলে। এই পঞ্চের আদেশানুযায়ী আখড়ার সমস্ত কার্য-পরিচালনা হয়। পঞ্চের যিনি প্রধান, তিনিই সংস্কারের সময় আচার্যের কাজ করিতেন। কিন্তু আজকাল একজন ব্রহ্মবিদ্ শাস্ত্রজ্ঞ পরমহংস সন্ন্যাসীকে পৃথকভাবে মনোনীত করিয়া আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তাঁহাকে মণ্ডলীশ্বর বলে। তিনিই আখড়ার সন্ন্যাসিবৃন্দকে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন এবং সংস্কারের সময় আচার্যের কাজ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইল মঠ বা আশ্রমেও মণ্ডলীশ্বর হইয়াছেন। তাঁহারাও মঠবাসীদের শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন ও সংস্কার দিয়া থাকেন, আবার সাধুমণ্ডলী সহ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যান দেন। মণ্ডলীর অধীশ্বর হইয়াছেন বলিয়াই মণ্ডলীশ্বর বলা হয়।

'আখড়াগুলি' নির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, আবাহন, অটল, আনন্দ ও অগ্নি—এই সাতটি নামে অভিহিত। অগ্নি আখড়ায় কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যসংস্কার হইয়া থাকে। নাগা সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ বিভূতি-ভূষিত জটাজূটধারী দিগম্বরবেশে থাকেন। কিন্তু পরমহংসগণ মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক আখড়ার আলাদা আলাদা নিদর্শন আছে। যেমন জটার বাঁধন কাহারও মস্তকের মধ্যে, কাহারও বা বামদিকে, কাহারও বা ডানদিকে, তেমন উত্তরীয় পরিধানের গাঁট বুকের উপরে, মাঝে বা নীচে হইয়া থাকে। বিভূতির যে গোলা হয়, তাহা গোল, চেপটা, ত্রিকোণ ও চৌকোণ প্রভৃতি আকারের হয়। আবার ত্রিপুণ্ড্রধারণও রকমারী হইয়া থাকে। এই সব নিদর্শনে প্রত্যেক আখড়ার মহাত্মাগণ অপর অপর আখড়ার মহাত্মাগণের পরিচয় পান।

এই মহাত্মাগণ প্রথমে বিরজা হোম করিয়া পরে ডালাদেবতার সম্মুখে আলাদা সংস্কার গ্রহণপূর্বক নাগা হইয়া থাকেন। দেশরক্ষার্থ যুদ্ধের সময় সন্ন্যাসিগণ শক্তির উপাসনা দ্বারা লড়াই করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই শক্তির প্রতীকরূপে বল্লমের পূজা হইয়া আসিতেছে। ঐ বল্লমই ডালা দেবতারূপে পূজিত হইতেছে। কুম্ভযোগ উপলক্ষে ডালা দেবতাকেই শোভাযাত্রা করিয়া আখড়া-বাসিগণ স্নান করিয়া থাকেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) হইতেই এই কুম্ভমেলার প্রবর্তন হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতি ছয় বৎসর প্রয়াগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবৃন্দের সম্মেলন করিয়া ধর্মালোচনা করাইতেন। ইহা হইতেই পরবর্তী সময়ে পুরাণোক্ত কুম্ভযোগে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে সন্ন্যাসিবৃন্দের মহাসম্মেলন হইয়া আসিতেছে।

বর্তমানে সাতটি আখড়ার মধ্যে তিনটি আখড়াই প্রধান। যথা নির্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনা। নির্বাণীর সহিত অটল আখড়া, নিরঞ্জনীর সহিত আনন্দ আখড়া এবং জুনা আখড়ার সহিত আবাহন ও অগ্নি-আখড়া একত্রে শোভাযাত্রায় যায়। এই দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ব্যতীত বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায় পরপর শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে যায়। নির্মলা সম্প্রদায় নানকপন্থী, আর উদাসী সম্প্রদায় নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত। কুম্ভযোগের স্নানে দশনামী সন্ন্যাসিগণ প্রথমে স্নান করিয়া থাকেন। পরে পরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ যান।

চৈত্রসংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতি কুম্ভরাশির সহিত এবং রবি মেষরাশির সহিত মিলনের সন্ধিক্ষণেই হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভযোগ হয়। একমাত্র হরিদ্বারেই কুম্ভরাশির সহিত বৃহস্পতির মিলন হয় বলিয়াই প্রকৃত কুম্ভযোগ বলা হয়। ব্রহ্মকুণ্ডেই এই মুখ্য স্নান হইয়া থাকে। শিবরাত্রিতে প্রথম স্নান, চৈত্র-অমাবস্যাতে দ্বিতীয় স্নান এবং মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে তৃতীয় বা প্রধান স্নান হয়। প্রথমে নিরঞ্জনী ও জুনা পাশাপাশি শোভাযাত্রায় বাহির হয়। তাহার পর নির্বাণী, বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা।

পৌষ-সংক্রান্তি বা মকর-সংক্রান্তিতে বৃহস্পতির সহিত মেষ এবং রবির সহিত মকররাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভযোগ হয়। ঐ দিনই প্রথম ও প্রধান স্নান, পরবর্তী অমাবস্যায় দ্বিতীয় ও বসন্ত পঞ্চমী বা সরস্বতীপূজার দিন তৃতীয় স্নান হইয়া থাকে। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান হয়। প্রথমে নির্বাণী শোভাযাত্রায় বাহির হয়। পরে পরে নিরঞ্জনী, জুনা, বৈরাগী, উদাসী, নির্মলা যাইয়া থাকে।

নাসিকে কুম্ভমেলা হয় চাতুর্মাস্যের সময়। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী হইতে কার্তিকের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত চাতুর্মাস্যকাল। শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতির সহিত মঙ্গল ও শুক্রের সহিত সিংহরাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই পূর্ণ কুম্ভযোগের প্রধান ও প্রথম স্নান হয়। ভাদ্রের অমাবস্যায় দ্বিতীয় স্নান ও কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে তৃতীয় স্নান হয়। সন্ন্যাসিগণ নাসিক হইতে বিশ মাইল দূরে গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান ত্র্যম্বকেশ্বরে আস্তানা করিয়া কুশাবর্ত ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। এখানকার ক্রম এইরূপ: প্রথমে শোভাযাত্রায় জুনা ও নিরঞ্জনী পাশপাশি যায়; তারপর নির্বাণী, উদাসী ও নির্মলা। আর বৈরাগিগণ নাসিক পঞ্চবটীতে থাকিয়া গোদাবরীর রামঘাটে স্নান করেন।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে রবির সহিত মেষ ও বৃহস্পতির সহিত সিংহরাশির মিলনের সন্ধিক্ষণেই উজ্জয়িনীর পূর্ণ কুম্ভযোগের প্রধান স্নান হয়। এই স্থানে একটিই স্নান হয়। শোভাযাত্রায় মধ্যে জুনা,

ডানদিকে নিরঞ্জনী ও বামদিকে নির্বাণী—এই তিন আখড়াই পাশাপাশি যাইয়া শিপ্রা নদীতে দত্ত আখড়ার ঘাটে স্নান করে। সন্ন্যাসিগণের স্নানের পর অপর তীরে বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা পর পর স্নান করিয়া থাকেন।

দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার পদ্ধতি

দিগ্বিজয়ডঙ্কা— জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের বিজয়ধ্বনি : একজন নাগাসন্ন্যাসী ঘোড়ার পিঠে বসিয়া দুইটি জয়ঢাক বাজাইয়া থাকেন।

দিগ্বিজয়ঝাণ্ডা— জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের বিজয়-পতাকা : একজন নাগাসন্ন্যাসী একটি গেরুয়া পতাকা সহ ঘোড়ার পিঠে বসিয়া থাকেন।

কসরৎ— নাগাসন্ন্যাসিগণ পদাতিক ভাবে এবং ঘোড়শোয়ার হইয়া যে ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার খেলা।

নিদর্শন— যে আখড়ার শোভাযাত্রা উহার নাম-লিখিত নিশান।

ঐকতানবাদ্য— যুদ্ধকালীন যে বাদ্য বাজিয়াছিল।

গেরুয়া পতাকা— হাতীর উপরে সন্ন্যাসিগণের ত্যাগের প্রতীক বড় গৈরিক পতাকা।

বিজয়ী ঝাণ্ডা— যুদ্ধে জয়লাভের নিদর্শন, হাতীর উপরে জরিদার মখমলের বড় নীল রংয়ের বিজয়-পতাকা।

দণ্ডধারী— যুদ্ধকালীন যে সকল নাগাসন্ন্যাসী তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী ও ভাণ্ডার রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকজন বস্ত্রধারী মহাপুরুষ (সন্ন্যাসী) সোনা ও রূপার নানা কারুকার্যে মণ্ডিত যষ্টিহস্তে যান।

ধুনাধারী— যুদ্ধকালীন নাগাসন্ন্যাসিগণ আরাধ্যা দেবীর পূজার্চনা করিতেন, তাহার নিদর্শন। কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রজ্বলিত সুগন্ধি ধুনার পাত্র হস্তে লইয়া যাইয়া থাকেন।

ডালা দেবতা— নাগাসন্ন্যাসিগণ শক্তির আরাধনা করিয়া বল্লমহস্তে যুদ্ধ করিতেন। শক্তির প্রতীক-রূপে ঐ বল্লমকেই পূজার্চনা করিয়া আসিতেছেন। এই বল্লমই ডালা দেবতা।

বেদপাঠ— কয়েকজন ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অক্ষতচন্দন ছড়াইয়া চামর ব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হন।

দণ্ডধারী— দেবতার রক্ষক সন্ন্যাসিগণ।

ইষ্টদেবতা— প্রত্যেক আখড়ার ইষ্টদেবতা সোনা ও রূপার নানা কারুকার্যের পাল্কীতে বিবিধ অলঙ্কার ও ফুলের মালায় সুশোভিত। দুই দিকে দুই জন চামর ব্যজন করিতে থাকেন।

ঐকতানবাদ্য— ইষ্টদেবতার মাঙ্গলিক বাদ্য।

দণ্ডধারী— আচার্যের রক্ষক সন্ন্যাসিগণ।

মণ্ডলীশ্বর— আখড়ার আচার্যকে সুসজ্জিত পাল্কী বা হাওদাসহ হাতীর উপরে জরিদার ছাতার নীচে বসাইয়া দুইদিকে চামর ব্যজন করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়।

দণ্ডধারী— সন্ন্যাসীদের রক্ষক।

দিগম্বর— বিভূতি-ভূষিত নাগাসন্ন্যাসিগণ।

অবধূত— গেরুয়া বহির্বাসধারী পরমহংস সন্ন্যাসিগণ।

ব্রহ্মচারী— অগ্নি আখড়াবাসিগণ।

অবধূতানী— সন্ন্যাসিনীগণ, তাঁহারা একমাত্র জুনা আখড়ার অন্তর্ভুক্ত।

আখড়ার বিবরণ

আখড়ার নাম	আখড়ার দেবতা
নির্বাণী	কপিলমুনি
নিরঞ্জনী	কার্তিক স্বামী
জুনা	দত্তাত্রেয়
অটল (নির্বাণীর অন্তর্গত)	গজানন
আনন্দ (নিরঞ্জনীর অন্তর্গত)	সূর্য
আবাহন (জুনার অন্তর্গত)	গণেশ
অগ্নি (জুনার অন্তর্গত)	গায়ত্রী

মঠের বিবরণ

মঠের নাম : শৃঙ্গেরী মঠ গোবর্ধন মঠ সারদা মঠ জ্যোতির্মঠ

ক্ষেত্র বা ধাম : রামেশ্বর পুরুষোত্তম দ্বারকা বদরিকাশ্রম

প্রথম আচার্য : পৃথ্বীধর বা পদ্মপাদ বিশ্বরূপ বা ত্রোটকাচার্য
হস্তামলক সুরেশ্বর বা মণ্ডনমিশ্র

সম্প্রদায় : ভুরিবার ভোগবার কীটবার আনন্দবার

সন্ন্যাসীদের পদবী : সরস্বতী, পুরী, বন তীর্থ গিরি, পর্বত
ভারতী অরণ্য আশ্রম ও সাগর

ব্রহ্মচারীদের পদবী : চৈতন্য প্রকাশ স্বরূপ আনন্দ

বেদ : যজুঃ ঋক্ সাম অথর্ব

তীর্থ : তুঙ্গভদ্রা মহোদধি গোমতী অলকানন্দা

অধিদেবতা : আদি বরাহ জগন্নাথ সিদ্ধেশ্বর নারায়ণ

দেবতা : অধিষ্ঠাত্রী কামাক্ষী বিমলা ভদ্রকালী পূর্ণাগিরি

বৈরাগি-সম্প্রদায়

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে 'বৈরাগী' বলে। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন ; সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। সত্ত্বগুণপ্রধান শ্রীবিষ্ণু পরাৎপর ব্রহ্ম ; তাঁহার উপাসনা অথবা তাঁহার অবতারপুরুষগণের (সত্যযুগে নরনারায়ণ, ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেব) উপাসনা করাই ইঁহাদের সাধনা।

শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্যগণের আবির্ভাবের যুগে তাঁহাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা এই সকল সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকে উপাসনা-ভেদে ইঁহাদিগকে রামায়েত, রামায়তী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইসকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও বড় বড় আখড়া ও মঠ আছে। দক্ষিণ-দেশের স্থানে স্থানে, নাসিকে, চিত্রকূটে, অযোধ্যায়, শ্রীবৃন্দাবনধামে ও নবদ্বীপে ঐ সকল আখড়া ও মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদেশে রামানুজী বৈরাগিবেশী। অযোধ্যায় ও চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক বৈরাগিবেশী। ইঁহারা তুলসীদাসী রামায়ণ ও তুলসীদাসের দোঁহা অধ্যয়ন করেন। শ্রীবৃন্দাবন-অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বৈষ্ণব সমধিক। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্য।

বৈরাগী বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি প্রধান মঠধারী সম্প্রদায় আছে :

১। রামানুজাচার্য-প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়।

২। মধ্বাচার্য-প্রবর্তিত মাধ্বী বা ব্রহ্মসম্প্রদায়।

৩। বল্লভাচার্য-প্রবর্তিত বল্লভাচারী বা রুদ্র-সম্প্রদায়।

৪। নিম্বার্কাচার্য-প্রবর্তিত সনকাদি সম্প্রদায়।

অন্যান্য কয়েকটি সাধুসম্প্রদায়ও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—কবীরপন্থী, দাদূপন্থী, গরীবদাসী ইত্যাদি। তাঁহারাও বৈরাগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রীরামানন্দ, শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীর, কবীরের পুত্র কমাল, কমালের শিষ্য দাদূ, দাদূর শিষ্য গরীবদাস।

শ্রীচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত উদাসী সম্প্রদায়

গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসী হইয়া বাহির হইয়া যান। তিনি পরে যে সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহার নাম উদাসী সম্প্রদায়। সুতরাং ইঁহারা সকলেই শ্রীচাঁদকে প্রধান বা আদি আচার্য বলিয়া মান্য করেন। ইঁহাদিগের আচার্য-গণকে মণ্ডলীশ্বর বলে। দশনামী পরমহংস সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মত এই মণ্ডলীশ্বরদেরও স্বতন্ত্র আশ্রম পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও ভারতের নানা স্থানে আছে। ইঁহারা নানকপন্থী, কিন্তু কালবশে ইঁহারা গুরু নানক অপেক্ষা শ্রীচাঁদকেই বেশী মানিয়া চলেন। গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পাঁচ গুরুর (নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস ও অর্জুন) রচিত এবং শ্রীচাঁদের রচিত গ্রন্থসমষ্টি 'গ্রন্থ সাহেবে'র ইঁহারা পূজা ও পাঠাদি করিয়া থাকেন

বলিয়া ইঁহাদিগকে 'নানক-পন্থী' সাধুও বলা হয়। ইঁহারাও বেদান্তবাদী। ইঁহাদের আখড়ার প্রধানতঃ দুইটি শাখা : (১) উদাসী বড় আখড়া। এই আখড়ার পাঁচজন মোহন্ত আছেন। (২) শ্রীসঙ্গত সাহেবের সময় হইতে উদাসী ছোট আখড়া বা নয়া আখড়া সংগঠিত হইয়াছে। এই আখড়াতেও পাঁচজন মোহন্ত আছেন।

নির্মল-সম্প্রদায় নানক-পন্থী

গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররাও, হরকিষণ, তেজবাহাদুর ও গোবিন্দসিংহ—শিখসম্প্রদায়ে এই দশ গুরু ছিলেন। মুসলমানদের প্রবল অত্যাচারের ফলে দশম গুরু গোবিন্দসিংহ শিখসম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন : (১) সাধু-সম্প্রদায় (ধর্মরক্ষক ও প্রচারক) (২) আকালী-সম্প্রদায় (অবিবাহিত যোদ্ধাবেশে)। সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় : (১) নির্মলা আখড়া—নানক-পন্থী দশমগুরু গোবিন্দসিংহই এই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। কাজেই তিনি প্রধান বা আদি আচার্য। ইঁহাদের আশ্রমকে 'গুরুদোয়ারা' বলে। (২) দশনামী পরমহংস সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের ন্যায় বিভিন্ন মোহন্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। যথা, নির্মলা বিরকৎ কুঠিয়া নির্ম্মলবাস ইত্যাদি।

সাধ ও সাধনা

'বৈভব'

হে প্রিয় সখা এসেছ তুমি
আমার মাঝেতে
আকাশ-ভরা তারায় ঘেরা
স্বপন-সাঁঝেতে !
এসেছ সখা হে প্রিয়তম
আলোর বানেতে
দূরের প্রিয় বারতা তুমি
ঢালিতে কানেতে।
ঘুমানো হিয়া জাগিয়া উঠে
তোমারি পরশে
বিরহগাথা জাগায় ব্যথা
আকুল হরষে।
হৃদয়মাঝে ফুলিয়া উঠে
পুরাণো অভিমান
মরমমাঝে রণিয়া উঠে
হারানো শত গান।
সুদূর-প্রিয়-বারতা-বহ
আসিলে তুমি আজ
অসীম পথে জ্যোতির রথে
অরূপ তব সাজ !

আঁধার রাতে তোমার আসা
বাধার পথে গো
সুনীল-ঘন-আকাশ চিরি'
আলোর রথে গো !
অরূপ-ঘন রূপের ছায়া
জাগালে কেন হায় ?
কী যেন পাওয়া হারায়ে যাওয়া
তাহারে ফিরে চায়।
তাহারে ফিরে চাহিছে বুকে
হিয়ার মাঝেতে
যে প্রিয়তম আসিয়াছিল
স্বপন-সাঁঝেতে—
যে প্রিয়তম হাসিয়াছিল
নীরব রাতেতে—
যে প্রিয় ভালো বাসিয়াছিল
প্রথম প্রভাতে—
তাহারে ফিরে চাহিছে হিয়া—
তাহারি বাসনা—
তাহারি লাগি জীবন ভরি
সাধের সাধনা !

অঙ্কুর

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

বয়স্করা বড় বড় বিষয়-বুদ্ধির কথা বলেন, নানা পরিকল্পনা, নানা সংগঠনের কথা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রকাশভঙ্গীর অঙ্কুর নিতান্ত শৈশবেই কি গ্রথিত হয় না? শিশু-জীবনের পরিকল্পনা বৃহত্তর জীবনে কার্যকরী হয় মাত্র। শিশুরা বড়দের মত ভাবতে পারে, দূরবর্তী না হ'লেও নিকটবর্তী ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য হাস্য-রোধক বা হাস্যকর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান করে। বারান্তরে 'শিশুমানস' প্রবন্ধে সে সব কথা আলোচনা করেছি। (শ্রাবণ, ১৩৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আজকের আলোচনার মূল বিষয় বস্তু দুটো—একটা হলো শিশুদের চিন্তাধারার পিছনে তাদের মানসিক সংগঠনা ঠিক কী প্রকার, আর দ্বিতীয়টা হলো শিশুর জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-ক্রোধের অভিব্যক্তির স্বরূপটা কেমন ধরনের।

সব মানুষের মধ্যেই তাদের মানসিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার নিজস্ব আত্মিক যোগ আছে। কথাটা সংক্ষেপে হলো 'আমি করছি' ভাব। আমি যা বুঝি, আমি যা বলি বা করি, তার মধ্যের সকল প্রকার কার্য-পরম্পরাই হলো সমীচীন। তাই কেউ যখন বেশী ত্রুটি বা বেশী অন্যায় করে, তখন তাকে কেউ সমর্থন না করলেও নিজের আমিত্ব তা' সমর্থন করে। এটার মানে হ'ল' egoism. এই ইগোয়িজ্‌ম্ বা আমিত্ব-ভাবাপন্ন মনোভাব ভাল-মন্দ দুই বস্তুরই সংগঠনার ক্ষেত্রে এমনই অলক্ষ্যে কাজ করতে সুরু করে যে, তার সামান্যতম অনুসন্ধানও বড় সহজ ব্যাপার নয়। শিশুর প্রারম্ভ-জীবনে এই আমিত্ব-কেন্দ্রিক ভাব খুব প্রকট। তার ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সে এটা পরিবেশন করে চলে। তবে সবার আমিত্বও শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের এবং পরের কল্যাণকর অবস্থার দিকে নিয়ে যায় না। দেয় না তাকে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হ'বার আয়ুধ। বরং পারিপার্শ্বিকতার দুরতিক্রম্য চাপে আমিত্ব তার অহঙ্কার-আত্মম্ভরিতার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে উঠে। যখন তারা খেলা করে, দল বাঁধে, আর পাঁচ জনকে নিয়ে সমাজজীবনের প্রাথমিক জীবনযাত্রা শুরু করে, তখন তাদের প্রত্যেকেরই কার্য-পরিবেশনে লক্ষ্য করা গেছে যে, তারা তাদের নিজ নিজ প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দেবার জন্য দাবী জানায়—পক্ষান্তরে, সে স্বীকৃতি না ঘটলে নানা ভাবে আপত্তি জানায়। সবার আমিত্ব সত্যকার কল্যাণপ্রসূ নয়, তার কারণ সবাই সেটাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। আবার সবার আমিত্বের স্বীকৃতিও হয় না। তারও একটা কারণ আছে। সেটা হলো আমিত্বকে চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব। শিশুর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন এটা শুনতে কেমন হ'লেও খুব সত্যি। যেমন সত্যি মধ্যাহ্ন-সূর্যের চেয়েও প্রভাত-সূর্যের স্বাস্থ্যগত তাপ-উপযোগিতা অধিক।

এই ব্যক্তিত্বের কার্যকারিতা-সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার প্রয়োজন আছে। অনেক মহান্ লোকের শিশুজীবনের কাহিনীতে শোনা গেছে, তাঁরা নাকি তাঁদের অপরাপর সমসাময়িক শিশুদের প্রত্যেকের চেয়েও বিভিন্ন ধরনের ছিলেন। এই বিভিন্ন ধরনটা হলো তাঁদের egoismকে চালিত করবার জন্যে অতিশক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। দল গড়বো, কিন্তু দলের নেতা হ'বো, ছবি আঁকবো, সবাইকে চমকে দেবো, মনের ঔদার্য-প্রখরতা দেখাবো

যাতে সবাই আশ্চর্য হ'য়ে যেতে পারে—এমনই মনোবিকাশের বাসনা অবরুদ্ধ মনের অন্তরে অনবরতই তরঙ্গাঘাত করছে, কিন্তু বাইরে আসবার পথ সবার পক্ষে সুগম হচ্ছে না। কারণটা হলো তাকে, বিশেষ করে আমিত্ব-ভাবাপন্ন মানসিক সংগঠনকে চালিত করবার প্রকৃত শক্তির অভাব। সাহসটা ক্রমেই তার কাজে আর মনে দৃঢ়তা এনে দিতে পারে যখন সাফল্যের জয়মাল্য তার গলায় এসে পড়ে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা, "এসেছিস্ যখন তখন একটা দাগ রেখে যা।" এই দাগ রেখে যাবার পিছনে যে সংগ্রামের অন্তহীন চিহ্ন পাওয়া যাবে, তার মূল কোন্ প্রেরণাসঞ্জাত? পৃথিবীতে যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিনের মধ্যে অন্ততঃ কমপক্ষে কয়েকটি দিনও যেন তার নাম, তার পরিচয়, তার স্মৃতি অম্লান থাকে, এই প্রচেষ্টা মানবের আদিম প্রচেষ্টা, এই ইচ্ছা মানুষের শ্রেষ্ঠ আন্তরিক ইচ্ছা, এই উদ্দেশ্যই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়। শিশুদের খেলা-ঘরের জীবন অলীক —এই রকম মন্তব্য করেন সুগঠিত মস্তিষ্ক বয়স্করা। কিন্তু তার এই অলীক জীবনের মধ্যেই উত্তরকালের সম্ভাব্য পরিণতির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। খেলা-ঘরে তার মনের সঙ্গে, মতের সঙ্গে ক্রীড়াসূচীর মিল হ'ল না। ফলে খেলা সে ভেঙ্গেই দিল। সামাজিক কর্মি-পরিষদ গঠিত হ'ল—কর্তৃত্ব করতে পেল না ব'লে দলে ভাঙ্গন এনে দিল। সাহিত্য-সেবার অঙ্গ হিসাবে সাময়িক পত্রিকা, বুলেটিন, আলোচনাপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করবার প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল। মূল উদ্যোক্তার মত ভিন্নমুখী হওয়ার জন্য সে প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল। আর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারলো না। এ সবই হ'ল আমিত্বের সর্বাধিনায়কতা। প্রচেষ্টা, কর্মশক্তি, উদ্দীপনা, এমন কি অহঙ্কারের সঙ্গেও পা মিলিয়ে মিলিয়ে সে চলে। তাই যার মধ্যে সে শক্তির সঞ্চয় অতিরিক্ত তার প্রভাবকে কেউই ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আসলে সেটাই হলো আমিত্বের ব্যক্তিত্ব।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা। সব প্রবণতার অভিব্যক্তি শিশুর মানসলোকে শিশুকাল থেকেই অঙ্কুরিত হয় না। কোনো কোনো আবেগ তার স্পষ্ট রূপ প্রকাশ করে তখন, যখন শৈশবের সুবিস্তীর্ণ অসহায়তা কেটে যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু যে ভাবাবেগের অস্তিত্বটা জীবনের শুরু হ'তেই প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয় সেটা হ'ল ক্রোধ। তার অর্থ হ'ল, ক্রোধকে একেবারে প্রাথমিক ভাবাবেগ বা ভাবানুভূতি এবং তার প্রকাশ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ক্রোধ-লোভ-বিরক্তি প্রায় একই পাত্র হ'তে পরিবেশিত হয়। কেবলমাত্র প্রকাশ-ভঙ্গীর রূপ বা স্বরূপটা একান্তই ভিন্ন। আয়ত্তে আনবার উদ্যম বা উদ্দামতা সকল সময়েই বেশ প্রবল। সেই প্রাবল্যকে রোধ করবার শক্তির অভাবেই ক্রোধরূপে বাইরে দেখা দেয়। অবশ্য সেই শক্তি অর্থাৎ সর্ববিষয়ে বা অধিকাংশ বিষয়ে না-পাওয়া-জনিত ক্ষতিকে সহ্য করবার সংযম অনেক পরে অর্জিত হয়। মনোবিকারের আদিমতা যতদিন এবং যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা হওয়া সম্ভব নয়। মুঠোর বাইরে যেটা রয়ে গেল, সেটাকে পাবার জন্য যে চেষ্টা তার বিফলতা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি। ক্রোধ সব সময় একই প্রকাশ-ভঙ্গী নিয়ে বিদ্যমান থাকে না। রূপান্তরিত হয় নব নব বিন্যাসে। লোভ হয়েছে কোন বস্তুর উপর; শিশুর মানসিক গঠন তাকে তখনই পাবার জন্যে প্রেরণা যোগালো। বিফলতার ফলে আবার সঙ্গে সঙ্গে জাগল ক্রোধ; আর বাড়লো লোভ। পাওয়া গেল না বলে পাবার আগ্রহটা তীব্র হ'তে তীব্রতর হ'তে লাগল এবং ক্রমেই বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট লোভের আকার গঠন করতে সমর্থ হল। বিরক্তিও সেই ভাবে এবং সেই বিচারভঙ্গীর দিক থেকে ক্রোধের অপ্রত্যক্ষ পরিণতি।

প্রথম অবস্থায় তীব্র ক্রোধ সংযমের অভাবে মনের মধ্যে একটা মানসিক বিকার সৃষ্টি করতে পারে। সেটা অতৃপ্তি, প্রকারান্তরে বিরক্তি। মান-অভিমান বা ঈর্ষা, মনোমালিন্য, রাগ, বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যসূচক ভাবাবেগের প্রকাশ শৈশব-মনোজগতে মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং বলা যেতে পারে, সেগুলোর উপলব্ধি একান্তই অনুপস্থিত। রাগ ক'রে ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়া, খাবারের থালাটাকে দূরে ঠেলে দেওয়া, সমবয়সীদের প্রহার করা, কীট-পতঙ্গদের যন্ত্রণা দেওয়া, জিনিষপত্র ভেঙ্গে ক্ষতি করবার চেষ্টা করা প্রভৃতি বহু কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেগুলি যে সময়ে ঘটছে তখন থেকে পিছনের দিকে যে অল্পপরিসর শিশুজীবন অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে তার বিষয়ে গবেষণা করা দরকার। অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তথ্যের আর তত্ত্বের—যা থেকে এই পরিণতিটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া যেখানেই জয়ী হয়েছে, সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, কারণটা সম্পূর্ণ ক্রোধসঞ্জাত—অথবা ক্রোধের পরিণতি যে বিরক্তি, অতৃপ্তি তা থেকেই উদ্ভূত। বিক্ষোভ যেখানে কার্যকর ফলদান করবে না সেখানে বিক্ষোভ ত চলবে না। তবে উপায়? উপায় কিছু আছে অবশ্য, কিন্তু সেটা সংযম-শিক্ষার পরে। সুতরাং আলোচ্য ক্ষেত্রে উপায়টার চেয়ে পরিণতির প্রশ্নটা বিশেষ প্রত্যক্ষ। বিক্ষোভ যখন বাহিরে প্রকাশমান নয়, পরিণতি তখন অন্যদিকে চলে—অনেকটা মর্মলোকের গোপনদ্বার দিয়ে অন্তঃপুরের অন্তরীক্ষে।

এবার আরও একটা প্রয়োজনীয় ভাবানুভূতির কথা আলোচনা না করলে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ হবে না। সেটা হ'ল আনন্দ। প্রাথমিক ভাবাবেগের পর্যায়ভুক্ত এটাও। প্রকাশের ভঙ্গিমা সবসময়ে না থাকলেও প্রকাশমান যে আছে সেটা চোখ আর মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হ'তে পারে। আনন্দের অনুভূতিটা হ'ল অনেক পরিমাণে মনো-বীণার সহানুভূতি বা দরদের তারে সুরসৃষ্টির কাজ করা। যেখানে কিছুটা সমর্থন, কিছু পরিমাণে সহানুভূতি, কিছু অংশের স্বীকৃতি থাকে, সেইখান থেকেই এই রসের উৎস তার জয়যাত্রা শুরু করে। ভাল লাগলেই ভাল ব'লে অনুভূত হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে ভাল লাগবার মধ্যে সমর্থনের অভাব যদি না হয়, তা হ'লে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত শিহরণ সৃষ্ট হয়। সেটা আনন্দ-রসানুভূতির তরঙ্গাঘাত। শিশু কিছু প্রত্যাশা করল, সেটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হ'ল, সুতরাং সে খানিকটা আত্মপ্রীতি বা আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোধ করল। সেটাই তার খুশীর মনে আনন্দের ঢেউ তুলে দিল। কোনো সামান্য-তম প্রকাশ বা নড়াচড়া স্বীকৃতি লাভ করলে শিশুর কাছে সেটা বিরাট কীর্তি—সাফল্য, গর্ব আর আনন্দে ভরা। আর এই আনন্দের রসলোক প্রকৃতির মূল অনুভূতি থেকে সঞ্চারিত হয় ব'লে এই ভাবানুভূতি প্রকৃতপক্ষে শিশুর প্রাথমিক সংগঠনার পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। যার মনের মাঝে কোনো সময়ে আনন্দের ঢেউ লাগে না, তার প্রসারের সম্ভাবনা নেই। আনন্দানু-ভূতি হ'ল একমাত্র আবেগ যা' সব বড় হবার পথগুলোকে আলোকিত ক'রে রাখতে সক্ষম। আনন্দটা কেমন করে শিশুর মানসিক শক্তির সঞ্চার ও বৃদ্ধির সহায়তা করে সেটা বোধ হয় একটু বুঝিয়ে বলা প্রাসঙ্গিকই হবে। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে যে উদ্দীপনা সঞ্চিত হয় সেটার প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ মানুষের শৈশবে বড় হবার বিরাট গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির বন্ধন খুলে দিতে পারে আনন্দের পরিবেশন। দ্বিতীয় অবস্থায় হ'ল সাফল্যলাভ ও আকারগত বৈশিষ্ট্য। সাফল্যলাভ সমাধানের জন্যই নয় বরং প্রকারান্তরে

এটা আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সফলতালাভ ঘটেছে যখন, তখন শিশু আরও ভিন্নতর বস্তুতে নিজেকে নিযুক্ত করবার প্রয়াস করবে। তা না হ'লে সাফল্যের উপ-যোগিতাই কী? সাফল্যের জন্য যে অনুভূতি বিশেষ করে তাকে আরও কোনো কর্ম-প্রেরণার প্রতি উন্মুখ ক'রে তোলে সেটাই ত আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। তৃতীয় পর্যায়ে হ'ল আনন্দের রসপাত্র হ'তে পরিবেশিত হয় ইচ্ছা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, কর্ম-দ্যোতনা, পুনঃপ্রয়োগ, উদ্যোগ ও উদ্যম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ে আনন্দই একমাত্র একটা শিশুকে পরিণত মানবে রূপান্তরিত করবার অঙ্কুর ব'লে স্বীকৃত হ'তে পারে। ব্যর্থতা কেন আসে বা ব্যর্থতা কি বস্তু? প্রকৃত কথা বলতে গেলে শিশুর কাছে এর পরিচয় অত্যন্ত আপেক্ষিক। আনন্দ যদি না থাকে সফলতাও ব্যর্থ ব'লে অথবা ব্যর্থতার রূপ ধরে মনোবেদনার কারণ হ'য়ে দেখা দিতে পারে। মিষ্টি-মাখানো তিক্ত দ্রব্য যেমন মিষ্টতার প্রভাবে আপন তিক্ত-তাকে হারাতে বাধ্য হয়, জীবনের সব অসামঞ্জস্য, তুচ্ছতাও তেমনি আনন্দধারায় প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠে। এইটাই আনন্দরসানুভূতির গূঢ় কথা। আর এই মূল সুরটাও অতি শিশুজীবনেই দানা বেঁধে উঠে এবং যথাকালে অঙ্কুরিত হ'বার জন্য অনুকূল পরিবেশের সন্ধান করে।

তাহ'লে দেখা গেল, গঠনের ক্ষেত্রে egoism যতটা আনন্দকে বাহন করে চলা শুরু ক'রতে পারবে ততটাই তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুসাধিত হবে। ক্রোধকে ও অন্যান্য তীব্রতর উদ্দীপনা বা ভাবাবেগকে সংযত করবার পক্ষেও তার উপযোগিতা কম নয়। বরং প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে egoism যেখানে ব্যর্থ হ'য়েছে, সেখানে আনন্দের মন্দাকিনীধারা অনুপস্থিত ছিল। কারণ, যে বিরুদ্ধশক্তি আমিত্বভাবাপন্ন মনোভাবকে ধ্বংস করতে পারে তাকে পরাভূত করবার একমাত্র উপায় হ'ল আনন্দের সাধনা। প্রারম্ভ-জীবনে মানবশিশু যাতে সেই সাধনায় ব্রতী হ'তে পারে, তার জন্য সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার আলোচনার এইটাই হ'ল প্রধানতম ইঙ্গিত।

দুটি কবিতা

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

'উত্তর'

কহিল সাগর
আকাশের মুখ চুমি
"ওগো প্রিয়তম
কত বড় বলো তুমি?"
কহিল আকাশ
"একি কথা তব মুখে?
মোর ছবি আঁকা
রয়েছে যে তব বুকে!"

'তীর্থলীলা'

আকাশে সাগরে যেথা
করে কোলাকুলি
উদার বাতাস সেথা
নিছে পদধূলি।
মহতে মহতে যেথা
হয় দরশন
বিরাজে কেবলি সেথা
লীলা উপবন

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মজীবনের ক্রমবিকাশ

শ্রীনবশঙ্কর রায় চৌধুরী

ধর্মের আকাশে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আচার্যরূপে ও প্রচারকরূপে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রতিভা যে দিকেই নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই দিকই অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষকে তিনি চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই নারায়ণ বিদ্যমান, এবং তাহার সেবাই ঈশ্বরের সেবা এইরূপ প্রচার করিয়া মানুষকে অপূর্ব মর্যাদা দান করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও বলিয়াছিলেন, "I am called to serve men. My object is not merely to look to the spiritual welfare of men, but also to their bodily welfare." (The Apostle's Calling) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাহাতেই ব্রহ্মলাভ, ইহা কেশবচন্দ্র বার বার প্রার্থনামঞ্চ ও তাঁহার বক্তৃতাবলীতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইখানে স্বামীজীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মানবপ্রেমে ও মানব-সেবাতে দুইজনই জীবন উৎসর্গ করেন। আমাদের মহৎ কর্তব্য-সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা শুধু এযুগে নয়, যুগ হইতে যুগান্তরে মনুষ্যসমাজের চিন্তার খোরাক হইয়া থাকিবে। তাঁহার ধর্মজীবনে যে সব মহাপুরুষ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। যৌবনে পৌত্তলিকতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া কেশবচন্দ্র নিজ চিত্তে অস্থিরতা অনুভব করেন। অন্য কোন মতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া পাপবোধের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়েন। এইপ্রকার মানসিক কষ্টের মধ্যে যখন তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত একটি প্রচারপুস্তক তাঁহার হাতে আসে। সেই প্রচারপুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও নিজ মতের অনেক সমর্থন দেখিতে পাওয়ায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহার পূর্বে তাঁহার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীঃ ইংলণ্ডে এক সভায় তিনি বলিয়াছিলেন, "English education unsettled my mind, and left a void; I had given up idolatry, but received no positive system of faith to replace it. (Lectures in England)

তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের আদেশে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য যতখানি সফল হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে অথবা মহর্ষির আকর্ষণে, যে ভাবেই হউক, মহর্ষি-সঙ্গলাভ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া যিনি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গতিলাভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াই কেশবচন্দ্র নিজ ব্যক্তিত্বের বলে নেতা ও উপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইলেন। প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া রুদ্ধ কারাগারে এতদিন যাহা অপ্রকাশিত ছিল তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমাজ ও দেশ ঈশ্বরের আদেশ ও নববিশ্বাস-সম্বন্ধে নূতন কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের চরিত্রে বৈরাগ্য-প্রণোদিত দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। যে যুগে খ্রীষ্টধর্ম ও ইংরেজী সভ্যতার হাবভাব আমাদের শিক্ষিত সমাজে উগ্র আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, সে যুগে কেশবচন্দ্রের চরিত্রের গতি উহা হইতে ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উহার আচার-ব্যবহার হইতে নিজেকে দূরে রাখা কেশবচন্দ্রের দৃঢ় চরিত্রের এক অভিনব প্রকাশ। মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাতেই দুইজন দুইজনকে বুঝিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন এই বৃদ্ধ ও যুবার মধ্যে ধর্মের গভীর আলোচনা চলিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র বলিয়া যাইতেছেন, বৃদ্ধ একমনে শুনিয়া যাইতেছেন, মধ্যে মধ্যে মহর্ষি কিছু বলিতেছেন, কিন্তু শুনিতেছেন বেশি। এরকম শ্রোতা মানুষের জীবনে কয়জন আসে? মহর্ষির সত্যসন্ধানী দৃষ্টি কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশা-ভরসার একটি উজ্জ্বলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। কেশবচন্দ্রও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় শান্তি লাভ করিলেন। পরবর্তী জীবনে কেশবচন্দ্র মহর্ষি-প্রদর্শিত পথ হইতে ভিন্নপথ অনুসরণ করিলেও দুইজনের মধ্যে মধুর আত্মিক সম্বন্ধ চিরদিনই অটুট ছিল। ১৮৬২ খ্রীঃ মার্চ মাসে বর্ধমানের অন্তর্গত গুসকরা গ্রামে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকাকালীন মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে বরণ করিবার নির্দেশ ঈশ্বরের নিকট হইতে পান। "কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে বরণ কর, সমাজ সর্বপ্রকারে সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইবে।" (শ্রীকেশব-কাহিনী) ঈশ্বরের নিকট হইতে এইপ্রকার নির্দেশ পাওয়া মাত্র মহর্ষি তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করিলেন ১৮৬২, ১লা বৈশাখ।

ইহার পর কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার-রূপে আমরা দেখিতে পাই। ব্রহ্মবাণী অনুসরণ করিয়া তিনি যেদিকেই চলেন সকল ব্রাহ্মেরা সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন। আচার্যের গুরু দায়িত্বের পদে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি মন স্থির করিয়া মহর্ষির অনুমতি লইয়া পূর্ববঙ্গ-প্রচার-সফরে যান। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মিলন ও আচার্যপদে অভিষেক; অতএব ব্রহ্মানন্দের পূর্ববঙ্গ সফরেও আমরা করুণাময়ের মঙ্গলহস্ত অনুমান করিয়া লইতে পারি। ইহার পূর্বে তিনি একবার ধর্ম-প্রচারে কৃষ্ণনগরে আসেন। সেই সময় কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত নদীয়া জেলা খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের কবলে পতিত হয়। কেশবচন্দ্রের প্রচার-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ডাক্তার ডফ্ তাঁহার অসাধারণ কার্যক্ষমতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "The Brahmo Samaj is a power—a power of no mean order—in the midst of us." (শ্রীকেশব-কাহিনী) কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ-সফরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কখনও পদব্রজে কখনও নৌকায় ব্রহ্মবাণী প্রচার করেন। এই সময় তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ 'True Faith' রচনা করেন। কেশবচন্দ্র বিশ্বাসাত্মা পুরুষ, তাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকে নানারূপ পরীক্ষার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। সমস্ত জীবনটাই যুদ্ধক্ষেত্র মনে করিয়া তাঁহার 'জীবনবেদে' এক জায়গায় লিখিয়া গিয়াছেন, "এখন যদি শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বিরোধানল প্রজ্বলিত হয়, বিপদ আসিয়া আমাদিগকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করে, তথাপি ভয় নাই। কেননা জয়ী হইবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি, কোন যুদ্ধেই হারি নাই। যত মহারণে প্রবৃত্ত হইলাম, যত অনুকূল প্রতিকূল অবস্থাতে পড়িলাম, সর্বত্রই জয় হইল।" 'True Faith' গ্রন্থে তিনি যে অপূর্ব বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা

ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে এবং সমষ্টিগতভাবে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজকে ধর্মজগতের এক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে ব্রাহ্মসমাজে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর জন্ম যাঁহার নাম প্রথমেই করিতে হয় তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নন। ব্রাহ্মসমাজে নানাপ্রকার ব্যাপারে লিপ্ত থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে নানাভাবের উদয় হইতে থাকে।

১৮৭০ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরে, ঠিক এই সময়টিতে কেশবচন্দ্রের মনের ভাব বিশ্লেষণ করা অথবা তাহার গতিধারা চিন্তা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পূর্বেই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান এবং প্রার্থনার সময় সময়মত তাহার উল্লেখ করেন। এখন তিনি তাঁহার কর্মপদ্ধতিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। প্রথম মানুষ প্রস্তুত করা, দ্বিতীয় মনুষ্যসমাজের সেবা। 'The Apostle's Calling'এ তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "I am called to form men." আবার বলিয়াছেন, "I am called to serve men." এই দুইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বেই সেখানে কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষতঃ শিক্ষিত এবং ধার্মিক সম্প্রদায়ের একটি পরিচয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জনসাধারণ কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনবার্তায় তৎকালে ইংলণ্ডে সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহার ইংলণ্ডভ্রমণ-বৃত্তান্ত আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। নববিধান, তথা এশিয়ার মর্মবাণী লইয়া এডিনবরা, মাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, যেখানেই তিনি গিয়াছেন, জনসাধারণ তাঁহার বাণী ও বাগ্মিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে অবস্থান স্বল্পকাল হইলেও তাঁহার প্রভাব বহুকাল ছিল। তাঁহার মৃত্যুর ২৭ বৎসর পর ১৯১০ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী লণ্ডনে এক কেশবস্মৃতিবাসরে পণ্ডিত ষ্টিফেনস্ শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া অবনতমস্তকে বলিয়াছিলেন, "England owes him a debt of gratitude not only for his direct, but also for the influence of his indirect teaching." (শ্রীকেশব-কাহিনী) কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডগমনে প্রচারের উদ্দেশ্য যতটা ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি সেখানকার রাজনৈতিক মহলে আবেদন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে পিতৃভূমির অভাবমোচনের যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া ফিরিবার পথে মিশর হইতে ১৮৭০ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর সেখানকার সুহৃদ্‌গণকে এক পত্রে লিখেন,—"আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনাদের নিকট গিয়াছিলাম; উহার দুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাবপূরণনিমিত্ত আপনারা প্রস্তুত, এ বিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ-সহকারে আমার নিকট যে আপনারা কৃতসঙ্কল্পতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যখন আমি উহা ভাবি তখনই আমার আহ্লাদ উপস্থিত হয়।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিজয়ী বীরের মত ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নববিধান-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া অনেকে ব্রহ্মানন্দকে ভুল বুঝিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন নববিধানই তাঁহার ধর্মজীবনে পূর্ণতা আনিয়াছে তাঁহারাও ভুল করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার ধর্মজীবনে নববিধান উল্লেখযোগ্য

হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। তাঁহার ধর্মজীবনে নববিধান ক্রমবিকাশ মাত্র। নববিধানের পূর্বে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহার ভিতর দিয়া নববিধানের লীলা প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হইল। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া ব্রহ্মানন্দ কেন বাহির হইয়া আসিলেন, এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ যখন কেশবচন্দ্রের সংস্কার পছন্দ করিল না তখন সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসা ছাড়া তাঁহার আর কি উপায় ছিল? প্রার্থনামঞ্চ হইতে এই সময় তিনি বলিতেছেন,—"হে মুক্তিদাতা বিধানের মালিক, সেই পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের দিন চলিয়া গিয়াছে, প্রায় অতীত হইল। একটি সামান্য শিবির হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিতেছি প্রকাণ্ড পৃথিবী।" কেশবচন্দ্রের যোগদানের পূর্বে পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের গতি ছিল না বলিলেই হয়। তিনি উহার আচার্যপদে আরোহণ করিয়াই চাহিলেন উহাকে টানিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে দাঁড় করাইতে, চাহিলেন উহার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রচারকার্য চালাইতে। এইখানেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ নববিধান তাঁহার আরব্ধ কার্য, যাহা ঈশ্বরের কার্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহাই সমাপন করিবার জন্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ-ত্যাগের কথা উঠিলেই প্রথমেই মনে পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা। ব্রহ্মানন্দের সংস্কারকার্য মহর্ষি পছন্দ করিতেন না; উহা তাঁহার পত্রাবলীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুভাবের সঙ্গে জগতের অন্য ধর্মের মূলভাব মিশাইয়া এক মহাধর্মবিধানের ইচ্ছা মহর্ষির মনঃপূত হইল না। নিখিলবিশ্বকে কার্যক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া ও ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের বিধান প্রচারের ইচ্ছা মহর্ষি অনুমোদন করেন নাই। মূলতঃ একদিকে মহর্ষির অনিচ্ছা, অন্যদিকে ব্রহ্মানন্দের ঈশ্বরের বিধান প্রচারের অদম্য ইচ্ছা, এই দুই বিরুদ্ধশক্তির সংঘাতেই নববিধানের প্রকাশ। নববিধানস্থাপনে কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের দৃঢ়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার মহিমাপ্রচারের তাগিদ এমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহার পূর্বজীবন হইতে তাঁহাকে হাত ধরিয়া যেন একটি অদৃশ্য শক্তি পরবর্তী জীবনে তাঁহাকে পূর্ণতার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ ও মহর্ষিকে ত্যাগ করিবার পরও মহর্ষি ব্রহ্মানন্দের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায়: "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না—তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার মত মনে হয়।" অন্য এক পত্রে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে লিখিতেছেন,—"আমার জীবনে বঙ্গভূমিমধ্যে তোমা অপেক্ষা বিশুদ্ধচরিত্র ও মহৎব্যক্তি দেখি নাই।"

নদী ও সাগরের মিলন যেমন মহামিলন, এইরূপ কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণদেবের মিলন। সাগরের আকর্ষণে নদী যেমন আকৃষ্ট হয় কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন-আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। দুইজনই দিব্যোন্মাদ, দুইজনই ধর্মের স্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছেন। বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্দ্র মাঝে মধ্যে সশিষ্য উপাসনার ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ এপ্রিলের শেষে ব্রহ্মানন্দ সশিষ্য যখন বেলঘরিয়ার তপোবনে উপাসনায় নিযুক্ত আছেন, সেই সময় পরমহংসদেব তাঁহার ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব প্রথমেই কহিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।" ইহার পর একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। সমাধি থাকা কালীন তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রের মধ্যে কি দর্শন করিয়াছিলেন তাহা চিন্তার বিষয়। হিন্দুধর্মের নবযুগের বাহকগণ বলিয়াছেন যে, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" পরমহংসদেব ধর্মজগতে নবযুগের বাহকগণের গুরুস্থানীয়। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে উপমাযোগে কত অধ্যাত্মতত্ত্বকথা শুনাইলেন। বহুবার ব্রহ্মানন্দ-পরমহংসদেবের মিলন হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিলে পরমহংসদেব ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। কখনও তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতেন, কখনও বুকে জড়াইয়া কহিতেন, "তুমি শ্যাম আমি রাধা।" ভাবের জগতে ভাবপাগলের এই খেলা কয় জন বুঝিতে পারে ?

বহুদিন হইল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন। যে সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আজও সম্যকরূপে হয় নাই। যে যুগে যে ভাবের আদর্শ তিনি বহন করিতেন এবং যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহাকে অসাধারণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এবং উপলব্ধি করা যাইবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কেন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান ধর্মের প্লাবন হইতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যেমন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই রকম খ্রীষ্টধর্মের প্লাবন রোধ করিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। নিজেকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার অনুসাশন-পালনই ঈশ্বরের ইচ্ছাপালন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নিজের উপর অখণ্ড বিশ্বাসই ইহার মূল কারণ। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মুক্ত বিহঙ্গের মত ধর্মাকাশে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী আমাকে এবং আমার ধর্মকে গ্রহণ করিবে।" শতবর্ষ পূর্বে এক কর্মবীর ধর্মবীর বাঙ্গালী যতখানি আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ভারতবাসী কি কোনদিন তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে ?

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি

[আগামী ২২শে মাঘ, শুক্রবার (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'মানসপুত্র'—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর (রাখাল মহারাজের) পুণ্য জন্মতিথি। সময়োপযোগী এই স্মৃতি-কাহিনীগুলি ভগবৎ-পার্ষদ 'নিত্যসিদ্ধ' মহাপুরুষের উদ্দেশে স্মরণার্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।—উঃ সঃ]

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

পাঠ্যাবস্থায় প্রথম 'মহারাজ' ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয় স্বামীজীর তিথিপূজার দিন (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) বেলুড়মঠের ভিজিটার্স রুমে। ঘরের মধ্যেই বেড়াচ্ছেন। পাখোয়াজের সহিত গান হবে, সব প্রস্তুত। বাগবাজারের একটি ছেলে তাঁকে একখানি হাতে আঁকা স্বামীজীর ছবি, পেন্সিল স্কেচ উপহার দিলে খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। তিনি আসনে বসলে ধ্রুপদ গান চলতে লাগলো। আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। যখন বেরিয়ে এলেন, তখন

আমি ও আমার সহপাঠী শচীন উভয়ে প্রণাম করলুম। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছ?" বল্লুম, "আমহার্স্ট ষ্ট্রীট থেকে।" বল্লেন, "আজ বড় ভিড়, লোকজন, আর একদিন এসো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।" এমন মিষ্ট কথা কখন শুনিনি। কিন্তু যতবারই এসেছি পাঠ্যাবস্থায় আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। একেবারে দেখা হলো যখন গৃহত্যাগ করে মঠে যোগ দিলুম। সবে মঠে ঢুকেছি কয়েক মাসমাত্র, মহারাজ মান্দ্রাজ বা কাশী থেকে এলেন, ঠিক মনে নেই। উঠানে আমগাছ-তলায় বেঞ্চির উপর বসে তামাক খেতে লাগলেন। আমি, ঈশ্বর, বিরূপাক্ষ, বীরেন, মাখন, যতীন ডাক্তার, চারুদা, গোঁসাই, নরেনদা, গোপাল প্রভৃতি সকলে নমস্কার করলুম। বাবুরাম মহারাজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহারাজ বল্লেন, "একজনকে করলে সকলকে নমস্কার করতে হয়।" আমরা তখন বাবুরাম মহারাজকেও প্রণাম করলুম। হঠাৎ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "তোমাকে দেখা করতে বলেছিলাম না একবার?" আমি বল্লুম, "হাঁ, কিন্তু যতবারই আমি মঠে এসেছি, আপনি ছিলেন না।" জিজ্ঞেস করলেন, "কি রকম লাগছে, পারবে ত?" আমি বল্লুম, "খুব ভাল লাগছে, ঠাকুরের যদি কৃপা থাকে, তা হলে আর পারব না কেন?"

তিনি বল্লেন, "হাঁ, হাঁ, থাকা না থাকা তাঁর হাত। বেশ কাজকর্ম কর। সর্বদাই মনে রাখবে যে ঠাকুরের সেবা করছি, মানুষের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে শান্তি পাবে না। ঠাকুরের সেবা করছি মনে করলে, ভাল মন্দ সকল অবস্থায় আনন্দে থাকবে।"

* * *

মঠে তখন কেনা বলে একজন চাকর ছিল। একবার তার জ্বর, কাজে কাজেই আমাকে, বিরূপাক্ষ, বীরেন প্রভৃতিকে গোয়ালের কাজ, বাসন মাজা, বিচালী কাটা, মঠ ও উঠান ঝাড়ু, ঠাকুরের ঘরের বাসন মাজা, জল তোলা, বাগানের কাজ, ট্যাণ্ডা চালানো প্রভৃতি সব করতে হত। মহারাজের দর্শনের জন্য একদিন ফল-ফুল নিয়ে বলরাম-মন্দিরে গেলুম। সব খবরাখবর নিয়ে বল্লেন, "কাজ ভাল, তবে নিয়মিত ধ্যান-ভজন ও লেখাপড়ার চর্চাও রাখা চাই।" হঠাৎ বল্লেন, "তোকে আমি পাঠক করব, বক্তা করব।" আমি হাসতে লাগলুম; ভাবলুম আমি শাস্ত্রাদি কিছুই পড়ি না, কেবল কোদাল, কুড়ুল, বাঁক নিয়ে থাকি; লেখা পড়া করি না বলে ঠাট্টা করছেন। বল্লুম, "এবার থেকে লেখাপড়া করবার চেষ্টা করব। আমি ত ভাল সংস্কৃত জানি না, তবে বাংলা বা ইংরেজীতে যতটুকু নিজে পারি তা করব।" কিন্তু তার পর থেকে মঠে খুব পাঠ আরম্ভ হলো, বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। বাবুরাম মহারাজ ক্লাশ পরিচালনা করতেন। চারুদা, বিরূপাক্ষ, মাখন, আমি হতুম পাঠক। প্রথম আরম্ভ হলো স্বামীজীর বই। মহারাজ যখন মঠে থাকতেন, তখন বাইরের গঙ্গাধারের বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে শুনতেন। সঙ্গে ব্যাকরণকৌমুদী পড়া আরম্ভ হলো। কিছু দিন পরে কলকাতা থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দজী এসে ব্রহ্মসূত্রের ক্লাস সকালে আরম্ভ করলেন। পরে ললিত, অবনী, পরেশ এসে যোগ দেওয়ায় ক্লাস খুব জোরে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে উদ্বোধন থেকে কপিল মহারাজ, রাজদা, দ্বিজেন, বিমল প্রভৃতিও যোগ দিত। এদিকে শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং ভোরে ধ্যানের ক্লাস আরম্ভ করলেন। যখন কালীকৃষ্ণ মহারাজ, শুকুল মহারাজ থাকতেন, তখন তাঁরাও ক্লাসে যোগ দিতেন।

বড় ও কঠিন কাজ ভুল করলে মহারাজ হেসে উড়িয়ে দিতেন। তিনি শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতেন

ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়ে। পুরাণো ফটকের কাছে একটা চাঁপার চারা যখন পোঁতা হলো, মহারাজ চারুদাকে রোজ তাতে জল দেওয়ার ভার দিলেন। বলরাম-মন্দিরে গিয়েও খবর নিতেন, "চারু গাছটায় জল দেয় ত?" হরিপদ একবার ম্যাগনোলিয়া গাছের ডাল ভাঙায় এক দিন তাকে ভিক্ষা করে খেতে বল্লেন। আবার একজন তাঁর কাছে অনুযোগ করলেন, "ছোঁড়ারা তামাক ধরেছে।" শুনে বল্লেন, "আমি ন বছর থেকে তামাক ধরেছি, তা আমার মানা কি কেউ শুনবে?"

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজ একদিন প্রার্থনার উপর খুব জোর দিয়ে বল্লেন, "সরল ভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। স্বাধীনভাবে মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, একটুও যেন তাতে অবিশ্বাস না থাকে। যারা দীন এবং শান্ত তারা খুব শীঘ্র তাঁর কথা শুনতে পায়। অনেকদিন তাঁকে ডাকিনি বলে, অথবা ভুলচুক হয়েছে বলে তাঁর কাছে লজ্জা করতে নেই। সরলভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেই তিনিও দেখবে সামনে দাঁড়িয়ে। 'সরল না হলে সরলেরে যায় না চেনা।' "

একদিন সকালে বেলুড়ে তাঁর ঘরে আমাদের সঙ্ঘের নিয়মাবলী পড়া হলো। পূজনীয় মহারাজ তাঁর ছোট খাটটিতে ধ্যানস্থ হয়ে বসে। স্বামী শুদ্ধানন্দজী পড়লেন। পাঠ শেষ হলে মহারাজ বল্লেন, "এসব কথা স্বামীজী এ দেহে থেকে বলেননি, খুব উঁচু স্তরে মনকে তুলে তারপর বলেছেন এবং তারকদা লিখেছেন। এসব কথা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য কোরে স্বামীজী বলেননি। ঠাকুরকে কেন্দ্র কোরে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য, তাঁর ভাব প্রচারের জন্য বলেছেন। ঠাকুরের কথায় ও সেবায় সকলের সমান অধিকার—তা সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, ধনী বা দরিদ্র হোক, উচ্চ বা নীচ বংশের হোক—তাঁর কথা ও সেবা যে গ্রহণ করবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। তোমরা জীবনে এই সব সরল বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ কর, আচরণ কর, আর একধার থেকে ছড়াতে থাক, দেখবে কলির প্রতাপ নাশ হয়ে সত্য যুগের আবির্ভাব হবে।"

* * *

একজন আর একজনকে মিথ্যা গালাগালি করায় তাকে উত্তেজিত দেখে শ্রীশ্রীমহারাজ বল্লেন, "হরি মহারাজের কাছে গীতা পড়ছ; কিন্তু শুধু পড়লে কি হবে? সেই রকম জীবন যাপন করতে হবে। সর্বংসহ হতে হবে, লোকের কথায় টললে চলবে কেন? কেবল বিচার করে দেখবে, তুমি ঠিক সত্য পথে আছ কিনা। একরকম লোকের স্বভাব কি জান? তারা ওপর ঠোঁটে ভাল বলে, আবার নীচের ঠোঁটে মন্দ বলে। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' ভগবান বলছেন, জানত?"

একদিন বল্লেন, "কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও কুরুক্ষেত্র, এই পঞ্চপীঠে তপস্যা করলে খুব শীঘ্র সিদ্ধি হয়—এ সব জায়গায় তপস্যা কর।" পরে কুরুক্ষেত্রে যখন গিয়েছিলুম পাণ্ডার খাতায় শ্রীশ্রীমহারাজের নাম দেখলুম। আবার বৃন্দাবনে গোবর্ধনের পাণ্ডারা শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের নামমালা রচনা করেছে দেখেছিলুম। শুনলুম কুসুম সরোবরে শ্রীশ্রীমহারাজ যখন তপস্যা করেন, তখন একবার মৌনী অবস্থা। শীতকালে একজন শেঠ তাঁর গায় একখানা ভাল কম্বল জড়িয়ে দেয়। একটি চোর দেখলে, এ সাধুত মৌনী। সে কম্বলখানি খুলে নিয়ে নিজের ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা তাঁর গায় জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

* * *

শ্রীশ্রীমহারাজের একবার ভাব-সমাধি দেখেছিলুম। পুরাতন মঠবাড়ীর উত্তর পশ্চিমের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন।

প্রায় দ্বিপ্রহর। নীরদ মহারাজ (স্বামী অম্বিকানন্দ) গাইছিলেন : 'ঢুলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব-আবেশে।' কালীকীর্তনের গান। দেখি চোখ দিয়ে অবিরল ধারা বইছে ; পুলক-কম্প, সমস্ত শরীর লাল, কণ্টকিত, দাঁড়িয়ে উঠলেন। দক্ষিণেশ্বরে আর একদিন এইরূপ দেখেছিলুম। নাটমন্দিরে—মাঝখানে মহারাজ, একদিকে মহাপুরুষ মহারাজ এবং অপরদিকে রামলালদাদা। আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে। মহারাজ রামলালদাদাকে বল্লেন, "ঠাকুর যেমন এখানে দাঁড়িয়ে গাইতেন ও নাচতেন, দাদা, তেমনি ক'রে গান।" হাত নেড়ে রামলালদাদা শ্রীশ্রীভবতারিণীর দিকে তাকিয়ে গান ধরলেন, 'কে নাচে সমরে বামা, তিমিরবরণী। শোণিতসায়রে যেন ভাসিছে নীলনলিনী॥' মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ ঠিক সেইরূপ অনুকরণ করতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে একবার কোরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দিকে এগিয়ে যান, আবার ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসেন। তিনজনেরই সে কী ভাবের অভিব্যক্তি! বুঝলুম—স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অঙ্গগুলি কী এবং 'অনুরাগের' পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 'ভাবের' প্রাকট্যই বা কী!

(দুই)

শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, ব্রহ্মানন্দের জীবনমূর্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের চরণোপান্তে বসিবার পরম সৌভাগ্য জীবনের অল্প কয়টি দিন লাভ হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ-প্রবরের দুর্লভ সঙ্গের সেই পূত স্মৃতি গ্লানি-মলিন কলুষ-জর্জর জীবনের অক্ষয় সম্পদ, অমৃতের অফুরন্ত উৎস হইয়া আছে।

মহারাজের পার্থিব জীবনের শেষভাগে তাঁহার দর্শন ও দিব্যসঙ্গলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। তখন কলেজে পড়ি এবং নিয়মিতভাবে বেলুড়মঠে ও মধ্যে মধ্যে বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত করি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের দর্শনলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া যখন প্রথম যাই, তখন মহারাজ কিছু দিনের জন্য বাংলার বাহিরে ছিলেন। একদিন সকালে মঠে গিয়া শুনিলাম তিনি মঠে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং কিছুক্ষণ পূর্বে দক্ষিণেশ্বর গিয়াছেন। শীঘ্রই ফিরিবেন। গঙ্গার ধারে, মঠের ঘাটের বাঁধান সিঁড়ির উপর বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আরও কয়েকজন গৃহী ভক্ত একই উদ্দেশ্যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। একটু পরেই একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। দুই তিনজন সাধু-ব্রহ্মচারী সঙ্গে মহারাজ নামিয়া আসিলেন এবং ঘাটসংলগ্ন ছোট মাঠটির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই প্রশান্ত, সৌম্য মূর্তির দিকে মুগ্ধনয়নে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে দেখিলাম কয়েকজন তাঁহার বিশেষ পরিচিত। মহারাজ সকলের দিকে চাহিয়া কয়েক জনকে সাধারণ কুশলপ্রশ্নাদি করিলেন। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন কেমন আছেন?" মহারাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "দেখুন, আমরা সাধু মানুষ, আমাদের আর কেমন থাকা না থাকা কী? যে দিনটা তাঁর নাম গুণগানে কাটে, সেই দিনটাই আমাদের ভাল গেল মনে করি।" শারীরিক কুশল-সম্বন্ধে প্রশ্নের যে উত্তর মহারাজ দিলেন তাহা আমার হৃদয়কে সেদিন বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। মনে হইয়াছিল—দেহের সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের যোগ্য উত্তর। ইহার পর তিনি গঙ্গার দিকের বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন। তখন উপস্থিত গৃহী ভক্তগণ নানা ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। মহারাজ মৃদু হাস্যের সহিত

সাধারণভাবে 'হাঁ' 'না' বলিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। সেদিন আর কোন সৎপ্রসঙ্গ হইল না। মনে পড়ে, সেদিন একটু অতৃপ্তি ও ক্ষোভ লইয়া ফিরিয়াছিলাম। কারণ আরও ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনিবার আশা অন্তরে ছিল।

ইহার পর একদিন একাদশী তিথিতে মঠে গিয়াছি। মহারাজের দর্শনলাভ এবং রামনাম গান শোনা দুইই উদ্দেশ্য ছিল। মঠে পৌঁছিয়া প্রথমে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া পরে মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি তখন একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। প্রণাম করিতেই আশীর্বাদ করিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় থাকি, কি নাম, কি করি,—ইত্যাদি। আমি তখন কলিকাতায় হেদুয়ার নিকট একটি পল্লীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতাম। আর্থিক অসুবিধার জন্য সেদিন আমার আবাস-স্থান হইতে হাঁটিয়া আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া নৌকায় গঙ্গা পার হই এবং সেখান হইতে হাঁটিয়া মঠে যাই। মহারাজকে ধীরে ধীরে সমস্ত পরিচয় দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করিলাম যে, সেদিন তাঁহার চরণ দর্শন এবং বিশেষ-ভাবে 'রামনাম' শুনিবার উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়াই মহারাজ আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! তুমি রামনাম শোনবার জন্য অতদূর থেকে, অত কষ্ট করে হেঁটে মঠে এসেছ! বেশ, বেশ! তোমার কল্যাণ হোক্। যাও, রামনাম শোন গিয়ে। ভগবানের নামগান, মহা পবিত্র জিনিস। সব পাপ-তাপ, কলুষ ওতে ধুয়ে যায়। আর দেখ, রামনাম গানের সময় সবাইয়ের সঙ্গে নিজেও গাইবে।" আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম, কারণ সে সময় আমি গান করা, বা স্তবস্তোত্র সুর করিয়া পাঠ করা, এ সব বিশেষ পারিতাম না। একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম, "গান আমি মোটেই গাইতে পারি না, সুর হয় না।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "তা হোক্। যেমন পার, আস্তে গাইবে। দেখ, যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয় সেখানে উপস্থিত থাকলে তাতে যোগ দিতে হ'য়, গাইতে হয়। ঠাকুর নিজে একথা বলতেন। যাও, এক্ষুনি রামনাম আরম্ভ হবে।" এমন মধুর, স্নেহপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিলেন যে, আমার সমস্ত মনপ্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল। মনে হইল, একজন সামান্য দীন দরিদ্র ছাত্রের কল্যাণের জন্য এই মহাপুরুষের কী স্নেহগভীর আকুলতা! পরম আনন্দে রামনামের ঘরে গেলাম। একটু পরেই রাম-নাম আরম্ভ হইল। সেদিন পরমপূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ রামনামে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার খুব নিকটে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিলাম। সেদিন রামনাম-গানের সময় মহাপুরুষজীর যে আনন্দোচ্ছল ভাবোদ্বেল মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও মনে পড়ে। রামনামের পর পুনরায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

ইহার তিন চারি দিন পরে একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে মঠে যাই। পৌঁছিয়াই দেখিলাম ভিতরের দিকে প্রাঙ্গণে, ঠাকুরঘরের সিঁড়ির কিছু দূরে, মহারাজ দাঁড়াইয়া আছেন এবং জনৈক সেবককে কিছু বলিতেছেন। আমি প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসেছ?" আমি একটু লজ্জিতভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে না, এইবার যাব।" মহারাজ বলিলেন, "না, আগে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এস। মঠে এসে সকলের আগে ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করে এসে তাঁর পরে অন্য কিছু করবে। যাও!" আমি অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঠাকুর-ঘরে গিয়া প্রণাম করিলাম, এবং তাহার পর নীচে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিলাম। এই সময় মঠে পালিত একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট গাভী সেখানে আসিয়া মহারাজের একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ একজন সেবককে কিছু তরকারির খোসা আনিতে বলিলেন। সেবকটি

একটি চুপড়িতে করিয়া উহা আনিলে মহারাজ নিজের হাতে সেই তরকারির খোসাগুলি পরম স্নেহে গরুটিকে খাওয়াইতে লাগিলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, এই গরুটার এখানে আসার একটা history (ইতিহাস) আছে। এটি যখন বাছুর, তখন একজন কসাই এটিকে মঠের ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাবুরামদা (স্বামী প্রেমানন্দজী) একে দেখে সেই কশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচটাকা দিয়ে একে কিনে নিয়ে আসেন। আমি অনেক সময় একে নিজ হাতে খাওয়াতুম, যত্ন করতুম। এও আমার এমন বাধ্য হয়ে পড়েছে যে, আমাকে দেখলেই কাছে ছুটে আসতে চায়। দেখ, পশুদের ভেতরও কত স্নেহমমতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ রয়েছে।" গরুটিকে খাওয়াইবার পর মহারাজ উঠিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বেড়াইতে চলিলেন। গরুটি তখনও তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যা, মা,—যা, যা।" তখন গরুটি ফিরিয়া গেল, এবং মহারাজ বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। আমি ও আমার সঙ্গী যুবকটি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মহারাজ দোতলার বারান্দায় একখানি ইজি-চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। আমি নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িলাম। এই সময়ে একজন মাদ্রাজী ভক্তও সেখানে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। চারিদিকে শান্ত, নিস্তব্ধভাব। মহারাজ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মাদ্রাজী ভক্তটি মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই প্রসঙ্গের অনুসরণে আমি মহারাজকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, ভগবানের নিকট আমার যদি কোন আন্তরিক প্রার্থনা থাকে, তাকি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়?" মহারাজ বলিলেন, "যদি ঠিক ঠিক ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আন্তরিক প্রার্থনা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। শুধু প্রার্থনা নয়, বিশ্বাসী ভক্তের মনের আন্তরিক ইচ্ছাও তিনি পূর্ণ করেন। সব সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। (মাদ্রাজী ভক্তের দিকে ফিরিয়া) He is the fulfiller of all wishes. ঠাকুরের জীবনের সেই তুলসী বাগান ঘেরার ঘটনা জানতো? ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে থাকার গোড়ার দিকে তিনি নির্জনে সাধনার জন্য পঞ্চবটীতে একটা জায়গায় অনেকগুলি তুলসী গাছ পুঁতেছিলেন। ঐ তুলসী বাগানটি ঘেরার জন্যে তাঁর খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাগান ঘেরার জিনিসপত্র জোগাড় করার বা ঘেরার ব্যবস্থা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ঠিক সেই সময় রাত্রিতে গঙ্গায় জোয়ারের স্রোতে বেড়া দেওয়ার উপযুক্ত কতকগুলি ছোট ছোট রলা কাঠ, বাখারি, খানিকটা দড়ি, মায় একখানা কাটারি পর্যন্ত একসঙ্গে বোঝা বাঁধা অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে এসে লাগল। ভর্তাভারি নাম করে বাগানের এক মালী ঠাকুরকে খুব ভক্তি করত। সে ঐ বোঝাটা তুলে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এল। সেইগুলি দিয়ে তখন তুলসী-বাগানের বেড়া দেওয়া হল। দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সত্যই ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করেন,—এতে কখনও সন্দেহ করো না।" খুব আবেগপূর্ণ স্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়া একটু-খানি চুপ করিয়া রহিলেন। ইহারপর বলিলেন, "দেখ, ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন সত্য; কিন্তু তা বলে প্রকৃত ভক্ত তাঁর কাছে যা তা চায় না। ভগবানের কাছে বিষয় চাইতে নেই; তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, এইসব চাইতে হয়।" এই বলিয়া মহারাজ চুপ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর

কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

* * *

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় মঠে গিয়াছি। জনৈক পরিচিত ব্রহ্মচারীজীর নিকট শুনিলাম, মহারাজ উপরে আছেন। খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলাম। দেখিলাম দোতলায়, গঙ্গার দিকের বারান্দায়, মহারাজ একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন। সামনে পায়ের চটি জুতা দুখানি খোলা, তাহার উপর পাদুখানি রহিয়াছে। বারান্দায়, কোণের দিকে তিন চারিজন সাধু-ব্রহ্মচারী জপধ্যান করিতেছেন। কোন শব্দ বা কথাবার্তা নাই। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, বদ্ধাঞ্জলি,—স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। আমি অতি সন্তর্পণে যাইয়া—তাঁহার ইজি চেয়ারের পার্শ্বে তাঁহার পায়ের নিকট নিঃশব্দে বসিয়া একটু জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিবার পর মহারাজ যেন কতকটা আপনমনে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "পা টা কেমন যেন টস্ টস্ করছে।" আমি উহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা জানাইলাম, "আমি পা টা একটু টিপে দেব মহারাজ?" তিনি বলিলেন, "দাও।" আনন্দে আমার চোখে জল আসিল; একটা উন্মাদনায় দেহ যেন কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের আরও নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে পায়ের পাতা দুইখানি টিপিয়া দিতে লাগিলাম। মহারাজের পদসেবা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কত দিন ধরিয়া ছিল। কিন্তু কোনও দিন সুযোগ পাই নাই, বা সাথে করিয়া চলিতে পারি নাই। অবশেষে ঠাকুর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার কৃপায় সেদিন তাঁহার 'মানসপুত্রে'র পদসেবার অধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। নিস্তব্ধ, মৌন পুণ্যপরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ অবস্থায় উপবিষ্ট মহারাজের পদস্পর্শ করিতে করিতে মনে হইল তাঁহার পবিত্র পদস্পর্শে জীবনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত গ্লানি যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে মহারাজ একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আর এখন দিতে হবে না। থাক্।" তখন তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

আর একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মঠে গিয়াছি। সঙ্গে আমার একটি আত্মীয় বালক ছিল। মহারাজ এক তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিলেন। গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতেছিলেন। নিকটে দুই তিন জন সাধু-ব্রহ্মচারী ও দু-একজন গৃহী ভক্ত ছিলেন। আমি নিজে মহারাজকে প্রণাম করার পর সঙ্গের বালকটিকে প্রণাম করাইলাম। মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" আমি পরিচয় দিতে তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—আর কোন কথা বলিলেন না। গঙ্গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে তামাক খাইতে লাগিলেন। লক্ষ্য করিলাম,—মহারাজ যেন খুব বেশী অন্তর্মুখ। ক্রমে তাঁহার শরীর যেন স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। অর্ধ-নিমীলিত নয়নে গঙ্গার দিকে চাহিয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই হাত হইতে গুড়-গুড়ির নলটি পড়িয়া গেল। একজন সেবক তৎক্ষণাৎ সেটি তুলিয়া লইয়া মহারাজের হাতে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহা তখনই আবার পড়িয়া গেল, হাতে রহিল না। মহারাজ গঙ্গার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, তেমনি অর্ধনিমীলিত নয়ন, —স্থির নিশ্চল দেহে বসিয়া রহিলেন! নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা বুঝা গেল না। প্রায় জড়বৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া গেল,—চারিদিকে আঁধার জমিয়া উঠিয়াছে। আমরা যে কয়জন সেখানে ছিলাম, নিস্পন্দভাবে মহারাজের এই অপূর্ব অবস্থা দেখিতে লাগিলাম।

অদূরে অন্ধকারে আবৃতা গঙ্গা ; সম্মুখে ব্রহ্মানন্দের অতলস্পর্শী গভীরতায় নিমগ্ন স্বামী ব্রহ্মানন্দ! চারিদিকে জমাটবাঁধা এক মৌন গাম্ভীর্য যেন থমথম করিতেছে। এই অনির্বচনীয় পরিবেশের মধ্যে নিজের মনের সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত গতি কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিলাম। এই ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল কাটিয়া গেল। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে আমাদের দিকে একবার চাহিলেন। কোন কথা বলার সাহস বা শক্তি হইল না। শুধু একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

সেই দিনটির স্মৃতি আমার জীবনে অমর হইয়া আছে। আজও যখন ঐ সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে, তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে,—চোখের সামনে সেই ব্রহ্মানন্দঘন মূর্তি আবার যেন জীবন্ত হইয়া উঠে!

পুরাতন পত্র*

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ

Vedanta Ashrama
West Cornwall, Conn.
Nov. 14th 1918

To His Holiness
Swami Brahmanandajee

পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ,

প্রবুদ্ধ ভারতে এবং উদ্বোধনে দেখিলাম যে এবার ঠাকুর বাবুরাম ভায়াকে ডাকিয়া লইয়াছেন —এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি। একে ২ সকল ভাই ও ভগ্নিগণকে হারাইতেছি। এক্ষণে তুমি কেবল একমাত্র প্রাণের সখা রহিয়াছ। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি তোমাকে নীরোগ রাখিয়া চিরজীবী করুন। বহুকাল আমি এদেশে একলা পড়িয়া আছি; দেশে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা কবে পূর্ণ হইবে তাহা ঠাকুরই জানেন। ইউরোপীয় সংগ্রাম স্থগিত হইয়াছে। শীঘ্রই শান্তিরাজ্য বিরাজ করিবে। ভাই, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর যেন অতি শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের সৎসঙ্গে এ জীবনের বক্রী অংশটা কাটাইতে পারি। প্রচারকার্য্য খুব করিয়াছি। আর ভাল লাগে না।

প্রকাশানন্দের কার্য্য বেশ চলিতেছে। গত মার্চ মাসে আমি তাহার Guest (অতিথি) হইয়াহইয়াছিলাম এবং তাহার সভায় বক্তৃতাদি দিয়াছিলাম। প্রকাশ অতি সুন্দরস্বভাব, সচ্চরিত্র এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়। * * *

ভাই, তোমার পত্র বহুকাল হইল পাই নাই। তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। সকল ভ্রাতৃগণকে আমার ভালবাসা ও কোলাকুলি দিও এবং তুমিও গ্রহণ করিও। পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীকে আমার শত শত সাষ্টাঙ্গ দিও। হরি ভায়া কেমন আছে লিখিয়া সুখী করিও এবং তাহাকে আমার বিশেষ বিশেষ নমস্কার দিও। ইতি

দাস
কালী

গঙ্গাধর এখন কোথায় আছে?

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের নিকট প্রাপ্ত

উপরোক্ত পত্রের উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

৫৭, রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট
বাগবাজার (পোঃ আঃ)
কলিকাতা
১৬ই জানুয়ারী, '১৯

পরমপ্রেমাস্পদেষু,

ভাই কালী, বহুদিন পরে সেদিন তোমার একখানি প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ওই দিন আমি মঠে উপস্থিত ছিলাম এবং তোমার পত্রখানি মহাপুরুষকে দেখাইয়াছিলাম ; তিনি উহা দেখিয়া তুমি এখানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ জানিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তোমাকে পূর্ব্বে অনেকবার কত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা না হইলে ত কিছুই হইবার নহে। যাহা হউক, তিনি যে এখন তোমার হৃদয়ে এইরূপ অভিপ্রায় জাগরূক করিয়াছেন ইহাতে আমরা কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। যাহাতে তুমি অচিরে সেখানকার সকল কাজ শেষ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিতে পার তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি। আবার তোমাকে এখানে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলে যে কি আনন্দলাভ করিব তাহা বলিবার নহে। ক্রমশঃ একে একে প্রভুর সন্তান সকলেই চলিয়া যাইতেছেন। বাবুরাম ভায়া দারুণ ব্যথা দিয়া সেদিন চলিয়া গেলেন। আমাদের শরীরও সব ভাল নহে। হরিভাই অনেক কষ্টে এবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই ; এইখানেই আছেন। গঙ্গাধর তাহার আশ্রমে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিল। প্রায় মাসাবধি হইল এখানে আসিয়া চিকিৎসা ও পথ্যাদির গুণে এখন অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। শরতেরও শরীর ভাল নয় ; বাতে কষ্ট পাইতেছে। শ্রীশ্রীমা তাঁহার দেশে ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এখান হইতে ডাক্তার যাইয়া দুইবার তাঁহাকে প্রায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছিল। যাহা হউক তাহার পর তিনি এখানে আসিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। সকলেই তোমার এখানে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইয়াছে জানিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছেন। এখন তুমি সেখানকার সকল হাঙ্গামা সত্বর মিটাইয়া এখানে চলিয়া আইস ইহাই সকলের আন্তরিক ইচ্ছা জানিবে। প্রচারাদি কার্য্য প্রভুর ইচ্ছায় যাহা হইবার হইয়াছে। এখন চিরদিনের যিনি আইস তাঁহাকে লইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কটা কাটাইয়া দেওয়া যাউক। ছেলেরা এখন প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ করুক। প্রভুর কৃপায় তাহারাই এখন সকল কার্য্য চালাইয়া লইতে পারিবে। ভুলভ্রান্তি সকলেরই হইয়া থাকে। এইরূপেই সকলে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। প্রভুর কৃপায় এখানেও তাঁহার কার্য্য একরূপ মন্দ চলিতেছে না। আপনা হইতেই তাঁহার ভাব দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। তুমি আসিলে ইহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। আমরা তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। অধিক আর কি বলিব। সাক্ষাতে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। সকলেই তোমাকে ভালবাসাদি জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে। তুমি আমার হৃদয়ের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে এবং অবিলম্বে দর্শন দিয়া সুখী করিতে অন্যথা করিবে না। ইতি

তোমার চিরসুহৃদ
রাখাল

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বাঁকুড়ায় মঠ ও মিশনের কার্য

বাঁকুড়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট শাখাকেন্দ্রগুলির ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণ নিম্নোক্ত প্রকার :

মঠ-বিভাগ

নিত্যনৈমিত্তিক পূজানুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মঠপ্রাঙ্গণে আলোচ্যবর্ষে ৫১টি ধর্ম-সম্বন্ধীয় ক্লাশ হইয়াছে। ১০টি সাধারণ বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতি একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তন হয়। শ্রীশ্রীকালীপূজা, সরস্বতীপূজা, বাসন্তীপূজা, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী ও স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের জন্মতিথি উৎসব যথারীতি নিষ্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কার্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে। মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৮৮৮। ৩০খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং ২খানা দৈনিক পত্রিকা পাঠাগারে রক্ষিত থাকে।

১৯৫২ সালের শেষভাগে গঙ্গাজলঘাটী থানার অন্তর্গত আমাদের রামহরিপুর কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে।

মিশন-বিভাগ

১। দাতব্য চিকিৎসালয় :—আলোচ্য বর্ষে তিনটি চিকিৎসালয়-কেন্দ্রের কার্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নে যথাক্রমে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা দেওয়া হইল :

(ক) বাঁকুড়া মিশনস্থিত চিকিৎসালয় :—

বহির্বিভাগে	অস্ত্রোপচার-সংখ্যা
নূতন রোগী—১৮৪৮৮	নূতন—২০৮
পুরাতন রোগী—৪৩০১৩	পুরাতন—৪৬৬
মোট—৬১৫০১	মোট—৬৭৪

অন্তর্বিভাগে : নূতন— ২৩৯
পুরাতন—১৭২৫

মোট—১৯৬৪

ঔষধাদি সাহায্য :—১০৫ জন নূতন রোগী ও ১৬০ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে ৫ আউন্স, ২ ড্রাম, ২ গ্রেন কুইনিন সাল্‌ফ বিতরিত হইয়াছে। ১৪৭ জন নূতন রোগী ও ২০৬ জন পুরাতন রোগীর মধ্যে ১২০৯টি প্যালুড্রিন টেবলেট বিতরিত হইয়াছে।

(খ) দোলতলা শাখা চিকিৎসা-কেন্দ্র
নূতন রোগীর সংখ্যা—১৯৬৫
পুরাতন রোগীর সংখ্যা—৪১২৬

মোট—৬০৯১

(গ) রামহরিপুর শাখা চিকিৎসা-কেন্দ্র
নূতন রোগীর সংখ্যা— ৪৫২১
পুরাতন রোগীর সংখ্যা—১৬১৯৫

মোট—২০৭১৬

শিক্ষা-বিভাগ

(ক) রামহরিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—ছাত্র ১০১ জন ও ছাত্রী ১৬ জন; মোট ১১৭ জন। আলোচ্য বর্ষে ১৬ জন প্রাথমিক ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছিল; ১৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

(খ) বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয় - ছাত্রসংখ্যা ৭

(গ) সারদানন্দ ছাত্রাবাস—ছাত্র-সংখ্যা ২০

(ঘ) রামহরিপুর পরিবর্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ১৫০

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন

বেলুড় মঠে অনুষ্ঠান

গত ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, '৫৩) শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন-উপলক্ষে বেলুড় মঠে সমস্ত দিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ ও ঊষাকীর্তন; তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি এবং নাটমন্দিরে ও অন্যত্র কালীকীর্তন এবং ভজনাদি নির্বাহ হয়। প্রায় দেড়লক্ষ নরনারী মঠে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্নে মঠের সুবিস্তৃত প্রান্তরে বহুসহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর এক বিরাট সভায় বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের আলোচনা হয়। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে তাঁহার শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। তিনি বলেন:—

"আজ শ্রীসারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত। এই শুভমুহূর্তে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর নিকট প্রার্থনা জানাই যে, তাঁহাদের শুভাশিস্ যেন আমাদের সকলের উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়।

"বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর অন্তরে জীবনের আদর্শ-সম্বন্ধে ঘোর সংশয় ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া লক্ষ্যভ্রষ্টের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তদনুযায়ী সমাজকে সুসংহত করাই আজ একান্ত প্রয়োজন। জীবনের সেই উদ্দেশ্য কি এবং কিরূপে উহা সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। এই দিব্য দম্পতীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবদনুভূতি। সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তদীয় সন্তানগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগই ছিল উভয়ের জীবনব্রত। এইরূপ জীবনাদর্শই সমাজে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতি, সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। অন্য যে কোন আদর্শ—তাহা নিজের ক্ষেত্রে যত ভালই হউক না কেন, আপেক্ষিক মাত্র।

"শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা এবং মানবজাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ও ঘটনা-বৈচিত্র্যহীন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উহা যে মহান আদর্শের প্রতীক, তদ্দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাই উহা সমস্ত জগতে এক মহতী বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারী-চরিত্রের চরম উৎকর্ষস্বরূপা এবং বলিতে গেলে এক সার্বভৌম আদর্শের প্রতিকৃতি, যাহা সমস্ত জাতি ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"শ্রীসারদাদেবীর জীবনে আমরা একাধারে আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ সন্ন্যাসিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। তিনি ছিলেন তাঁহার দেবোপম স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী এবং জগতে তাঁহারই জীবনব্রতের পরিপূর্তির সহায়িকা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই! মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশই ছিল সারদাদেবীর জীবনের মহত্তম দিক। তাঁহার স্বার্থলেশহীন স্নেহ সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানবজাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল। সারদাদেবীর

জীবন বর্তমান যুগের নারীজাতিকে আহ্বান জানাইতেছে 'নারীত্বের যথার্থ মহিমা বিকাশ করিয়া তুলিবার জন্য—যে মহিমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দিব্য মাতৃভাব। এই অমূল্য জীবনসম্পদের উত্তরাধিকার সর্বসাধারণের নিকট ধরিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে সকলে উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণতার পথে পরিচালিত হইতে পারে আসুন আমরা আজিকার এই পুণ্যতিথিতে জগতের শান্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত বিশ্বজননীরূপ শ্রীসারদাদেবীর নিকট আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করি।"

ডক্টর কালিদাস নাগ, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ এবং স্বামী বিমুক্তানন্দ ভাষণ দেন। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ একটি প্রবন্ধে মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও মহতী শিক্ষা-সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করেন।

সভাপতি স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার ভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন যে, ৫০ বৎসরের জীবনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে কাজ শেষ করিতে পারেন নাই—শ্রীসারদা দেবী তাহা সম্পূর্ণ করার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া জানেন, অতএব মাতা সারদা দেবীও মহাদেবী বা ভগবতী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সকলের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অতি কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবন যাপন করেন। অপরের কল্যাণ কিভাবে হয়, ইহাই ছিল তাঁহার চিন্তা ও সাধনা। আধ্যাত্মিক দিক দিয়াও তিনি অসাধারণ ছিলেন। আজিকার দিনে তাঁহার পবিত্র জীবনের ভাবধারা যত আলোচনা হয় এবং তাঁহার আদর্শ যতটা গ্রহণ করা যায় ততই দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

সভায় স্যার যদুনাথ সরকার, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আরও অনেক গণ্যমান্য সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শত-বর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী অবিনাশানন্দ কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে ঐ দিন সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে একটি বেতার ভাষণ দেন।

১৩ই ও ১৪ই পৌষ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তমণ্ডলীর উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী ওঁকারানন্দ। ১৮ই পৌষ অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৯শে পৌষ, রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় সুসজ্জিত দুইটি দোলায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পুষ্পপত্রমাল্যাদি ভূষিত করিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্থী এবং ভক্তগণের একটি শোভাযাত্রা বেলুড়মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যায়। তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল এবং প্রায় ৫ সহস্র নরনারী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অনেকগুলি দলকর্তৃক গীত মাতৃ-সঙ্গীত শোভাযাত্রায় যোগদানকারী এবং পথিপার্শ্বস্থ নাগরিকগণের চিত্তে অদ্ভুত স্নিগ্ধ ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতেছিল। কালীবাড়ীতে পৌঁছিয়া শোভাযাত্রাটি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীসারদাদেবীর জীবনের বহু-স্মৃতি-জড়িত বেলতলা, পঞ্চবটী ও নহবতের পার্শ্ব দিয়া গিয়া অবশেষে মন্দিরের প্রশস্ত আঙিনায় প্রবেশ করে। দেবদর্শনাদির পর সমবেত প্রায় দশসহস্র নরনারীকে মঠ হইতে আনীত খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কলিকাতায় সভা

বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী শতবর্ষজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে ১৫ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর), কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে একটি মহতী জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈল-কুমার মুখোপাধ্যায়। ডক্টর স্যর সি পি রামস্বামী আয়ার (ইংরেজীতে), শ্রীমতী চন্দ্রকুমারী হাণ্ডু

(হিন্দীতে), শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (বাংলাতে) এবং স্বামী অবিনাশানন্দ (ইংরেজীতে) বক্তৃতা দেন।

ডক্টর আম্বার তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন—বিদেশীরা মনে করে ভারতের স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা, কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মানদণ্ড কি? লিখিতে ও পড়িতে না পারিলেই বিদেশীরা মনে করে অশিক্ষিত। প্রাচীন ভারতে জনসাধারণ জননী, গুরু, যোগী ও সন্ন্যাসীদের বাণী ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করিত। সে শিক্ষাই ছিল প্রকৃত শিক্ষা। মাতা সারদামণি লিখিতে জানিতেন না, কিন্তু পড়িতে জানিতেন। সুতরাং বিদেশীদের কাছে তিনি ছিলেন অশিক্ষিতা। ভারতের আদর্শ দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতের যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সমস্তই মাতা সারদামণির মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিতা। বিবাহের ৭।৮ বৎসর পর সারদামণি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে নিম্নের দিকে টানিবে, না উপরের দিকে তুলিবে? সারদামণি উত্তর দিয়াছিলেন—আমি তোমাকে নীচের দিকে টানিব না; ঊর্ধ্বের দিকে যাওয়ার সাহায্য করিব। সারাজীবন উভয়ে ভ্রাতা-ভগিনীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সারদামণিকে মাতৃত্বের সাধনায় সিদ্ধ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ষোড়শীরূপে পূজা করেন। সারদামণির জীবন ছিল সহজ, সরল ও সাদাসিধা। শ্রীরামকৃষ্ণের পরলোক-গমনের পর মাতা সারদামণি তাঁহার বাণী প্রচার করিতেন। তাঁহার করুণা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের উপর সমান ভাবে বর্ষিত হইত। ভক্তগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার অপূর্ব শক্তি তাঁহার ছিল। প্রেম, ভক্তি ও সাহসের বাণী তিনি প্রচার করিয়াছেন। সেবা ও আত্ম-ত্যাগের প্রেরণা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাইয়াছিলেন।

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে বলেন, ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার বেলুড়ে অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। সারাদিন ধরিয়া তিনি মাতৃপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চনাদর্শনার্থী সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর অবিরাম জনস্রোত গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের দীপ্ত চক্ষু ও আনন্দোজ্জল মুখে এক নূতন যুগের অভ্যুদয়ের আভাস তিনি দেখিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছে যেন, যে রহস্যময় নৈঃশব্দ্য শ্রীশ্রীমাকে ঘিরিয়া ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইয়াছে; যে অবগুণ্ঠন তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছিল তাহা যেন অকস্মাৎ উন্মোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে আনন্দোৎসব

শ্রীশ্রীমা তাঁহার জীবনের শেষ ১১ বৎসর কলিকাতার যে গৃহটিতে বাস করিয়াছিলেন তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই উদ্বোধন কার্যালয়ে ('শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'-নামে ভক্তমহলে অভিহিত) ১২ই পৌষ ভোর ৫টা হইতে রাত ১০টা পর্যন্ত আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, বেদ ও চণ্ডীপাঠ, ভজন, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অন্যূন ৫ হাজার নরনারীর মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান

১৮ই পৌষ (২রা জানুয়ারী, শনিবার) 'সারদা-মন্দিরে' শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উদ্বোধন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ভোর বেলা মঙ্গল-আরতি ও বেদপাঠের পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ এবং হোম নির্বাহ হয়। নিমন্ত্রিতা বহু ভক্ত-মহিলা, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রীগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত পূজা-হোমাদি দর্শন করেন। সকলকেই বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বিকাল ৩টার সময় প্রায় ৫ শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সুসজ্জিতা একখানি প্রতিকৃতির সম্মুখে দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার জীবনী আলোচনা এবং মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। গম্ভীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত সর্বাঙ্গসুন্দর উৎসবটি সকলকে প্রভূত পরিতৃপ্তি দান করিয়াছিল।

জয়রামবাটীতে উদ্বোধন-উৎসব

অভূতপূর্ব উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে জননী সারদাদেবীর পুণ্যাবির্ভাবস্থান জয়রামবাটীতে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পূর্বদিন হইতেই দূর দুরান্তরের বহু ভক্ত নরনারী আশ্রমে (শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে) সমবেত হইতে থাকেন। আশ্রমের স্থায়ী অস্থায়ী সমস্ত গৃহগুলিই আগন্তুকগণের বাসস্থানরূপে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। গ্রামের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের আলয়ে বহুসংখ্যক ভক্তকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

তিথিপূজার দিন সকাল ৯টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের প্রাচীন সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অন্যতম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী কর্তৃক পরিচালিত একটি শোভাযাত্রা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। ঐ পুণ্যদিনে এবং পরের দিবসও বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান-সংযুক্ত পূজা, পাঠ, ভোগরাগ, হোম তথা ভজন-কীর্তন, রামায়ণগান উপস্থিত জনমণ্ডলীর চিত্তে অপূর্ব আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তি উদ্রিক্ত করিয়াছিল। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রথমদিন সন্ধ্যারতির পর একঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীমায়ের পূতজীবনী ও অমৃতময়ী বাণী আলোচনা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। অনুমান ১২ হইতে ১৫ সহস্র নরনারী ঐ গ্রামে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠান

জন্মতিথির দিন প্রভাতে মঙ্গলারতি, বৈদিকমন্ত্র-আবৃত্তি, ভজন-সঙ্গীত, বিশেষ পূজা ও হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্তা নীলিমা আচার্যের সভানেতৃত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি সভায় স্বামী সত্যকামানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। শ্রীমার জীবন ও আদর্শ-সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করেন শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী নারায়নন্, শ্রীমতী সুদর্শন শর্মা, শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, কুমারী নমিতা বসু, শ্রীমতা সরোজ প্রভু ও স্বামী সত্যকামানন্দ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বেগম সুদিয়া কামাল ও শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা। কবি শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর-রচিত কবিতা পড়েন শ্রীআনন্দহরি পাল। সমবেত প্রায় ছয় শত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত ছায়াচিত্রও দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের বিবরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্রেই শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী-জয়ন্তীর উদ্বোধন যথাশক্তি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সকল উৎসবের খবর এবার প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। নিম্নে আমরা মাত্র কয়েকটি চুম্বক (পূজা-হোম-ভজনাদির উল্লেখ না করিয়া) দিলাম। আগামী সংখ্যায় বিস্তৃততর সংবাদ ছাপিবার সঙ্কল্প রহিল।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা)—আলোচনা-সভায় নেতৃত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীএম্ এন্ ঘোষ ও শ্রীমতী সুষমা দেবী বাংলায় এবং শ্রীএস্ এন্ রাওয়াল ও ডাঃ জে কে ওয়াডিয়া যথাক্রমে হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। চিত্তরঞ্জন (১০ মাইল দূরবর্তী) হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

আলদহ—কাটিহারের শ্রীমতী পুষ্পময়ী সিংহের

পরিচালনায় একটি সম্মেলনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কথা ও শিক্ষা-আলোচেনা, পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী নমিতা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মীরা দাসবক্সী ও স্বামী পরশিবানন্দ (আশ্রমাধ্যক্ষ)।

বালিয়াটি (ঢাকা)—১২ই পৌষ স্থানীয় হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। শ্রীসারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করে। বেলুড় মঠের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মূল ইংরেজী অভিনন্দন-বাণীর মর্মানুবাদ স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ পাঠ করেন। স্কুলের ছেলেরা স্বামী বিবেকানন্দ রচিত কবিতাদি আবৃত্তি করে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা চারুবালা সাহা ও শ্রীযুক্ত সনদানন্দ চক্রবর্তী মহাশয় স্বরচিত শ্রীশ্রীসারদা দেবী-স্তব পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় চৌধুরী মায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী অত্যন্ত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। যদিও পল্লীগ্রামের সভা তথাপি প্রায় ৫০০ শত বালবৃদ্ধবনিতা তাহাতে যোগ দেন।

উক্তদিন সকালে শ্রীসারদামণি বালিকা-বিদ্যালয়ে একটি মহিলাসভা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষদর্শিনী শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রবালা রায়চৌধুরী সভানেত্রী হন। উপস্থিত মেয়েরা শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ করেন, সভায় গান ও বক্তৃতা হয়। অত্যন্ত আবেগের সহিত মায়ের কথা বলিয়া সভানেত্রী সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। প্রায় একশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

(1) Vivekananda—The Yogas and Other Works

স্বামীজীর জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, দেববাণী (Inspired Talks), মদীয় আচার্যদেব (My Master), ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট (Christ, the Messenger) এবং আরও কতকগুলি নির্বাচিত বক্তৃতা, কবিতা ও পত্রের সুসম্পাদিত সঙ্কলন। গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বামী নিখিলানন্দ-লিখিত স্বামীজীর বিশদ জীবনী সংযুক্ত হইয়াছে। কাপড়ে বাঁধাই ; ২৫ খানি ছবি আছে ; পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯৯২ ; মূল্য—১০ ডলার। প্রকাশক—Ramakrishna-Vivekananda Centre ; 17E, 94th Street, Newyork 28, N. Y. U S. A.

(2) Thus Spake The Holy Mother

ইংরেজীতে অনূদিত শ্রীশ্রীমায়ের উক্তির সংগ্রহ। সঙ্কলয়িতা—স্বামী শুদ্ধাসত্ত্বানন্দ ; পকেট সাইজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯০ ; মূল্য ।৵০ আনা। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ—৪

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বাবাজী মহারাজ—গত ১৯শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) বরাহনগর পাটবাড়ীতে বৈষ্ণবকুলশিরোমণি ত্যাগ-বৈরাগ্য-প্রেমভক্তির প্রতিমূর্তি শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর মহাপ্রয়াণে ধর্মজগতে একজন যথার্থ সিদ্ধ মহাপুরুষের অভাব ঘটিল। তাঁহার গভীর উদার আধ্যাত্মিক জীবন শুধু বৈষ্ণব-সমাজের নহে, সকল মতের ঈশ্বরভক্তগণের নিকটই আদর্শস্থানীয় ছিল। একনিষ্ঠ ভজনানুরাগ বাবাজী মহারাজের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও নিষ্কাম ভাগবত কর্মে তাঁহার উৎসাহ এবং অকুণ্ঠিত ব্যাপৃতি ছিল বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার। বহু লুপ্ততীর্থের উদ্ধার তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট কীর্তি। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রীরাধা-রমণ চরণদাস বাবাজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারকে তিনি স্বকীয় সাধনা ও মনীষা দ্বারা প্রশংসনীয় ভাবে শুধু সংরক্ষণই করেন নাই, উহাকে পরিপুষ্ট এবং পরিবর্ধিতও করিয়াছিলেন।

বহু-সম্মানিত এই মায়ানির্মুক্ত ভক্তশ্রেষ্ঠের চিন্ময় আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর—১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম আজমীর ও রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে সাধ্যমত সেবাকার্য করিয়া আসিতেছে। ১৯৫২ সালে আশ্রম কর্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি গ্রন্থাগার ও একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি শনিবার শ্রীরামনাম-সংকীর্তন এবং রবিবার উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। আশ্রমের দাতব্যচিকিৎসালয় হইতে ২৫৯৪ জন ব্যক্তি চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। গ্রন্থাগার দুইটিতে চারখানি দৈনিক এবং দশখানি মাসিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। পুস্তকের সংখ্যা ১৬৫৯ ছিল—তন্মধ্যে ১২৪৯ খানি পাঠার্থ সভ্যগণকে দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসর একটি ৩৬ ফুট উচ্চ মন্দিরসহ আশ্র[illegible] শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি-দিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গতবৎসরের উদ্বৃত্ত ২৫৫৮৮/৩ পাই সমেত এই বৎসরের মোট আয় ৩৯২৩৩/০ এবং মোট ব্যয় ৫৪৩২৯/৬ পাই।

নানাস্থানে শ্রীসারদা দেবীর শতাব্দীজয়ন্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমূহ ছাড়া নানাস্থানে নানা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগি-মণ্ডলীর ব্যবস্থায় ১২ই পৌষ এবং তৎসমীপবর্তী দিনসমূহে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। সংবাদপত্রে এই সকল অনুষ্ঠানের কিছু কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে আমরা কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও স্থানের নাম উল্লেখ করিলাম :—

কলিকাতা ও হাওড়ায়—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ, বিবেকানন্দ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিট্যুট, বিবেকানন্দ ইনষ্টিট্যুশন্ (খুরুট), হাওড়া শান্তি সঙ্ঘ, চেৎলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ, হাওড়া শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী জন্মোৎসব সমিতি।

কলিকাতার উপকণ্ঠে—দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির (দেশবন্ধুনগর), বাগুই-আটি পল্লীকল্যাণ সঙ্ঘ, দক্ষিণ দমদম স্বামীজি সেবাসঙ্ঘ।

বাংলার বিভিন্ন জেলায়—ভাঙ্গামোড়া (হুগলী), খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনীপুর), সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কাটোয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জয়নগর-মজিলপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ইছাপুর প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ।

বাংলার বাহিরে—রামগড় ক্যান্টনমেন্ট, আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (পুর্ণিয়া), হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (কাছাড়), আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর

নমস্কার

যং পৃথগ্ ধর্মচরণাঃ পৃথগ্ ধর্মফলৈষিণঃ ।

পৃথগ্ ধর্মৈ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ ॥

অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ ।

শান্তাঃ সংন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ ॥

যুগেষ্বাবর্ততে যোঽংশৈঃ মাসত্ব য়নহায়নৈঃ ।

সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বতশ্চ যঃ ।

যশ্চ সর্বময়ো দেবঃ তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭তম অধ্যায়)

পৃথক পৃথক ধর্মকৃত্যের ফলাভিলাষী হইয়া লোকে পৃথক পৃথক ধর্মচর্যার অনুশীলন করে, কিন্তু এই কল বিভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা মূলতঃ যাঁহার আরাধনা করা হয়, সেই ধর্মস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার।

পুণ্য ও পাপ উভয়েরই অবসান ঘটিয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি আত্মজ্ঞানের সামর্থ্যে সুশান্ত, জন্ম-মৃত্যুর য দূরে—অতিদূরে তিরোহিত, তত্ত্বনিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের এই অবস্থার নামই মোক্ষ। মনুষ্যজীবনের াম ও পরম কাম্য এই মোক্ষ যাঁহার স্বরূপ সেই পরমপুরুষকে নমস্কার।

অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহকে অংশে অংশে বিভক্ত করিয়া মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসররূপে যিনি অনন্ত যুগ রিয়া প্রকাশিত হইতেছেন, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা সেই মহাকালস্বরূপ পরমপুরুষকে নমস্কার।

যাঁহাতে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, যাঁহা হইতে উদ্ভূত, যিনি সব দিকে সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন াই সর্বময় সর্বস্বরূপ পরম দেবকে নমস্কার।

কথাপ্রসঙ্গে

বেদমূর্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়া এবার পড়িয়াছে ২২শে ফাল্গুন, শনিবার, (৬ই মার্চ)। যুগাবতারের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য উদ্বোধনের এই সংখ্যায় তাঁহার জীবন ও শিক্ষা-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা আমরা সন্নিবেশিত করিলাম।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সংজ্ঞিত করিয়াছিলেন 'বেদমূর্তি' বলিয়া। মুখ্যতঃ বেদ অর্থে বুঝায় জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অলৌকিক শাশ্বত জ্ঞানরাশি। যে শব্দসমূহ দ্বারা এই অলৌকিক জ্ঞানকে আর্য ঋষিগণ প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই শব্দ ও বাক্য-সমষ্টিকেও বেদ বলা হয়, অবশ্য গৌণতঃ। এই শব্দরূপ বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ডাদি-সংক্রান্ত কিছু কিছু লৌকিক অংশ রহিয়াছে, দেশ-কাল-পাত্র ভেদে উহাদের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিরন্তন সত্যের যাহা জ্ঞাপক, বেদের সেই অংশ সার্বলৌকিক এবং সার্বকালিক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঐ অলৌকিক জ্ঞান বিপুল আকারে অতিশয় স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল; এই জন্যই স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'বেদমূর্তি', অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনই বেদ-সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয়।

বেদমূর্তি না বলিয়া গীতামূর্তি বা অন্য কোন শাস্ত্রের মূর্তি বলা হইল না কেন? কারণ আছে। হিন্দুদের নিকট বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। বেদ অপৌরুষেয়, অনাদি এবং অনন্ত, অর্থাৎ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বুদ্ধি দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বেদ লিখিয়া যান নাই। ঋষিরা নিত্যবর্তমান বেদকে 'দেখিয়াছিলেন' মাত্র, বেদমন্ত্র তাঁহাদের শুদ্ধচিত্তে 'আবির্ভূত' হইয়াছিল মাত্র। শব্দের মাধ্যমে যেমনটি তাঁহারা পাইয়াছিলেন তেমনটিই তাঁহাদের পুত্র-শিষ্যাদি-পরম্পরা শুনিয়া শুনিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—এই জন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদের রচনায় ঋষিদের অপর কোন কর্তৃত্ব নাই, তাঁহারা শুধু সনাতন সত্যের পরিজ্ঞাপক মন্ত্রসমূহের 'দ্রষ্টা'।

অন্যান্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ নয়। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি উহা বলিয়া বা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তি-চিত্তের অনেক ছাপ ঐ সকল উক্তি বা রচনায় পড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, গিয়াছেও। নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় একমাত্র অপৌরুষেয় বেদে। অন্যান্য শাস্ত্রে অলৌকিক জ্ঞানের কথা অবশ্যই আছে —কিন্তু বেদের ন্যায় বিশাল পরিমাণে নয়, বেদবাণীর ন্যায় অপ্রতিহত শব্দশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়াও নয়। বেদপ্রকাশিত জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া এই সকল পরবর্তী শাস্ত্র রচিত, তাই উহাদের অপর নাম স্মৃতি। বেদ যদি স্বয়ংপ্রভ সহস্রাংশু সূর্য হন তো অন্যান্য শাস্ত্র হইবেন তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ বা অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জ্যোতিঃ-কেন্দ্র। এই তুলনা কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধ একটা গোঁড়ামির কথা নয়, গভীর বিশ্লেষণমূলক একটি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিস্তারিত আলোচনার ইহা ক্ষেত্র নয়।

মানুষের গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, বিশ্বাস, সভ্যতা কালক্রমে বদলায়, ধ্বংস হয়, কিন্তু সৃষ্টির বিধাতা ঈশ্বর যেমন অবিনাশী তেমনি তাঁহার সনাতন জ্ঞানরাশি—বেদও রহিয়া যান অব্যাহত। হয়তো কিছুকাল চাপা থাকেন, অপর কোন উপযুক্ত ঋষি আসিয়া 'আবিষ্কার' করেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদ অর্থাৎ সনাতন ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের ন্যায়ই মহিমান্বিত

অর্থ হল অবিনশ্বর অস্তিত্ব, শুদ্ধ জ্ঞান ও অফুরন্ত প্রেম এবং অসীম আনন্দ। অবশ্য এতে এটা বোঝাচ্ছে না যে ভগবান আছেন বা তিনি চেতন বা প্রেমময়; বরং বোঝাচ্ছে তিনি স্বয়ং সত্তা-স্বরূপ, চৈতন্য ও প্রেমস্বরূপ। আমাদের কাছে এসব কথার কথা মাত্র। মন এই সত্যকে ধরতে পারে না; একে নিজস্ব করে নিতে হবে, অনুভব করতে হবে।

অনুভূতির নিম্নস্তরও আছে। তখন ভগবানকে জানাও যায়, আবার অহংজ্ঞানও থাকে। "সেই ভগবৎপ্রীতি আমি জানি ও অনুভব করি—" মরমীর এই ভাবকে বলে সবিকল্প সমাধি। ঈশ্বর তখন সগুণ ব্যক্তিবিশেষ। উপনিষদে এই অবস্থার বর্ণনা এইরূপ আছে: 'মাকড়সা যেমন নিজের জাল বুনে তাতে থাকে ও আবার নিজের মধ্যে সেই জাল গুটিয়ে নেয়, ভগবানও তেমনি এ জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকেন এবং নিজের মধ্যেই আবার জগৎকে গুটিয়ে নেন।'

এই ব্যক্তিসত্তাকে আবার সাকার বা নিরাকার ভাবেও অনুভব করা যায়। মরমীরা ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ দেখে থাকেন। মানবমনের তা কল্পনা নয়, কিন্তু বাস্তব সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিতেন এই বলে যে, নিরাকার সমুদ্রের জল দারুণ শীতে জমে বরফরূপে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। মরমীরা আবার সাকার ভগবানকে অবতাররূপে দেখে থাকেন। খৃষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের রূপ আজও অমর হয়ে আছে। এসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের খৃষ্টদর্শন একটা আত্ম-সম্মোহন ব্যাপার নয়। ভগবান খৃষ্টরূপে এসেছিলেন; তাঁর এই রূপ দিব্য ও শাশ্বত। কৃশ্চিয়ানরাই যে কেবল খৃষ্টকে দেখেন তা নয়, অন্যান্য সাধুরাও তাঁকে দেখে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ খৃষ্টকে দেখেছিলেন। তেমনি একজন কৃশ্চিয়ানও শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পারেন। মানুষ যখন সবিকল্পের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে নানা মূর্তি দেখে থাকে। সেই জন্যেই যথার্থ মরমী যিনি, কৃশ্চিয়ান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা যে কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী হ'ন বা না হ'ন, তিনি কখনও ধর্মান্ধ থাকতে পারেন না। যথার্থ মরমীর কাছে ঈশ্বর-দর্শনের পথ হয় উন্মুক্ত এবং বহুভাবে তিনি তাঁর দেখা পান।

দার্শনিক পরিভাষায় এই সবিকল্প জ্ঞানকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়েছে, যার মূলকথা হল আমি ভগবানের অংশ, তাঁর থেকে বিশেষ কিন্তু পৃথক নয়। এই অবস্থায়ও সমাধি হয় এবং ভগবানের সঙ্গে প্রেম ও মিলন হয়, তাঁর বিভিন্ন রূপ ও গুণাবলী-সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। তখন মনে হয় ভগবান যেন যাবতীয় দিব্য গুণ ও সম্পদের ভাণ্ডার। খৃষ্ট এ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন—'আমি আঙুর গাছ, তোমরা হলে তার শাখা।' সমুদ্র ও তার তরঙ্গের উপমাও দেওয়া যায়। তরঙ্গ কিছু সমুদ্র নয়, কিন্তু সম্মিলিত তরঙ্গেই সমুদ্রের সৃষ্টি। সেইরকম বহু নামরূপে বিশিষ্ট সমগ্র বিশ্ব মিলিয়ে হলেন ভগবান বা ব্রহ্ম।

মরমী ভগবানের এই সব বিবিধ রূপ দেখেন এবং আরও দেখেন এইসব রূপ রূপাতীতে গিয়ে মিলিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—"যখন জ্ঞান-সূর্যের উদয় হয়, তখন বরফ গলে যায়।" ভক্তের তীব্র ব্যাকুলতায় ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন। যেই জ্ঞানসূর্যের উদয় হয় অমনি রূপ অরূপে যায় মিলিয়ে।

এই সব অতীন্দ্রিয় অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে কোন সাধক যখন স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসেন, তখন তিনি এই বিশ্বকে বিভেদসমন্বিত দেখে ভাবেন যে, এগুলি ভগবানের লীলা। তখন তাঁর অহংএর আকারমাত্র থাকে। সময়ে সময়ে তিনি দ্বৈতবাদী হয়ে যান এবং কখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর কত না সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর তখন তাঁর কাছে আসেন পিতা মাতা বন্ধু প্রেমিক বা সন্তানরূপে। এও দেখা যায় যে, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এই সব

একাধিক সম্বন্ধও স্থাপন করতে পারেন। যথা, খৃষ্ট স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন "তোমরা আমার বন্ধু।"

রামচন্দ্র—যাঁকে অবতার বলে গণ্য করা হয়, একদা তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আমাকে তুমি কিভাবে দেখ?" হনুমান্ বড় সুন্দর ভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয় করে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"যতক্ষণ আমার দেহজ্ঞান থাকে ততক্ষণ মনে হয় তুমি প্রভু, আমি দাস। যখন আমি নিজেকে জীবাত্মা বলে ভাবি, তখন মনে হয় তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। আর যখন ভাবি যে আমি পরমাত্মা, তখন আমি আর তুমি এক বোধ হয়।" বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাব প্রবল হয়। বস্তুতঃ এই তিন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয়সাধন করতে হলে—সর্বোচ্চ স্তরে পৌছান চাই। নিম্নস্তরে থেকে—বিশেষ করে ধর্মশাসন ও মতবাদের আওতায় পালিত হয়ে—যদি কাউকে বলতে শোনা যায় যে "আমি ও আমার পিতা এক" তখন আমরা ভাবতে পারি যে, লোকটি ভগবানকে ছোট করছে। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক পথের সাধক একেবারে গোড়া থেকেই এই সব সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজতে থাকেন। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই তিনটি ভাবের অনুশীলন করেন।

জ্ঞানলাভ করতে হলে ঠিক যে নীতিটি অবলম্বন করতে হবে তা হল নিজেকে অহংমুক্ত করা। কোন জিনিসটা ভগবানকে দেখতে দেয় না?—স্বতন্ত্র অহংবোধ। যথার্থতঃ এই অহংএর মোটেই কোন স্বতন্ত্রতা নেই। এটা ছায়ামাত্র, আর ছায়া ভাবে যে সে সত্য। যে করেই হোক এই ছায়াকে তার আলোতে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হিসেবে লোক ভাবে যে ছায়া সত্য, তখন অহংজ্ঞানও আছে। বেশ, সেই অহং ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকুক। নিজেকে পবিত্র ও দেবভাবময় বলে ভাব, তারপর ভগবানের চরণে সম্পূর্ণ নিজেকে সমর্পণ কর।

ভগবৎ-অনুভূতির পথে কয়েকটি কার্যকর উপায় আছে। ধ্যানে এই সব বিভিন্ন ভাব অভ্যাস করতে হয়। নিজেকে ভগবানের মন্দির বলে ভাব। ভগবান সকলের মধ্যে আছেন, তিনিই আমাদের একমাত্র অন্তরাত্মা; সাকার বা নিরাকার যে ভাবেই হোক ভগবানের চিন্তা করা যাক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন এবং তিনিই সর্বব্যাপী সত্তা। অবশ্য আমাদের মধ্যে অহংভাব আছে। আমাদের প্রদীপ-শিখার মত জীবাত্মা সেই বিরাট আলোর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাক। একমাত্র ভগবানই আছেন এই বোধ হলে তবে বলা যায় "আমি ও আমার পিতা এক।" তারপ[র] ভাবতে হয় যে আমরা তাঁর থেকে বেরিয়ে আসছি তাঁর পূজা করছি, তাঁর ধ্যান করছি। আবা[র] যখন আমরা কাজ করি, খাই ও ঘুমাই তখ[ন] ভাবতে হয় যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। অহংজ্ঞানের ছায়া পরিত্যাগ করে এও ভাবা যায় "আমি ব্রহ্ম, তা' হতে অভেদ। আমি বিশ্বের সঙ্গে এক।"

জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সংযোগ চাই। অন্তর ও ভাবকে ব্যবহার করা চাই। ভগবানকে ভালবাসতে শিখতে হবে ও সেই সঙ্গে অনুভব করতে হবে যে আমি ও তিনি অভেদ। ধ্যানাভ্যাস করবার সময় সব কটি সাধনবিধির একটা সংগত সমন্বয় করে নিতে হবে। তবেই ভগবানকে দেখার পথ খুলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুধীর চৌধুরী

পঞ্চবটীর তরুমূলে বসি কাহার অতল ধ্যানে
কাটাইতে কাল প্রতি পলে পলে পৃথ্বীচেতনা ভুলি ;
হাত তালি দিয়ে কখনো নাচিতে মায়ের
আরতিগানে ;
কালীমন্দিরে মাতৃপূজায় নিত্য উঠিতে দুলি ।

এ ছিল শুধুই তব প্রার্থনা মাতৃকমলপদে ;
দাও না আমারে শুদ্ধা ভক্তি, আর কিছু নাহি চাহি।
মাতৃভাবের প্লাবন আনিলে তোমার চিত্তনদে,
জীবনাঞ্জলি পরাৎপরার তারে নিয়েছিলে বাহি ।

পারেনি রহিতে জগজ্জননী আঁখির অন্তরালে :
তব আবাহনে মা যে দিলো ধরা তব অন্তর ভরি ;
পরালো জননী বিজয়ের টিকা তব প্রশস্ত ভালে ;
বিশ্বমাতার অমল অঙ্ক নিয়েছিল তোমা বরি' ।

এক সত্যের বহুধা প্রকাশ সকল ধর্ম মাঝে ;
নানা রূপে ভাবে এক ভগবান দিয়েছে বিশ্বে ধরা ;
একই বীণার বহু মূর্চ্ছনা বিশ্বলীলায় বাজে,
এক সত্তার বিচ্ছুরণেতে সকল সৃষ্টি গড়া ।

"যদি কেহ চাহ হৃদয় ভরিয়া আলোর আশীর্বাদ,"
ঘোষণা তোমার, "ছুঁড়ে ফেলে দাও মোহ-
আঁধারের খেলা ।
মাতৃচরণে লহগো শরণ, লহ সাধনার স্বাদ,
মায়ের ধেয়ানে রহ নিমগ্ন জীবনের সারা বেলা ।"

যুগে যুগে আসে গোলোকের হরি মানবের মূর্তি ধরি',
দুষ্কৃতজন বিনাশন তরে, হরিতে ভুবনভার ।
তুমি এসেছিলে অধরার দেব নামরূপ মালা পরি',
করিলে নরক-পঙ্ক হইতে ধরণীরে উদ্ধার ।

পরমহংস রাম ও কৃষ্ণ মিলনের অবতার,
ভারত অন্তরাত্মার চির জাগ্রত বিগ্রহ ;
তপোবলে তুমি নাশিয়াছ এই যুগের অন্ধকার,
হে তাপস, প্রেমঘন প্রশান্ত আলোর বার্তাবহ ।

বিবেকানন্দ, ব্রজের রাখাল আরো কত যুগ-ঋষি,
তোমার মন্ত্রে উঠেছিল জেগে সাধনার মঠে মঠে ;
তোমার বাণীরে নিয়েছিল বহি দেশে দেশে
দিশি দিশি
হিন্দু ধর্ম সনাতন এযে অখিলে পড়িল র'টে ।

নমো নমো নম শ্রীরামকৃষ্ণ সব সিদ্ধির মণি,
জন্ম তোমার আলো আঁধারের যুগসন্ধিক্ষণে ।
যুগের নেতারা শুনেছিল তব চির উদাত্ত ধ্বনি ;
লভেছিল মহামুক্তি-দীক্ষা তব পদপরশনে ।
ওগো বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ জগতের চিরগুরু !
ঝরাও তোমার কল্যাণধারা ধরণীর শুভ লাগি ;
তব আগমনে সত্য যুগের হইয়াছে যেন শুরু ;
তোমার দিব্য পরশের তরে রহিয়াছি মোরা জাগি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনায়নের এক অধ্যায়

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেতিহাস তাঁহার জন্মের ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার তিরোধানের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বৎসরের তথ্যবহুল ঘটনাবৈচিত্র্যের পরিমাপেই সীমায়িত নহে, পরন্তু তাঁহার স্মৃতির সহস্র সান্নিধ্য, তাঁহার সমৃদ্ধ আখ্যাননিচয় অনাগত মানবসমাজের অনন্তশক্তি

ও প্রেরণার অনর্গল উৎস—চরমতম অধ্যাত্মদর্শনের নিদর্শন, যাহার সাহায্যে মানব আধ্যাত্মিক জীবন-সৃজনের সঙ্কেত পাইবে।

সনাতন ভারতের অবলুপ্তপ্রায় অতীত ও ভাস্বর ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে তিনি দ্যুতিময় 'বর্তমান',—মহাকালের ত্রিভাগ ইতিহাসের প্রয়াগক্ষেত্রে তিনি এক চৈতন্যময় একীভূত জমাট বিগ্রহ, স্বর্গীয় রসাস্বাদনের সঠিক স্বয়ম্ভু সমীকরণ।

বাংলার তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের সকল প্রকার সাধনসিদ্ধির দিগ্‌দর্শন তিনি। এই সাধনসমুদ্রে জীবনতরণী যখনই সীমাহীনতার মাঝে দৃষ্টিহারা হইয়া হাবুডুবু খায়, তখন তাঁহার সুমহান আদর্শ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয়ের অবসান ঘটাইয়া শাশ্বত-স্থির-অচল ধ্রুবতারার ন্যায় দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিয়া ঊর্ধ্বমুখী ও পবিত্র জীবন-যাপনের সহায়করূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই কারণেই তাঁহার জীবন ও বাণী সমসাময়িক কালের ও জাতির নির্দিষ্টতার মাঝে সান্ত নহে, উহা মানবের নৈর্ব্যক্তিক ও নৈর্জাতিক দেবমানবতার প্রতীকরূপে মহাজাতি-সাধনার ব্যাপক ক্ষেত্রেও অবারিত। এইখানেই তাঁহার জীবনের যথার্থ সার্থকতা।

ভারতের ধর্মগত প্রাণ পরশক্তির চাপে যখন মুমূর্ষু, তাহার কৃষ্টি, তাহার সৃষ্টি যখন অনাত্মীয় পালনকর্তার অধীনে ধ্বংসোন্মুখ, তখন মধুমাসে দোললীলার পূর্বে রামকৃষ্ণদেবের এই বাসন্তিক আবির্ভাব যেমন রঙে ও রেখায় সঞ্জীবিত, তেমনি নূতন ফাগের নূতন চুতমঞ্জরীর রসঘন অবদানের তথা শাশ্বত প্রাণধারার দ্যোতক। ফাল্গুনের এই নির্মোহ অবদান ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয়। শীতের হিমেল স্পর্শে স্খলিত পত্রের অবসানে প্রাচীন বৃক্ষদেহে যেমন নবপত্রের সবুজ কোরকদল বিচিত্র শোভায় নবতর তারুণ্যের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হইয়া উঠে সেইরূপ ভারতের প্রাচীন, শুষ্ক-রিক্ত কলেবরে রামকৃষ্ণদেবের আবাল্য-ধর্মভাব-অনুপ্রাণিত জীবনরস নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছে।

গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মের স্বপ্ন ও যুগীদের শিবের জ্যোতির্ময় আলোকের রহস্যময় মিলনের মাঝে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে দরিদ্র অথচ সত্যনিষ্ঠ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা শ্রীমতী চন্দ্রমণির ভাঙ্গা ঘরে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ-দেবের আবির্ভাব। এই তপোবহ্নিকে তাঁহার জন্মের পরক্ষণেই ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় ধাত্রী ধনী কামারনী আবিষ্কার করিলেন উনানের মাঝে। তাঁহার জন্মগৃহ ঢেঁকিশালও বোধ হয় তুচ্ছ তুষের অপসারণে তণ্ডুলরূপ সারবস্তু-গ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

বাংলাগ্রামের উদাস উন্মুক্ত ও উদার জীবন-যাত্রার মাঝে গদাধরের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। প্রাকৃতিক অজস্রতার সাহচর্যে, অনাবিল আকাশের অফুরন্ত দাক্ষিণ্যের মাঝে তাঁহার শৈশবপাঠ হইল সাঙ্গ। প্রকৃতিরূপ গুরুর অধীনে তাঁহার শিক্ষা যে কতদূর সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা বুঝি যখন গ্রাম্যপথে চলিতে চলি[illegible] একদিন মাত্র ছয়বৎসর বয়সে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘের পট-ভূমিকায় হংসবলাকার অবাধ সঞ্চরণ গদাধরের মনকে অধ্যাত্মানুভূতির অনাহত ঝঙ্কারের অধিকারী করিয়া তাঁহার নশ্বরদেহকে মূর্চ্ছাহত করিল সেইদিন হইতেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইল। ভোগপ্রবৃত্তির সহায়ক 'চাল-কলাবাঁধা বিদ্যা'কে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন না। মহাবিদ্যার অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ তাই আপাতবিচারে একপ্রকার নিরক্ষরই থাকিয়া গেলেন।

জীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টির এই নবভঙ্গী তাঁহাকে অধ্যাত্ম-সাধনার অমৃতাস্বাদনে ক্ষুধাতুর করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন—"অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া" এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে

মাঝে সদানন্দে বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার এই ধারণা তাঁহার পরবর্তী উদার জীবনযাত্রার পথে একটি সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন লাভের সহায়ক বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। উপনিষদের মহাবাণীও এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় :—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥" (কঠ)

অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ যে আত্মা তাহার তত্ত্ব জীবসমূহের অন্তরে নিহিত আছে। অকাম ও বীতশোক ব্যক্তি শরীরধারক মন আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নাবস্থায় ঐ আত্মার মহিমদর্শন বা উপলব্ধি করে।

শীঘ্রই এক সুন্দর সুযোগও এই সিদ্ধপুরুষের অভিলিপ্সিত জীবনযাত্রার সহায় হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাধরকে সংবাদ পাঠাইলেন— "কলিকাতায় আসিয়া আমার প্রাত্যহিক পূজারী-বৃত্তিসাধনে সহায়ক হও।" শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় তাৎকালিক দ্বন্দ্বময় জীবন, বহির্ব্যাকুলতার তাণ্ডবময় লীলাখেলা ও আসক্তির মদিরায় মাতলামির মিছিল চলিতেছিল। এই পরিবেশের মাঝে তাঁহার মন হইয়া উঠিল রিক্ত, নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ। ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন জীবন-ধারণের অভাব-অনটন তাঁহাকে অধিকতর নিস্পৃহ করিয়া তুলিল। জীবনের বৃহত্তম লাভের পূর্বে এ এক প্রশংসনীয় প্রস্তুতি। "Blessed are the pure in heart for they shall see God"— পবিত্রাত্মারাই ঈশ্বরলাভ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটিলেন সেই পথে যে পথে ত্যাগই একমাত্র পাথেয়, বৈরাগ্যই একমাত্র সহায়, আন্তরিকতাই একমাত্র উপায়—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" যে খৃষ্টের আহ্বান—"Decline yourself, bear the Cross and follow me"—অর্থাৎ স্বার্থকামনায় ও লাভালাভে উদাসীন হও। জীবনের দুঃখবিপদাদি ধৈর্যের সহিত বহন কর ও আমার পথে অর্থাৎ ভগবানের পথে চল।

গঙ্গার পূর্বতীরে, দক্ষিণেশ্বরের সহজশ্রী ও গাছের জীবন্ত জটলার অন্তরঙ্গতায়, রাণী রাসমণির স্বপ্নাদিষ্ট দ্বাদশশিবমন্দিরযুক্ত কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ শেষ হইল। কলিকাতার নিকটস্থ শহরতলীর এই মুক্ত, নিরালা ও নিস্তব্ধ পরিবেশের অকৃত্রিম সখ্যের মাঝে অখণ্ডজীবনের আস্বাদস্পৃহা লইয়া গদাধর আসিলেন বিষ্ণুমন্দিরের পূজকরূপে। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি বিজয়মূর্তি ভবতারিণীর পূজারী নিযুক্ত হন। সাধনজগতের বিভিন্ন অনুভূতিলাভের অন্তর্লীন ব্যাকুলতা তখন তাঁহার মনে কালবৈশাখীর ঝড় তুলিয়াছে।

এক দিগন্তবিসারী নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে পাইয়া বসে। হৃদয়ে এক বিত্রস্ত জ্বালাময়ী বেদনা মাতৃমিলনাকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত হয়। এই অস্থিরতা যে প্রাণবন্ত একটা কিছু তাহা তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে প্রমাণিত হয়। অঝোর ক্রন্দনে, অভি-মানের সুরে যখন তিনি চীৎকার করিতেন— "আমাকে দেখা দিবি না, মা?"—তখন তাঁহার ঐ গভীর-মিনতিপূর্ণ উত্তরোল আকুতি উপস্থিত সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিত। অবশেষে একদিন মায়ের জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি তখন সবকিছুই চিন্ময় দেখিতে থাকেন। মায়া-আবরণের 'আঁধার গহন ঠেলিয়া' অপরোক্ষ অনুভূতির উহা এক অতন্দ্র উদ্বেল অরুণোদয়। বুঝিলেন চেতন-রাজ্যের স্বপ্নপুরী কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস নহে; ত্যাগ ও প্রেমের সুমহান প্রস্তরখণ্ডে তাহা গঠিত, সাধন-প্রচেষ্টার দুঃখ-বেদনার ভাস্কর্যেই তাহা উৎকীর্ণ, আন্তরিকতার অনুলেখায় তাহা রূপায়িত এবং অকম্প আত্মবিশ্বাসে তাহার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে নানা সাধনার আরম্ভ,

—"যতমত ততপথ" নির্দেশের যাহা ভিত্তিভূমি। পঞ্চবটীর ঘনগাছের সমারোহের মাঝে, রহস্যঘন আবেষ্টনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতানুভূতির চরম সাধনাও বাদ পড়িল না। তাঁহার ভাগবতী তনুতে তাই দেখিতে পাই অনাবিল প্রসন্নতা যাহার সাথে উপনিষদের কথার তুলনা মেলে:—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
—(শ্বেতাশ্বতর উপ)

সেই মহান আদিত্যবর্ণ তমের অর্থাৎ অজ্ঞানের পরপারস্থ পুরুষকে আমি জানিয়াছি; তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, ইহা ব্যতীত অমৃতত্বলাভের অন্য উপায় নাই।

ইহার পর ঐ "চাপরাস"প্রাপ্ত যুগ-প্রতিভূর আধ্যাত্মিক ভোজসভায় সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনি-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খৃষ্টান, দ্বৈতবাদি-অদ্বৈতবাদী, সাকারবাদি-নিরাকারবাদী, গৃহি-সন্ন্যাসী, বালক-বৃদ্ধ সকলেই। এই জনতার ভিড়ে সকলেই তাঁহার উদারতায় বিমুগ্ধ হইয়াছে। সকলেই 'বাদশাহী আমলের টাকা' ছাড়িয়া 'নবাবী আমলের টাকা' সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সর্ব-সাধনার সিদ্ধিরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিতেন কাহার কি ভাব, কি তাহার পথ, কিসে তাহার সিদ্ধি। এই ধারণা তাঁহার বুদ্ধিগত কষ্ট-কল্পনার স্বেদ-মূল্যে ক্রীত অনিশ্চয়তা নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষানুভূতি। ভূ-বিদ্যা পুস্তকে লিখিত মেরু-রশ্মির বর্ণনাপাঠ নহে, ইহা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবের উদারতা ও সকল-সাধন-রীতি-স্বীকারের ঔদার্য এক বিস্ময়কর সত্য। বহু-সাধনার শাখা-সম্বলিত ধর্মবৃক্ষের নীচে বাস করিয়া তিনি 'বহুরূপী'র সকল রূপতত্ত্বের সন্ধানই পাইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও তাহার মত ভুল ও তাঁহার নিজস্ব মতই অভ্রান্ত এই বলিয়া দলে টানিতেন না। প্রত্যেককে তাহার অবস্থাতেই একটু 'চিতাইয়া' দিতেন মাত্র। ব্রহ্মচারীকে সাধারণ কাষ্ঠ আহরণ করিতে দেখিলে তিনি কোন আপত্তি তুলিতেন না, কেবল তাহাকে অধিক অগ্রসর হইতে বলিয়া চন্দনকাঠ, রূপার খনি ও সোনার খনির সন্ধান বলিয়া দিতেন মাত্র। তিনি জানিতেন, "অনাদি অনন্ত অফুরন্ত শক্তির সীমাহীন প্রকাশ—দেশ ও কালের পরিধির মাঝে অদ্ভুত স্ফুরণ; ইহা নিষ্ক্রিয় হইয়াও সকল ক্রিয়ার উৎসস্বরূপ—সংখ্যা, গুণ ও রূপ বাধিত, অনির্বাচ্য ও অনির্দেশ্য; পরমার্থ সন্মাত্র ও বুদ্ধির অগম্য,—তাহা মুখে প্রকাশ করিয়া উচ্ছিষ্ট করা যায় না। তথাপি সত্তা ও শক্তি, ভাব ও ভব (being and becoming), ব্রহ্ম ও জগৎ, শিব ও কালী অভেদ;—ইহা চিৎশক্তি ও চিদ্-বিলাসের লীলাখেলামাত্র।" অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, জল ও তাহার তরঙ্গলীলার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভেদাভাস-মাত্র। পাহাড়ে উঠিবার পূর্বে পৃথিবীর বস্তুনিচয় বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলে তাহা একাকার হইয়া একটিমাত্র বস্তুসত্তার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি বিভিন্ন হইলেও ছাদে উঠিয়া দেখা যায় ছাদ ও যাহা দিয়া তৈয়ারী সিঁড়িও তাহা দিয়াই তৈয়ারী।

এই রহস্যময় চৈতন্য-সত্তা, লোকোত্তর চরিত্র, 'সর্বধর্মস্বরূপী' 'অবতারবরিষ্ঠ', 'নির্গুণ-গুণময়' পুরুষের জন্য মানবের আন্তরিক পাদ্য-অর্ঘ্য চিরকাল সজ্জিত থাকিবে। এই আগ্নেয় সত্তার উদ্দেশে তাই স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে:

"শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"
—(রবীন্দ্রনাথ)

মহামানব শ্রীরামকৃষ্ণ

অতুলানন্দ রায়

ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূল কথা জীবে শিব-জ্ঞান। অখণ্ডব্রহ্ম-সত্তাবোধ। জীবে প্রেম, জীবের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা।

দিব্যদর্শী ঋষি বলেছেন, "ত্বমেকোঽসি বহু-তনুপ্রবিষ্টঃ"...তিনি এক হয়েও বহু তনুতে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এই অনাদি অনন্ত 'একে'র বহু বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও সেই 'একের'-ই অস্তিত্ব-বোধ অপরিসীম ভালবাসার নির্ঝর মুখ খুলে দেয়। ভেসে যায় তখন যোগ্যাযোগ্য-বিচার, থাকে না জাতি কুল মান মর্যাদা ভেদজ্ঞান। তখন ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, ভালো লাগে বলেই ভালবাসা। নির্বিচারে জীবে শিবজ্ঞানে অনুরাগ-নিবেদন করাই চরম সার্থকতা। তখনই মূর্তরূপে প্রকাশ পায় গীতার বাণী, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি"। অমৃতমধুর কণ্ঠে গীত শুনি পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাসের গান, "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" এই মহান সত্যকেই প্রত্যক্ষ জীবনে রূপায়িত করে দেখাতে ও শেখাতে এসেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

জীবকে শিবজ্ঞানে অকপটভাবে ভালোবাসাই শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের মূল ভিত্তি। যে মতেই চল, যে পথেই এগোও, মানুষকেই যদি ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা কর, ভালবাস, পেতে চাও, মতেরও মত্ততা নেই, পথেরও পার্থক্যে যায় আসে না। মানুষ মানুষ। ছোট বড়, উঁচু নীচু, জাত বেজাত দেশ বিদেশ নিয়ে বিচার নেই, বিবাদ-বাদানুবাদ নেই। তখনই সম্ভব যুদ্ধ-বিবাদবিরতি। তখনই বিরাজ করে সাবলীল শান্তি মৈত্রী সাম্য। মৃন্ময় ইষ্টমূর্তি, দেববিগ্রহ প্রতীক তো! ওই প্রতীক মধ্যে ভগবানকে আরোপ করেই না পূজার্চনা। জীবও প্রতীক। এ প্রতীকে "ইহাগচ্ছ" বলা নেই। রয়েছেন-ই তিনি জীবন্তরূপে। সত্য সুন্দর শিব, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-সচেতন।

এই সচেতন দেবতার পূজাই সহজ-পূজা। গর্ভ-ধারিণী বৃদ্ধা জননী মনে কষ্ট পাবেন বলে বেদান্ত-সাধনকালেও শ্রীরামকৃষ্ণ চিরাচরিত বৈদিক প্রথা মেনে নামরূপত্যাগী সন্ন্যাসী সাজেন নি; অখণ্ডব্রহ্ম-সত্তাবোধ করার পরেও প্রত্যহ প্রভাতে প্রথম জননী চন্দ্রমণির পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে প্রশ্ন করতেন, "মা, কেমন আছ?" মায়ের মুখে, "বেশ আছি বাবা" শুনে তবে অন্য কাজ। "বেশ নেই" শুনলে যেন আর কোনও কাজ নেই। সাধন ভজন পূজার্চনা, দেবতার সান্নিধ্য সাধ সব-ই যেন জগন্মাতার প্রত্যক্ষ প্রতীক জননীর তুষ্টি-সাপেক্ষ। এ শ্রদ্ধা, এরূপ ভালবাসা শুধু রক্তমাংসের টানেই প্রকাশ পেত তা নয়। আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে-ই প্রকাশ পেত প্রাণের টানে, নির্বিচারে "সবার উপরে মানুষ সত্য" স্বীকার করে, অপ্রত্যাশী অনুরাগে।

ধনী কামারের মেয়ে। গদাধরের ধাই মা। ব্রাহ্মণের ছেলে গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম)। ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রথম সংস্কার উপনয়ন। উপবীত-ধারণ করে ব্রহ্মচারী বেশে তাকে অন্নভিক্ষা করতে হয়। উপনয়নের প্রাক্কালে ধনী শিশু গদা-ধরকে বললো, পৈতের সময় আমি তোমাকে ভিক্ষা দেব, বাবা।... খেয়াল। অশিক্ষিতা পল্লীরমণী ধনী শিশু গদাধরের প্রতি অত্যধিক স্নেহে ভুলে গিয়েছে গদাধর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর সে নিম্নস্তর

জাতের মেয়ে। প্রথাপর্যায় ভুলে মানুষের মেয়ে ধনী প্রকাশ করে ফেলেছে অন্তরের দুরাকাঙ্ক্ষা। আত্মীয় স্বজন সমাজপতিদের প্রতিবাদ বারণ তিরস্কার গ্রাহ্যও করলো না গদাধর। করলোই সে সত্যপালন। ধনী কামারনীর হাত থেকেই গ্রহণ করলো অন্নভিক্ষা। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ গদাধরের সর্বাঙ্গ থেকে সহস্র মুখে ধ্বনিয়ে উঠলো শাশ্বত জীবনসত্যের স্বীকৃতি, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই বালক গদাধর শিহড়ে রাখালদের সঙ্গে বসে খেলো জলপান, চিনিবাস শাঁখারির হাতে খেলো মিষ্টান্ন, নির্ভীক মনে ছুতোরের মেয়ে খেতুর মার সাধ মেটাতে বসে খেলো ছুতোর মেয়ের দেওয়া ডালভাত।

হলোই বা রাখাল, হলোই বা শাঁখারি, হলোই বা ছুতোরের মেয়ে, মানুষ তো। জীবন্ত জীব। নিঃসংশয়ে ওদের সঙ্গে আপন অসমত্ব অস্বীকার না করলে হয় না যে ব্রহ্মসাধনা, ব্যর্থ হয় যে শাস্ত্রের বাণী; "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"...জীব তো ব্রহ্মই। অপর নয়। অভিন্ন তো!

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীর মেথর রসকে। মায়ের পূজারী রামকৃষ্ণ। এতটুকু পার্থক্যবোধ নেই রামকৃষ্ণের। বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। হাসিগল্প করেন ঠাকুর বাড়ীর মালিকদের সঙ্গেও, মেথর রসকের সঙ্গেও। অবশেষে তাকে একদিন কৃপা করলেন। মানুষ তো সেও। "বহুতনুপ্রবিষ্টঃ" যে পরমেশ্বর তিনি তো রয়েছেন রসকের মধ্যেও। রসকের সেবা তাঁরই সেবা তো!

বৈদিক সন্ন্যাসী তোতাপুরী। রামকৃষ্ণের বেদান্তসাধনের গুরু। পঞ্চবটীর তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসেছেন তোতাপুরী। পাশেই রামকৃষ্ণ। বৈদিক সন্ন্যাসীরা ধুনিকে শ্রদ্ধা করেন বহ্নিব্রহ্ম-জ্ঞানে। ধুনির আলোতে বসে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে বলছিলেন অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির কথা। ঠাকুরবাড়ীর একটা মালির সাধ হয়েছে তামাক খাবে। আর কোথাও সহজে আগুন না পেয়ে এলো তোতার জ্বলন্ত ধুনি থেকেই একটু আগুন তুলে নিতে। মূর্খ মালী। জানে না তো সন্ন্যাসীরা ধুনিকে শ্রদ্ধা করে বহ্নিব্রহ্ম বলেন। আগুন আগুন। নিলই বা এক টুকরো। এলো। নিচ্ছিলও। দেখেই তোতাপুরী চটে লম্বা লোহার চিম্‌টা তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মালীটাকে। মালী তো দিল ছুট্। "দুর্ শালা দুর্ শালা" বলে হেসে গড়াতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। দেখে তোতা বললেন, "দেখলে কী অন্যায়? ধুনির আগুন নিয়ে তামাক খেতে চায়? তা তুমি হাসছো কেন? হাসির কি হলো এতে?"

রামকৃষ্ণ তখনও হেসে গড়াতে গড়াতে বললেন, "হাসছি তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টা দেখে। এই না তুমি বলছিলে, ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় সত্তা নেই। জগতে যা কিছু সবটাতে তাঁরই প্রকাশ। আর রাগের বশে সব ভুলে মানুষকে মারতে-ই তেড়ে উঠলে?"

মালীটাও মানুষ তো। অধ্যস্ত ব্রহ্মস্বরূপ। ক্রোধে স্বার্থে ভেদজ্ঞানে মানুষকে আঘাত করা ভগবানকেই আঘাত করা নয় কি? ভগবানকেই ক্ষুণ্ণ করা নয় কি?

ব্রহ্মানন্দে ডুবে আছেন রামকৃষ্ণ। বাহ্য জ্ঞান নেই। ক্ষুৎপিপাসা-বোধও নেই। নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন অটল অচল হয়ে আছেন মাসের পর মাস, ছয় মাস। এ ভাবে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকাই বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য। পূর্ণাঙ্গ সাফল্য। দেববাঞ্ছিত সচ্চিদানন্দ। সাধকজীবনে সব চেয়ে বড় পাওয়া। জগন্মাতা বললেন, নিজেই আনন্দে মেতে থাকবি কি? লোককল্যাণে নেমে আয়। আনন্দে মাতিয়ে দে সবাইকেও।

নিরুদ্বিগ্ন দেবদুর্লভ পরমানন্দ ছেড়ে নেমে এলেন রামকৃষ্ণ লোককল্যাণে, লোকসেবায়। আত্মদান করলেন মানুষের হিতসাধনে, পরমাত্মীয়-বোধে

পরম ইষ্টজ্ঞানে। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের হিত সাধন করা, সেবা করা যেন ব্রহ্ম-সান্নিধ্যলাভের চেয়েও প্রিয়তর। পরম শ্রেয়ঃ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অসামান্য মানবপ্রীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর প্রাণপ্রতিম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। পরমপুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব পূর্ণ মানব। কে এই পূর্ণমানব? নিজের মতো প্রিয় ও শ্রেয়ঃ জ্ঞানে যিনি সবাইকে দেখেন, ভালোবাসেন, সেবা করেন। এ জ্ঞান আসে অখণ্ড একত্ববোধের ফলে। তখনই অনুভূত হয়, আমি আমিই নয় শুধু, আমি তুমিও। তুমিও আমি-ই। এই আত্মপ্রসাদের পরিণতি সচ্চিদানন্দে মগ্নচিত্তেই আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "Never forget the glory of human nature! we are the greatest God...Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I Am"...মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মাধুর্যকে কখনও ভুলো না। আমরাই পরম ঈশ্বর। যীশু ও বুদ্ধরা এই শাশ্বত আমির অনন্ত ব্যাপ্তির তরঙ্গমাত্র।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে রোজ-ই প্রসাদী অন্ন বিতরণ করা হয়। চাঁদনীতে সারি দিয়ে বসে গরীব দুঃখী কাঙালীরাও প্রসাদ পায়। আপন খেয়ালে মায়ের পূজারী রামকৃষ্ণ এক এক দিন কাঙালীদের এঁটো পাতা তুলে নিয়ে ফেলেন। এঁটো প্রসাদের কণা খুঁটে খান। ঘৃণা নেই, গ্রাহ্যও নেই। রামকৃষ্ণের খুড়তুত ভাই হলধারী (শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজারী) একদিন দেখে তেড়ে এলেন: রামকৃষ্ণ, তুই কিরে? ছত্রিশজাতের এঁটো তুলছিস্, খুঁটে খাচ্ছিসও? বামুনের ছেলে না তুই? এঁটোমাখানো হাতটা চাটতে চাটতে রামকৃষ্ণ অনুদ্বিগ্ন আনন্দে বললেন, হলামই বা। এরাই বা কি কম? জীব-ই শিব তো। সবটাতেই শিব। মানুষে বিশেষ প্রকাশ। সচেতন।

মথুরের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন রামকৃষ্ণ। দেওঘরে এসে নেমেছেন ওঁরা। বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশী যাবেন। দেওঘরে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। পথের ধারে একটা ধূসর মাঠে জড়ো হয়ে পেটের জ্বালায় হাহাকার করছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত রিক্ত দীন দুর্গত একদল সাঁওতাল। সেই পথে যেতে তাদের দেখে তাদের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে ব্যথার্ত রামকৃষ্ণ মথুরকে বললেন, "সেজবাবু, তুমিতো মায়ের-ই দেওয়ান। এরাও মায়েরই ছেলেমেয়ে। ওদের একদিন পেট ভরে খেতে দাও, একমাথা তেল দাও, পরতে একখানা করে কাপড় দাও।" মথুর বললেন, "এখন এই পথের মাঝখানে এতটাকা কোথায় পাব, বাবা? তীর্থে চলেছি। কখন, কোথায়, কি খরচা লাগবে জানিনে। হাতের টাকা এখানে ওদের জন্য খরচা করে ফেললে হয়ত কত জায়গায় যাওয়া-ই হবে না। দেবদর্শনও হবে না।"

দরদী রামকৃষ্ণ ওই ক্ষুধার্ত নগ্ন সাঁওতালদের মধ্যে বসে পড়ে বেদনাবিহ্বল আর্তকণ্ঠে বললেন, "তবে তোমরা যাও বাবু। আমি এদের সঙ্গেই থাকবো"...দুঃস্থ দরিদ্র উপবাসী জীব...এদের হাতেই তো দেবতা নেবেন সশ্রদ্ধ নিবেদন...পূজার নৈবেদ্য। কোন্ তীর্থে তুমি পাবে এমন সজীব দেবতার দর্শন? কোথায় আবার তীর্থ, কোথায় তুমি খুঁজবে দেবতাকে? এখানে এদের মধ্যেই তো তিনি। এরাই-তো দরিদ্রনারায়ণ।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

দেওঘরে দু'দিন থেকে মথুর অনশনে ক্ষীণ দুঃস্থ দীন সাঁওতালদের পেট ভরে খেতে দিলেন, ধূলিরুক্ষ মাথায় দিলেন তেল, নগ্ন দেহ ঢেকে দিলেন বসন। আনন্দে নাচতে লাগলেন রামকৃষ্ণ...এই-তো তীর্থ, এরাইতো নারায়ণ...এই-তো সহজ দেবদর্শন। প্রিয়বোধে শ্রেয়োজ্ঞানে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে মেখেই তো দেখতে পাওয়া যায় প্রিয়তমকে সবার মধ্যে...

সকল রূপে, সর্বত্র। তাই না শ্রীরাধা দেখেছিলেন কৃষ্ণময় বৃন্দাবন?

রাসমণির জানবাজারের বাড়ীতে এসেছেন রামকৃষ্ণ। আত্মভোলা তন্ময়। সর্বদাই সমাধির ভাব। কখনও কথা বলেন, আবার কখনও ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। মথুর, মথুর-পত্নী জগদম্বা এঁরা সবাই তখন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত। দেখে শুনে ওঁদের পুরোহিত হালদার ঈর্ষায় জ্বলে যায়। ভাবে রামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই গুণতুক্ করেছে বাবুকে। রামকৃষ্ণের জন্যেই ওদের মানসম্মান পসার-প্রতিপত্তি কমে গেছে। সেদিন বৈঠকখানায় বসে আছেন রামকৃষ্ণ। একাই। তন্মনস্ক ভাব। সুযোগ বুঝে হালদার এসে শুধালো, "এই বামুন, কি করে বাগালি বাবুটাকে? বল্‌না। কি করে হাত করলি? বল না?"

রামকৃষ্ণ নীরব। বার বার প্রশ্ন করে কোনই উত্তর না পেয়ে হালদার চটে রামকৃষ্ণকে মেঝেতে ফেলে, "বলবিনে শালা" বলতে বলতে বারংবার পদাঘাত করে চলে গেল। গায়ের ধুলো ঝেড়ে রামকৃষ্ণ উঠে বসলেন। কিছুই বললেন না কাকেও, ঘুণাক্ষরেও বললেন না মথুরকেও। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণুভাব! অক্রোধ। অহিংস। প্রেমময়। কিছুদিন বাদে মথুর শুনে বললেন, আমায় বললেন না, বাবা। ওর মাথাই থাকতো না তাহলে। রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তাইতো বলিনি সেজবাবু। যাই করে থাক হালদার, রাগের বশেই করেছে। রাগ পড়লেই বুঝবে। মানুষ তো। ও রাগলো বলে আমিও রাগবো কি?

রাগদ্বেষ হিংসার এতটুকু অবসর নেই। শত্রুমিত্রবিচার সাপেক্ষ নয় মানুষ। মানুষ মানুষ। তাকে ভালবাসাই ধর্মকর্ম, সাধনাসাফল্য। বৈরীকেও বশ করতে হবে ভালবেসে। রাগকে দমন করতে হবে প্রেমে। "অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধম্" বলেছিলেন বুদ্ধ। অন্তিম মুহূর্তে প্রাণঘাতী চণ্ডালকে ও ক্ষমা করে আশীর্বাদ করেছিলেন পরমানন্দে। তেমনি।

নাট্যকার গিরিশ ঘোষকে ভালবাসতেন রামকৃষ্ণ। গিরিশ তখন মদ্যপ অনাচারী। থিয়েটারে একদিন মাতাল গিরিশ খুব গালাগাল দিলেন ঠাকুরকে। মারমুখো। ভক্তরা ভয়ে রামকৃষ্ণকে নিয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরের দিনই রামকৃষ্ণ গিরিশের বাড়ী এসে হাজির। বললেন 'তোমাকেই দেখতে এলাম গিরিশ। এখন কেমন আছ বল।' পায়ে লুটিয়ে পড়লেন নাট্যকার। এতখানি ভালোবাসা কবির কল্পনাতেও আসে না যে!

রামকৃষ্ণকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে সপরিবারে এসেছেন বলরাম বসু। দেখে শুনে নৌকায় উঠলেন বাড়ী ফিরতে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠলো খুব। ফুলে ফুলে উঠলো গঙ্গার তোড়। নৌকাখানাও দুলতে লাগলো উদ্বেল তরঙ্গাঘাতে। তীরে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণের কী কান্না! 'আহা! ওরা ডুববে নাকি ছেলেপুলে নিয়ে?' সবার মধ্যে আপনকে, আপনার মধ্যে সবাইকে এভাবে দেখতে পান যিনি, ভালবাসেন যিনি তিনিইতো মহামানব। সকল কালে সর্বত্র সবার প্রতি অহেতুক প্রেমেই তো তাঁর প্রকাশ। তাঁর পরিচয়।

বেড়াতে বেরিয়ে পথের ধারে পতিতাদের দেখে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন রামকৃষ্ণ। এদের মধ্যেও তো রয়েছেন তিনিই—"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—যে দেবী সবার মধ্যে মাতারূপে বিরাজ করছেন।

রামকৃষ্ণ দেখালেন, শেখালেনও, পতিতাকেও মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা যায়। করতেই হয় সর্বভূতে জগন্মাতার অখণ্ড সত্তা স্বীকার করে।

অসুস্থ অবস্থায় শ্যামপুকুরের বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে একদিন রামকৃষ্ণ দেখলেন, যেন ওঁর দেহের ভিতর থেকে আর একটা দেহ

খোলস্ ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো বেরিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ালো। পিঠে অনেকগুলো ঘা। ঘা কেন? কিসের ঘা! ভাবাবিষ্ট হ'য়ে জান্‌লেন ওগুলো হয়েছে পাপীদের স্পর্শে।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কথা-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছিলেন যে, মানুষের হিতব্রতে যদি তাঁকে অসংখ্য কোটী বারও জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাও করবেন। আজও আবার তাই ব'লে পিঠে ঘা দেখার প্রসঙ্গে বল্‌লেন, "দেখলুম পিঠময় ঘা হ'য়েছে। ভাব্‌ছি কেন এমন হল? আর মা দেখিয়ে দিলে, যা তা কোরে এসে যতলোক ছোঁয় আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়—ওদের দুষ্কর্মের ফল নিতে হয়। সেই সব নিয়ে নিয়েই তো পিঠময় ঘা হয়েছে। গলায় ঘা হয়েছে। তা কি করব বলো! মানুষই তো, যাই করে থাক, দূর করে কি দিতে পারি?" বিস্ময়ে আতঙ্কে ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলেন, আর অপরিচিত কাকেও ঠাকুরের ঘরে ঢুকতেও দেবেন না, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেও দেবেন না। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বল্‌লেন, "যতই বল, চেষ্টা করে দেখ, পারবে না শেষ পর্যন্ত। ঠাকুর এসেছেনই তো পাপি-পতিতকে উদ্ধার করতে।"

নাট্যকার গিরিশ ঘোষের থিয়েটারের অভিনেত্রী বিনোদিনী, খুব তার খ্যাতি। অভিনয়ও করে অপূর্ব। শ্রীচৈতন্যলীলা নাটকে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রশংসা করেছিলেন রামকৃষ্ণ। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিয়ে ছিলেন। পদস্পর্শেই বিনোদিনী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলো। সে দিন থেকেই বিনোদিনী ঠাকুরের ভক্ত। দেবতাজ্ঞানে নিত্য ঠাকুরের নাম করে। শ্যাম-পুকুরের বাড়ীতে ঠাকুর অসুস্থ শুনে বিনোদিনী দেখতে অধীরা হ'লো। যাবে, ঠাকুরকে দেখবে, আবার একবার ঠাকুরের পদধূলি মাথায় মেখে জীবন ধন্যজ্ঞান করবে। গিরিশ ঘোষকে জানাতেই তিনি বললেন, "এখন আর উপায় নেই। ঠাকুরের ঘরে এখন যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তোমাদের তো নয়ই।"

বারণবাধার কথা শুনে বিনোদিনীর ব্যাকুলতা বাড়লো শত গুণ। যাবেই সে দেখ্‌তে। মানবে না কারও বারণ, কোনও বাধাই। এমনি জেদ্। একাগ্র আগ্রহ। উপায়ান্তর না পেয়ে থিয়েটারের কর্মচারী কালীপদ ঘোষকে চেপে ধরল সে। কালীপদ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। ভক্তরা সবাই জানেন। খাতিরও করেন। কালীপদর পরামর্শে ইংরেজ যুবকের বেশে ঠাকুরকে দেখতে গেল বিনোদিনী। খাস্ বিলাতি সাহেব ভেবে ভক্তরা বাধা দিলেন না যেতে। ভাবলেন, ইংরেজ যুবক ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে না তো? স্পর্শ করবে না, দেখ্‌তে এসেছে, যাক্, দেখে যাক্।

রামকৃষ্ণ শুয়েছিলেন। আসন্ন সন্ধ্যা। আবছা আলোয় কালীপদর সঙ্গে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো ছদ্মবেশিনী অভিনেত্রী বিনোদিনী, সঙ্কোচে ভয়ে কাঁপছিল তার নারীহৃদয়। রোগজীর্ণ রামকৃষ্ণকে দেখে পতিতারও শাশ্বত মাতৃহৃদয় আর্তনাদ করে উঠল, "এ কি হয়েছে বাবার!"

ইংরেজ যুবকের মুখে নারীকণ্ঠে স্পষ্ট কাতরোক্তি শুনে রামকৃষ্ণ চকিতে উঠে বসে বললেন, "কে? বিনোদিনী না?" সলজ্জ বেদনায় অবশ বিনোদিনী, "আমিই বাবা!" বলে কাঁদতে লাগলো অঝোরে।

অশ্রুজলে সিক্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণের দু'চরণ।

কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন সকালে বেশ সুস্থ বোধ করছিলেন। গিরিশ,

মহেন্দ্র, রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তরা বসে আলাপ করছিলেন ঠাকুরের সঙ্গে। মায়ের মতো স্নেহার্দ্র চোখে বার বার ভক্ত সন্তানদের পানে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, "কি জানো গিরিশ, আজ বেশ আছি। তোমরা সবাই বসে আছ, স্পষ্ট দেখছি ঈশ্বরই বসে আছেন। এটাতেও তাই।" রামকৃষ্ণ নিজের অঙ্গ নির্দেশ করে বললেন, "সবাই তিনি; বাড়ী, ঘর, দোর, বাগান, বসন, বাসন সব। রোগ শুধু দেহটারই। পাপ, পতন, কলঙ্ক সব শুধু এই খোলটারই। স্পষ্ট দেখছি, তিনিই ঘাতক, তিনিই বধ্য, তিনি হাড়ি-কাঠটাও।"

ভক্তরা পরম শ্রদ্ধায় শুনছিলেন ঠাকুরের কথামৃত। একটু বাদে ভাবাবিষ্ট রামকৃষ্ণ বললেন, "জানো মহেন্দ্র, এই খোলটা (নিজ দেহ) যদি আরও কিছুকাল টিকে থাকতো আরও অনেককে জাগান যেত, এতটা মা চান না। সোজা সরল পেয়ে অনেকেই ঠকিয়ে আদায় করে নেয় দুর্লভ সাধনা-শক্তি। কিছুতেই মানুষকে ফেরাতে পারিনে তো। মা তাই এবারকার মত টেনে নিচ্ছেন। যুগটাও চলেছে এমন, সাধন-ভজনের পথে চলতেও লোকে ব্যাজ বার্তা চায়।"

মাথা নুয়ে সজল চক্ষু লুকিয়ে ভক্তরা ভাবতে লাগলেন, সত্যই তো সংশয়ের ঘোর মেটে কই? ঠাকুরের অকুণ্ঠ ভালবাসাকে অকপট বলে ভাবে কয় জন? ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে দেখে এখনও কতজন ঢং বলে তো!

রামকৃষ্ণের অসুখ বেড়েছে। ভক্তরা উৎকণ্ঠায় অধীর। অন্যতম ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে আসেন, সেবা করতেন।

মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বে নাগ মহাশয় এসে পায়ের কাছে বসতেই রামকৃষ্ণ বললেন, "ও দুর্গাচরণ, ডাক্তাররা তো পারলে না কেউ। তুমি পার না এ রোগটা সারাতে?"

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন নাগ মহাশয়। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন ডাক্তারদের পয়সা অপবিত্র। সেদিন থেকে নাগমহাশয় লোক-কল্যাণে চিকিৎসা করতেন, পয়সা নিতেন না। চিকিৎসা করতেন ভাল, হাতযশও ছিল। ঘরে অন্যান্য ভক্ত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ভাবলেন, ঠাকুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কথাই বলছেন। ভগবানের কথা ভক্তই বোঝেন তো! নাগ মহাশয়ের মনে পড়লো যযাতির নবযৌবন-লাভের পৌরাণিক কাহিনী। মনে পড়লো মোগল বাদশা বাবরের আত্মদানে পুত্র হুমায়ুনের আরোগ্যের ঐতিহাসিক ঘটনা। মুহূর্তকাল চোখ বুজে ভেবে নাগমহাশয় অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "পারি। আপনার কৃপায় অবিলম্বেই এ রোগ সারাতে পারি।"

ভক্তরা সোৎসাহে সমস্বরে বলে উঠলেন, "পারেন?"

"নিশ্চয়ই পারি,"—বলে নাগমহাশয় সসম্ভ্রমে শয্যাশায়ী রামকৃষ্ণের বুকের পাশে এসে বসলেন। চোখে মুখে তার ফুটে উঠলো ঋষির আত্মপ্রত্যয়, তেজ, অপরূপ আত্মশক্তির প্রতিভা, বিপন্ন প্রিয়তমের কল্যাণে অকুণ্ঠ আত্মদানের আনন্দ!

অন্তর্যামী ঠাকুর চকিতে উঠে বসে নাগ মহাশয়কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিভোর আনন্দে বললেন "ওরে না, না, না, দুর্গাচরণ, তাকি হয়! জানি তুই এ রোগ সারাতে পারিস আত্মবলি দিয়ে। তা কি দিতে পারি? নিতেই তো আসা তোদের সব জ্বালা, সব দুর্ভোগ। মানুষকে ভালবেসে তাদের সর্বসন্তাপ হরণ করে নিতেই তো এবারকাঁর আসা।"

মহাপূজারী

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু

নবীন যুগের পুণ্য লগনে
ধন্য করিয়া মানব-বংশ
মহা মিলনের মন্ত্র গাহিলে
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।
দেব-মানবের ছন্দ মিলাতে,
গড়িলে জীবন অমিয় বিলাতে,
বঙ্গ-ভুবন-অঙ্গনে প্রেমে [illegible]
পূর্ণ হইল জীবের অংশ।
মন্ত্রমুগ্ধ মানব গাহিল
জয় ভগবান পরমহংস॥

গঙ্গার নীরে জাগিল সেদিন
পুণ্য লহরী নব তরঙ্গ,
ভরি' নিল ঝারি শান্তির বারি
নিঃস্ব পূজারী গড়িল সংঘ।
বিত্তহীনের চিত্ত স্নিগ্ধ
প্রেমে হলো তনু অপাপবিদ্ধ,
মর্ত্ত্যের গৃহে অমর্ত্য লীলা
অমিয়মাধুরী নবীন রঙ্গ,
সে মহা-ছন্দে লভি' আনন্দ
অন্তরঙ্গ পেল যে সঙ্গ।

ক্ষুদ্র সে দিন উচ্চে তুলিল
ধূলি-লুণ্ঠিত মলিন শীর্ষ,
শূদ্র পেয়েছে ব্রাহ্মণ-পদ
চকিতে হেরিল বিপুল বিশ্ব।
মাটির কুটিরে নব গরিমায়
জাগে কল্যাণ ভরিল বিভায়,
নত জানু হয়ে বিলাইল প্রেম
মহাপূজারীর মন্ত্র-শিষ্য;
অগ্নি-সমান করিল দীপ্ত
কার জ্ঞানরাশি গগন-শীর্ষ।

মহাভারতের নব যৌবন
তড়িতের তেজে ভরিল চিত্ত।
গঙ্গা-কাবেরী সিন্ধু-লহরী
উত্থান যুগে করিল নৃত্য।
সকল ধর্ম হাতে হাত ধরি
হিন্দু-গর্বে উঠিল শিহরি,
গৈরিক পরি সাধে সন্ন্যাসী
বিশ্বজনের মিলন কৃত্য;
নিন্দিত হলো ভণ্ড জনের
কূপমণ্ডূক সমান নৃত

সাগরপারের কন্যা আনিল
সেবার যজ্ঞে জীবন-অর্ঘ্য,
তাপসীর বেশে ফিরি দেশে দেশে
চাহিল গড়িতে ধূলির স্বর্গ।
গুরুর চরণ করিয়া স্পর্শ
করে তপস্যা বর্ষ-বর্ষ,
কহিল ডাকিয়া, মিলনযজ্ঞে
সবাকার হাত সকলে ধরগো,
তাপসী উমারে আবার দেখিনু
শিবের পূজায় দানিতে অর্ঘ্য।

মহা পথিকের পদধূলি লয়ে
কত মহাজন চরণ বন্দে,
ভবতারিণীর মন্দিরে যিনি
নাচেন সন্ধ্যা-আরতি ছন্দে।
নানা পথে পেয়ে পায়ের চিহ্ন,
দেখিলেন, 'তিনি' এক অভিন্ন,
'যত মত তত পথ' এ সত্য,
ঘোষিল বারতা মহা আনন্দে,
ভারত আবার ভরে ভবানীর
পুণ্য পূজার পুষ্প-গন্ধে।

মহা-অন্বেষণে

অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন, এম্‌-এ

জীবনে দু'টি পথ, ভোগ ও ত্যাগ, বন্ধন ও মুক্তি, আলো ও অন্ধকার। পতঙ্গ আলোর আকর্ষণে ধাবিত হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আলোর বিকিরণে মানুষ পথ খুঁজে নেয়, অন্ধকার তার মৃত্যু।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বললেন, "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভিতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে। জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভিতর পতি নিজের স্বরূপ দেখে। আত্মাই পরম প্রিয়।

আত্মাই পরমাত্মা, প্রেমাস্পদ। আত্মার বিশ্বরূপ বিশ্বপ্রীতি। বিশ্ব আত্মারই রূপ। আনন্দ-সত্তার বিকাশ। পরমানন্দ বিশ্বসত্তার বিকাশ।

সেই আলো, সেই পথ। সেই পথ বেয়ে যেতে হবে। ভোগে ত্যাগ, সে আলো সে মানুষেই চিনতে পারে। স্রষ্টা সার্থক মানুষে।

মানুষের সার্থকতা তাই অরূপের রূপদর্শনে; সৃষ্টির সৌরভের মারাপথ বেয়ে ফুলের অন্বেষণে। তাই "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। মায়াকুজ্ঝটিকার আবরণে স্রষ্টার জনকসুলভ আনন্দ, লুকোচুরির অন্তরালে প্রেম ও প্রেমিকের পরম প্রকাশ। শুদ্ধানন্দ।

তাই মানুষের অবচেতন মন নিরালায় যেন প্রশ্ন করে "আমি কি ও কে? কোথায় আমার পথ?" জীবের এক দুর্বল মুহূর্তে এমনই একটা প্রশ্ন তার চিত্তকে আকুল ক'রে তোলে "আমি কি সেই?" অজানিতে অচকিতে সে যেন ছুটে চলে এই প্রশ্নের মীমাংসার অন্বেষণে। বিরাট সে অন্বেষণ।

ভোগ তার দূরে চ'লে যায়। মৃৎপাত্রের মত ভোগকে পায়ে ঠেলে ফেলে অলক-মেঘের পুঞ্জস্তরের বিন্যাসের মত দ্রুতগতিতে সে যাত্রা করে এক অনির্দিষ্টের পথে। তবু সে দেশ যেন পরম নির্দিষ্ট তাই সে যাত্রা-পথ যেন আনন্দে সুন্দর। ভোগের বিনাশ দেয় শক্তি। শক্তি দেয় কর্মে প্রেরণা। কৃচ্ছ্রসাধন যোগায় আনন্দ।

দুর্গম পথযাত্রী, তবু সে আনন্দরসাপ্লুত। আপনার গন্ধে সে বনে বনে ফেরে কস্তুরীমৃগসম। এ তার চিত্তের অভিযান, প্রাণের অভিযান, অন্তরীক্ষ হতে সে পায় বাণী. তার প্রশ্নের উত্তর। পার্বতী পেলেন তপেশ্বরকে, তপস্যা বিনা পাওয়া যায় না।

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।

পার্বতী তপস্যা করলেন, কৃচ্ছ্রসাধন করলেন, তপেশ্বরের অন্তরে পার্বতী লীন।

শ্রীরাধিকার অভিযান।

কিশোরী রাধিকা জল্‌কে যেতে যমুনার কূলে কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন, অমনি--

"পহিলাহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল,
অনুরাগ বাঢ়ল অবধি না গেল।"

"যমুনা যাইতে পথে দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা,
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা।"

শ্রীরাধিকা আপনার ভোগ, কামনা-বাসনা সব দূরে ফেলে দিলেন। কুলবালা আপন-হারা রাধিকা জীবন বিপন্ন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কামনা-বাসনা সব-কিছু।

"তুঁয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইতে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই, তুঁয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে লীন।

বাংলার এক পল্লীপ্রান্তে গদাধর করলেন এমনই অভিযান, অন্তর্যামী অন্তর-দেবতার অন্বেষণে। গদাধর পাগল, অন্তর্যামী বিনা জীবন কই? নাচেন, কাঁদেন, গান করেন, কিন্তু কই? আলো যেন দেখা যায়, আলোর স্পর্শ ত মেলে না। পথ যেন আছে, কি ভীষণ! সংগ্রাম করলেন গদাধর, ভক্তির পথে ভক্তের সংগ্রাম। শিশু যদি তেমন করে চায়, মা দেখা দিবেনই। শিশু যদি তেমন করে কাঁদে মা কি না দেখা দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি সব ত্যাগ করলেন, মায়ের কাছে কত কাঁদেন।

মায়ের চরণ-স্পর্শ বিনা সমস্ত বুক শূন্য। 'যেন বিরহ অগ্নি অন্দর জ্বারে'। মায়ের চরণ স্পর্শ বিনা এ আগুন নিভবে না। কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তপস্যা করেন, মাকে ডাকেন, কাঁদেন।

God is both a principle and a personality.

> আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি,
> বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম,
> আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ,
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

আনন্দের নির্যাস রস। তিনি লীলারস আস্বাদন করেছেন। প্রেমের সাধনে ভগবান লীলাবিগ্রহ গ্রহণ করেছেন।

> ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
> ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে বশ॥

তিনি 'শুদ্ধা' ভক্তি অর্জন করেছেন। তাই প্রেমরসে নিমগ্ন। তাই তিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেছেন, ভগবানে সর্বভূতকে দর্শন করেছেন।

বদ্ধজীবের প্রতি তাঁর হৃদয়ে বিচরণ করছে গভীরতম্ দয়া।

একদিন প্রশ্ন হ'লো—'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন কি?' উত্তর এলো—'হ্যাঁ দেখেছি। তোকে যেমন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে তাঁকে আমি দেখতে পাই। আমি তোকেও ঈশ্বর দেখাতে পারি।'

প্রশ্ন করলেন নরেন্দ্রনাথ, উত্তর দিলেন পাগল গদাধর, শ্রীরামকৃষ্ণ।

বদ্ধজীবের প্রতি কী গভীর সমবেদনা! তাই নরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, রামকৃষ্ণের আর জুড়ি নেই,......সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া এ জগতে আর নেই। রামকৃষ্ণ, the latest and the most perfect. রামকৃষ্ণ শিব, শক্তি। হিন্দুধর্মের সকল পথেই নিজে চ'লে ধর্মসাধন করেছেন। সে কঠোর তপস্যার কথা, সে প্রতিপদে ভগবানের সাথে একত্র বাস; সে অদ্ভুত প্রীতি, সে লোকাতীত কামকাঞ্চন ত্যাগ, সে অহেতুকী নিষ্ঠার কথা ভাষায় লিখে প্রকাশ করা যায় না। সমুদ্র পূর্ণ হলে সে কখনও বেলাবদ্ধ থাকতে পারে না নিশ্চিত।

তাই রামকৃষ্ণের বদ্ধজীবের প্রতি অপার করুণা, প্রীতি। জীবের মুক্তির জন্য তাঁর অন্তর কাতর।

স্বামীজী বলেছেন, বেদ, বেদান্ত আর অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁর লীলা না বুঝলে বেদ, বেদান্ত, অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছিলেন, সে দিন থেকে সত্যযুগ এসেছে, এখন ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ, ধনিনির্ধন ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান্ ভেদ, ব্রাহ্মণচণ্ডাল ভেদ, সব তিনিই দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন; হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি সব চলে গেল। * * * যে তাঁর

পূজা করে সে নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান্ হবে, মেয়ে বা পুরুষ।

আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা সার্থক হবে যদি আমরা মহাপুরুষের মহা-অন্বেষণের বাণী আমাদের জীবনের কর্মে মূর্ত করবার প্রেরণা সঞ্চয় ক'রতে পারি, তা নইলে নয়। ক্ষুদ্র মানুষের পরম মানুষের পূজার আয়োজন এই জন্যেই। কর্মে তাকে মহান্ হ'তে হবে। কর্মই তার জীবনবেদ। বিনা কর্মে মৃত্যু।

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্‌বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেবতা ইন্দ্র সখা হ'য়ে তার সঙ্গে চলেন। আর যে চলতে চায় না, শ্রেষ্ঠতম হলেও সে নীচাভিমুখী হয়ে পাপে পতিত হয়।

আজিকার দিনের সঙ্কীর্ণমনা ভারতবাসী যেন হয় মুক্তমনা। তাতেই হবে ভারতের সমস্যার সমাধান। তাতেই আসবে শান্তি।

সমন্বয়বিধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী
(ধর্মাঙ্কুর বিহার)

প্রাচীন ভারতে ধর্মান্ধতা ছিল না একথা বলা চলে না। কিন্তু তা মানুষের চিত্তকে আচ্ছন্ন করেনি, তার চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেনি। সবার উপরে বিচারবুদ্ধিকে রেখে সংস্কার-মুক্তভাবে সে যুগের ভারতবাসী আলোর সন্ধান করেছে। তাই বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রবর্তনে, বিভিন্ন ধর্ম-উপধর্মের উত্থানে ভারতে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তার তুলনা নেই। তজ্জন্য রক্তপাতে ভারতের কোন অংশ কলঙ্কিত হয়নি। তবে বাধাবন্ধ নূতনের পথকে সর্বদাই যে কণ্টকিত করে তুলত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা তর্কযুক্তির সীমা ছাড়িয়ে কখনও বাহুবলকে আশ্রয় করেনি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মধ্যযুগের প্রারম্ভে ভারত আপনার রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলে তার অতুল সহিষ্ণুতা, উজ্জ্বল বিচার ও চিন্তার স্বাধীনতা। বস্তুতঃ তখন হতেই তার জ্ঞানমার্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, ক্ষুদ্র আচার-অনুষ্ঠানের বালুরাশি তাকে শূন্যমরুভূমিতে পরিণত করে।

যে ধর্মান্ধতাকে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত যুগ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তা মারাত্মক ব্যাধির মত ভারতবাসীর চিত্তকে অধিকার করে। ধর্মান্ধতা তার মজ্জাগত সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। যে যে ধর্মের উপাসক, সে সেই ধর্মকে এমনি ভাবে আঁকড়ে ধরে যে, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। ধর্মের লক্ষ্য হতে ধর্মই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এ বিকৃত দৃষ্টিতে মানুষ নিজের অবলম্বিত ধর্মকে পৃথিবীর সারধর্ম বলে মনে করে। তার মতে একমাত্র সে অনুসরণেই সত্যোপলব্ধি হয়, অন্য কোন ধর্মাবলম্বনে নয়। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায়, সেখানেও মৌলিকতা নিজের ধর্মেরই কল্পিত। তাই অপর ধর্মকে উপহাস করতে সে কুণ্ঠিত হয় না।

মানুষ এভাবে আপনার সংকীর্ণতার জালে আপনি বদ্ধ হয়ে আপনার বিচারবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলে এবং চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে তোলে। এজন্য ধর্মের নামে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ধর্মবিগর্হিত কার্যে আত্মনিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি ধর্মের নামে তার অমানুষিক আচরণ বনের পশুর ক্রিয়াকেও নিষ্প্রভ করে।

ধর্মান্ধতারও ঘৃণ্যতম পরিণতির প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতের অন্তরাত্মা যেন নিপীড়িত হয়ে উঠে। তারই আর্তকণ্ঠের আহ্বানে যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সকল ধর্মের ধারা তাঁর জীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যিনি ধর্মাধর্মের অতীত, তাঁর ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? সুতরাং তাঁর ধর্মসাধনা লোকশিক্ষার জন্যই। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন সাধনপন্থাবলম্বনে তিনি জগৎকে দেখিয়ে দেন—সকল ধর্মের লক্ষ্য এক এবং সকল ধর্মের ভিতর দিয়ে সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবে একই ভগবানের আরাধনা চলছে মন্দিরে মসজিদে গীর্জায়।

ধর্মশাস্ত্রসমূহ যেমন ভগবানের বর্ণনামুখর, তেমনি এ বিশ্বপ্রকৃতিও ভগবানের মহিমাকীর্তনরত। ঈশ্বর, আল্লাহ্, গড্ জিহোভা প্রভৃতি বহুনামে উচ্চারিত একই ভগবানকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এ বিশ্বপ্রকৃতির খোলা পুঁথিতে অদ্বিতীয় বলে দেখিয়ে দিয়েছেন। সকল শাস্ত্রই তাঁর জীবনে এক হয়ে গেছে।

বিভেদ বিশ্ববিধানের এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম। বৈচিত্র্য এরই নামান্তর। বৈচিত্র্যের মধ্যে ধ্বনিত এক সুরের সঙ্গে সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণের অন্তর গাঁথা বলে দেশ-কাল-পাত্রভেদ সত্ত্বেও তাঁদের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ সামঞ্জস্য পণ্ডিতম্মন্যদের অন্ধবিচারে একের কাছে অপরের ঋণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মূলে যেন কুঠারাঘাত করে প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করবার জন্য তাঁর শ্রীমুখ হতে বাণী নিঃসৃত হয়—"সব শেয়ালের এক রা।" এ উদার বাণী অন্তরের সংশয়-গ্লানিকে মুছে দিয়ে ইঙ্গিত দেয়, সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন বিভ্রান্ত জনসঙ্ঘকে সত্যের গোপন পথ প্রদর্শনের জন্য, বাইরের সকল পার্থক্যের মধ্যেও তাঁদের মূল সুর এক। এর উপর তাঁদের নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ কোথায়?

বাইরের বৈচিত্র্যকে নিয়ে যারা বাদানুবাদের পাহাড় রচনা করে, তারা সত্যের সন্ধান পায় না। তাদের প্রতি অনুকম্পায় পরমহংসদেবের অন্তর হতে বাণী উত্থিত হয়—"আমবাগানে এসেছিস্, আম খেয়ে যা, ডাল গুনে আর পাতা গুনে তোর কি হবে?" তর্কযুক্তির মধ্যে ভগবান্ নেই, ভগবানকে পেলে তর্কযুক্তির অবসান ঘটে। তাই তর্কযুক্তির গোলোকধাঁধার মধ্যে না ঘুরে অনুকূল পন্থা অবলম্বনে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টাই তাঁর নির্দেশ।

কামারপুকুরে উৎসব-দর্শনে

শ্রীসুধীরচন্দ্র নন্দী

শ্যামা মায়ের স্নেহের দুলাল, বাংলা মায়ের মুকুটমণি
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা, ধন্য মোদের জন্মভূমি।
শ্যামা মায়ের পূজার তরে বেলের পাতায় ভরতে সাজি—
তাইত হেথা পল্লীপথে তোমার চরণ চিহ্ন খুঁজি!

রিক্ত তুমি মুক্ত পুরুষ, ভক্তি তোমার বিল্বদল
দুর্যোগেরই আঁধার রাতে চিত্ত তোমার অচঞ্চল।
আপন মনের গহন গুহায় মহাজ্ঞানের মশাল জ্বেলে—
অবহেলায় করিলে জয় কামনাক্রূর সর্পদলে।

শাস্ত্র দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের বর্ত্ম টাকে রুদ্ধ ক'রে—
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে—দম্ভভরে অহঙ্কারে।
জীবন তোমার শাস্ত্র হল তাইত তুমি নিরক্ষর,—
ব্রহ্মজ্ঞানের আদি নিধান দীপ্ত তুমি তেজস্কর !

বিবেক তোমার বাণীর বাহন, তোমার জ্ঞানের বার্তাবহ—
তাইত আজি জগৎ জুড়ে তোমার পূজার সমারোহ।
অন্ধ যত বিজ্ঞ জনে করিয়া গেলে দৃষ্টি দান—
প্রণাম তোমায় প্রণাম তোমায়, হে রামকৃষ্ণ মহাপ্রাণ।

মাটির ধরায় স্বর্গ নামাও, ধন্য তোমার মানব প্রেম—
বিবেকে তা' শিক্ষা দিলে, সেইত নিকষিত হেম !
ভেদাভেদের গণ্ডী মুছে করলে সবই একাকার
প্রণাম তোমায় সাম্য-সাধক হে রামকৃষ্ণ যুগাবতার।

অবতারের মর্মকথা*

সার সি পি রামস্বামী আয়ার

ভারতের মূল মনোভাব যে সব নীতিতে গঠিত সে বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে কেউই ভারতীয় চিন্তাধারা ও মনের গতি কোন দিকে তা ঠিক ঠিক বুঝতে বা ধারণা করতে পারে না। উপনিষদের অভীঃ বাণীটি তাদের মধ্যে প্রথম। এই অভীই বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বিশ্বের ও আপন চৈতন্য-নিহিত সত্যসমূহকে নির্ভীকভাবে খুঁজে বার করবার আহ্বান দেয়। বস্তুতঃ একটি উপনিষদে এই গুণকে স্বয়ং ঈশ্বরপর্যায় বলে দেখান হয়েছে। বলা হয়েছে—'অভীই ব্রহ্ম।'

এই অভী থেকে অনিবার্যভাবে আসে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি। আমি সাহসভরে বলতে পারি যে, এটাই হল ভারতীয় চিন্তার এবং বিশেষ করে বেদান্তের বিশিষ্ট পরিচিতি। ভগবান বুদ্ধ যখন বললেন, "আমার উপদেশ অনুসরণ কর, আমার কথা শোন, কিন্তু কেবল ভক্তিভাবে না করে যুক্তি দিয়েও কর" তখন তিনি এই ভাবটার উপরেই খুব জোর দিয়েছিলেন। বেদান্ত-দর্শনের আধুনিক বিভাবের রূপদাতা শংকরও একদা তাই বলেছিলেন : অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রত্যক্ষ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সুষ্ঠুভাবে লভ্য হতে পারে, কেবলমাত্র বিশ্বাস দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করলেই প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না।

এই দৃষ্টি দিয়ে অবতারতত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে, এই উপলব্ধির পটভূমিকা হবে নির্ভীকতা ও অনুসন্ধিৎসা। দ্বিতীয় কথা হল, কোন দর্শন, কোন ধর্ম-বিশ্বাস ও কোন মতবাদ সম্বন্ধে পরের মুখে

* Vedanta and the West (May-June 1953) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক : শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়।

ঝাল খাওয়া চলবে না। সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে হবে; হতে হবে অনুভূতিসম্পন্ন; যতটা বোধ করা সম্ভব জ্ঞাতার পক্ষে ততটাই বা ততদূরই সত্য। সেই জন্যই অবতারতত্ত্ব বা অন্য কোন ভারতীয় ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সব সময়েই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির দৃঢ়প্রত্যয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সে প্রত্যয় কি এসেছে? বেশ, তাহলে সেটি বিশ্বাস করা চাই। যদি ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধানের সাহায্যে, স্বজ্ঞার (অর্থাৎ অনুসন্ধিৎসার এক রহস্যময় পন্থার) সাহায্যে, কেউ কোন সত্যে, কোন বিশ্বাসযোগ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বে উপনীত হয় তখন তা স্বীকার করা উচিত। এই হল তৃতীয় তত্ত্ব এবং এই তিনটি চরমে যেখানে যায়, প্রাচীনরা তাকেই ধর্ম আখ্যা দিয়েছেন। এখানে ধর্ম মানে স্বমিতি, একটা শ্রেষ্ঠতর মান, যাকে লক্ষ্য করে বিশ্বে জীবন যাপিত হয় এবং তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। "রাইচিয়াস্‌নেস্" অর্থাৎ আচার নিয়ম নিষ্ঠা পালনরূপ ধর্মজীবন, ধর্ম শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ নয়। ধর্ম বলতে বোঝায় বিশ্বসত্তার সনাতন নিয়ম। এ বিষয়ে ভারতীয়রা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তারা মানে এর ব্যতিক্রম নেই, এতে কোন রহস্যও নেই। জীবনে এই ধর্মকে এই অতিমানস স্বমিতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুভব করতে হবে।

কোন ধর্মকে মোটেই যথাযথ বোঝা যাবে না যদি না সঙ্গে সঙ্গে তা বিকাশ করা যায়, সর্বদা সে বিষয়ে চেতন না থাকা যায়, একটা বিশ্বপ্রাণের ভাব যদি না থাকে। সংস্কৃত ভাষায় একে আত্মা বলা হয়েছে। তাই আত্মাই হল চরম, সর্বব্যাপক বিশ্বজনীনতা। এই আত্মার অস্তিত্ব যে অঙ্গীকৃত হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই, যাই হোক এটা কোন অজ্ঞতার উপর নয়, পরন্তু অবশ্যম্ভাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূলে রয়েছে জিজ্ঞাসার যুক্তি, ও ভয়শূন্য চিন্তা এবং সৃষ্টির অত্যাবশ্যকতা।

এই প্রকল্প আমাদের কাছে সত্তার অন্যতম রহস্য এনে দেয়—সেটা স্বয়ং এই জীবন—তা সে পাহাড়, গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ, অর্ধ দেবতা, অতিমানব প্রভৃতি যারই হোক না কেন, কিন্তু মানুষ স্বয়ং যতখানি দৈবভাবাপন্ন, প্রয়োজনগতভাবে এসব ততখানি নয়। এই সব অবয়বীতে জীবনের যে চিহ্ন দৃষ্ট হয় তা হল সৃষ্টির আর একটি দিক, একেই লীলা বলা হয়। ভারতীয়ের ধারণা অনুযায়ী পুরুষ মায়াবলম্বনে প্রকৃতিকে সহায় করে কাজ করে থাকেন। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হলেই হয় জীবনের জন্ম।

এবার আমরা অবতারবাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি রহস্যের আলোচনা করব। গীতার সেই অদ্ভুত শ্লোকটির কথা আবার চিন্তা করা যাক ঃ—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

জগতের মূলে যে তথ্য আছে তার সমগ্র অংশটি এই কথাগুলিতে নিহিত। ভারতীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস যে শরীর কেবল একটা বহিরাবরণ, একটা পোষাক, একটা দৈবাৎ সৃষ্টি, একটা ঘটনামাত্র এবং এটা জীবনের সারবস্তু নয়।

সত্যি এটা খুব মজার যে আমেরিকার ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আধুনিক চিন্তার গতি এখন আমাদের প্রাচীনরা যে সত্য বুঝেছিলেন তাই অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। "সায়েন্স এণ্ড পারসোনালিটি" গ্রন্থে অধ্যাপক উইলিয়ম ব্রাউন বলেছেন যে, আইনষ্টাইনের আপেক্ষকিতাবাদ-মতে বিশ্বমনের অস্তিত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে অসঙ্গত নয়। এটা যে পৃষ্ঠপোষকতার একটা ভঙ্গী তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং যাঁরা দয়া করে এই বিশ্বমনের অস্তিত্বকে একটু দাঁড়াবার স্থান দিয়েছেন আমরা তাঁদের কাছে অনায়াসেই কৃতজ্ঞ

হতে পারি। কিন্তু এই সব সূচনা উল্লেখযোগ্য এবং প্রায়ই খুব বেশী বেশী দেখা যায় যে রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিকদের মতে কতকটা শক্তি—সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তিই সম্ভবতঃ এই বিশ্বের মূল কারণ।

সেই সমাবিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শক্তি যাকে ভৌতিক বা জড়ভাবে বোঝা যায় না, অথচ যেটা একটা আভ্যন্তর ভাব তাকেই আত্মা বলে বলা হয়েছে। এই পরম সত্তা নানাবিধ নামরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। বেদান্ত বিশ্বাস করে যে, অবতার—অর্থাৎ সেই পরমাত্মার প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করে অবতরণ—মানুষদেহ ধারণ করেন, এক অর্থে আমরা প্রত্যেকেই অবতার। জগতের ইতিহাস হল ভাবের ইতিহাস, কিন্তু সেটা সেই ভাব যা ব্যক্তিত্বের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। কার্লাইল যেমন তাঁর 'হিরোজ এ্যাণ্ড হিরোওয়ারসিপ্' বইএ তার উপায় দেখিয়েছেন এবং ইমার্সনও তা লক্ষ্য করেছিলেন। জগতের ইতিহাস বিভিন্ন ছাঁচের অবতারের ইতিহাস। অবতাররা যথার্থ ও ভ্রান্ত দু' শ্রেণীরই হতে পারেন। এটাও সৃষ্টির অন্যতম রহস্য। একজন হিটলার মন্দ প্রকৃতি, দমননীতি ও হিংসার এক বিশেষ ধরনের অবতার এবং তাকে জয় করতে হলে অন্য অবতারের প্রয়োজন। কিন্তু আমি এখন নির্দিষ্ট অবতারদের কথা ভাবছি না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই পরমা শক্তির অবতরণের ইতিহাসই হল জগতের ইতিহাস। প্রত্যেক অবস্থায় কতকটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বিশ্বনীতিকে পরিপূর্ণ করা চলে। আমরা প্রত্যেকেই একটা পূর্ণরূপ, আমরা প্রত্যেকেই আবার ভবিষ্যতের ছবি। আমাদের কেন্দ্র করে যে সব বিশ্ব প্রয়োজনীয়তা কাজ করছে সে সবের পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎরূপ আমরাই ঠিক ঠিক বুঝলে বিশ্বমনের সেই তাগিদই তথাকথিত হিতকর ফলসমূহের দিকে আমাদের প্রধাবিত করে। ভুল বুঝলে, ভুল অভ্যাস করলে ও ভুল প্রয়োগ করলে এটাই আমাদের বিভিন্ন মন্দভাবে চালিয়ে নেয়।

যদি কেউ ইতিহাস পড়ে—উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস ধরা যাক—তাহলে দেখা যাবে যে ষোড়শ শতাব্দীতে ছোট বড় সব কিছুতেই দৈব পরিকল্পনার প্রভাবটাই প্রবল ছিল। তখন সেটা ছিল দৈবের দ্বারা পরিচালিত হবার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এল যুক্তির যুগ। তখন প্রায়ই নিরর্থক ও অন্ধ-যুক্তিকেও বিচার করা হত। সে সময় এই ভাবটাই প্রবল হওয়াতে এইভাবে ভাবিত ভল্‌টেয়ারের মত কয়েকজন অবতারের আবির্ভাব হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অবতারের বেশীর ভাগই বৈজ্ঞানিক ও জড় উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিংশ শতাব্দীর ভাবের প্রাধান্য অর্থাৎ অবতাররা সকলেই নিরাপত্তার দিকটাতেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁরা ভয়, অভাবের হাত থেকে নিরাপত্তা চান। এখন আমরা সেই অবস্থায় এসেছি, যে অবস্থায় নির্ভীকতার ঠিক বিপরীত গুণকে সম্মান করা হয়। আমরা ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাই। এখন এই আদর্শটাই চালু, আর তাই আমাদের চারদিকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরাপত্তার ভাবটা রূপান্তরিত হতে চলেছে।

কিন্তু অন্যান্য অবতারও আছেন এবং ইতিহাসের নির্ধারিত সময় ও যুগে যুগে সেই পরব্রহ্মের অবতরণ হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে, আর দেশ-দেশান্তরে বেশ একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। গীতাতে এ বিষয়ে কি লেখা আছে ?

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

*　　*　　*

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

এই হল গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি। কিন্তু কেন ?

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ভগবান ত ইচ্ছা করলে সহজেই একমুহূর্তে জগতের মন্দকে ভাল করতে পারেন। তবে কেন তিনি যন্ত্র সহায় করে কাজ করেন? এ জন্যে অবতারদের আনার কি দরকার? অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ বা প্রাচ্য চিন্তা ও দুর কল্পনায় স্বাধীন ইচ্ছার অভাব-সম্বন্ধে নির্বোধের মত যে সব প্রশ্ন কল্পনা করা হয় তার মীমাংসা এই প্রশ্নের উত্তরে নিহিত আছে। অবতারের আবির্ভাবে অস্মিতার রক্ষণ হয়। মানবীয় অস্মিতা হল বংশগতির ফল, পূর্ব পূর্ব জীবনের প্রচেষ্টা উদ্যম, পতন ও সাফল্যের প্রভাব হতে যে উপলেপ হয় এ তার ফল। সমস্ত যুগের পিতৃ-পিতামহের, মাতা প্রমাতামহের ও পিতা মাতার বংশধর হয়ে প্রত্যেকেই জগতে জন্ম নেয়। তার নিজের কর্মেরও সে উত্তরাধিকারী। ইচ্ছাশক্তি সহায়ে অতীত জীবনের গতিকে সে এই পৃথিবীতেও এখুনিই মোড় ফিরিয়ে দেবার স্বাধীনতা রাখে। ভাল বা মন্দভাবে তা সে করেও থাকে। কিন্তু অবতারের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সত্যের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবনকে উদাহরণরূপে স্থাপিত করা—তিনি বিশ্বমনের নীতি পূর্ণ করতে মানুষকে জোর করেন না, বরং তার সামনে একটা উদাহরণ রেখে যান। অবতারের লক্ষ্য এই এবং আমাদের শাস্ত্রে এই জিনিসটাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

এই ধরনের অবতাররা হয়ত বা আংশিক কিংবা অল্প বিস্তর পূর্ণাংগ হতে পারেন এবং হয়ত বা তারা জাতি, দেশ ও যুগগণ্ডীতে আবদ্ধও থাকতে পারেন। বিশেষ বিশেষ অবতারের, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দৈবী শক্তির, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন বিভিন্ন যুগ চেয়েছিল, বিভিন্ন দেশ দরকার মনে করেছিল, এবং তাই আরবের মরুভূমির নির্জনতায়, যাযাবর জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে যখন মহাসংশয় উপস্থিত হল, তখন তাদের আলো দেখাতে মহম্মদ এলেন প্রেরিতপুরুষরূপে ও যথার্থতঃ তিনি হলেন এক অবতার। তেমনি আবার প্যালেষ্টাইনে বিশেষ এক দেশের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে, দয়া ও প্রেমের নূতন নিয়ম প্রবর্তন করবেন বলে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম নিলেন। ভারতীয় ত্রিশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এঁদের যে কোন একজনের সঙ্গে ভারতের অবতাররা সাধারণতঃ সম্বন্ধিত।

আমি কয়েকজন ভারতীয় অবতারের উল্লেখ করে দেখাব যে তাঁদের প্রত্যেকের আসার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কি ছিল। বলিরাজার গল্পে আছে যে তিনি একজন বড়, বিজ্ঞ ও ন্যায়বান্ শাসক ছিলেন। তিনি অতি বড় অহংকারী, অত্যধিক বাসনাপ্রবণ ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জগৎকে জয় করবেন এবং তা করলেনও। এবার চাইলেন জগৎ ছাড়া অন্য রাজ্য জয় করতে। তখন সব জগদ্বাসী বিষ্ণুর কাছে আবেদন করলেন যেন তিনি বলির অধিকার থেকে বিশ্বসাম্যকে রক্ষা করেন। বিষ্ণু তখন দু' ফুট উঁচু এক বামনবেশে হাতে ভিক্ষা ও জলপাত্র নিয়ে বলির দ্বারে এসে উপস্থিত। রাজা যখন সকালে দান করতেন তখন বিষ্ণু প্রতিদিন তার কাছে যেতেন। একদিন বললেন তিনি "বলি রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

রাজা—"কি চাও তুমি?"

বামন—"আমার তিন পায়ে যতটা জমি পড়ে শুধু ততটুকু।" তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে যতটুকু জমি মাত্র এই।

গর্বভরে হেসে নিয়ে বলি বললেন—কি নির্বোধ তুমি। চাইবার মত একটু কিছু চাইলে না কেন? তুমি আমাকে ঠাট্টা করতে চাইছ?

বামন—না আমি ঐটুকুই চাই।

বলি—বেশ, তুমি তিন পাদ জমি নিতে পার।

তখন সেই বামন ফুলতে লাগলেন এবং বিষ্ণুরূপ গ্রহণ করে এক পা দিয়ে সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেললেন এবং দ্বিতীয় পা দিলেন স্বর্গে, তারপর তৃতীয় পদ কোথায় রাখবেন জিজ্ঞেস করে বললেন—এবারে কোথায় পা দেব ?

সত্যপ্রতিজ্ঞ বলি তখন নিজের মাথা পেতে দিয়ে বললেন—"এ ছাড়া আমি আপনাকে আর কিছুই দিতে পারি না। আমার মাথাটি ছাড়া সবই আপনি নিয়েছেন, আপনার পা আমার মাথায় রাখতে পারেন।" মাথায় পা রাখতেই বলি পাতালে চলে গেলেন। নীচে গিয়ে বলি বললেন—"হে প্রভু, আমি ভালভাবে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে প্রজা-পালন করেছি। আমার অহংকারের শাস্তি হয়েছে। আপনি কি সে জন্যে দয়া করবেন না ?"

ভগবান বিষ্ণু উত্তর করলেন—হ্যাঁ, আমি তোমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে মান্য করি, সেই জন্যে তুমি পাতালের রাজা হয়ে থাকবে চিরকাল। আরও পৃথিবীর অধিবাসীদের দেখতে আসার জন্যে, তারা ভালভাবে দিন কাটাচ্ছে কিনা তা জানতে, আমি তোমায় ত্বু'বার এখানে আসবার অনুমতি দিচ্ছি।" আজও বিশেষ কোন দিনে বলিরাজা তাঁর প্রিয় প্রজাদের দেখতে এসেছেন বলে আমরা উৎসব পালন করে থাকি।

বিষ্ণু একজন অবতার এবং উপরের কাহিনী থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি এসেছিলেন দুষ্টের দমন করতে, ভাল ও মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সাম্য আনতে। বিষ্ণুর আগমনে বোঝা গেল যে, অহংকার হলে তার কি দশা হয়।

রামচন্দ্রের কাহিনী এমনিই এক অবতারের কাহিনী যিনি সত্যরক্ষারূপ ব্রত পালন ও পিতৃস্নেহ ও ভ্রাতৃপ্রেমরূপ কর্তব্য পালন করতে এসেছিলেন। রামায়ণের কথা বলতে চাই না, কিন্তু এটা ঠিক যে তখন রামের জীবন ও কাজ দিয়ে ঐ ভাবের উপরেই খুব জোর দেওয়া হয়েছিল।

তারপর এলেন শ্রীকৃষ্ণ। রাজা তিনি তবুও কিন্তু সখা ও শিষ্য অর্জুনের প্রতি ভালবাসার বশে তাঁর রাজত্বকে দূরে রাখলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে তিনি গীতার বাণী শোনালেন। শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অর্জুন ভড়কে গেলেন, তাঁর মনে সন্দেহ এল, তিনি সাত্ত্বিকতার ভান করতে লাগলেন, যা করতে যাচ্ছেন সেটা ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে পারলেন না—এ যুদ্ধ ঠিক কিনা তা তিনি বুঝতে পারলেন না। হিংসার পথ গ্রহণ করছেন বলে তাঁর মনে যে ভ্রান্ত যুক্তি এল, তাতে তিনি দয়া বোধ করতে লাগলেন এবং তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন বাসনাশূন্য হয়ে, নিস্পৃহ হয়ে, নিজে অধিকার করব এটা না ভেবে, ভক্তি ও আত্ম-সমর্পণের ভাব নিয়ে যদি যুদ্ধ কর তা হলে কিছুই ভয় নেই। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্যই হল মনের দ্বন্দ্ব নাশ করে ভ্রান্ত যুক্তির নিরসন করা। কাজের মধ্যে নিষ্ক্রিয় থাকার অবস্থা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এরই প্রতীক।

ভগবান বুদ্ধকেও অবতার বলা হয়। যজ্ঞ, কৃত্য ও পূজার বহিরঙ্গ-সাধন-যুগের পরেই এলেন বুদ্ধ। তিনি এলেন ঘোর সন্দেহবাদিরূপে, সাধন জগতে শুধু বহিঃকৃত্য-দমনকারিরূপে। তিনি যেন একটা প্রতিক্রিয়া কিন্তু তখন সেই প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল তাই বুদ্ধকে অবতাররূপে গণ্য করা হয়।

আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু এখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে বলব। তাঁদেরও অবতার বলা যায় এবং বলাও উচিত। কেন ? রামকৃষ্ণ এমন এক সময়ে এলেন, যখন জড় উন্নতি ও জাগতিক সুখকে মানুষ শ্রদ্ধা করত ও তার পেছনে ছুটত এবং বাহিরের সুখের সামান্য মাত্র পেলেই তাতে মুগ্ধ হত ও তাকে বড় করে তুলত। ভারত তখন তামসিকতা, অজ্ঞতা ও জাড্যমগ্ন। সে তখন বিদেশী ভাবের দিকে চো

থাক , সে ভাব তার অতীত জীবনের যোগ্য নয় বা ভবিষ্যতেরও উন্নতিবিধায়ক নয়। এর দ্বারা এটা বলতে চাইছি না যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যন্ত্রপাতি সহায়ে মানব-উপকারার্থে সেই জ্ঞানের প্রয়োগের আমি বিরোধী বা তার প্রয়োগকে ছোট করছি। মানবমনের উন্নতির জন্যে এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু মানুষকে ছোট করে যদি যন্ত্রের পূজো করা হয় এবং তাতে যদি দাসমনোভাব বেড়ে যায়—সে দাসত্ব, ভাবের দিকেই হোক বা যন্ত্রপাতির দিকেই হোক—তা হলে কিন্তু বলতে হবে আমরা আত্মপ্রতারণা করছি। ভারত তখন এই অবস্থায় এবং আরও কি তখন সে যথার্থ অতীন্দ্রিয়তা ভুলে নৈসর্গিক দর্শন অধ্যয়নে ব্যস্ত এবং এই করে সে তার বংশগতি ও প্রাচীন সম্পদকে অস্বীকার করতে চলেছিল।

তাই রামকৃষ্ণ এলেন, অতি সাধারণ এক ব্যক্তি, ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি কোন বিশেষ দাবীকে অবলম্বন করলেন না। সত্যি বলতে কি ভারতে আমরা ত্রাণকর্তা বা মধ্যস্থ বলে কাউকে তত বেশী বিশ্বাস করি না—হ্যাঁ, অবশ্য গুরুকে বিশ্বাস করি, কিন্তু মানি যে চরম দায়িত্ব নিজের মধ্যেই নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এবং তাঁর মনে প্রথম যেটা অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বলে মনে হল সেটা হল মিথ্যা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান ও তন্ত্র সব সাধনা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ও প্রচারও করেছিলেন যে, এ সবই সমন্বয়সাপেক্ষ—খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম ও তন্ত্রের মৌলিক মতবাদ যা সত্য সে সবকে গ্রহণত করেই বরং সে সবের ভেতরে যা আছে তাকেও ছাপিয়ে যায়। ধর্মমত ও ভাবকে স্বার্থপূর্ণ প্রয়োজনে না লাগিয়ে বরং সে সবের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন আনাই হল রামকৃষ্ণের শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দ যেটা জনসমাজে প্রচার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তাই বিশেষ বিশেষ অবতারদের কথা বলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, তাঁরা নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের জন্যে জন্ম নেন, নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় ও নির্দিষ্ট পশ্চাদ্‌ভূমি নিয়ে। যার প্রয়োজন সার্বজনীন নয় তাকে সার্বজনীন করে লাভ নেই। অবশ্য সার্বজনীন অবতাররাও আছেন এবং একজন যিনি সর্বযুগে ও সর্বকালে জীবিত আছেন তিনি হলেন গীতা-ব্যাখ্যাতা। আমি এটা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, এঁদের সম্বন্ধে যে সব আখ্যান আছে, সেগুলিকে নিছক গল্প বা উপকরণ বলে গণ্য করা ঠিক হবে না বরং এগুলি অভিজ্ঞতার ও কত উদ্বেগপূর্ণ গভীর চিন্তার পরীক্ষায় টিকে গেছে। তা হলেই হল যে, সেই পরব্রহ্ম কোন কোন সময়ে বিরাট ও স্থায়ী বিশ্বপ্রয়োজনে অবতীর্ণ হন।

গান

শ্রীজগদিন্দ্রচন্দ্র বসু

প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রণাম লহগো মোর।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া খুলেছ
অজ্ঞানতার দোর।
ওগো সন্ন্যাসী, মুক্তিসাধক তাই
বিশ্বের মাঝে তুলনা তোমার নাই
তুমি ছিলে তাই মানবমনের
কেটেছে তন্দ্রা ঘোর॥

চিত্তরে তুমি করিয়াছ জয়
বিত্ত করেছ দান।
ধরার ধূলিতে হে যুগমানব
তুমি চির মহীয়ান্॥
মানবাত্মার দরদী বন্ধু প্রিয়—
স্মরণস্তম্ভে রবে তুমি স্মরণীয়
তোমার স্মৃতির প্রতিমা স্মরিয়া
দুঃখনিশি হবে ভোর॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভোগবাদ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

Of the Imitation of Christএ বলা হয়েছে :

> বেশী কথা বলা ঠিক নয়, নির্জনে থাকো, তোমার ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করো : কারণ তিনি তো তোমারই আছেন, আর সারা জগতের ক্ষমতা নেই তোমাকে তাঁর থেকে বঞ্চিত করে।'

এই পৃথিবীতে আর কিসের উপরে আমরা আনন্দের জন্য নির্ভর করতে পারি ? স্ত্রী, পুত্র, পার্থিবসম্পদ, সর্বোপরি স্বাস্থ্য—কার উপরে নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকা যায় ? ফরাসী মনীষী মঁতেন (Montaign) বল্‌তেন :

> 'Why should we, contrary to the laws of reason and nature, make our contentnent subject to another's power ? We should have wife, children, worldly goods, and above all, health, if we can ; but not be so strongly attached to them that our happiness depends upon them.'

আমাদের আনন্দ আর একজনের খুসীর উপরে নির্ভর করবে কেন ? আমাদিগকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা আর একজনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা মূঢ়তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে ? আনন্দের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা প্রকৃতির নিয়মেরও বিরোধী। স্ত্রী, পুত্রকন্যা, ঘড়-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, সর্বোপরি শরীরে স্বাস্থ্য থাক্‌লে তো ভালোই। কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের আসক্তি এমন গভীর হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের আনন্দ নির্ভর করবে তাদের উপরে।

ঠাকুরও আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করতে বলেন নি। ত্রৈলোক্যকে বলেছিলেন, সারে মাতে থাকার কথা। সদরওয়ালাকে বলেছিলেন :

> 'যে কালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এসবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়তো খেতেই পেলে না! তখন ঈশ্বর-টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। একজন তার মাগকে ব'লেছিল, আমি সংসার ত্যাগ ক'রে চল্লুম। মাগটী একটু জ্ঞানী ছিল। সে বল্লে, 'কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যদি পেটের জন্য দশঘরে যেতে না হয় তবে যাও। তা যদি হয়, এই এক ঘরই ভালো।'

মণিমল্লিককে ঠাকুর বলেছিলেন : 'তোমাদের কর্তব্য কি ?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করবে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার না।'

ঠাকুরের কথা : 'ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, আর একহাতে কাজ ক'রবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দু'হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে। তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে।'

ঠাকুর ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব পড়েন নি, কিন্তু তাঁর পড়বার কোন দরকার ছিল না। মা তাঁকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন।' নারীকে ভোগ করবার কামনা পুরুষের মনে কত প্রবল—একথা বুঝবার জন্য বই পড়বার কোন দরকার নেই। ঠাকুর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে দেখতে পেয়েছিলেন, মানুষের স্বভাবে যৌনক্ষুধার মত প্রবল ক্ষুধা আর

নেই। বলতেন মেয়েমানুষ পুরুষের পক্ষে আচার তেঁতুল। বলতেন, 'যেঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা! তা রোগ সারবে কেমন ক'রে?' তাই নির্জনতার উপরে বারংবার ঠাকুর এত জোর দিয়েছেন। সংসার ত্যাগ করতে বলেননি একথা ঠিক। সংসারের মধ্যে নিশিদিন ডুবে থাকতে বলেননি—একথাও ঠিক। মনে ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিন্তু অনাসক্তি কি সহজলভ্য? মনকে নির্লিপ্ত ক'রে সংসার-জলের উপরে মাখনের মত ভাসিয়ে রাখা কি যা'তা কথা? বলেছেন নির্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথমভাগ থেকে পঞ্চমভাগ পর্যন্ত পাতায় পাতায় নির্জনতার উপরে বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে। সংসারত্যাগের প্রয়োজন নাই ঠাকুরের এই কথা সত্যের অর্ধেকটা মাত্র। অপর অর্ধেক—খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। আধা-সত্য নিয়ে থাকতে গেলে নিজেকে ঠকাবো। মনকে গেরুয়ারঙে না রঙিয়ে বাইরে গৈরিক পরলে কি হবে? মনে যদি ত্যাগ না আসে বাইরের ত্যাগ ঈশ্বরের পাদপদ্মে কখনো পৌঁছে দিতে পারবে না। নিজের সঙ্গে নিজের অনবরত যুদ্ধ চল্‌তে থাকবে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধে মন ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই যদি মনের সারাশক্তি ব্যয় হ'য়ে যায় তবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দেবার সময় পাবো কখন? আনাতোল ফ্রাঁস্ 'থাইস' উপন্যাসে এবং ফ্রয়েড তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বে বলতে চেয়েছেন, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে জোর ক'রে অবদমন করতে যাওয়া ঠিক নয়। ঠাকুর Repressionএর থিয়োরী না প'ড়েও বলেছিলেন :

> 'যাদের প্রথম মানুষজন্ম তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।' বলেছিলেন, 'সহবাস স্বদারার সঙ্গে, তাতে দোষ নাই।'

কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণার শেষ নাই—একথাও কি তিনি বলেননি?

> 'দেশলাই যদি শুকনো হয়, একটা ঘস্‌লেই দপ ক'রে জ্বলে উঠে। আর যদি ভিজে হয়, পঞ্চাশটা ঘসলেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বিষয়রসে রসে থাকলে কামিনী-কাঞ্চনরসে মন ভিজে থাক্‌লে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না! হাজার চেষ্টা কর, কেবল পণ্ডশ্রম। বিষয়রস শুকুলে তৎক্ষণাৎ উদ্দীপন হয়!'

একথাও কি ঠাকুরের কথা নয়?

তাইতো ঠাকুর ভোগের কথাই শুধু বলেননি—অনাসক্ত হ'য়ে ভোগ করবার কথা বলেছেন, একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থেকে কাজ করবার কথা বলেছেন। 'দিনকতক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই।' কতরকম ক'রে কত উপমা দিয়ে কত বিচিত্র ভাষায় তিনি আমাদিগকে ব'লে গেছেন, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করতে কোন দোষ নেই। বলে গেছেন, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বারবার একথাও বলেছেন :

> 'সংসার করনা কেন, তাতে দোষ নাই! তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর, জেনো সে বাড়ীঘর পরিবার আমার নয়; এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে।'

বলেছেন সংসারে বড় মানুষের বাড়ীর দাসীর মত থাকতে। 'আমার হরি, মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে সে হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।

তিনি আমাদের বলেছেন স্ত্রীপুত্র, বিষয়-বৈভবের প্রতি যেন এতটা আসক্ত না হই যে তারা না হ'লে আমাদের সমস্ত আনন্দ চলে যাবে। তিনি বলেছেন সংসারের সমস্ত সাজসজ্জা-জাঁকজমকের পিছনে হৃদয়ের নিভৃতে একটি মন্দিরদ্বারকে নিয়ত খোলা রাখতে। সেই নির্জন মন্দিরে আর কেউ নেই,

কেবল তিনি আর আমি। সেইখানে তাঁর পাদপদ্মে আমাদের চরম আশ্রয়, আমাদের পরম সান্ত্বনা। অনাসক্তি! অনাসক্তি!! অনাসক্তি!!! এই কথাই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মের কথা। এই কথাই ভগবদ্গীতার কথা, উপনিষদের কথা, আর ঠাকুরের জীবন ও বাণী তো ভগবদ্গীতারই ভাষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপমা

শ্রীঅরুণকুমার বিশ্বাস

ভাবরাজ্যের যে সকল উচ্চতত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হয় নাই সেইগুলি কোন সুপরিচিত বস্তুর সহিত উপমা সহযোগে ব্যাখ্যাত হইলে, সেই সকল তত্ত্বের কিছুটা আভাস যেন মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপমার মধ্যে একদিকে যেমন অপরূপ সৌন্দর্যবোধ ও রসবৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অপরদিকে দরদী মনের আভাস পাওয়া যায়। সত্যগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াও জীবন-উপত্যকার প্রতিটি ধূলিকণার উপর তিনি কিরূপ প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—তাহা ভাবিয়া মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সমুদ্রের কাণ্ডারী। যখনই শিষ্যের মনে সন্দেহ উঠিয়াছে প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন বৈরাগ্য হয় না, তখন তিনি গ্রামাঞ্চলের একটি দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়াছেন।

"তীব্র বৈরাগ্য হয় না কেন—তার মানে আছে। ওদেশে মাঠে জল আনে, চারিদিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেড়িয়ে যায়। কিন্তু কাদার আলের মাঝে মাঝে ঘোগ, গর্ত। প্রাণপণে ত জল আনছে। কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাসনাই ঘোগ।"

শিষ্যদের মনে যাহাতে ইষ্টের উপর একটা অচলা-নিষ্ঠা স্থায়ী ভাবে থাকিয়া যায়, তাহার জন্য তিনি জ্বলন্ত উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; অজস্র উপমা সহযোগে সেই আদর্শ নিষ্ঠার বেগ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা বুঝাইয়া দিতেন। নষ্ট মেয়ে সংসারের কাজ করিলেও তাহার মন থাকে উপপতির দিকে, পাকা জেলে ছিপ ফেলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হয়ে থাকে, নিষ্ঠা বেড়ার অভাবে ভক্তি চারাগুলি কাম-ক্রোধরূপ পশু-আদির দ্বারা উৎসাদিত হইয়া যায়, সার্কাসে ঘোড়ার উপর এক পায়ে দাঁড়ানোর কৌশল যেন কত নিষ্ঠায় আয়ত্ত করেছে—এইরূপ প্রচুর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি নিষ্ঠার আদর্শস্বরূপটি শ্রোতার মনে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিতেন।

সাধকের পক্ষে একটি বিঘ্নকর বস্তু "আত্মাভিমান" যাঁহাকে তিনি বলিতেন অহংভাব। ঠাকুর কি সুন্দর উপমাসহযোগেই না এই অহংভাব-বিনাশের প্রেরণা যোগাইয়া ছিলেন:

"গরু হাম্বা (আমি আমি) করে; আর কত দুর্গতি দেখ। লাঙ্গল টানতে হচ্ছে, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, হয়ত কসাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে, ছাল চামড়া হবে, অবশেষে কিনা নাড়ীভুঁড়ি দিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোনবার সময় তুঁহু, তুঁহু বলে। তবেই নিস্তার, তবেই মুক্তি" অর্থাৎ "আমি'র স্থলে "তুমি" হইলেই যথার্থ আত্মাভিমান ত্যাগ এবং তখনই মুক্তি লাভ।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধারা

সমূহের দুইটি প্রবাহকে বিশেষ বেগবান্ করিয়া গিয়াছেন—মাতৃভাবের সাধনা আর সর্বধর্মের সমন্বয়। সুতরাং এই দুইটি বিষয়েই যে তাঁহার উপমা-সৌষ্ঠবের মাধুর্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

জগন্মাতাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দিবেনই দিবেন—ভক্তের এই বিশ্বাস প্রবল করিবার জন্য তিনি সুন্দর উপমা, সুন্দর গল্পের আশ্রয় লইয়াছিলেন:

"ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—মা হয়তো আর মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে। প্রথমে মা কোনমতে দিতে চায় না; বলে 'উনি বারণ করে গেছেন, এক্ষণই ঘুড়ি নিয়ে কি একটা কাণ্ড বাধাবি।' যখন ছেলে কাঁদতে শুরু করে, কোনমতে ছাড়ে না, মা অন্য মেয়েদের 'রোস মা, এ ছেলেটাকে ক্ষান্ত করে আসি' বলে চাবিটা নিয়ে কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয়। তোমরাও মার কাছে আব্দার করো, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।"

আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, বিচারমার্গে নেতিবাদেরই প্রাধান্য, তখন বেল বলতে শাঁসই বস্তু, শাঁসই আসল। কিন্তু বস্তুলাভের পর সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ, তখন শাঁস নিয়ে থাকলে পুরো বেলটাকে বোঝানো যায় না, কেননা "ওজনে কম পড়ে যাবে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিষয়বস্তু যত উচ্চস্তরের ও কঠিন হইয়াছে, তাঁহার উপমাগুলি তত সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া চলিয়াছে।

তাঁহার দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সর্বধর্মসমন্বয়-সাধন। "সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের জল ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে বরফ হইয়া যায়" এই সামান্য কথায় তিনি দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদের সকল বিরোধের মীমাংসা করিয়াছেন। সাপের স্থির অবস্থা শিবের এবং সাপের চঞ্চল অবস্থা শক্তির পরিচায়ক। এই উপমার পর শিব ও শক্তির বিভিন্নত্ব-সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবার কোন কারণ থাকে না।

ঠাকুর জীবনে যদি কিছুর শত্রুতা করিয়া থাকেন তাহা হইল গোঁড়ামির বা "মতুয়ার বুদ্ধি"র। ঘণ্টাকর্ণের গল্পে বিশেষতঃ নিম্নোক্ত "কানার হাতী দেখা" গল্পে গোঁড়ামিকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন:

"কতগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল—হাতীটা কিরকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে এগিয়ে এল। একজন পা স্পর্শ করেছিল। সে বলল হাতী একটা থামের মত। আর একজন কানে হাত দিয়ে বলল "কুলোর মত।" তেমনি ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, "ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয়।" একই পুকুরের বিভিন্ন ঘাট থেকে একই বস্তু জল নিয়ে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বিবাদ করে, সেই বস্তু জল না পানি, না water—এই গল্পেও ঠাকুর বিভেদবুদ্ধির উপর চরম আঘাত হানিয়াছেন।

পূর্ণজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত যে এই দুঃখময় সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে হইবে এই কথা বেদ-বেদান্ত, সকল শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরের বাণী ছাড়া আর কোথায় দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকায় এই প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই?

"কুমোরেরা হাঁড়ি শুকুতে দেয়, কখনও গরুটরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে দেয়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলো ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে, সেগুলো আবার ঘরে এনে, জল দিয়ে মেখে, চাকে দিয়ে নূতন হাঁড়ি তৈয়ার করে। যতক্ষণ কাঁচা থাকবে, কুমোর ছাড়বে না। যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, ঈশ্বরদর্শন হয় ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে।"

এই সকল উপমা-নির্বাচনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটা সংস্কৃত চিত্ত, একটা বিদগ্ধজনোচিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কোন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না বলিলেই চলে। তাহা সত্ত্বেও এই সকল

ব্যবহৃত উপমারাজির মধ্যে যে সকল আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিলে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। পূর্ণজ্ঞানীর আর মরজগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে না এইটি বুঝাইবার জন্য ঠাকুর পূর্ণজ্ঞানীর সহিত সিদ্ধধানের সাদৃশ্য দেখাইতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সিদ্ধ ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না, জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেহ হয় তাহলে তাকে দিয়ে আর সৃষ্টির খেলা হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। * * তুমি ত পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বল্লে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ল্যাজ কি হাঁড়িমুখ থাকবে তা নয় (সকলের হাস্য)।

এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁহার সাধনজাত সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রভাবে রসবোধের এমন একটি উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিলেন যেখানে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কৌশল বড় একটা খাটিত না।

তবে তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল রসাস্বাদন। "চিনি হব না চিনি খাব" এইটিই ছিল তাঁহার মনের ইচ্ছা। লীলাবৈচিত্র্যের মাঝে সাধকের উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধিজনিত আনন্দ উপভোগ তাঁহার মত সাধারণ জীবও যাহাতে করিতে পারে ইহার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না।

উপমা-সহযোগে কোন দুরূহ বিষয় বোঝাবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর করুণামাখা হৃদয়ের পরশ পেয়ে মন কৃতার্থ হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বগুলি তিনি যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বদ্ধজীবের পক্ষে সেইরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবু যাহাতে সাধারণ জীবের ঐ সকল উচ্চতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হয়, আর সেই অনুপ্রেরণায় ধর্মপথে সে অগ্রসর হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বাণীর মধ্যে উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহার ব্যাকুল মন যে নব নব উপমা নব নব দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের জন্য কত ব্যগ্র ছিল তাহা একদিনের ঘটনা-উল্লেখে স্পষ্ট হইবে।

ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের একটি ছবি তুলাইয়াছেন। ঐ উপলক্ষে ঠাকুর photograph তোলার কৌশল কিছুটা বুঝিয়াছেন। ছবি তোলার কাঁচে কালি (সিলভার ব্রোমাইড) মাখান না থাকিলে যে ছবি উঠে না, ঠাকুরকে এই কথাও বলা হইয়াছে। সেই দিনই ঠাকুর ভক্তকে উপদেশ দিতেছেন :

"আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটা দেখলুম, শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালী মাখিয়ে দেয় তবে ছবি থাকে, তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছ তাতে কিছু হয় না যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালীমাখান না থাকে।"

এইরূপে কৃষক থেকে সম্রাট, পতিতা নারী থেকে করুণাময়ী মাতা, বেদের হোমাপাখী থেকে বর্তমান যন্ত্রযুগের photography ও টেলিগ্রাফের তার—সকল স্তরের বস্তু, জীবন ও ঘটনা তাঁহার উপমারাজির মধ্যে স্থান পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

তাঁর বাণীর এই সকল উপমারাজির মধ্য দিয়া তিনি স্বর্গমর্ত্যের মিলনসাধন করিয়া গিয়াছেন, উপমাসঙ্গমে বিশ্বপ্রকৃতি ও চৈতন্যপ্রকৃতি গঙ্গাযমুনার মত অপরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে।

ইংরেজী অলঙ্কারশাস্ত্রে 'parable'র একটা সংজ্ঞা পাওয়া যায় "earthly story with a heavenly meaning"। এই দিক দিয়া রামকৃষ্ণদেবের অমর উপমাগুলিকে parable এর সমগোত্রীয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সত্যই তিনি মাটির কুটিরে স্বর্গের দেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বাণী ও আমরা

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, যে সত্যকে ধরিয়া থাকে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সকলেরই সত্যের প্রতি গভীর আঁট থাকা একান্ত উচিত। ত্যাগী সন্ন্যাসীই হউন আর গৃহস্থই হউন, সত্যের উপর গভীর আঁট না থাকিলে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন হয়। নিজের জীবন-সম্বন্ধে বলিতেন, সত্যের উপর এমন নিষ্ঠা হইয়াছে যে, ঝাউতলা যাব বলিলে প্রয়োজন না হইলেও গাড়ু লইয়া ঝাউতলা যাইতে হইবে। কে যেন ঠেলিয়া দেয়।

যাঁহারা তপস্যা করেন,—লোক-দেখান ভাবে নহে,—প্রকৃতই যাঁহারা সাধনশীল, তাঁহারা এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন বলিয়াই জীবন-যাত্রায় উৎরাইয়া যান। অসাধন জীবন আমাদের, ইহার বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, মুখে একরূপ বলিয়া কার্যতঃ অন্যরূপ করিতেছি। নিজেকে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মনে করিয়া কার্যতঃ যাহা করিতেছি, তাহাতে অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইতেছে। এই যে ফাঁকি, ইহাতে অন্যের অপেক্ষা নিজেরই অনিষ্ট হইতেছে অধিক। চতুরতায় দুচার দিন বঞ্চনা করা যায়, কিন্তু অধিক দিন এ ব্যবসা চলে না। শেষে এমন ঠকা ঠকিতে হয় যে, পরিণামে ইহার প্রতিকার করিবার সুযোগ পর্যন্ত থাকে না। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতই আমরা সত্য হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছি। যদি আমরা সত্যই সাধুজীবন যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সত্যকে একান্ত ভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। ভিতরে কত মলিনতা, বাহিরে শুধু মনোমোহকর আবরণে অন্যকে ঠকাইতেছি, নিজেকে অধোগামী করিতেছি। এ অপরাধ আমাদের মোহপ্রবৃত্ত নহে, সম্পূর্ণ জ্ঞানকৃত। অজ্ঞানকৃত অপরাধের মার্জনা আছে, কিন্তু জ্ঞানকৃত অপরাধের ক্ষমা মানুষেই করে না, আবার ভগবান?

বিষয়-বাসনা, ভোগের পিপাসা—নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা ভিতরে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, উহা কি মালা-তিলকে ঢাকা পড়িবে? বৃথা চেষ্টা! সরল মনে ডাকিলে নাকি যাঁহাকে পাওয়া যায় তাঁহাকে পাটোয়ারীর কৌশলে ফেলিয়া কি নিগ্রহই করিতেছি! নিজের দুর্ভাগ্য নিজেই রচনা করিতেছি! মিথ্যা—ভান—কপটতার আশ্রয় লইয়াই জীবন কাটিয়া গেল! সত্যের সন্ধান মিলিল না!

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষে প্রদত্ত বাণীই আমাদের অধঃপতিত জীবনে একমাত্র অবলম্বন: 'চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ এবং মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।'

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, কাক খুব চতুর, কিন্তু পরের বিষ্ঠা খেয়ে মরে। মানুষের ভিতরেও এই চতুরস্বভাবাপন্ন কাকের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাকের উপমা দিয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন।

আমরা যদি নিজেদের জীবন আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমরা নিজেকে খুব চতুর বলিয়া মনে করি, নিজেকে অন্য অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান বলিয়া ধারণা করি ও সেই মত প্রচার করি। একথা খুবই সত্য যে, আমরা হীনবুদ্ধি

অথবা অল্পবুদ্ধি একথা কিছুতেই স্বীকার করি না। এমন কে আছেন যিনি নিজেকে এইরূপ মনে করেন ?

অতি বুদ্ধিমান অথবা চতুর হইয়া আমরা কি করিতেছি ? শুধু অপরকে ঠকাইবার বুদ্ধি দ্বারাই চালিত হইতেছি ; অপরকে ঠকাইতেছি, অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতেছি। ধর্মের ভানে সরল মনের উপর আধিপত্য করিয়া নিজেব প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু ভুলিয়া যাইতেছি,—আঘাতের প্রতিঘাত আছে, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে।

ধর্মজীবন যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহাদের পক্ষে এই ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জীবনপথে কতটুকু সহায় অথবা বিঘ্নকর, তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রকাশ্য দস্যু বরং বরণীয়, কিন্তু ছদ্মবেশী তথাকথিত সাধু হইতে সতর্ক হওয়া সকল সময়ই দরকার। অথচ আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না, কে সাধুভাবসম্পন্ন, কে অসাধুতায় পূর্ণ। রাবণের চরিত্রে সর্বত্রই বীরত্বেব ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একস্থলে তাহার দুর্বলতা। রাবণের দুর্বলতা সাধুর বেশে সীতাহরণ। এইখানেই রাবণের 'ভাবের ঘরে চুরি' ধরা পড়িয়াছে।

আমাদের প্রতিপদে এই দুর্বলতা, এই নীচাশয়তা আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, অথচ আমাদের হুঁশ নাই। ধর্মজগতে যাঁহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই দুর্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চেষ্টা করাই কাম্য ; তাহা না হইলে মলিনচিত্তে, কপট হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর সন্ধান সুদূরপরাহত। মন আমাদের মলিন, অথচ বাহিরে উচ্চতত্ত্বের কথা আলোচনা করি। নিজের ত্যাগ নাই, তপস্যা নাই, তবুও বাহিরে ধর্মব্যাখ্যা করিয়া অন্যকে তাক লাগাইতেছি। আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অন্যকে প্রতারণাই করিতেছি। এই ক্রমবর্ধমান প্রতারণার ফলে আমাদিগের যে অধঃপতন হইতেছে, তাহার অনুভূতি পর্যন্ত নাই। যখন ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন বুঝিতে পারিব, শ্রেয় হইতে আমরা কত দূরে সরিয়া গিয়াছি। সারা জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—সকলকেই ঠকাইয়াছি, ফলে নিজেরই লোকসান হইয়াছে অধিক।

কেন এমন হয় ? আদর্শভ্রষ্ট হইলে জীবের নাকি এইরূপই হইয়া থাকে—মহাজনগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। সেই শ্রেষ্ঠ চতুর, যিনি আদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী চালাইয়া যান। ইহলোক এবং পরলোকেব কল্যাণকামী হইয়া যিনি চলিতে জানেন, তাঁহার সেই চাতুরীই চাতুরী।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে : "সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বাছিয়া লও, সেই আদর্শ লাভ করিবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন একটা মহান আদর্শের জন্য জীবন পাত করা অপেক্ষা বড় কিছুই নাই।"

জীবন কতদূর অগ্রসর হইল তাহা যাচাই করিতে গেলে নিজেদের অক্ষমতায় নিজেরাই লজ্জিত হই। দৈনিক গীতাচণ্ডী-পাঠ, স্তবস্তোত্র-আবৃত্তি, মালাতিলক-ধারণ, কথায় কথায় শ্লোক আওড়ান ঠিক নিয়মমত চলিতেছে ; কিন্তু জীবন অগ্রসর হইল কৈ ? ভিতরের যদি সংস্কার না হইল, মন যদি চঞ্চলই রহিয়া গেল, চিত্ত যদি অশুদ্ধ ভাবেই পূর্ণ রহিল, তাহা হইলে বাহিরের অনুষ্ঠান শুধু অন্যকে এবং নিজেকে ঠকাইবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়।

'যত্র জীব তত্র শিব' একথা মুখে শুধু উচ্চারিত হইল, অথচ নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণে, অন্যের ত দূরের কথা, নিজের ভাইয়ের বুকে ছুরি মারিতে একটুও পশ্চাৎপদ হই না। অসত্যভাষণের ভিত্তির উপর

দাঁড়াইয়া অসত্য জীবন যাপন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, উহা ছাড়িতে গেলে নিজের অস্তিত্বই থাকে না।

যাঁহারা সাধনশীল তাঁহাদের জীবন কতদূর অগ্রসর হইল, তাহার নিরিখ হইবে তাঁহাদের জীবনে কতটুকু স্বার্থহীনতার বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখিয়া। ত্যাগের মহিমা যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, স্বার্থ সেখান হইতে বিদায় লইতেছে। নিজের সুখের জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাই স্বার্থনামে অভিহিত। নিজেকে যিনি অধিক পরিমাণে বিলাইয়া দিতে পারিতেছেন, তাঁহার পরার্থবোধ তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। নিজের স্বার্থের জন্য যতটা ক্লেশ স্বীকার করি, তাহার সিকির সিকিও যদি পরার্থের জন্য করি, তাহা হইলে জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে।

সাধনার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়,—সাধক কি ভাবে নিজেকে বিলাইয়া নিজে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রকৃত ভোগ করেন, যিনি ত্যাগ করিতে শিখিয়াছেন। গীতা-চণ্ডী তখনই সার্থক হইবে, যখন 'সর্বভূতে নারায়ণ' আমরা ঠিক ঠিক দেখিব, অনুভব করিব। কর্মের অনুষ্ঠান ও মুখের কথায় অনেক তফাৎ। পুঁথিপড়া বিদ্যায় লোককে ঠকান যাইতে পারে, অনভিজ্ঞকে তাক লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধনার নিরিখে উহার কোন মূল্যই নাই, যদি তার মূলে না থাকে আন্তরিকতার প্রেরণা।

আমরা দিনরাত্র মন দ্বারা যে সকল অপরাধ করিতেছি, যদি প্রকৃতই সেইগুলি কার্যে পরিণত করি, তবে আমাদের কি শাস্তি হইতে পারে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠি—জেল হয়, ফাঁসি হয়, শূল হয়, তুষানল হয়। মনের এই অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি কি আমরা পাইতেছি? কখনই নহে। ভগবান মাঝে মাঝে একটু খোঁচা দিয়া চেতনার সাড়া দেন, তাহাতেই আমরা অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়ি। জীবের উপর তাঁহার করুণার সীমা নাই। তিনি যে কত ভাবে জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা সাধক ভিন্ন অন্যের বুঝা অসম্ভব। অসাধন জীবনে, মলিন মনে সে সাড়া জাগে না। মন-দর্পণে কত ময়লা আবর্জনা জমিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাই উহাতে শিবের ছায়া পড়িতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের এই দীন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইতে বারবার বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি ঠিক ঠিক ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইতে পারি—মুখের কথায় নহে—পুঁথির ভাষায় নহে, অন্তরে অন্তরে,—তাহা হইলে আশা হয় যে, অসাধন জীবন হেলায় অতিবাহিত হইলেও তাঁহার মন্দির-দুয়ার আমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কিভাবে যে তাঁহার করুণায় মানুষ কৃতার্থ হয়, তাহা কেহই জানে না। সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিদের নিকট জিজ্ঞাসু হইলে তাঁহারা শুধু বলেন—করুণা—করুণা—করুণা! তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
(আমায়) এনেছ তোমার দুয়ারে।"

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা

শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্মকার, কবিশ্রী

ফাল্গুনে এলো ঋতু-বসন্ত এলো পূর্ণিমা-তিথি,
স্নিগ্ধ-আলোয় হাসিয়া উঠিল পুলকে কুঞ্জবীথি।
আবীরের রাগে সাজায়ে যুগলে
গোপীগণ গাহে মিলিয়া সকলে
নূতন ছন্দে পরমানন্দে মিলনের প্রেম-গীতি,
ফাল্গুনে এলো ঋতু-বসন্ত এলো পূর্ণিমা-তিথি॥

লাল রঙে রাঙা যমুনার জল করিতেছে আজি খেলা,
শুভ্র চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় হেরি অভিসার-মেলা।
হোলি-উল্লাসে শুক্‌সারি মাতে
কোহেলা গাহিছে ফাগুনের রাতে
কলগুঞ্জনে ঋতুর রাজারে অলিরা জানায় প্রীতি,
গোপীগণ গাহে ঋতু-বসন্তে কতনা মধুর গীতি॥

গৌর-গীতি

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

লীলাকীর্তন-সঙ্গীতের প্রবর্তক শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কেন্দ্র করিয়াই এ দেশের কেবল পদাবলীই নয়, অন্য নানা শ্রেণীর গান রচিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলের সংগীতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রেমলীলার আবরণেই নরনারীর প্রাকৃত প্রেমের গান হিন্দুস্থানীতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের গান সংসার-বৈরাগ্য ও অনাসক্তির গান। বাংলার গানে লৌকিক অপেক্ষা পারমার্থিক তত্ত্বই প্রাধান্য পাইয়াছে, ইহজীবন বা গৃহজীবনের কথা ইহাতে নাই বলিলেই হয়।

এককালে বাংলাদেশের সংগীতের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলাই প্রধান উপজীব্য ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে দেশবাসীর অন্তরের উষ্ণ স্পর্শ থাকিত না। বৈষ্ণব গান ধীরে ধীরে গৌরকে যখন তাহার নায়ক করিল, সারা বাংলাদেশ সেদিন কীর্তনে মাতিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গদেবকে লোচনদাস, নরহরিদাস প্রমুখ কবিরা 'নদীয়া-নাগর' করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নাগরী ভাব লইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার মধুর সম্বন্ধ লইয়াও কিছু কিছু গান রচিত হইয়াছে। এইগুলিতে গৃহজীবনের কথা আসিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও গৃহজীবনের প্রতি ঔদাসীন্যের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য ত্যাগের প্রতীক। কবিদের কাব্যে তাই বৈরাগ্যের সুরই নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বা দ্বারকালীলা লইয়া গান রচিত হয় নাই, সেইরকম শ্রীচৈতন্যদেবকে গৌরনাগরী ভাবের সাধক কবিরা নবদ্বীপের লীলারঙ্গেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা পুরীধামে তাঁহার সন্ন্যাসজীবন লইয়া গান রচনা করেন নাই। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বে'র বা 'সাধ্যসাধনতত্ত্বে'র প্রচারক গৌরচন্দ্রকে তাঁহারা 'গৌর-চন্দ্রিকা' গানে রূপদান করেন নাই।

সদ্যস্নান করিয়া সুরধুনী তীর হইতে পট্টবস্ত্রপরিহিত দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ নিমাই টোলে ফিরিতেছেন, তাঁহার গলায় শ্বেত উপবীতের গোছা দুলিতেছে, ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পশ্চাতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখে

তাঁহার বুদ্ধির ঝল্‌কানি, মুখে মৃদুস্মিত হাসি—সারা নবদ্বীপের তরুণীরা এইরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

সন্ধ্যায় তাঁহার আর একরূপ—রাঙাপাড় ধবলপাটের জোড় পরনে, পায়ের নখ স্পর্শ করিয়া কোঁচা দুলিতেছে, পায়ে বাঁকমল, সোনার নূপুর, চুলে চাঁপাফুল, সম্মুখের চুলে ঝুঁটিবাঁধা—তাহাতে কুন্দমালতীর মালা। সর্বাঙ্গে চন্দন, কপালে শ্বেতচন্দনের লম্বা ফোঁটা। লোচনদাসের পদে আছে :

ধবল পাটের জোড় পরেছে রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।
বাকমল সোনার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিলে ভুবন মূরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়েছে চাঁপাফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দনমাখা গোরা গায়, বাহু দোলায়ে চলে যায়
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা॥

গৌরের এই অপরূপ রূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের গৃহজীবন তুচ্ছ হইয়া গেল। সংসারে অনাসক্তি জাগিয়া উঠিল। নদীয়া-নাগরীভাবের গানও সেজন্য বৈরাগ্যের গান। এই যে নদীয়া-নাগরীর দল ইহারা নদীয়ার কুলবধূরা নয়।

নরহরিদাস, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ নদীয়ানাগরী-ভাবের সাধক কবিরাই নদীয়া-নাগরীদের অভিনয় করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের গৌরগীতিতে গৃহস্থঘরের কুলবধূদের মুখের জবানী ব্যবহার করিয়াছেন :

হলুদ বাটিতে গৌরী বসিলা যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সেই ছটফটানি প্রাণে॥
কিসের রাঁধন কিসের বাড়ন, কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল, ভেসে গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে॥
লোচন বলে আল্লো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারও একদিন অবসান হইয়াছিল, গোপীরা তাহাদের প্রেমডোরে, মা যশোদা তাঁহার স্নেহডোরে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন নাই। 'নদীয়ানাগর'ও একদিন মথুরাযাত্রা করিলেন, কুঞ্চিত কেশপাশ মুড়িয়া ফেলিলেন, পট্টবস্ত্র কৌপীনে পরিবর্তিত হইল, কমনীয় রূপ রূপান্তরিত হইল, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ মলিন হইয়া গেল। কবিদের এত যে ফলাও করিয়া তাঁহার রূপের বর্ণনা, সেরূপ হেলাভরে তিনি ত্যাগ করিলেন।

নবদ্বীপের লীলা সাঙ্গ করিয়া গৌর লইলেন সন্ন্যাস। সারা নদীয়া শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে অশ্রু মিলাইল, কবিরা সে বেদনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন গৌরপদাবলীতে।

বাসুদেব ঘোষের পদে—

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়েছে মাথার কেশ ধৈরাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
এমত হইল কেনে শিরে কেশ দেখি হীনে
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি মায়ের অনাথ করি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥

যুবতী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বল রইল না কিছুই। তবু নবদ্বীপের সেই পর্ণকুটীরের আঙ্গিনায় তাঁহাকে যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে. ঋতুর পর ঋতু আসিবে নব নব ফুলপাতার ডালি সাজাইয়া, আবার চলিয়া যাইবে। কতবার নব নব ফাল্গুন দিনে কোকিল ডাকিবে, পূর্ণ চন্দ্রের মায়ায় আকাশ ভরিয়া যাইবে, বর্ষা নামিবে, সারারাত ধরিয়া দাদুরী ডাকিবে, সম্মুখের পথ দিয়া কতবার কত পথিক যাইবে, কিন্তু তিনি আর ফিরিবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহের আর অবসান হইবে না।

কবিরা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে নিজেদের প্রাণের আর্তি, আকুলতা ও আকুতি আরোপ করিয়া 'বারমাস্যা'র গানগুলি লিখিয়াছেন—

বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা
দিব্য ধোত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাঁদে॥

শ্রাবণে বর্ষাবাদলে তাঁহার দুশ্চিন্তা শচীনন্দনের ভাষায়—

এ দুরদিনে প্রিয়া দেশে দেশে ফিরত
ভিগুত সোনার কাঁতিয়া।
হাম অভাগিনী কৈছে রহব গেহ
এ হেন পিয়াক বিছুরিয়া॥

গৌর-পদাবলীর অন্তে কবিদের নাগরী ভাবের ভণিতাগুলি উপভোগ্য। নরহরি দাস বলিতেছেন—

নদীয়া বসতি আর না করিব ডুবিয়া মরিব জলে।
জীবনে মরণে না ছাড়িবে গৌর দাস নরহরি বলে॥

বৈষ্ণব কবিদের সাহিত্যের মানে উন্নীত এ সকল পদগুলি ছাড়াও কত যে বৈরাগী বাউল তাঁহার লীলাগান রচনা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এই সব 'inglorious Milton'দের গানের সুরে সেদিন-কার নদীয়াবাসীদের চোখের জলের ধারা সমানে বহিয়া আসিতেছে। বৈরাগী বাউলরা সংসারবিবাগী গানে নিমাইয়ের সংসার-ত্যাগের চিত্রটি নিজেদের মনের মাধুরী মিশাইয়া নানাভাবে আঁকিয়া লইয়াছেন।

কেবল গৌর নন, নিতাইও আছেন। নদীয়ালীলায় গোর একা সম্পূর্ণ নন, নিতাইয়ের সম্মিলনে তাঁহার পূর্ণরূপ; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরামকে তো থাকিতেই হইবে। গ্রাম্য কবিরা নিতাইকেও ভোলেন নাই—

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই

আমার নিতাই যদি মনে করে, (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে)

নামে পাষাণ গলাইতে পারে।

একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌তো কিনা হতো)॥

একদিন জগাই-মাধাই মোহবশে তাঁহার গায়ে আঘাত করিয়াছিল, তাহার পর কত রূপান্তরই ঘটিয়াছে। তাহারা নিজেরাই মহাভক্তে পরিণত হইয়াছে। শত শত প্রণামে তাঁহার দেহের আঘাতজনিত পাপ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কত দিন তাহার পর কাটিয়াছে– কিন্তু গ্রাম্য কবিরা আজও জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করেন নাই, বারবার দিনান্তে তাহাদের দুষ্কতের কথা স্মরণ করাইয়া ধিক্কার দিয়া চলিতেছেন—

তারে মারলি কেনে ওরে জগাই, ওরে মাধাই,

হরিনাম বল্‌তে ছিল রে।

হরির নাম বল্‌তেছিল, কইতেছিল লইতেছিল রে

যে নাম পাপীর সম্বল, দরিদ্রের ধন (সে নাম বল্‌তেছিল রে)।

যে নাম শুনলে পাপীর পরাণ জুড়ায় বলতেছিল রে॥

দাশরথি-নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের যুগ পর্যন্ত গৌরগীতি সমানে রচিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী কবিরা এতো ঢঙে, এতো ভাবেও সেদিনের সেই নিশীথ রাতের সংসারবিবাগী নীলাচল-যাত্রী রাঢ় বঙ্গের সেই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা আজও বলিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলুড় মঠ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ

পুণ্য বেলুড় মঠ—

শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা বিকাশি শোভিছে গঙ্গা তট।
বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ-কীর্তি ভাতিছে হেথা,
চিন্ময় দেহে ব্রহ্মানন্দ সদা জাগ্রত যেথা।
শ্রীগুরু-প্রসাদে গৈরিক লভি ধন্য হইল যারা,
বেলুড় মঠের আকাশ বাতাস তাহাদের তপে ভরা।

বেলুড় মঠের পথে—

শ্রীরামকৃষ্ণ-গরিমা ঘোষিছে বিদ্যাভবন সাথে।
শ্রীগুরু-দেউল রচিল যাহারা মহান কর্মযোগে,
বেলুড় মঠের পরতে পরতে তাদেরো মহিমা জাগে।
পথ হ'তে হেরি রম্য দেউল স্বর্গে তুলেছে শির—
চলিতে চলিতে মূক হয়ে যাই, গতি হয় মোর স্থির!

বেলুড় মঠের কলা—

মন্দিরদেহে পুণ্য-লিখন, মুখে ত যায় না বলা।
নরদেহ ধরে নেমেছিলে দেব, ভবানী মায়ের ছেলে,
ধন্য বাঙলা, রাম ও কৃষ্ণ এক দেহে যেথা এলে।
হিন্দুধর্মকাণ্ডের মূল জগতে করি প্রমাণ,
বিশ্বধর্ম বেদ-উদ্ভূত—দিয়ে গেলে এই জ্ঞান।

বেলুড় মঠের প্রভু—

অবতার তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমি জগতের বিভু।
বিবাহ করিয়া জায়া সাথে ছিলে সন্তানভাব ধরে;
'ষোল টাং' করে শিখালে, মানুষ 'এক টাং' যেন করে!
ওগো ভগবান! তব নামে খসে ভব-ভয়-বন্ধন,
তব মহিমায় যুবক নরেন বিশ্ববিজয়ী হন।

বেলুড় মঠের নাম—
মানব-হৃদয়ে ধর্মের জ্যোতি বিতরিবে অবিরাম।
গুরুমন্দিরে নরেন, রাখাল, মহেন্দ্রাদি ঋষি—
শরৎ-শশি-বাবু-তারকাদি সবাই রয়েছে বসি!
মহান্ তাহারা গুরুকর হ'তে গেরুয়া পাইল যারা;
ধন্য গিরীশ, চরণ নেহারি হয়ে গেল মাতোয়ারা!

বেলুড় মঠের বাণী—
আমার মমে বাজিয়া উঠিলে ঘুচিবে চিত্তগ্লানি।
ব্যথা পাশরিতে আমার বুকেতে রয়েছে দেবনিবাস।
সর্বব্যাপ্ত প্রাণের ঠাকুর সদাই করেন বাস।
মূর্তিস্মরণে মনের কালিমা মুছিয়া যা'বে সবার,
সকলধর্মী শান্তি লভিবে চরণ ধেয়ানে তাঁর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীস্বামীজী

(কেরলের দুই মহাত্মার শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রী পি শেষাদ্রি আয়ার

কেরলের বিখ্যাত দুইজন আধুনিক আচার্য—শ্রীনারায়ণ গুরু ও শ্রীচট্টম্পী স্বামীর শতাব্দী জয়ন্তী এই বৎসরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা জানিতে ভক্তদের কৌতূহল হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনারায়ণ গুরু অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পবিত্র জীবন, অদম্য অধ্যবসায় এবং আন্তরিক শ্রদ্ধার বলে ধর্মের রহস্য বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ তাঁহার জাতির অবিসংবাদিত আচার্যপদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য গৃহী এবং কয়েক জন সন্ন্যাসী শিষ্যও আছেন।

এক সময়ে আর কোন পরিচয় না দিয়া তাঁহাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখান হইয়াছিল। তখন ঠাকুরের বিষয়ে তাঁহার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ছবি দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "যদি পরব্রহ্ম কোন মূর্তি ধারণ করিয়া আসেন, তবে তাহা এই রূপই হইবে।"

আর এক সময়ে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ হইতে কিছু কিছু শুনিতে চাহিলেন। শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অনুভবসম্পন্ন মহাপুরুষগণ এইরূপই বলিবেন। বা! বা! বড়ই সত্য কথা।"

তাঁহার জনৈক শিষ্য মহাকবি কুমারন্ আশান মালয়লম্ ভাষায় স্বামীজীর 'রাজযোগ' অনুবাদ করিয়াছেন। সেই অনুবাদে পরমপূজনীয় শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) আশীর্বাদ-পত্র তিনি দিয়াছেন।

শ্রীনারায়ণ গুরুর যোগমার্গের শিক্ষক শ্রীচট্টম্পী স্বামী এক আশ্চর্য পুরুষ। সংগীত, চিকিৎসা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ও গঠন করিয়াছেন। তাঁহার একটি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী এবং আমার মধ্যে তুলনা করিলে বলিতে হয়, তিনি অতুলনীয় গরুড় এবং আমি অতি ক্ষুদ্র এক মশক।" এমনই ছিল স্বামীজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা।

শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজী-সম্বন্ধে নারায়ণ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুধর্মের একান্ত বিলোপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনিই আমাদের ধর্মের পুনঃস্থাপন করিয়াছেন।"

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

(বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে)

শ্রীছুবলাল মাহাতো, এম্-এ

কি পেখলুঁ প্রেম নব-ছন্দ।

সুরধুনীতীরে গো ভকত গদাধর

পুলকভাব-অনুবন্ধ॥

গিরিবর শির জিনি' উন্নত কলেবর

হেমকান্তি মৃদুরাগ।

আয়তলোচনযুগ উর্ধ্বযুগলভুজ,

সঘনে মগন অনুরাগ॥

কুঞ্জ পঞ্চবটী করত কঠোর তপ

ভূমি পর হোত শয়ান।

বিমল ভকতি প্রীতি বঢ়ত সো নিতি নিতি

অভিমানে ফুলত বয়ান॥

কোমল ছয়েলা জনু মৃদু মিঠী বোলী

মাতুচরণ অবলম্ব।

কতহুঁ মাঁগত প্রীতি নীতি কভু পুছত

শুদ্ধা ভকতি দেহুঁ অম্ব॥

কাঞ্চন-কামিনী সুখ সো ছোড়ল,

কলিযুগ শিক্ষা-আধার।

ভাবসমাধিসুখ- অমৃত পদ লাগি

হরি সো মনুজ অবতার॥

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

শ্রীবি জি খের

[লণ্ডন বেদান্ত-কেন্দ্রের সাম্প্রতিক একটি সভায় লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বি জি খের কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সার-সংকলন। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

ইংলণ্ডে আসা অবধি এই সর্বপ্রথম অনুভব করিতেছি, আমি যেন ঠিক নিজের বাড়ীতে আছি; লণ্ডন বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিবেশই আমার মধ্যে এই সুখানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছে। যদিও কবি এবং মনীষিগণ 'বৃক্ষে ভাষা, প্রবহমাণ স্রোতস্বতীতে গ্রন্থ, প্রস্তরে উপদেশ এবং সর্ববস্তুতে শুভ' দেখিতে সমর্থ হন, তথাপি সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা-পুষ্টির জন্য আশ্রম, গির্জা বা মন্দিরের পরিচিত আবেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা আছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠটি দর্শন করিয়াছি। সকল ধর্মই সত্য এবং সকল মত-পথেরই স্থান আছে—এই শিক্ষার উপলব্ধি ও প্রচারই জগতের নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ধর্ম প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়—কেবল মন্দিরে বা গির্জায় গমন করিলেই ধর্মলাভ হয় না। অতীতে ধর্মের নামে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু মূলতঃ সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় একই সত্য প্রচার করে। তেরশত বৎসর পূর্বে হজরৎ মহম্মদ প্রচার করিয়াছিলেন—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র খোদার রসুল। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতি স্বয়ং আচরণ করিয়া সকল ধর্মের সমন্বয় ও ঐক্য প্রত্যক্ষানুভব করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ কোন সাহায্য ও পরিচিতি পত্র ব্যতীতই আমেরিকার শিকাগো নগরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান এবং পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামে যুগ্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শক্তি, কৃতিত্ব ও সাফল্য ছিল অনুপম। প্রতীচ্যে বেদান্ত-প্রচারের প্রতিভূ-রূপে তিনি বাস্তবিকই একটি বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার তিরোভাবের পর অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

পাশ্চাত্ত্যে বিশাল ভবন ও বিপুল ঐশ্বর্যে বাস করিয়া মানুষের পক্ষে যাবতীয় উপাদেয় ভোগ্য-বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, কিন্তু এই সকল ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্ত থাকিলেই তাহাকে পরিপূর্ণ মানুষ বলা যায় না। পশু হইতে মানুষের বিশেষত্ব ঈশ্বরলাভের জন্য তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়। দুই প্রকার জীবনধারা আছে। এই বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং আমি জীবনে বিভিন্ন পথ আশ্রয় করিয়াছি। আমি বিবাহ করিয়াছি এবং আমার পুত্র-পৌত্রাদি আছে। কিন্তু এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসি-পরিচালক স্বামী ঘনানন্দজী যৌবনেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক—ত্যাগ ও শ্রেয়ের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিজে সত্য-উপলব্ধি এবং অপর সকলকে তদনুভূতিলাভে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

ভারতের কয়েকটি রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত আমার পরিচয় আছে। কিন্তু অপরিচিতদের মধ্যে বিদেশে একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা নিঃসন্দেহে অধিকতর দুরূহ কার্য। এই বেদান্ত-কেন্দ্রটি গড়িয়া তুলিতে স্বামী ঘনানন্দকে তাঁহার ছাত্র ও সাহায্যকারীদের প্রত্যেককে তিনটি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইয়াছে: প্রথমতঃ, তিনি তাঁহাদিগের নিকট ধাপ্পাবাজি বা বুজরুকি করিতে আসেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের জন্য কিছুই চাহেন না; তৃতীয়তঃ, তিনি ব্রিটিশ জাতিকে হিন্দুতে পরিণত করিতে আসেন নাই। অন্যান্য অনেকের মতো আমিও দুঃখ অনুভব করিতাম যে, স্বামী বিবেকানন্দের লণ্ডন-ত্যাগের পর অনেক বৎসর যাবৎ ইংলণ্ডে কোনও বেদান্ত-কেন্দ্র ছিল না। আজ আমি দেখিয়া আনন্দিত যে, দীর্ঘকাল পরে অবশেষে লণ্ডনে একটি বেদান্ত-কেন্দ্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ধ্যান

শ্রীআশুতোষ দাস

শান্ত সুবিমল, সৌম্য সমুজ্জ্বল, কান্ত-কোমল-দেহধারী,
জগ-জন-শরণ, যুগল শ্রীচরণ, শোক-পাপ-তাপহারী॥
স্থিত সুখাসন, পরিহিত-বসন অঞ্চল গলদেশ পাশে,
কাঞ্চন-বরণ, লাঞ্ছনা-বারণ কুঞ্চিত সঞ্চয়-ত্রাসে॥
আধ-নিমীলিত নয়ন-কমলে আবরিত করুণারাশি,
শ্মশ্রু-সুশোভিত রক্তিম অধরে ক্ষরিত সুমধুর-হাসি॥
অঙ্গুলি-সংযুত উরুদেশ চুম্বিত আজানু-লম্বিত পাণি,
নাতি স্থূল-কৃশ, হেমতরু সদৃশ, প্রেমঘন মূরতিখানি॥
মূর্ত-পবিত্রতা, আর্ত-অধমত্রাতা, পার্থসারথি-সীতাপতি,
নবযুগ-ইষ্ট, তারক-বরিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-পদে নতি॥

জ্ঞান ও প্রেম

[সন্ত প'লের পত্র ; কোরিন্থিয়ান ১।১৩]

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত)

মানুষের ভাষাতেই কথা বলি আর দেবতার ভাষাতেই বলি, প্রেম যদি প্রাণে না থাকে, তবে আমার কথা কাঁশরের বাদ্য, ঘণ্টার আওয়াজের সমতুল্য।

হই না কেন আমি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটয়িতা, সকল জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বাসের জোরে পর্বতপ্রমাণ বাধা দূর করিতে সমর্থ, তবু প্রেম যদি না থাকে, ধিক্ আমাকে।

দরিদ্রের পোষণের জন্য যথাসর্বস্ব দান করি না কেন, নিজের দেহটাকেও পোড়াইবার জন্য বিলাইয়া দি, তবু যদি প্রেমের সঙ্গে এ কাজ না করি, তবে সমস্তই বৃথা। প্রেম নীরবে সহিয়া যায়, করুণা করে, দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করে, নিজের গুণকীর্তন করে না, আত্মশ্লাঘা করে না। উদ্ধত ব্যবহার বর্জন করে, স্বার্থ খোঁজে না, সহজে বিচলিত হয় না, মন্দ চিন্তা করে না। অন্যায়ে উৎফুল্ল হয় না, সত্যের জয়েতেই উল্লসিত হয়। প্রেম সমস্ত সহ্য করে, বিশ্বাস রাখে, আশা ত্যাগ করে না, তিতিক্ষা ত্যাগ করে না। প্রেম সর্বজয়ী হয়। ভবিষ্যদ্দর্শন ভুল হয়ে যায় ; বাক্‌পটুতা একদিন নীরব হয় ; পাণ্ডিত্যের অবসান হয় ; কিন্তু প্রেম অবিনাশী। মানুষ পারি পূর্ণভাবে জানিতে পারে না, সম্পূর্ণ-ভাবে ভবিষ্যদ্দর্শন করিতে পারে না। যখন সম্পূর্ণতার আবির্ভাব হয় তখন আংশিক জ্ঞান স্বতঃই বসিয়া পড়ে। যেমন, যখন বালক ছিলাম তখন বালকের ন্যায় কথা বলিয়াছি, বালকের ন্যায় বুঝিয়াছি, বালকের ন্যায় ভাবিয়াছি —আবার কালক্রমে যখন পরিণতবয়স্ক হইলাম, তখন বালকভাব আপনা হইতেই চলিয়া গেল। তেমনি, এখন যাহা কাচের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট দেখিতেছি, একদিন তাহা মুখোমুখি দেখিব ; এখন যাহা আংশিকভাবে জানিতেছি, একদিন তাহা নিজেকে নিজে যেমন ভাবে জানি, তেমনি ভাবেই জানিব। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম—এই তিনবস্তু কালজয়ী। এ তিনের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

দিনের শেষে

শ্রীঅনিলকুমার রায়

ফুরায় দিন সন্ধ্যা নামে—ক্ষণেক আছে বাকি
অ-বলা মোর যে কথা হায় হারানো দিনে-রাতে
তাহারে আজ কেমনে প্রভু গোপন ক'রে রাখি
হৃদয় মম ব্যাকুল তাই তোমারি মালা গাঁথে।

নয়ন ঝরে কি কথা ভেবে বলগো কতকাল
রইবো আর তোমার লাগি গাইবো আশাবরী
হে প্রভু মোরে কর গো কৃপা, জ্যোতির্ময়জাল
ভরায়ে দাও হৃদয়ে মম ভাসাই খেয়াতরী।

তোমাকে মনে পড়ে গো মোর তোমাকে মনে পড়ে
দুঃখঝরা করুণ দিনে হে ঘুম-ভাঙ্গানিয়া
মাটির আঙিনাতেই যতো চাঁদের সুধা ঝরে
তোমার স্নেহ-আশিস আর তোমার বাণী নিয়া।

আকাশে যতো ছড়ানো ছবি বাতাসে যতো গান
তোমারি সে তো রূপের ছড়া সুরের নির্ঝর
সাগরে যতো নাচিছে ঢেউ গাহিছে অফুরান্
তোমারি সে তো বন্দনা হে করুণাশঙ্কর।

জীবন মম তীর্থ হোক তোমারি শুভনামে
মুক্তি দাও এবার প্রভু অনন্তের ধামে।

সমালোচনা

বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত; অনুবাদক—ঋষিদাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২; ২৮৪ পৃষ্ঠা; মূল্য: ৬৲ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীসম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel নাম দিয়া প্রথম ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় (অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া)। দীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর উদ্যোগে উহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দবোধ করিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর শক্তি, উপযোগিতা এবং সর্বজনীনতা কোথায় এই সম্বন্ধে মনীষী রোলাঁর বিশ্লেষণ বাস্তবিকই অপূর্ব। মূল গ্রন্থটি ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়া বিশ্বসাহিত্যে বিশিষ্ট মর্যাদালাভ করিয়াছে এবং এই জন্যই ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় উহা অনূদিত হইয়াছে। ইংরেজী বইটির অনেকগুলি সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বাংলা সংস্করণে ঋষিদাস তাঁহার অনুবাদ-কার্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। রোলাঁর ভাব-ব্যঞ্জনা ও বাক্য-বিন্যাস বহুপরিমাণে অক্ষুণ্ণই আছে, তবে কোন কোন জায়গায় নির্বাচিত শব্দ কিছু কঠিন এবং শ্রুতিকটু মনে হইল। কাগজ এবং ছাপা ভাল। বাঙালী পাঠকপাঠিকার নিকট রোমাঁ রোলাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ সমাদৃত হউক ইহাই প্রার্থনা। প্রকাশক এবং অনুবাদককে অভিনন্দন জানাইতেছি।

মন্দাকিনী (কাব্যগ্রন্থ)—শ্রীরবি গুপ্ত (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী)-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীনিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮বি, ব্রজেন্দ্র ঘোষ লেন, কলিকাতা—১০; ৯৬ পৃষ্ঠা; মূল্য: ৩৲ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ৬২টি কবিতা ও গান স্থান পাইয়াছে। সুদীর্ঘ প্রথম কবিতা 'মন্দাকিনী'তে সমগ্র গ্রন্থের সুর অভিব্যঞ্জিত। মন্দাকিনী—মানুষের চরম ও পরম কাম্য সত্য-শিব-সুন্দরের স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী-সুধা-ধারা সোল্লাসে সাগ্রহে মর্ত্য-জীবনকে প্লাবিত করিতে ছুটিয়া আসিতেছে:

> "অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
> তরঙ্গ-উল্লাসে".

কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ, সে যে বসিয়া আছে—"শূন্যতার নিপ্রান্ত-সৈকতে।" তাহার "ঊষর মরুর বুকে সবুজের কোন রেখা নাই।" তাই:

> "দূরে বহুদূরে দূর দিগন্তের সীমান্ত-সীমায়
> স্বপন মিলায়,—"

কিন্তু তবুও তাহার আশা ছাড়িতে পারি না। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তাহারই মিলনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। জানি যোগ্যতা নাই, প্রস্তুতি নাই—তথাপি তাহাকে চাই:

> "অনন্ত গগনে জাগা অপলক ধ্রুবতারা সম
> ওগো অনুপম!
> জাগে দুটি আঁখিতারা, মুর্ত তব সুর-সন্দীপন
> লভে এ-চেতন।
> তোমারি প্রতীক্ষারত মর্ম-বীথিকায়
> প্রভাত-প্রসূন-লগ্ন বুঝি বা ঘনায়!
> আমি তব আলোকের অনন্ত-পিয়াসী
> পরিপূর্ণ সবিতার চির অভিলাষী
> অন্তর-আকাশে।
> অমরার মর্ম হ'তে মন্দাকিনী আসে ব'য়ে আসে
> তরঙ্গ-উল্লাসে।"

জানি, একদিন প্রতীক্ষা সফল হইবে। 'জীর্ণ কারাগারের' 'তমোবক্ষ' উদ্ভাসিত করিয়া সূর্যের

উদয় হইবে, 'শোণিতের প্রতি অণুতে অণুতে' 'অনাহত মন্ত্রের সম্বিৎ' জাগিয়া উঠিবে :

"বিপুল বিস্ময়ে হেরি অঙ্গে অঙ্গে রাজে
স্নিগ্ধ শ্যামলিম আভা, নৃত্যতালে বাজে"
* * *
"দুর্বার চরণে নামে আত্মহারা তরঙ্গ প্রোজ্জ্বল
লভিতে সকল
সত্তার সাম্রাজ্য মোর বিসারিয়া মর্ম-অমরার
সুবর্ণ-সম্ভার।
প্রভাত-কিরণে খোলে শত শতদল
আনন্দ-সলিলে জাগে স্বর্ণ সুনির্মল.."

গ্রন্থের পরবর্তী কবিতা ও গানগুলির মধ্যেও একটি ব্যাকুল সাধক-প্রাণের প্রতীক্ষা, আত্ম-নিবেদন, বিশ্বাস ও তৃপ্তি অতি সরসভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'অনিরুদ্ধ'

ছোটদের সারদামণি—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-এ-প্রণীত ও প্রকাশিত; ৭সি, গোখেল রোড, ১ নং ফ্ল্যাট, কলিকাতা—২০; পৃষ্ঠা : ৬৭; মূল্য : ৷৶০ আনা।

ছোটদের জন্য চরিতকথা রচনায় সিদ্ধহস্ত কাননবাবুর সহজ সরল ভাষায় শ্রীসারদাদেবীর এই ক্ষুদ্র জীবনীটি যে ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার মত বই হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রীমা সারদামণির জীবনের প্রধান প্রধান অনেক কথাই এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা—শ্রীঅজিত কুমার সেন-প্রণীত। প্রকাশক : দাশগুপ্ত য়্যাণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—৫৫; মূল্য : দশ আনা।

সাবলীল ভাষায় বর্ণিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-কাহিনী ও ভাবালেখ্য। পাঠক-পাঠিকার চিত্তে বইখানি একটি বিশুদ্ধ গম্ভীর উদ্দীপনা আনয়ন করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। কিছুকিছু মুদ্রণ-প্রমাদ লক্ষিত হইল।

কামাখ্যায় • কুমারীপূজা—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট—কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; 'দক্ষিণা—ষোল আনা'।

পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা-সম্বলিত আলোচ্য পুস্তকখানিতে কামাখ্যাপীঠ ও কুমারীপূজা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আছে। পুস্তকের প্রথমাংশ গদ্যে ও দ্বিতীয়াংশ পদ্যে লিখিত। কুমারীপূজা-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইখানি পাঠ করিলে লাভবান হইবেন বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসী লেখকের নির্মল চিত্তের ভাবমাধুর্য রচনায় একটি স্নিগ্ধ আবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-সঞ্চয়ন—সঞ্চয়ক ও সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। প্রকাশক : স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী, সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ (যোরহাট), আসাম। পৃষ্ঠা—১৬৬; মূল্য—দুই টাকা।

ধর্মজগতে শ্রীগুরুর স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে। গুরুর মাধ্যমেই ইষ্টের সন্ধান মিলে। ভারতের অনেক ধর্মাচার্যের (শঙ্করাচার্য, নানক, তুলসীদাস, জ্ঞানেশ্বর, রামদাস স্বামী প্রভৃতির) গুরুতত্ত্ব-বিষয়ে ধারণা এবং বিভিন্ন শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের গুরুভাবের পরিচয় সহজ ভাষায় আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। বাংলার ধর্ম-সাহিত্যে গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান সংযোজন বলিয়া মনে করি।

ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য

সব-হারাদের গান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। প্রকাশিকা : শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায়, নবজীবন-সংঘ, লোকসেবা-শিবির, পোঃ বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া। প্রাপ্তিস্থান—৫এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩; পৃষ্ঠা : ১১১; ল্য : আড়াই টাকা।

আটাশটি কবিতার সমষ্টি এই বইটি একসঙ্গে

ভাবের আবেশে পড়িয়া ফেলিয়া লক্ষ্য করিলাম ইহা চতুর্থ সংস্করণ। তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ জনচিত্তে যে দোলা লাগিয়াছে তাহার শেষ হয় নাই। তাই অনবসিত উৎসাহের নব-উদ্দীপন।

ইংরেজ কবি Rupert Brooke নামগোত্রহীন দেশদরদী সৈনিকদের গান গাহিয়া অমর হইয়াছেন; Owen'ও ঠিক ঐরূপ দুঃখীর সমব্যথী। জীবনে যাহারা কিছু পাইল না, কাঁদিয়া ও খাটিয়া মরিল, অভাব-অভিযোগ যাহাদের নিত্যসহচর, অথচ যাহাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে সভ্যতার আকাশচুম্বী ইমারত তৈরী, তাহাদের পক্ষে ওকালতির লোক কোথায়? মানবমিত্র স্বামী বিবেকানন্দ 'ত্রৈলোক্যকম্পনকারী' সর্বংসহ এই সর্বহারাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি—সংবেদনশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। আসিলেন 'কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গান্ধীজী, আবার নিষ্পিষ্ট মানব-সমাজ আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পাইল। কবি বিজয়লাল—উৎসবে ব্যসনে সবহারাদের নিত্যসঙ্গী বিজয়লাল—বিবেকানন্দ-গান্ধীর ঐতিহ্যকেই রূপদান করিতে বদ্ধপরিকর। কৃতকার্যও হইয়াছেন বিপুল-ভাবে। 'পার্থ' কবিতায় কবির আহ্বান—

'হর্ম্য ছেড়ে বেরিয়ে এস, বর্ম পরে দাও দেখা,
লুপ্ত কর অধর্মের এই শর্বরী;
কৃষ্ণ যাহার বন্ধু—সে তো বিশ্বে কভু নয় একা,
কপিধ্বজের চক্র উঠুক ঘর্ঘরি।'

Leviathan-সদৃশ মৃতকল্প নিপীড়িত মানব-জাতির নবজাগৃতির গান। ইহাদের 'নির্বাসন,' 'ক্ষুধার জ্বালা,' 'কাঁটার বন,' 'ফাঁসির রশি,' 'শিকল-হার'—সবই বিরাট মনুষ্যসংহতির অপরিহার্য উপকরণ। বিজয়-কবির অমোঘ আশ্বাস:

'সকল দেশই তোদের হবে, আপন হবে সকল ঘর,
থাকবে না কো বর্ণবিচার, থাকবে না কো
আপন পর।
থাকবে শুধু একটি জাতি—সে জাত হবে
মানুষ-জাত—
তার উপরে থাকবে নাকো রাজা-উজির
কারো হাত।'

সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে বেশী আলোচনার উপায় নাই। তবে এইটুকু বলা যায়, যাঁহাদের নিকট প্রাণের মূল্য সর্বাধিক, মানবসেবায় যাঁহাদের পরম তৃপ্তি, প্রেমেই যাঁহারা কৃতার্থম্মন্য তাঁহারা এই কবিতাবলী-পাঠে বিমল আনন্দ ও প্রকৃত প্রেরণা লাভ করিবেন। কবিকে সাদর অভিনন্দন জানাই।

গীতাতত্ত্ব-প্রকাশ—শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়-অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়, পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, অথবা নিচিৎপুর কোলিয়ারী, পোঃ বাঁশজোড়া, জেলা মানভূম। পৃষ্ঠা: ৩৩০। মূল্য: পাঁচ টাকা।

লেখক 'বহু বৎসর ধরিয়া গীতা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া যে চিত্তপ্রসাদ' লাভ করিয়াছেন তাহার একটি বিস্তৃত পরিবেশন এই গ্রন্থখানি। গীতা-শাস্ত্র যুগ যুগ ধরিয়া একক আপন মহিমা বিস্তার করিয়া আসিতেছে; ইহার মধুপানমত্ত কত ব্যাখ্যাতৃমধুপ নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, বিচিত্র ব্যাখ্যান দ্বারা জনচিত্তকেও বিমল আনন্দে আপ্লুত করিয়াছেন। আলোচ্যমান গীতাব্যাখ্যা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের গীতাভাষ্য-অবলম্বনে লিখিত। লেখক আলোচনাকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; দীর্ঘ পরিশিষ্ট জিজ্ঞাসু পাঠকদের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। শ্লোকের অন্বয় দিলে ভাল হইত। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (অধ্যাপক)

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা-প্রসঙ্গ—শ্রীরাজবালা দেবী-প্রণীত ও প্রকাশিত; ১৯৪, গণেশ মহল্লা; পৃষ্ঠা: ১৪২; মূল্য: ২৷৷০ টাকা।

যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে আনুমানিক ১২৯২ সালে কাত্যায়নী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই উত্তরকালে কাশীধামে সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল ভগবৎসাধনায় অতিবাহিত করেন এবং শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা-নামে পরিচিতা হন। তাঁহার দেহত্যাগ হয় ১৩৫০ সালে।

আলোচ্য বইখানি তাঁহারই জীবনকথা এবং উপদেশ-সঙ্কলন। যে বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী মাতাজী প্রকাশ করিয়াছেন উহার নাম 'কায়াভেদী বাণী'। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার পূতসঙ্গধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় উহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও উহা যথাযথ ধারণা করা সুকঠিন। পুস্তকে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কতকগুলি এতই অলৌকিক যে, উপকথার ন্যায় শুনায়। যেমন—

"একদিন মা কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, 'অশ্বত্থামার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। দেখিলাম তাঁহার মস্তকে ঘা'র চিহ্ন রহিয়াছে।' তাঁহার সঙ্গে মার যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল তাহা তিনি গোপন রাখিলেন। মাত্র বলিলেন—'তোমরা তেল মাখিবার পূর্বে 'অশ্বত্থামা স্বাহা' বলিয়া তিনবার তেল ছিটাইয়া দিও।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইহা করিলে কি হয়?' মা বলিলেন, 'অশ্বত্থামার ক্ষতের স্থান ঠাণ্ডা হয়।'

* * *

"... মহাত্মা দুর্বাসা মুনি মার কাছে আসিয়া সাতদিন ছিলেন। * * বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব মার নিকট আসিয়া বসিতেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মাকে হরিনাম কীর্তন করিয়া শুনাইয়াছিলেন। * * পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মধ্যে মধ্যে মার নিকট আসিতেন। মা যোগের বিষয় কিছু জানিতে হইলে পরমহংসদেব ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মীমাংসা করিয়া লইতেন। * * শঙ্করাচার্য মাকে যোগ ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ মাকে হরিনাম শুনাইতেন, বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ শুনাইতেন এবং ব্যাসদেব মাকে পুরাণপাঠ শুনাইতেন। * * পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত আসিয়া মাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। * * মহাত্মা শুকদেবের সঙ্গে মার দেখা হইয়াছিল। শুকদেব মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। মা সময় সময় শুকদেবকে কোলে বসাইতেন।"

অন্তরাগে আলাপন—স্বামী বাসুদেবানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—অহিভূষণ মুখোপাধ্যায়; ৪০এ, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা—৯। পৃষ্ঠা—২৩২; মূল্য—৩৲ টাকা।

গ্রন্থকার ১৯৪২ হইতে ১৯৪৮ সালের গোড়া পর্যন্ত বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সহিত ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে যে সকল প্রসঙ্গ করিয়াছেন প্রশ্নোত্তরের আকারে তাহাদেরই কতকগুলি নির্বাচিত সঙ্কলন বর্তমান গ্রন্থের রূপ লইয়াছে। আলোচ্য প্রসঙ্গগুলির বিষয়বস্তু অতি ব্যাপক, প্রকাশভঙ্গী সতেজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর বহুশ্রুত বক্তার মৌলিক আলোকসম্পাত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাস্ত্রীয় আলোচনার পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাব বইখানিতে আগাগোড়া বিকীর্ণ। এই সুখপাঠ্য সরস পুস্তকখানি তত্ত্বামোদিগণের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। সেই অনুপাতে মূল্য খুব কমই বলিতে হইবে

বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ পত্রিকা—(শ্রীশ্রীসারদাদেবী শতবার্ষিকী সংখ্যা)—হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের (১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া) এই বিশেষ বার্ষিকী পত্রিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের রচিত শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে রচনাগুলি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কয়েক জন বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রবন্ধ ও কবিতা পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী এই সংখ্যায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ হইল।

স্বামী অম্বিকানন্দজীর দেহত্যাগ

গত ১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণ ৫-৩৫ মিঃ এ বেলুড় মঠের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী অম্বিকানন্দজী (নীরদ মহারাজ) ৬১ বৎসর বয়সে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছেন। তিনি পূর্বাশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ গৃহী ভক্ত নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। নবগোপাল বাবুরই হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বসত বাড়ীতে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া ঠাকুরের পটবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং পূজার আসনে বসিয়াই মুখে মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত প্রণাম-মন্ত্রটি (স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥) রচনা করিয়াছিলেন। নীরদ মহারাজ ১৯০২ সালে ১৮ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে যোগদান এবং ১৯১৪ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার সহিত বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিশুকালে মাতৃ-অঙ্কে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শ ও আশীর্বাদ এবং কৈশোরে স্বামী বিবেকানন্দেরও পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

ধ্যানভজনে একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি পাঞ্জাবে কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া আসিয়া যকৃতের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। স্বামী অম্বিকানন্দজী সুদক্ষ গায়ক এবং চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তাঁহার সুললিত গম্ভীর কণ্ঠের ভজনসঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। বেলুড় মঠে এবং অন্যান্য বহু শাখাকেন্দ্রে গীত কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভজনসঙ্গীতের সুর অম্বিকানন্দজীরই দেওয়া। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি তৈলচিত্র মঠে রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ—গত ২৬শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী) কলিকাতা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন কার্যালয়) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সেক্রেটারী পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসব প্রচুর উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রত্যূষ হইতে বেদ, উপনিষদ ও চণ্ডীপাঠ এবং পূজা-হোমাদি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। সমাগত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সন্ধ্যারতির পর বাগবাজারের একটি দল দুই ঘণ্টা-ব্যাপী কালীকীর্তন দ্বারা সকলকে তৃপ্তিদান করেন।

প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠে, উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং অন্যান্য অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রে ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হইয়াছিল।

১লা জানুয়ারী (১৯৫৪) 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে। উভয় স্থানেই বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটী সারাদিন-

ব্যাপী পূজাপাঠ, ভজন-কীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বৈকালে ডক্টর শ্রীরাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে একটি সভারও আয়োজন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী জপানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা এবং বিশেষ করিয়া 'কল্পতরু'র ঘটনাটি অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাপতি মহাশয়ের তুলনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) স্বামী বিবেকানন্দের ৯২ তম জন্মতিথি উৎসব বেলুড় মঠে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও হোম, কঠোপনিষৎ-পাঠ, কালী-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়া স্বামীজীর মন্দির ও তাঁহার আবাসকক্ষ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পরিদর্শন করেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে বসাইয়া খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির-সংলগ্ন ভাগীরথীতীরে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীসন্তোষকুমার বসু উহাতে পৌরোহিত্য করেন এবং অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ, শ্রীবিমল ঘোষ, স্বামী গম্ভীরানন্দ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী বলেন, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পূজারী এবং ভারতের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেছেন বর্তমান নেতৃবৃন্দ। স্বামীজী বহু পূর্বে বেদান্তের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে, গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বেদান্তের সঙ্গে জড়িত।

শ্রীবিমল ঘোষ বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সাধনার আদর্শ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকচ্ছটার ন্যায় আপন প্রভাবেই প্রসারিত হইয়াছে। আপন অভিজ্ঞতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, সুদূর রুমানিয়ায় যেখানে ঈশ্বর-চিন্তার স্থান নাই সেখানকার বহু লোক স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানে। স্বামীজী সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয়তার বীজ বপন করেন এবং তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের সৈনিকগণ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমার সম্পর্কবর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীমার চোখে স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ইংরেজীতে তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজীর উভয়বিধ বাণীর সামঞ্জস্য কোথায় তাহা প্রদর্শন করেন।

সভাপতি শ্রীবসু বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ভারতকে নৈতিক বলে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। স্বামীজী ভারতবাসীর প্রতি স্তরেই প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশের অন্তর দর্শন করিয়াছিলেন। তাই তিনি ভারতকে নূতন ভাবধারায় চালিত করিয়া জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি জাতিগঠনের কার্যে বেদান্তকে সম্যকরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বরাহনগর বিবেকানন্দ জন্মোৎসব কমিটীর উদ্যোগে বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৯২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রত্যূষে মাঙ্গলিক স্তোত্র ও উষাকীর্তন এবং সকাল আটটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামীজীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর জীবনাদর্শ বর্ণনাপ্রসঙ্গে স্বামী মাধবানন্দজী বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রতীক। ভারতের অবস্থা, ভারতবাসীর অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তিনি

সর্বাগ্রে ভারতের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। মাধবানন্দজী একটি চিত্র-প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবনদর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ কমলাকান্ত গাঙ্গুলী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি। মৃদঙ্গ-বাদনে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীপঞ্চানন পাল। অসংখ্য নরনারী উক্ত ধর্মসভায় যোগদান করেন।

২৭শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে অপরাহ্নে এক কিশোর-সভায় প্রায় ছয় শত কিশোর যোগদান করে। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং এগারো বৎসরের কিশোর শ্রীমান সুশান্ত সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, শ্রীজনার্দন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ২৮শে জানুয়ারীর সভায় স্বামীজীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ডাঃ সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা বিশ্লেষণ করেন। অপর দুই জন বক্তা ছিলেন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং স্বামী সাধনানন্দ। অতঃপর সংগীতের আসরে যোগদান করেন খেয়ালে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ঘোষাল, শ্রীমহাদেব ঘোষাল ও ডাঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, যন্ত্রসংগীতে জনাব মুস্তাক আলী সুরসাগর, তবলা-সংগতে শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত ও শ্রীবিশ্বনাথ বসু। শ্রীঅমলকুমার দত্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকানাইলাল ঢোল প্রমুখ সুদক্ষ কর্মীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, ভজন, ৮টা হইতে বিশেষ পূজা, ১০টায় গীতা পাঠ এবং ১২টায় হোম হয়।

অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় বিবেকানন্দ শিশু সঙ্ঘের বালকবালিকাদিগের ব্রতচারী নৃত্য ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় স্থানীয় জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমিহিরকুমার দত্তের একটি প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীপ্রণবকুমার চক্রবর্তীর আবৃত্তি হয়। সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর পবিত্র জীবনকথা ও বাণী এবং অবদান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর স্বদেশপ্রীতি ও বর্তমান জগতে তাঁহার অবদান-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শক-রূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের নব জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের অধিকতর প্রচার হওয়া দরকার। পরিশেষে স্থানীয় স্কুল-কলেজের প্রবন্ধ ও ক্রীড়া-প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ হয়। সন্ধ্যারতির পর অধিক রাত্রি পর্যন্ত আশ্রমটি ভজন ও কীর্তনে মুখরিত ছিল।

বালিয়াটী (ঢাকা) কেন্দ্রে স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণাদি সহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। অপরাহ্ণে স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ ও স্থানীয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগামী জন্মতিথি—আগামী ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, শনিবার) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম পুণ্যাবির্ভাব তিথি সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি সহ উদ্‌যাপিত হইবে। 'সাধারণ উৎসব' অনুষ্ঠিত হইবে ৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ, রবিবার)।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী—বিগত ১২ই পৌষ হইতে ২১শে পৌষ পর্যন্ত দশদিবস-ব্যাপী

[বাঁ]কুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী [উ]ৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই পৌষ প্রাতে [স]াড়ে সাতটার পর শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সহ [শো]ভাযাত্রা মঠ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া শহরের [ক]য়েকটি প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া পরিক্রমা সাঙ্গ [ক]রিয়া বেলা প্রায় এগারটার সময় মঠে প্রত্যাবর্তন [ক]রে। প্রাতে ৮ ঘটিকা হইতে মন্দিরে বিশেষ পূজা, [হো]মাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনাদির পর শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। [ঐ]দিন ১৩ই পৌষ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনান্তে সন্ধ্যারতির [প]র রামায়ণগান ও কীর্তন হয়। ১৪ই পৌষ হইতে উৎসবের পরবর্তী দিবসগুলিতে প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে কিছু সময় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ অপরাহ্ণে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার সঙ্গিগণ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে 'শ্রীশ্যামসুন্দর অপেরা পার্টি' কর্তৃক যাত্রা অভিনীত হয়। ১৭ই পৌষ অপরাহ্ণে মঠের সাধু ও সহকর্মিবৃন্দ 'শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন' গান করেন। ১৮ই পৌষ অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীগৌর শাস্ত্রীর শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯শে পৌষ সুবিন্যস্ত মুক্ত প্রাঙ্গণে পঁচিশ সহস্রাধিক নর-নারায়ণের সেবাকার্য রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত চলিয়াছিল। ২০শে পৌষ অপরাহ্ণে রায় বাহাদুর শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদের নেতৃত্বে একটি জনসভা হয়। স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২২শে পৌষ রাত্রিতে বাংলা সবাকচিত্র 'শকুন্তলা' প্রদর্শিত হয়।

ত্রিচূড় (কোচিন রাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সারদামন্দিরে ২৭শে ডিসেম্বর প্রায় দেড় সহস্র পুরুষ এবং মহিলা ভক্তের উপস্থিতিতে সারাদিনব্যাপী পূজা-পাঠ-ভজনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্বামী বিমলানন্দ (মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শন-পাঠচক্রের পরিচালক) শ্রীমা সারদাদেবীর শুচিশুভ্র উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-সম্বন্ধে হৃদয়াকর্ষী আলোচনা করেন। সায়াহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, রাত্রে বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণ-বিষয়ক কথকতা এবং পরবর্তী দিন (২৮শে) সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কতিপয় চিত্রকে অবলম্বন করিয়া বালিকাগণের একটি নাট্যাভিনয় সমবেত জনমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল।

কইম্বাটোর (মাদ্রাজরাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে শতবার্ষিকীর উদ্বোধন-উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর একটি জনসভা (কুন্‌ট্রাকুড়ির মঠাধীশের নেতৃত্বে) এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ দিন আশ্রমে প্রায় ২৫,০০০ নরনারীর সমাগম হয়। ২৭শে ডিসেম্বর (শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন) 'অখণ্ডপূজা', 'সহস্রনাম অর্চনা' (১৩৬ জন অংশ গ্রহণ করেন) এবং ৩০০ গায়ক কর্তৃক ভজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐ দিনকার আলোচনা-সভায় ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ইংরেজীতে ভাষণ দেন। বক্তৃতাটি ত্রিরুচি বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচার করা হয়। সভাপতি ছিলেন ডক্টর আলাগাপ্পা চেট্টিয়ার। শহরের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু গণ্যমান্য সুধী উপস্থিত ছিলেন।

রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটিতে ২৭শে ডিসেম্বর পূজা-হোম-ভজন-কীর্তন-উপনিষদাবৃত্তি-প্রসাদবিতরণ-পুরঃসর উৎসব সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমার জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে মিসেস্ আউঙসান্ কর্তৃক পরিচালিত একটি মহিলা-সভায় ইংরেজি, বাঙলা, হিন্দী এবং বর্মী ভাষায় বক্তৃতাদি হয়।

কালাডি (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য) শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়, সারাদিন-ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে। পূজাপাঠাদির ভিতর একঘণ্টাব্যাপী আশ্রম ছাত্রাবাসের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক 'ললিতসহস্রনাম-পারায়ণম্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় মহিলাবৃন্দ ব্রহ্মানন্দোদয়ম্ উচ্চবিদ্যালয়ে সুচারুভাবে সজ্জিত একটি রথে জননী সারদাদেবীর বৃহৎ তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া পূজাপাঠাদির অনুষ্ঠান করেন। বৈকালে সংস্কৃত মধ্য-বিদ্যালয়ের হলঘরে অধ্যাপিকা এ পি সারদার নেতৃত্বে একটি সভা আহূত হয়। শ্রীমার মহান্ নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন অধ্যাপিকা কে সাবিত্রী এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা কুঞ্জাম্মা। তাঁহারা ভারতীয় নারীগণকে শ্রীশ্রীমার জীবনাদর্শ যথাসাধ্য অনুসরণ করিবার প্রার্থনা জানান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড বেদান্তকেন্দ্রে মায়ের জন্মতিথিতে পূজা এবং হোমের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রায় একশত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার সময় স্বামী প্রভবানন্দজী এবং স্বামী অশেষানন্দজী শ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সমবেত সকলেই ঐ দিন আশ্রমে মধ্যাহ্নভোজনে প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির সময় একঘণ্টা-ব্যাপী একটি বিশেষ উপাসনায় বহুসংখ্যক নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্টলুই বেদান্ত সমিতি শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন করেন ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর। সমিতির নেতা স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সমিতির উপাসনালয়ে একটি সম্মিলনে 'ধ্যান' এবং 'পাঠ' নির্বাহের পর সারদা দেবীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট গায়কগণ ওড়িয়া এবং বাংলা ভজনসঙ্গীত করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তীর উদ্বোধন তমলুক-কেন্দ্র এই ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন :—ভোর পাঁচটায় মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন ; সকাল সাতটায় ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পত্রপুষ্পে সজ্জিত প্রতিকৃতি সহ একশত শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি ও কীর্তন-সংযোগে সমস্ত শহরে শোভাযাত্রা ; বেলা আটটা হইতে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং তৎপরে প্রসাদ-বিতরণ ; বেলা ২টায় আন্দুলের কালীকীর্তন ; বেলা ৪॥০টায় সভা এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন।

মনসাদ্বীপ (সাগরদ্বীপ, ২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের নদী-মেখলা উদার পল্লী-পরিবেষ্টনীতে জননী সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভ সমারম্ভের স্মরণ—অনাড়ম্বর পূজা এবং আদর্শ-বিক্ষুব্ধ জগতের শান্তির জন্য সমবেত নীরব প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রসেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ বৈকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত জনগণের নিকট মায়ের জীবন-মর্ম সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

দিনাজপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শত-বার্ষিকীর উদ্বোধন-উৎসবে একটি বিরাট মহিলাসভা হয়। সভায় শ্রীতরু সেন লিখিত প্রবন্ধে বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সহধর্মিণীরূপের উচ্চতম প্রকাশ দেখাইলেন শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী। সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি প্রাচীন যুগের মহীয়সী নারীগণ আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছিলেন গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া। সারদা দেবী আদর্শ দেখাইলেন আধ্যাত্মিক ধর্মসাধনা, সন্ন্যাস ও নির্লিপ্ত গৃহী জীবনের ভিতর দিয়া। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা ধর্মসাধনার পথে উভয়ে উভয়কে সহায়তা করিতেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, ভালবাসা ছিল—কিন্তু সমস্তই নির্মল, নিষ্পাপ ও স্বার্থশূন্য। সংসারে নিত্য সংসারী সাজিয়াও মনকে যে কতখানি ঊর্ধ্বে উঠাইতে পারিলে মাতা সারদাদেবীর ন্যায় নির্লিপ্ত হইতে পারা যায় তাহা সর্বসাধারণের কল্পনাতীত।

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই মাঘ সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় উৎসব-মণ্ডপে বেলুড়মঠের

স্বামী অবিনাশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন, তৎপরে শান্তিপাঠ হয়। সন্ধ্যা ঘটিকায় স্বামী অবিনাশানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ-অবলম্বনে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। রাত্রি ৮ ঘটিকায় হাওড়া অভয় সঙ্গীতপরিষদ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীর্তন হয়। ১৭ই মাঘ রবিবার সকাল ৮টায় আশ্রমপ্রাঙ্গণ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়া শেষ হয়।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতিতে গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন; তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর নূতন প্রতিকৃতি স্থাপন পূর্বক বিশেষপূজা, হোম ভোগ-রাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তিন শতাধিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সভায় অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট জগতের শান্তি ও মঙ্গলের নিমিত্ত আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করেন ও পরে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রীমার আদর্শ-জীবনের ভাবধারা আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও মাতৃসঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব দুই পর্যায়ে মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১২ই পৌষ হইতে চারিদিন-ব্যাপী উৎসবে প্রথম দিন বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভজন, সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ এবং বক্তৃতা হয়। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে স্বামী সুশান্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিন শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ চণ্ডীর গান কীর্তন করেন। চতুর্থ দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন হয়।

জয়ন্তী-উৎসবের দ্বিতীয়পর্যায়ে ৩০শে জানুয়ারী স্বামী আদিনাথানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শ-সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ পাঠ ও আলোচনা হয়। অনুষ্ঠান-গুলিতে সহস্র সহস্র নরনারী যোগদান করেন।

শিলং-কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানে সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও ভজন-কীর্তনে সকলের মনঃপ্রাণ অপূর্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। পঞ্চ হইতে দশ বৎসর বয়স্কা ১০১টি কুমারীকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হয়। ১০১টি চন্দনলিপ্ত জবাবিল্বদলে অঞ্জলি-প্রদান, ভক্তিগদগদকণ্ঠে চণ্ডী-পাঠ, ১০১টি আলোর মালায় উদ্ভাসিত মন্দিরাভ্যন্তরে ভক্তিমতী পুররমণীগণের হুলুধ্বনি অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মাধুর্য দান করিয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম (আবির্ভাব), শৈশব, সাধনা, সেবা ও মাতৃত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যাহাতে জনসাধারণের একটি পরিষ্কার ধারণা হয় সেই উদ্দেশে প্রথিতযশা শিল্পী-দিগের অঙ্কিত আলেখ্যদ্বারা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীহট্ট-কেন্দ্রে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা, পাঠ, হোম, ভোগরাগ এবং ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ও কয়েক জন বিশিষ্ট সুরশিল্পীর ভজনদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শিলচর (কাছাড়) সেবাশ্রমে আট দিনব্যাপী (১২ই পৌষ—১৯শে পৌষ) সাড়ম্বরে বিবিধ কার্যক্রম-সংযুক্ত শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এতদঞ্চলে সর্বত্র প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। স্বামী পুরুষাত্মা-নন্দের আলোকচিত্রের মধ্য দিয়া শ্রীমার জীবনালেখ্য প্রদর্শন ও বক্তৃতা শত শত ভক্ত নরনারীর আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে বিশিষ্ট ভক্তদ্বয়—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুজরাটী ভক্তগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীডাহ্য়া ভাই রামচন্দ্র মেহেতা গত ২৭শে নভেম্বর, ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১২ সনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও উপদেশ গুজরাটী ভাষায় সর্ব প্রথম প্রকাশ করিয়া গুজরাটী ভক্তদিগের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। সর্বসমেত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার ১৫০ খানি বই লিখিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিতে করিতে মেহেতাজী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী বি কে সাহা এণ্ড ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবসন্তকুমার সাহা গত ১০ই পৌষ ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিজের সততা, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গৌরবস্থানীয় হইয়াছিলেন। বসন্তবাবু অমায়িক চরিত্র, বদান্যতা এবং ধর্মানুরাগের দ্বারা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি-বিধান করুন এই প্রার্থনা।

নানাস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী—গত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে কটকে সারাদিন-ব্যাপী পূজাপাঠ, কীর্তনাদি এবং স্থানীয় নারীসঙ্ঘ সদনে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র, আবৃত্তি ও প্রার্থনা-সঙ্গীত হয়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হইতে পাঠ, ভজন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়বাণীর ব্যাখ্যাও হয়। বিকাল ৪½ টায় সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সাধারণ সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ উপলক্ষে ১০০টি প্রদীপ জ্বালাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের আরতি হয়। পরে একটি সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভাপতি ছিলেন উড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব।

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শত বার্ষিকী জয়ন্তী দিবস বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ভোগের পর ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীরের অধ্যক্ষ স্বামী অপর্ণানন্দের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খাতড়া (বাঁকুড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১২ই পৌষ প্রাতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা ও কীর্তন, পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পৃথক ভাবে ষোড়শোপচারে পূজা ও হোমাদি, দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই হাজার নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ, সন্ধ্যায় আরতি ও তৎপরে বালিকাবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীকালীকীর্তন হয়। ২২শে পৌষ এক সভায় বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেন।

হাফলং এ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম-শতবর্ষ মহিলা সমিতির উদ্যোগে এক অভূতপূর্ব ভাবগম্ভীর পরিবেশ ও আনন্দোল্লাসের মধ্যে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণে মহিলাসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা গিরীন্দ্রবালা দাস মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবন আলোচনা করেন।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে ১২ই পৌষ শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগর হাটখোলা নিবাসী শ্রীনিতাই চরণ মোদক মহাশয় এই আশ্রমে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র-নারায়ণ সেবা উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। বৈকালে একটি সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হয়। সভাপতি ছিলেন রায়সাহেব শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সাহা। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

ধ্যান

ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ।

তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি। অথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে।

অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি। ধ্যানমুপাস্স্বেতি।

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।৬।১

[বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গূঢ় মহান রূপটি কখনো উপলব্ধি করিয়াছ কি? সে রূপ তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রশান্তিতে, তাহার গম্ভীর মৌনে, অচঞ্চল আত্ম-স্থিতিতে।] চাহিয়া দেখ, সুবিস্তীর্ণা এই বসুন্ধরা যেন নিস্পন্দ ধ্যানের আসনে বসিয়া আছেন, অন্তরীক্ষও যেন ধ্যানমগ্ন, আবার অন্তরীক্ষের ঊর্ধ্বে যে দ্যুলোক—তাহাও যেন এক স্তব্ধ একাগ্রতার মূর্তি। জলে যেন ছাইয়া আছে স্তিমিত শান্তি, পর্বতসমূহ যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অপ্রকম্পা ধ্যানের বিগ্রহরূপে; দেবতুল্য মনুষ্যগণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে যেন অবিচলিত ধ্যানেরই মহিমা।

অতএব পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা ধ্যানসিদ্ধির কণামাত্র পাইয়া ঐরূপ শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহাদিগকে আমরা ক্ষুদ্র বলি তাহারা ক্ষুদ্র কেন? ধ্যানকে তাহারা গ্রহণ করে নাই বলিয়া। তাইতো তাহাদিগকে দেখিতে পাই কলহশীল, পরছিদ্রান্বেষক এবং অপরের দোষ-দুর্বলতার প্রচারকারী। সর্বশক্তির উৎস ধ্যানেরই কিঞ্চিন্মাত্র ফল আয়ত্ত করিয়া মানুষের যত শক্তি, যত কীর্তি, যত প্রভাব। শ্রেয়স্কামীদের ধ্যানই তাই হউক পরম অবলম্বন।

কথাপ্রসঙ্গে

বৃক্ষশাখায় ধর্ম

কলিকাতা হইতে রাণাঘাট এবং বহরমপুর হইয়া পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত উত্তরাভিমুখ যে প্রশস্ত রাজপথ কয়েক বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে তাহারই কোন এক অঞ্চলে, রাস্তা হইতে চার পাঁচ হাত দূরে অশ্বত্থ গাছটি দাঁড়াইয়া। দুই ফার্লং পূর্বে রেল লাইন - তাহারও প্রায় এক মাইল পূর্বে গঙ্গার উন্নত বাঁধ। পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। রাজপথে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক চলে উত্তর হইতে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ হইতে উত্তরে কৃষক, শ্রমিক, শহরের চাকুরে, দোকানদার পুরুষ স্ত্রী, তরুণ বয়স্ক। বাঁধের উপর দিয়াও নর-নারীর সারি আসিতে দেখা যায়, উহারা রেল লাইন ডিঙ্গাইয়া শস্যক্ষেত্রের আল ধরিয়া অশ্বত্থ গাছের গা ঘেঁষিয়া রাজপথে আসিয়া পড়ে। সমস্ত পথচারীই অশ্বত্থকে লক্ষ্য করে, তাহার বহুশাখায় বিপুল আয়তনের জন্য নয়, নিদাঘরৌদ্রে সুশীতল আশ্রয়ের জন্যও নয় লক্ষ্য করে বৃক্ষটির কাণ্ডে উপকাণ্ডে মানুষ নানা রংএর অসংখ্য কাপড়ের টুকরা দিয়া তাহার যে অভিনব শৃঙ্গার করিয়া দিয়াছে তাহারই জন্য। কতকাল হইতে কি বিশ্বাসে গাছটির শাখা-প্রশাখায় কত লোকে এই কাপড়ের নিশানা টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিতেছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, জানিতেও চাহে না। কিন্তু নূতন পুরাতন যাহারাই যায় তাহারাই এক টুকরা কাপড় বাঁধিয়া দিয়া যায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ইহা তাঁহাদের একটি ধর্মকৃত্য, অহিন্দুরা টিটকারি দিয়া যায়, 'হিঁদু'র ধর্ম কী অদ্ভুত!

পাথরপূজা ও গাছপূজা মানবসমাজের অতি আদিম কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তখন ঐ পূজার প্ররোচক ছিল অজ্ঞাত প্রাকৃতিক 'শক্তির ভয়। ব্যাধি-আরোগ্য, পুত্র-বিত্ত-খাদ্যশস্যাদি লাভ —এই সকল কামনাপূরণের জন্য মানুষ 'দেবতা'র তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করিত। তাঁহারা রুষ্ট হইলে তাহার নানা অনিষ্ট হইবে এই ভয় সর্বদা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু দেবতা সম্বন্ধে তাহার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না নদীর খরস্রোত, মেঘের গর্জন, অশনিপাত, রৌদ্র, বৃষ্টি, উন্নত পর্বত, বিশাল মহীরুহ এক কথায় যেখানেই শক্তির অভিব্যক্তি সেই সব কিছুতেই মানুষের নিজের অপেক্ষা শক্তিধর কাহারও সত্তা ও কার্য অস্পষ্টভাবে সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল। বহু শক্তি বহু দেবতা। বহু তাঁহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তাই তাঁহাদের তোষণরীতিও ছিল বিচিত্র।

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেবতার ধারণা বহু রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। পৃথক পৃথক দেবতার সংখ্যা কমিয়া বৃহত্তর ব্যাপকতর অখিল বিশ্বনিয়ামক এক দেবতার ধারণা আসিল। প্রাকৃতিক শক্তির অপেক্ষা আত্মিক শক্তির মূল্য অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। জ্ঞানময়, প্রেমময় আনন্দময় ভগবানকে তাহার নিজের চৈতন্যসত্তাকে ক্রমশঃ মানুষ আবিষ্কার করিল।

ধর্মের স্বরূপ, প্রয়োজন, ক্রিয়া ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেকার ইতিহাসকে আজ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবুও সে তাহার আদিম 'দেবতা-তোষণ'-সংস্কার ছাড়িতে পারে নাই। প্রমাণ মুর্শিদাবাদের রাজপথের ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ। যাহারা গাছের ডালে নেকড়া ঝুলাইয়া উহাকে এখনও ধর্মকৃত্যের সম্মান দেয় তাহাদের ধর্ম কোন্ পর্যায়ে? খুব উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চিতই নয়। তথাপি কিন্তু হিন্দুধর্ম বলে না, ঐ গাছটিকে এখনই কাটিয়া উড়াইয়া দাও, শাখা-প্রশাখা

হইতে লম্বমান নানা বর্ণের মলিন বস্ত্রখণ্ডগুলি টানিয়া, ছিঁড়িয়া জ্বালাইয়া দাও। মানুষ পৃথিবীরই মানুষ। অনেক তাহার কামনা, অনেক তাহার বিপদ বেদনা দুঃখ-অশান্তি। দৃষ্ট জগতের পরীক্ষিত সম্ভাবনাগুলি লইয়াই সর্বদা সে থাকিতে পারে না। অদৃষ্ট, অজ্ঞেয়ের জন্য তাই মাঝে মাঝে সে ব্যাকুল হয়। ভাবে, লৌকিক উপায়ে যে সকল বাসনা মিটল না, হয়তো অলৌকিক উপায়ে তাহা পূর্ণ হইতে পারে। তাই সে রাজপথে চলিতে চলিতে এক টুকরা নেকড়া অশ্বথের ডালে বাঁধিয়া করজোড়ে অজানা শক্তির উদ্দেশে আকুতি জানাইয়া চলিয়া যায়। দুর্বলতা! - কিন্তু হিন্দুধর্ম জানে, মানুষকে সবল হইতে সময় দিতে হয়।

কয়েক শতাব্দী পূর্বেও দেশের পল্লীতে পল্লীতে মানুষ গাছ-পাথরে সিঁদুর যেমন মাখাইত, তেমনি ধর্মজীবনের উচ্চতর সাধনা-সম্বন্ধেও সজাগ থাকিত। কথকতা, যাত্রা, নানাপ্রকার পূজা অর্চনা কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পল্লীর নরনারী ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইত। আজ সেদিন নাই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজের যেমন মর্মান্তিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় অতি-দরিদ্র ও অতি-ধনী একই সমাজে পাশাপাশি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঐরূপ শোচনীয় বৈপরীত্য প্রকট : বিচারহীন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী বৃক্ষশাখায় নেকড়া ঝুলাইয়া ফিরিতেছে, আবার সুসংস্কৃত বিদ্বন্মণ্ডলী ধর্মের কথা, দর্শনের কথা বিদগ্ধসমাজে আলোচনা করিতেছেন, প্রচার করিতেছেন। কোথাও একেবারেই অন্ধকার, আবার কোথাও উজ্জ্বল আলো! অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে বৈষম্য ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঐরূপ উদ্যম আনা প্রয়োজন। হিন্দুধর্মের মূল সত্যগুলি সহজ করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করা আবশ্যক আগেকার দিনের কথকতা, পাঁচালী, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতির মধ্য দিয়া - যাহাতে হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও গভীর হয়। তখন যদি অশ্বত্থগাছে সে কখনো নেকড়া ঝুলাইয়া দেয় তো, উহার যথার্থ মূল্য বুঝিয়াই করিবে উহাই ধর্মের সব এই অজ্ঞান তাহার থাকিবে না। তখনই সে সমালোচকদের টিটকারি সচেতনভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু তৎপূর্বে নয়। তৎপূর্বে রাজপথচারী শত শত সাধারণ হিন্দু নর নারীর হিন্দুত্বের মান ঐ 'বৃক্ষশাখায় ধর্ম' পর্যন্তই।

বিশ্লেষণ

কুম্ভমেলার মর্মান্তিক ঘটনার কথা সহজে ভুলিবার নয়। সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে উহা একটি গভীর শোক ও বেদনার রেখাপাত রাখিয়া গিয়াছে। কাহার ত্রুটিতে কি ধরনের অব্যবস্থায় শত শত নরনারীকে এমন অপ্রত্যাশিত প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য-নির্ধারক কমিশনের অনুসন্ধান শেষ হইলে জানিতে পারা যাইবে। ইতোমধ্যে নানা সাময়িক ও সংবাদপত্রে, তথা নানা সম্মেলনে লোকের মুখে বহু প্রকারের আলোচনা, বিতর্ক, অনুযোগাদি পড়িতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, নাগা সন্ন্যাসীরা কোন বিশেষ আচরণ দ্বারা প্রথম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিলে পরে অন্যান্য কারণে উহা বৃদ্ধি পায়। বহু প্রত্যক্ষদর্শী নাগাদিগের উপর কোন দোষারোপ করিতেছেন না। কেহ কেহ শুধু নাগা নয় সমগ্র সাধুসমাজ এবং সাধুদের শোভাযাত্রা ব্যাপারটিরই উপর দুর্ঘটনার জন্য পরোক্ষভাবে অনেকটা দায়িত্ব চাপাইতেছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে লক্ষ লক্ষ নরনারী একটা যুক্তিহীন আবেগের বশবর্তী হওয়ার দরুনই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল এবং ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা থাকিবে। এই সমালোচকগণ চান দেশের লোকের জীবন-দর্শনেরই সংশোধন - এমন একটা জীবন ধারার সৃষ্টি যাহাতে লোকে একটা অনুষ্ঠান-

মূলক ধর্মকৃত্যকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ মাতামাতি না করিতে পারে।

কোন বিশেষ দিনক্ষণে, কোন বিশেষ তীর্থসলিলে স্নান করিয়া বা সাধু মহাত্মাদের চলিয়া যাওয়ার পথের ধূলি স্পর্শ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় পুরাণে বা স্মৃতিতে বা অন্য কোন ধর্মপুস্তকে লেখা থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দুধর্মের উহাই যে একটি বড় কথা নয় তাহা উপনিষদ্ গীতাদি শাস্ত্র যাঁহারা পড়েন তাঁহারাই জানেন। প্রকৃত ধর্মজীবন এইরূপ কোন সংক্ষিপ্ত কৃত্যে গড়িয়া উঠিতে পারে না, উহার জন্য যে চাই বহু ত্যাগস্বীকার, সংযম, বহু সদ্‌ভাবনা ও বৃত্তির অনুশীলন তাহা প্রত্যেক হিন্দুশাস্ত্রে ঘোষিত। তবে এমন লোক আছে, হয়তো লক্ষ লক্ষই আছে, যাহাদের জন্য ঐরূপ আনুষ্ঠানিক কৃত্য প্রয়োজন—তাই হিন্দুধর্ম এই সকলকে উৎসাহ দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম মনুষ্যমনের বৈচিত্র্যকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এক এক মানুষ ধর্মসংস্কৃতির এক এক ধাপে দাঁড়াইয়া আছে—ওখান হইতেই তাহাকে তুলিতে হইবে, উন্নতির পথে লইয়া যাইতে হইবে। তাই কুম্ভমেলায় যাহারা স্নান ও সাধুদর্শন দ্বারা পুণ্যার্জন করিতে সমবেত হইয়াছিল শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণতম আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের ঘোষয়িতা ঋষিগণেরই সমর্থন তাহাদের সহিত আছে। তবে ঋষিগণ কখনো একথা বলেন নাই যে, ঐ স্নান করিয়াই থামিতে হইবে, উহাই ধর্মের সবটা। প্রকৃত ধর্ম যে উহা হইতে অনেক দূর তাহা তাঁহারা অবিসংবাদিত ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখাইয়াছি 'বৃক্ষশাখায় ধর্ম' ধর্মের মর্ম না জানিয়া করা যায় (শত সহস্র পথের লোকের মতো), আবার জানিয়াও করা যায় [নিজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল (?) মুহূর্তে]। কুম্ভস্নানের ক্ষেত্রেও এই দুই শ্রেণীর লোক আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। উভয় শ্রেণীর প্রতিই আমাদের সহিষ্ণুতা থাকা উচিত—তবে যাঁহারা হিন্দুজাতিকে ভালবাসেন, হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য কিছু করিতে চান তাঁহাদিগের একটি কর্তব্য সুস্পষ্ট। অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট ধর্মের মূল সত্য তাহাদের মতো করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে যাহাতে কুম্ভস্নানার্থীদের মধ্যে যাহারা পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোক কোন উচ্চ আদর্শ বা ভাববিহীন গতানুগতিক একটি আচারকেই ধর্ম বলিয়া যাহারা মনে করে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া আসে।

কুম্ভস্নানার্থী জনগণের কোন দল একটি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন কি ? যাঁহাদের কুম্ভমেলা দর্শন ও কুম্ভকৃত্য নিছক একটি লোকাচার নয় অথবা যাঁহারা এমন লোকের মধ্যেও পড়েন না যাঁহাদের ধর্মের উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা-সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পুণ্যলাভের আকর্ষণ যায় নাই ? হাঁ, এমন একটি শ্রেণীরও অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যে সকল সাধুসন্ত বা গৃহস্থ ভক্ত সাধনমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, জীবনে জ্ঞান-ভক্তি কিছুটা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতই 'পাপক্ষালন' বা 'পুণ্যার্জনে'র কথা ভাবেন না। তাঁহারা কুম্ভে যান ভগবদ্ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনার জন্য। সাধুসন্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন ও সান্নিধ্য নিষ্কাম অধ্যাত্ম-সাধনারই অন্তর্গত। সহস্র সহস্র লোক যেখানে ভগবানের নামে ও চিন্তায় একত্র হইয়াছে সেখানে জীবন্ত তীর্থের আবির্ভাব ঘটে।

যাঁহারা পুণ্য বা সাধুসঙ্গ বা জ্ঞান ভক্তি বা 'ধর্ম' লইয়া মাথা ঘামান না, তাঁহাদেরও কুম্ভসম্মিলনে যাওয়ার একটা সার্থকতা আছে। ভারতের নানা অঞ্চল হইতে নানা ভাষাভাষী, নানা আচারব্যবহার-যুক্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী একটি জায়গায় মোটামুটি একই উদ্দেশ্যে জমা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের একটা অন্তরপরিচয়, অর্থাৎ সরল ভাষায় ভারতের নাড়ীর পরিচয় ঐ স্থানে পাওয়া যায় না কি ? যদি কেঁচো খুঁড়িতে সাপই বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে যদিই ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই

বিরাট জন-সম্মিলনের একটা বৃহৎ অংশের মন ধর্ম-নামক কুসংস্কারকে ভীষণ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে তাহা হইলেই বা ভয় কি ? স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতার (Angels Unawares) এই পঙক্তিগুলির কথা মনে পড়িবে

** The 'Sages'
Winked, and smiled,and called it
'Superstition.'
But he did feel its power and peace
And gently answered back—
'O Blessed Superstition !'

[ভাবার্থ : 'বিজ্ঞ' লোকেরা ভুরু কুঁচকাইয়া, চক্ষু মিট্ মিট্ করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া রায় দিলেন, উহা 'কুসংস্কার'। সে কিন্তু উহার শক্তি ও শান্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। বিজ্ঞদের কথার জবাবে মৃদুস্বরে শুধু এই টুকু বলিল,—'অহো ! পরম ঈপ্সিত কুসংস্কার !']

বঙ্গসংস্কৃতি

বাঙ্গালী ভারতীয়, আবার বাঙলার মাটির লোকও। বৃহৎ ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শের সহিত যেমন তাহাকে তাদাত্ম্য বোধ করিতে হইবে তেমনি বাঙ্গালী চরিত্র, ভাব ও জীবনধারা হইতে কোন সময়েই তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী ভারতীয়ত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়াও কোথায় যথার্থ বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ও অনুভূতি রাখা প্রয়োজন, বিশেষতঃ জীবনের বহুক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই দুঃখকর অপমান ও পরাভবের দিনে। প্রাদেশিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ যে 'প্রাদেশিকতা' নয় তাহা দেশের অনেক নেতা এবং বুধমণ্ডলী স্বীকার করিতেছেন।

গত ২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত এগারো দিন কলিকাতার মহম্মদ আলী পার্কে যে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন হইয়া গেল উহার উদ্দেশ্য এবং কর্মধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালীত্ব-বোধ প্রকাশ পাইয়াছে। আজকাল 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' অর্থেই কিছু নাচ, কবিতা আবৃত্তি ও কান্নার সুরে কিছু 'মর্ডার্ণ' সঙ্গীত পরিবেশন বুঝায় বাঙ্গালীর সুচিরলব্ধ জীবন-সংস্কৃতির কতটুকু পরিচয় ঐ সকল অনুষ্ঠানে মিলে তাহা বলা কঠিন। আলোচ্য বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। উদ্যোক্তারা তাঁহাদের বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সত্যই বঙ্গসংস্কৃতির একটি ব্যাপক রূপ দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই, বাঙলাদেশ মানে শুধু কলিকাতার শহর নয়, আর সংস্কৃতি মানে শুধু নৃত্য আর গীত নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম এ সকলই সংস্কৃতির এক একটি প্রকাশ। বিশিষ্ট মনীষিগণ বিভিন্ন দিনে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতার মধ্য দিয়া এই এক একটি দিকের সরস শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করিয়াছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য প্রভৃতি শহরের বাঙ্গালীদের নিকট বাঙলার একটি অভিনব প্রাণ-পরিচয় উপস্থিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সম্মেলনে অবশ্যই অনেক ত্রুটি ছিল (এই প্রথম বর্ষের প্রচেষ্টায় তাহা স্বাভাবিকই)। বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয় বলিতে পরিকল্পিত কর্মসূচি ছাড়া আরও অনেক কিছু বুঝায়। তবুও উদ্যোক্তৃগণ এবারকার প্রচেষ্টায় যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

টুকরা স্মৃতি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্‌-এ

খ্রীঃ ১৯১০ সালে জয়রামবাটীতে প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই। চার বন্ধুতে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। এই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ অন্য একটি লেখায় * ইতঃপূর্বে বলিয়াছি। এখানে কয়েকটি টুকরা স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বিষ্ণুপুর হইতে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া প্রায় তিন রাত্রি অনিদ্রার পর আমার গভীর নিদ্রা হইল এবং আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখিলাম যাহা এই বিয়াল্লিশ বৎসর পরেও আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত আছে সুস্পষ্টভাবে। কত স্বপ্নই তো দেখিয়াছি ও ভুলিয়াছি, কিন্তু এ স্বপ্ন আজও ভুলিতে পারি নাই। দেখিলাম (বোধ হয়) একটি লাল বর্ণের মেজেতে, একটি দ্বিতল কক্ষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বসিয়া আছেন ও দুইজন সন্ন্যাসীও আছেন। ইহার পূর্বে আমি মাতাঠাকুরাণীকে চর্মচক্ষে কখনও দেখি নাই। এই গাঢ় নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শনের কালে আমার শরীর ও মন যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল সব পুঞ্জীভূত ক্লেশ ও অবসাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। তাহার পর জয়রামবাটী আসিয়া দেখি সেখানে বাস্তবিকই দুই জন সাধু শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী এবং পূজনীয় নির্মল মহারাজ উপস্থিত আছেন। এ ব্যাপারটিকে অলৌকিকের পর্যায়ে হয়তো ফেলা চলে।

জয়রামবাটী আসিয়া আমরা শ্রীমার সঙ্গে যেরকম স্বাধীনতা নিয়াছি, এরূপ অসঙ্কোচ ব্যবহার পরে উদ্বোধনের বাটীতে সম্ভব হয় নাই। আমার সঙ্গিত্রয়ের একজন ৺প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় যতদূর মনে হয় ৺রামলাল দাদার নিকট হইতে ঠাকুরের একটি ভুবন-মনোহর নৃত্য-ভঙ্গী শিখিয়াছিলেন। প্রফুল্ল সুকান্তি সুপুরুষ ছিলেন; তখন তাঁহার বয়স মাত্র সাতাস কি আটাস হইবে। তাঁহার মনেরও আনন্দ অতুলনীয়-প্রায়। তিনি মায়ের সেই বহিঃপ্রকোষ্ঠে ঠাকুরের সেই ত্রিলোক-অভিরাম নৃত্য এমন মোহন ঠামে অভিনয় করিলেন যে সকলেই একেবারে অবাক! আর ভানুপিসী সরলা বিধুরা ভানুপিসি এই অদৃষ্টপূর্ব আনন্দনৃত্য দর্শনে আনন্দবিহ্বল হইয়া বিমুগ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা, এমন আনন্দ তো দেখি নি।" তাঁহার সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি এবং সমাহিত-প্রায় ভাব আমার মনে এখনও জাগিয়া আছে।

ভানু পিসী! এই দুইটি কথার ভিতরে কত না মাধুরী, কতনা স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। যেন মন্ত্রপূত এই নামটি। শ্রীরামচন্দ্রের শবরীর মত, শ্রীকৃষ্ণের ফল-বিক্রয়িণীর মত এই অশিক্ষিত-পটীয়সী, আক্ষরিক বিদ্যায় গরীয়সী না হইয়াও অমল ভগবৎপ্রেমে মহীয়সী এই গ্রাম্য মহিলা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর লীলাসহচরীরূপে এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অশেষ কৃপা পাত্রীরূপে চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন। বয়সে অধিক হইলেও 'রসেশ্বরীর' প্রসাদে ইনি ছিলেন একটি ভগবৎ-প্রেমিকা রসিকা বালিকা। ছোট-খাটো মানুষ, চোখে চশমা, আমাদের ভানুপিসী কত কথাই না অনর্গল বলিয়া যাইতেন— ঠাকুরের কথা। ব্রহ্মানন্দ যে কি তাহা শতবাসনাবাসিতচিত্ত মানবের কল্পনাতীত। কিন্তু এই যে ভানুপিসী যিনি একরকম সর্ববিধ পার্থিব সম্পদ হইতে বঞ্চিতা, পতিহীনা, কন্যাহারা, দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিতা, বর্তমান শিক্ষার আলোক অপ্রাপ্তা, যেন বিধাতা কর্তৃক সর্বতোভাবে অভিশপ্তা এই যে সদ্গোপ বরললনা, তাঁহার এই অপার্থিব প্রেম, পরা ভক্তি,

* উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৯—'একটি ভাগবত জীবন'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আসিল কোথা হইতে? শত শত শাস্ত্র অপেক্ষা কি এই রকম জলন্ত দৃষ্টান্ত 'দৈবীসম্পদ' ও ভগবদ্ভক্তিযোগের মহিমার অস্তিত্ব প্রকটিত করে না? এই রকম অনেক ভগবদ্ভক্ত নারী ও পুরুষ অলক্ষিতে এখনও ভারতে বাস করিতেছেন ও করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নানাবিধ বাদবিতণ্ডার মধ্যেও ভারত-ভারতী এখনও জীবিতা আছেন। জাতিতে সদ্গোপ হইলেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর এই নর্মসখী সমস্ত জাতির গণ্ডীর পারে। আমি গান গাহিতে জানিতাম। শ্রীশ্রীমাকে শুনাইয়া বোধ হয় এই দুইটি গান গাহিয়াছিলাম: 'আদর করে হৃদে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' আর 'করুণানয়নে চাও গো মা।' সঙ্গীত সমাপ্ত করিবার পর বোধ হয় মা আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার কানের কাছে আঙ্গুল লইয়া (এমন স্পর্ধা আমার!) জিজ্ঞাসা করিলাম,—"(এই গান) কানে কি ঢোকে?" সুপ্রসন্নবদনা মাতাঠাকুরানী অমনি বলিয়া উঠিলেন, "হৃদয় ভেদ করে যাচ্ছে। তুমি গানে সিদ্ধ হবে।" আহা! শুনিয়া যে কি আরাম পাইলাম তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। কথা দুইটি অক্ষয় কবচের মতো আমার বুকে এখনও (পঁচাত্তর বৎসর বয়সে) গাঁথা আছে।

ইহার পর আরও অনেকবার মাতাঠাকুরানীকে উদ্বোধনে দেখি। কিন্তু সেখানে শ্রীশ্রীমাতা রাজেশ্বরী-দ্বারপাল ও দ্বারপালিকাদ্বারা সতত বেষ্টিতা! সেখানে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার বা কথা কহিবার সুযোগ ঘটে নাই। মাতাঠাকুরানা অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া পদকমল অনাবৃত রাখিয়া দ্বিতল কক্ষে পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রণাম করিয়া এই ভাবে নিবেদন করিতাম "মা, কিছু যে হচ্ছে না।" অভয়া অভয় দিতেন "হবে! হবে।" এই পর্যন্ত। তাহার পরেই নামিয়া আসিতাম, কেন না একাধিক জানা অজানা লোক সর্বদাই বর্তমান।* আমার সহধর্মিণী শ্রীমার নিকট দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্বোধনে যাই ও শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করি, "মা, এ কি বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?" উত্তরে তিনি বলেন,—"বিদ্যেশক্তি! তা নইলে কি তোমাদের ঘরে এসেচে?" আরও সামান্য একটু কথাবার্তা হয়, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।

অনেক বৎসর পূর্বে যখন বেলুড় মঠে ৺দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়—যতদূর মনে পড়ে সেবারে মাতা ঠাকুরানা মঠে পদার্পণ করেন। সন্ন্যাসী ও ভক্ত-পরিবেষ্টিতা মা এখানে রাজরাজেশ্বরী। মনে হয়, সেইবার দেখিলাম পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আনন্দোচ্ছ্বাস। তাহা বোধে বোধগম্য—কিন্তু অবর্ণনীয়। বাবুরাম মহারাজের সেই রক্তিমাভ গৌরবর্ণ ভাবসমুজ্জ্বল মনোহর বদনমণ্ডল ও রক্তাক্ত নেত্রযুগল যেন আনন্দে ফাটিয়া পড়িতেছিল। শরৎ মহারাজ আসিয়াছেন উদ্বোধন হইতে—ধীর, স্থির, গজেন্দ্রসদৃশগম্ভীর। তিনি সবে স্বামীজীর ভবনের এক তলায় পশ্চিম দিক হইতে পদসংলগ্ন করিয়াছেন, অমনই কোথা হইতে যেন ছুটিয়া আসিয়া বাবুরাম মহারাজ ঢিপ করিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার মন ও বাক্য যেন সম্মিলিত হইয়াও অন্তরের উদ্বেল আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। যতদূর মনে আছে, তিনি আনন্দ-মণ্ডিত চঞ্চল হাস্যে একেবারে বালকের মত বলিলেন —"দাদা! কি আনন্দ অ্যাঁ!" কথা সামান্যই ও স্বল্পই, কিন্তু বস্তু অসামান্য ও অনল্প—বর্ণনাতীত। গম্ভীর শরৎ মহারাজেরও সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিল; কিন্তু তাঁহার অভিব্যক্তি অন্যবিধ। বাবুরাম মহারাজের এই উচ্ছলিত আনন্দে তাঁহার জলধিতুল্য ভাবগম্ভীর আনন একটা দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সংলাপশূন্য দিব্যানন্দের ছবি ধ্যানের বিষয়, বর্ণনার নহে।

শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দজী) কিন্তু নানাবিধ ভক্তের এই যে "মা" "মা" করিয়া নানা

আবদার, তাহা তেমন পছন্দ করিতেন না। তিনি একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম এই : স্বামী বিবেকানন্দ মাঠাকরুনের সামনে সসম্ভ্রমে হাত জোড় ক'রে থাকতেন। আর সব আদুরে বুড়ো লোকের দল "ম্যা" "ম্যা" বোলতে অজ্ঞান। হয়তো এই শ্লেষের মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল; কিন্তু এ কথা সত্য যে, জয়রামবাটীতে মাতাঠাকুরানী প্রায় সব শ্রেণীর ভক্তকেই যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের মনপ্রাণ চিরজনমের মত কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

একটি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া এই টুকরা স্মৃতি শেষ করি। আমার অনিদ্রা রোগ আছে। এমন অনেক রাত্রি গিয়াছে যখন কিছুতেই নিদ্রা আসে না। তখন "মানসোত্তেদতীর্থের" মতন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর স্নিগ্ধ মূর্তিটি ভাবিতাম—আর ভাবিতেই নিদ্রা আসিত।

শ্রীশ্রীসারদা সরস্বতী

(পাচালী)

শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী

জয় মা সারদা মাতা তুমি বাগ্‌দেবী,
পূজিলে তোমায় হৃদে ফোটে জ্ঞানরবি।
অবিদ্যা আঁধারে ডুবে আছে এ সংসার,
জ্ঞানালোক দানি সবে করহ উদ্ধার।
জ্ঞানের অভাবে লোকে দুঃখ কষ্ট পায়,
তোমার না হলে কৃপা কি হবে উপায়।
না পড়িয়া বই পুঁথি অনায়াসে হাসি,
ঢালিলেন রামকৃষ্ণ জ্ঞান রাশি রাশি।
তুমি মা সঙ্গিনী তাঁর হয়ে অধিষ্ঠান,
তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর করি কৃপা দান।
ঠাকুর কহেন তোমা "ও যে সরস্বতী,
রূপ ঢাকি জ্ঞান দিতে এল বুদ্ধিমতী।"
জ্ঞানের আশায় সবে আসি দলে দলে,
কৃপাকণা মাগি লয় পড়ি পদতলে।
যাগ যজ্ঞ করি যাহা পাওয়া নাহি যায়,
তোমার কটাক্ষে তাহা অনায়াসে পায়।
সরস্বতী-রূপে মাগো আস ধরণীতে,
দেশময় সাড়া জাগে তোমারে পূজিতে।
আমের বউলে যবে ঘেরে চারিধার,
কুল পাকি গাছে গাছে হয় একাকার।
মাঠে মাঠে পাকা ধান কাটা রাশি রাশি,
প্রকৃতির মাঝে ফোটে মা তোমার হাসি।
পলাশের গাছে গাছে রাঙা রাঙা ফুলে,
তোমার চরণ যেন দোলা পরে দোলে।
ঘরে ঘরে ও চরণে "নমোহস্তুতে" বলি'
রাশি রাশি গাদা ফুলে দেয় পুষ্পাঞ্জলি।
স্বরূপ লুকায়ে এবে এলে যে ধরায়,
যে ডাকে একান্তে তোমা সে তোমায় পায়।
তোমার চরণ যেবা করেছে স্মরণ,
ধন্য হয়ে গেছে তার এ নর জীবন।
তোমারে স্মরিয়া আজি কত শত নারী,
হইতেছে দিন দিন জ্ঞানের ভাণ্ডারী।
দিনে দিনে হইতেছে অবিদ্যার নাশ,
আঁধারে হেরিছে সবে আলোর প্রকাশ।
শাস্ত্র আদি ভুলি করে অশাস্ত্রীয় কাজ,
বিশৃঙ্খলা এসেছিল সমাজের মাঝ।
তুমি মা করিলে রক্ষা ধরাতে আসিয়া,
তোমার আদর্শে সব উঠিছে গড়িয়া।
মহাবিদ্যা তুমি মাতা আদ্যাশক্তি মানি,
সুখদা বরদা বাণী দেবী বীণাপাণি।
শ্যামবর্ণা স্মিতহাসা মধুরভাষিণী,
সারদা জননী তুমি কলুষনাশিনী।
অবোধ সন্তান তব না চিনে তোমায়,
শতেক-জয়ন্তী দিনে রাখ দু'টি পায়।

চিত্তের প্রশান্তি*

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

বর্তমানের বিপদ-সংকেত

আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা দেশবিদেশের দূরত্ব কমাইয়া দিয়াছে এবং পৃথিবীর নানা লোক ও জাতিকে অভূতপূর্বভাবে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। এইজন্যই কোন একটি দেশের বা মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যকার আলোড়ন হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী অপর দেশের অধিবাসীদিগকেও আজকাল দ্রুত বিচলিত করিয়া তুলে। বর্তমান কালে নানাপ্রকার বিরোধ ও সংঘর্ষ তাই, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ভয়ঙ্কর উত্তেজনা বা উগ্র মানসিক চাপের সৃষ্টি করিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে ক্যানসার রোগের অপেক্ষাও ভীষণতর বলিয়াছেন। এই উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান গতিতে বিশ্ববাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মনকে ধরিতে হইবে

জীবনে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে গেলে কিছু পরিমাণে স্নায়বিক উত্তেজনার প্রয়োজন হইতে পারে। এমন কি, আমাদের দেহে ও মনে স্নায়বিক রোগের ঝোঁকগুলিও যাহাতে সুশোধিত হইয়া পরিণামে আমাদের কল্যাণকর কাজে লাগে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনাগুলিকে কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে রূপান্তরিত করা যায় তাহার যথাযথ জ্ঞানের অভাব আমাদের সমসাময়িক বাতিকগ্রস্ত সমাজে ভাব-প্রবণ অস্থিরচিত্ত লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। জনৈক মনস্তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক বলিয়াছেন, আমরা যে আমাদের মনকে প্রয়োজনমত শান্ত ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিনা—এই অক্ষমতাই ক্রম-বর্ধমান মানসিক ব্যাধির নিদান। আর মানসিক ব্যাধি হইতেছে "আমাদের সভ্যতার সর্বাপেক্ষা অধিক-প্রসারী কিন্তু সর্বাপেক্ষা কম-স্বীকৃত ব্যাধিগুলির মধ্যে অন্যতম।" যে বায়ু-পরিমণ্ডলে আমরা বাস করিতেছি, উহা যেন আমাদের দেহ, স্নায়ু ও মনের পক্ষে অনিষ্টকর স্পন্দনসমূহে পরিপূর্ণ! তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, বহুসংখ্যক ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানী 'শ্লথন' (Relaxtion) বা মনকে আলগা করিবার অভ্যাসের দ্বারা মানসিক চিকিৎসার আবশ্যকতা ক্রমেই স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ধ্যানেরও মূল্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজের মতো করিয়া কোন না কোন প্রকারের ধ্যান অভ্যাস করা, কেন না, ধ্যানই চিত্তের সজীবতা ও বিশ্রাম আনে, ভাবী প্রয়োজনের নিমিত্ত শক্তিকে সঞ্চিত রাখে এবং জীবনকে সুসমঞ্জস ও স্থিতিস্থাপক রাখিতে সহায়তা করে।

কিন্তু অশান্ত মনকে সংযত করা খুবই কঠিন। মনে পড়ে, আমাদের একজন তাঁহার ছাত্রাবস্থায় পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার মন এখনও বড় চঞ্চল। কি উপায়ে একে শান্ত করা যায়? প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমি যেন একটুও এগুতে পারছি না। সব চেষ্টাই ভুয়ো মনে হচ্ছে।" মহারাজজী উত্তর দিলেন, "তাতে দুঃখের কিছুই নেই। ধ্যানের ফল অবশ্যম্ভাবী। যদি তুমি ভগবানের নামজপের সঙ্গে নিয়মিতভাবে

* Vedanta for East and West পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপক শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত।

একটি সহজ ধরনের ধ্যান অভ্যাস করতে থাক, তা হ'লে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে। প্রথম প্রথম ধ্যান তো মনের সঙ্গে যুদ্ধের মতোই মনে হবে। * * * প্রথম দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন ধ্যান করতে গিয়ে মস্তিষ্ককে অতিমাত্রায় পীড়ন না কর। চেষ্টাকে ধীরে ধীরে বাড়াতে থাক, তা হলে দেখতে পাবে ক্রমে মন শান্ত হয়ে আসছে। তারপর অনেকক্ষণ ধ্যানে বসে থাকলেও ক্লান্তি অনুভব করবে না। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে এবং গাঢ় ঘুমের পর শরীর ও মনে নিজেকে যেমন সজীব অনুভব কর, সেইরূপ করতে থাকবে। কিছু দিন পরে তীব্র আনন্দের অনুভূতি আসবে। * * * শরীর ঠিক না থাকলে, মনও চঞ্চল হয়। কাজেই, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। রিপুগুলিকে আয়ত্তে রাখতে হবে। ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মন স্থির না হলে ধ্যান হয় না। মন স্থির হলে ধ্যান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনও ধ্যান করা হবে না।"

মন কি ? —পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী

মন কি ? এক সময়ে অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মনে করিতেন যে, মন জড়েরই একটি প্রতিভাস, মস্তিষ্কের এক স্পন্দনবিশেষ। যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত-ক্ষরণ হয় —মস্তিষ্ক হইতেও তেমনি চিন্তা 'নিঃসৃত' হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শরীরের উপর মনের প্রভাব বিষয়ে অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। মন মস্তিষ্কের সহোৎপন্ন পদার্থমাত্র—এই মতকে তাঁহারা অপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের যোগ মাত্র নয়, কিন্তু একত্র-সংহত দেহচিত্তাত্মক।

যে সকল মনোবিজ্ঞানী কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতিরেকেও মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত যন্ত্রণা লাঘব করিতে সমর্থ, আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁহারা যে সকল সমস্যা লইয়া কারবার করেন, তাহাদের বেশীর ভাগই যে প্রকৃত পক্ষে অধ্যাত্ম-সম্পর্কিত, এ কথা বিখ্যাত মনোবিদ্ ডাক্তার জাঙ্ (Jung) স্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই সুখের বিষয় যে, জীবনে যাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম-দৃষ্টি নাই এমনও কতকগুলি মানসিক পীড়াগ্রস্ত লোককে শারীরিক ও মানসিক সামঞ্জস্যে ফিরাইয়া আনা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমান মনঃসমীক্ষার প্রণালী দ্বারা সম্পাদিত এই সামঞ্জস্য অহং-কেন্দ্রিক—ইহার কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই এবং উহা স্থায়ী না হইবারই সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর পূর্বে ডাক্তার জাঙ্ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকগণের পারস্পরিক সহযোগিতায় মানুষের মানসিক ব্যাধি লাঘবের চেষ্টা করা উচিত।

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গী

হিন্দুরা মানব-ব্যক্তিত্বকে সংহত দেহ-চিত্তাত্মক-রূপে দেখেন না। তৎপরিবর্তে, তাঁহারা দেহকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আধার বা যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন চক্ষু দর্শনের, নাসিকা ঘ্রাণের ও কর্ণ শ্রবণের যন্ত্র বিশেষ। উপনিষদে আছে,—"আত্মাই বিজ্ঞাতা", "চিত্ত ভাগবত চক্ষু"—জ্ঞানের যন্ত্র-স্বরূপ। মানুষের ব্যক্তিত্ব জিনিসটি বস্তুতঃ বড়ই জটিল। মানুষ যথার্থ-স্বরূপে আত্ম-চেতন আধ্যাত্মিক সত্তা, পরম পুরুষের শাশ্বত অংশ-বিশেষ। এই ব্যষ্টি-আত্মা বা জীবাত্মা মন- ও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-শরীরে অবস্থিত এবং স্থূল দেহে আবৃত; কিন্তু বিশ্ব-আত্মা বা পরমাত্মা এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র।

মন স্পন্দনাত্মক সূক্ষ্ম পদার্থ। ভগবদ্গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন যে, মন চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ ও দৃঢ়। এই মনের নিগ্রহ বায়ুর নিগ্রহের মতোই সুদুষ্কর। শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, মন চঞ্চল এবং ইহাকে সংযত করা কঠিন, সন্দেহ নাই;

কিন্তু ইহাকে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তে আনা যাইতে পারে, আর ইহার মূল উপায় বৈরাগ্য বা অনাসক্তি।

দেহকে জলাবর্ত ও মনকে ঘূর্ণিবায়ুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অথবা, পতঞ্জলির ভাষায়, একটি স্থিরবক্ষ সরোবরে ঢেউ উঠিলে যেরূপ হয় চিত্তেরও তাহাই রূপ। বাহিরের দ্রব্য বা ভাব বহিরিন্দ্রিয়গণকে উদ্রিক্ত করে, এই ইন্দ্রিয়গুলি আবার অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ ও জীবাত্মাকে প্রভাবিত করে। তারপর তরঙ্গাকারে প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে পরস্পর পৃথক্ করা যায় না। প্রত্যেক চিত্ততরঙ্গে এই তিনটি অংশের সব কয়েকটিই কম-বেশী বর্তমান থাকে। মোট তরঙ্গটির স্বরূপ উহার প্রধান অংশের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তরঙ্গগুলি প্রবলতরভাবে মস্তিষ্ককে আঘাত করিলে চিন্তা এবং হৃদয়কে আঘাত করিলে অনুভূতি উদ্ভূত হয়। ইচ্ছার বেলায় প্রতিক্রিয়াটি এই দুইয়ের মাঝামাঝি সীমাবস্থায় থাকে। চিত্ত-গুহাশায়ী আত্মা প্রতি-নিয়তই এই চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার তরঙ্গ-পরম্পরার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন। কতিপয় আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতেছেন যে, তাঁহাদের রোগীদের গোলযোগের কারণ সাধারণতঃ এই সকল চিত্ত-তরঙ্গের সহিত একাত্মতাবোধ। কিন্তু এখনও তাঁহাদের অধিকাংশই মনকেই মূল বলিয়া ধরিয়া আছেন এবং মনকে স্ব-চেতন সত্তা বলিয়া মনে করেন।

পক্ষান্তরে, হিন্দু-মনীষীরা আত্মিক চৈতন্যকেই মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, মনও একটি 'কোষ'মাত্র এবং ইহা আত্মাকে আবৃত করে। অথবা, মনকে আত্মার পরিধেয় বস্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অপ্রবুদ্ধ অবস্থায়, আত্মা নানাপ্রকারের গোচরীভূত ও অনির্জ্ঞাত সংস্কারের সহিত ঐক্যবোধ করিয়া থাকে, আর এই সংস্কারগুলি চিত্তসরোবরকে কলুষিত ও আলোড়িত করে। আত্মাকে সব সময়ই অশান্ত তরঙ্গমালার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হয়। আমাদের জাগ্রদবস্থায় এই তরঙ্গগুলি সর্বক্ষণই উঠিতে থাকে। কল্পনার জগতেও আমরা আবেগ ও স্মৃতির মাধ্যমে তাহাদের সহিত তাদাত্ম্য বোধ করি। এই সমুদয় চিত্ত-তরঙ্গ হইতে নির্মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিতে ও উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, কিন্তু ইহা অতি দুঃসাধ্য কার্য।

কখনো কখনো সম্ভবতঃ জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা-বশতই, মন এক ধরণের নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, বেশীর ভাগ সময়েই, মন বানরের ন্যায় কোন না কোন নূতন বস্তুর পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ছুটাছুটি ও লম্ফঝম্প করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "মানুষের মন বানরের মতো স্বভাবতই অবিশ্রান্ত চঞ্চল; আবার, ইহা বাসনা-সুরায় মত্ত হইয়া আরও অস্থিরভাব ধারণ করে। মন বাসনাধীন হইবার পর অপরের সাফল্য দেখিয়া ঈর্ষ্যার বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করে। সর্বশেষে, মনের মধ্যে অহংকাররূপ পিশাচ প্রবেশ করায়, মন নিজেকেই সর্বপ্রধান বিবেচনা করে। এরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!" আমাদিগকে এই সকল উন্মাদনা, বিষ ও অসুরের কবল হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

মানসিক শক্তির অপচয় বন্ধ করিতে হইবে

আবার, মনকে একটি ক্ষিপ্ত দুষ্ট হাতীর সঙ্গে অথবা মেঝের উপর ছড়ানো এক রাশি সর্ষপ-বীজের সঙ্গেও তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু, যে সকল আলোক-রশ্মি কোন বস্তুতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, মনকে তাহাদের সহিতও তুলনা করা চলিতে পারে। দিবা-রাত্রির প্রতিক্ষণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে মানসিক শক্তির ক্ষয় হইতেছে। সময় সময়, যখন আমরা

শক্তির অভাবের অভিযোগ করি, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ফলে এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মনের যথেচ্ছ ছুটাছুটির দরুণ আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছি। ধ্যান বা উহার অনুরূপ কোন নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে মনকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিতে না শিখিলে আমাদের মানসিক শক্তির ক্রমশঃ অপচয় হইবেই,—আর তাহার ফলে, তেজ ও শান্তি, উভয়ই নষ্ট হইবে।

মানুষ নিজের টাকা পয়সা খরচ সম্বন্ধে কত সাবধান অথচ যে সকল মানসিক ক্ষমতা ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে এতটা উদাসীন!

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে মানসিক ক্ষমতার অপচয় বিষয়ে এই বলিয়া নিষেধ করিতেন, "মনের রাশ ছেড়ে দিওনা, ওকে তোমার সঙ্গে ও আয়ত্তে রেখো।"

কোন ভদ্রলোক একবার তাঁহার পীড়িতা পত্নীর চিকিৎসার জন্য জনৈক মন-সমীক্ষকের শরণাপন্ন হন। জিজ্ঞাসাবাদের পর চিকিৎসক বলিলেন,—"দেখছি, এঁর মন বলে আর কিছু নেই।" ভদ্রলোকটি মন্তব্য করিলেন,—"আমি তাতে একটুও আশ্চর্য হচ্ছি না। উনি এই কুড়ি বছর ধরে টুকরো টুকরো করে মনের বাজে খরচ করে এসেছেন।"

এই ভাবেই আমরা মনের ক্ষমতাগুলিকে হেলায় ফেলায় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। এতই বেপরোয়া আমাদের এই মানসিক অপচয় যে, আমরা সকলেই যে কেন উন্মাদাশ্রমে যাই নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এখন হইতেই আমাদের মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক লোকের এই অপচয় ও ক্ষতি এবং এই শক্তির অপপ্রয়োগের কথা বুঝিতে শেখা উচিত। আমরা ঠিক যে ভাবে কর্ষিত জমি হইতে সেচের জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে না পারে সেজন্য সমস্ত মূষিকের গর্তগুলি বন্ধ করিয়া থাকি, ঠিক সেইভাবেই আমাদিগকে মনের অপচয় নিবারণের উপায় বাহির করিতে হইবে এবং আমাদের মানসিক শক্তি-সমূহকে আধ্যাত্মিকতার পথে চালিত করিতে হইবে।

নোঙর ফেলিয়া নৌকা টানা

এই অপচয় নিবারণের নিমিত্ত পরিকল্পিত সকল প্রকার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে অনাসক্তি অভ্যাস করা। জনৈক মহিলা কিছুতেই উপাসনায় মন স্থির করিতে পারিতেন না, কেননা, সহোদরা ভগিনীর উপর ছিল তাঁহার বিষম ঘৃণা; অর্থাৎ মহিলার মনটি ছিল যেন নোঙরা-ফেলা নৌকার মতো।

কোন সময়ে একদল মাতাল নৌকা বিহার করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল। প্রাণ ভরিয়া মদ্য পান করিবার পর তাহারা একখানি নৌকায় আরোহণ করিল এবং নেশা ছুটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত্রি ধরিয়া একই ভাবে দাঁড় চালাইয়া গেল। তাহার পর, ঊষার আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহারা সেই একই জায়গাতে আছে, এক ধাপও অগ্রসর হইতে পারে নাই, কেননা তাহারা নোঙরটি তুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল! ঠিক সেই রকম, নৈতিক পরিশীলন ভিন্ন কোনও আধ্যাত্মিক সাধনাতেই আমরা অগ্রসর হইতে পারি না। এইজন্যই, যে গুরু যোগবিষয়ে শিক্ষা দেন, তিনি আসন, প্রাণায়াম বা ধ্যানের রূপ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিবার পূর্বে অন্তত ন্যূনতম মানসিক শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। এই চিত্তশুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন 'উদ্‌গতি' (Sublimation) আর মরমীরা (mystics) বলেন 'পাপক্ষালন' (Purgation)।

লক্ষ্য

এই অত্যাবশ্যক প্রথম ধাপ পার হইলে তবেই আমরা অধ্যাত্ম-সাধনার বিবিধ প্রণালী অনুসরণ

করিতে পারিব। আর, এই সাধনার ফলে, আমাদিগের যথাসময়ে আসিবে পরমসত্যের উপলব্ধি। এমন একটি সাম্য ও স্থিতিলাভ আমরা তখন করিব যে, জগতে কোন কিছুই আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কিন্তু, মেষশাবকের কিংবা শিশুর, অথবা নিদ্রিত বা মৃত ব্যক্তির শান্তভাব আমাদের ঈপ্সিত নহে। আবার, যে আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্থিতিসাম্যপ্রাপ্ত ও সংযত, তাঁহার স্থিরতাও আমাদের কাম্য নহে, কেননা, তাঁহার স্থিতি-সাম্য নিরাপদ নয়, যে কোন মুহূর্তেই উহা বিপর্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু যিনি অনন্ত চৈতন্যের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়াছেন এবং বদ্ধজল ক্ষুদ্র একটি ডোবায় পড়িয়া না থাকিয়া অসীম মহাসাগরে অবগাহন করিয়াছেন, সেই প্রবুদ্ধাত্মা পুরুষের প্রশান্ত চিত্তই আমাদের কাম্য। হাতী ছোট জলাশয়ে নামিলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং উহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, কিন্তু মহাসাগরে অবতরণ করিলে এ সকল কিছুই ঘটে না। যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি ক্ষুদ্র চৈতন্যকে পরম-চৈতন্যের সহিত যুক্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনি মহাসমুদ্রের তুল্য। এইরূপ ব্যক্তি প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যেও স্বয়ং শান্ত ও অবিক্ষুব্ধ থাকিয়া প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারেন। অধ্যাত্মজগতের সমস্ত আচার্যই পরম *একাগ্রতা রক্ষা করিয়া এবং শক্তিকে সুসংহত* করিয়া একটি অপ্রকম্প স্থিতির মধ্যে জীবনযাপন করেন।

যদি কোন বয়াকে একটি ক্ষুদ্র নোঙ্গরের সহিত বাঁধা হয়, তাহা হইলে ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় রশিটি ছিঁড়িয়া গেলে নোঙ্গরটি নষ্ট হইতে ও বয়াটিও ভাসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি বয়াটি শক্ত শিকল দিয়া গুরুভার নোঙ্গরের সহিত বাঁধা হয়, তাহা হইলে ঝড়ের সময়ও ইহা নিরাপদে ঢেউয়ের উপর ভাসিয়া বেড়াইবে। এইরূপ, যাহাতে আমরা ইচ্ছা করিলে বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিতে পারি, তাহার জন্য আসুন, আমরা সচেষ্ট হই। আমাদের শান্তি হউক দিব্য পবিত্রতার শান্তি, ভাগবত উপলব্ধির সুগভীর শান্তি।

আহ্বান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সুখের সময় তোমার কথাটি সহজে ভুলিয়া যাই।
সুখ-সম্পদ যত পাই, তত চাই।
তখন দিবস রাতি,
ধনজন নিয়ে করি শুধু মাতামাতি।
ভাবি চিরদিন এম্‌নি ক'রেই দিনগুলি যাবে চ'লে,
উৎসব কলরোলে।

দুঃখের দিনে তোমারে স্মরার কথা।
তোমা হ'তে হই বিমুখ ততই যত পাই প্রাণে ব্যথা।
ভাবি তুমি বুঝি করিতেছ অবিচার,
আমারে দিয়াছ মুষ্টি-ভিক্ষা, অন্যেরে ভাণ্ডার।

বিপদ যখন ঘটে,
তোমারে তখন ডাকার সময় বটে।
তখন আবার ভাবি,
কোন দিন তোমা ডাকে নি যে তার
ডাকার নেইক দাবি।
লজ্জা তখন চিত্ত আমার ভরে
তোমারে ডাকার আগ্রহটুকু হরে।
করি প্রতীক্ষা অনিবার্যেরই তরে।

অবাক হইয়া ভাবি শুধু প্রভু, এতও তোমার সয়,
মিথ্যা বলে না, লোকে যবে বলে তোমারে করুণাময়।
কোন দিন ভুলে করি নাই আহ্বান
তবু কতবার সঙ্কট হ'তে করেছ পরিত্রাণ।
বিভীষিকা মাঝে হেরি কতবার তোমার অভয় পাণি
এত দয়া যদি কর নিরবধি কেন লওনাক টানি?

রোহিণী

(পুরাতন জৈন কথিকা)

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

সেকালের—সে সময়ের কথা।

রাজগৃহ নগরে ধন্য নামক এক সমৃদ্ধিশালী ও বুদ্ধিমান সার্থবাহ (বণিক) ছিলেন। তাঁহার ভদ্রা নামক স্ত্রী, ধনপাল, ধনদেব, ধনগোপ ও ধনরক্ষিত নামক চারি পুত্র এবং উজ্ঝিকা, ভোগবতী, রক্ষিকা ও রোহিণী নামে চারিজন পুত্রবধূ ছিল।

একদা ধন্য শ্রেষ্ঠীর মনে উদিত হইল যে আমার গৃহের সমস্ত কার্য আমার আদেশ ও পরামর্শ-অনুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু কোন সময়ে আমি যদি গৃহে অনুপস্থিত থাকি বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে অন্য স্থানে গমন করি বা যদি রোগ-গ্রস্ত হই, অথবা আমার যদি মৃত্যু হয় তবে গৃহের কার্য কাহার পরামর্শে পরিচালিত হইবে তাহার কোন ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি তাঁহার নিজের ও পুত্রবধূগণের আত্মীয়-স্বজনগণকে এক সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং নানাপ্রকার ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করাইয়া সকলকে পরিতৃপ্তি-সহকারে আহার করাইলেন। আহার-সমাপনান্তে সকলে উপবেশন করিলে ধন্য শ্রেষ্ঠী একে একে তাঁহার পুত্রবধূগণকে আহ্বান করিয়া সকলের সমক্ষে প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া পরিপুষ্ট ধান্যের দানা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন—তোমরা এই ধান্যগুলিকে যত্নের সহিত রাখিবে ও আমি চাহিলে এইগুলি প্রত্যর্পণ করিবে।

জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ উজ্‌ঝিকা পাঁচ দানা ধান্য গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিল, আমাদের বাড়ীতে বহু গোলা ধান্য রক্ষিত আছে. শ্বশুর মহাশয় যখন চাহিবেন তখন রক্ষিত ধান্য হইতে পাঁচ দানা লইয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিব। এইরূপ বিচার করিয়া সে শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত পাঁচ দানা গোপনে ফেলিয়া দিল।

দ্বিতীয়া পুত্রবধূ ভোগবতী চিন্তা করিল, শ্বশুর মহাশয়ের গোলায় বহু ধান্য রক্ষিত আছে, যখন তিনি চাহিবেন তখন পাঁচ দানা আনিয়া প্রদান করিব, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত ধান্য ফেলিয়া দেওয়াও উচিত নয়। অতএব স্বস্থানে গমন করিয়া ধান্যের খোসা ছাড়াইয়া পাঁচ দানা চাউল সে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

তৃতীয়া রক্ষিকা মনে করিল, শ্বশুর মহাশয় যখন যত্নের সহিত রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তখন তাহা সুরক্ষিত রাখাই উচিত। এইরূপ বিচার করিয়া সে ধান্যগুলিকে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বন্ধন করিয়া নিজের অলঙ্কার রক্ষা করিবার রত্ন-পেটিকায় রাখিয়া দিল এবং প্রতিদিন তাহা যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে লাগিল।

চতুর্থা রোহিণী বিচার করিল, শ্বশুর মহাশয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাঁচ দানা করিয়া ধান্য প্রদান করিয়াছেন, নতুবা বাড়ীতে এত ধান্য থাকিতে মাত্র পাঁচ দানা করিয়া দিবার কোন সার্থকতা থাকে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিজের পিতৃগৃহ হইতে কর্মচারীকে ডাকিয়া সেই পাঁচ দানা ধান্য প্রদান করিল এবং সেই ধান্য কয়টিকে বর্ষার সময় যত্নের সহিত বপন ও রোপণ করিয়া যখন ধান্য পরিপক্ব হইবে তখন তাহা কর্তন করিয়া আনিয়া তাহাকে প্রদান করিতে আদেশ করিল।

সেই পাঁচটি মাত্র ধান্য বপন করিয়া উহা হইতে যত ধান্য হইল তাহা সে নূতন মাটির হাঁড়িতে রাখিয়া যত্নের সহিত হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল এবং দ্বিতীয় বর্ষার সময় পুনরায় সেই ধান্যগুলি বপন করিয়া তাহা হইতে প্রাপ্ত ধান্যসমূহ পূর্ববৎ

কয়েকটি হাঁড়িতে রক্ষা করিল এবং তৃতীয় বর্ষায় তৎসমস্ত বপন করিয়া বহু ধান্য প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সে প্রতিবর্ষে সমস্ত ধান্য বপন করিয়া বহুগুণ ধান্য উৎপন্ন করিতে লাগিল। পাঁচটি ধান্য হইতে ক্রমে বৃহৎ একটি গোলা ভরিয়া গেল।

পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ধন্য শ্রেষ্ঠী পুনরায় তাঁহার ও পুত্রবধূগণের আত্মীয় স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা প্রকার উপাদেয় ভোজ্যে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলে তিনি একে একে পুত্রবধূগণকে সকলের সমক্ষে আহ্বান করিলেন।

প্রথমে উজ্ঝিকা আসিলে শ্রেষ্ঠী তাহাকে তাহার প্রদত্ত ধান্য ফেরত দিতে বলিলে সে বাড়ীতে রক্ষিত ধান্য হইতে পাঁচটি দানা আনিয়া দিল। শ্রেষ্ঠী এই ধান্যগুলি তাঁহার প্রদত্ত দানা কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, বাড়ীতে রক্ষিত ধান্য ভাণ্ডার হইতে সে এই দানা কয়টি আনিয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রদত্ত দানাগুলি ফেলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় ভোগবতীও গৃহে রক্ষিত ধান্য আনিয়া দিল এবং বলিল,—আমি আপনার প্রদত্ত দানাগুলি ভক্ষণ করিয়াছি। তৃতীয় রক্ষিকা তাহার বস্ত্রপেটিকা আনিয়া তাহাতে সযত্নে রক্ষিত ধান্যের দানাগুলি তাঁহাকে প্রদান করিল। রোহিণী সর্বশেষে আসিয়া বলিল যে, ঐ পাঁচটি দানা হইতে এত ধান্য হইয়াছে যে এখানে আনয়ন করিতে কয়েকটি গাড়ীর প্রয়োজন হইবে। তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বলিতে বলিলে সে কিরূপে ধান্য কয়টির দ্বারা এত অধিক ধান্য উৎপন্ন করিয়াছে তাহা বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিল।

রোহিণীর কথায় শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের সমক্ষে তাহাকে গৃহের সমস্ত কার্যের কর্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তাহার আদেশ ও উপদেশ অনুসারেই সমস্ত কার্য পরিচালিত হইবে। রক্ষিকাকে গৃহের সমস্ত ধনসম্পত্তির রক্ষিকা, ভোগবতীকে রন্ধনশালার কর্ত্রী ও উজ্ঝিকাকে গৃহাদি পরিষ্কার রাখিবার তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করিলেন।

গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিলেন—হে শিষ্য, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া যে উজ্ঝিকার ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করে সে ইহলোকে কুখ্যাতি ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে ভোগবতীর ন্যায় মহাব্রত গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহের উপায় স্বরূপ তাহা বাহিক ভাবে পালন করে এবং আহারাদিতে আসক্ত হয় সে পরলোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যে রক্ষিকার ন্যায় গৃহীত মহাব্রত যত্নপূর্বক পালন করে সে ইহলোকে সুখ্যাতি ও পরালাকে সুগতি প্রাপ্ত হয়, আর যে মহাব্রত ধারণ করিয়া রোহিণীর ন্যায় তাহা জীবনে অধিকাধিকরূপে বিকাশ করে সে ইহলোকে শান্তি, কীর্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আয়ুক্ষয়ে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

উৎকল-সংস্কৃতির কয়েক অধ্যায়

স্বামী জগন্নাথানন্দ

উৎকল ও উড্র ব্যক্তিদ্বয়ের নামে উৎকল ও ওড়িশাদেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মহাভারতে, পুরাণাদিতে উৎকল ও উড্রের নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ওড়িশাভাষা লিখিত-সাহিত্য আকার ধারণ করে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাদলাপাঞ্জি নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে। উহাতে জগন্নাথ মহাপ্রভুর পূজাপদ্ধতি, ভোগরাগ, রাজাদের বংশাবলী ও কীর্তিকলাপ বর্ণিত আছে। কেহ কেহ

উহা হইতে উৎকলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন। উহা গঙ্গাবংশীয় রাজগণের রাজত্বের সময় লিখিত।

শূদ্রমুনি সারলাদাস উৎকলের প্রাচীন কবি। তিনি সার্ধচতুর্দশ শতাব্দীর লোক। সারলাদাস জাতিতে শূদ্র ছিলেন। বিশেষ কিছু লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহার বাড়ী ছিল কটকজিলান্তর্গত ঝঁকড় গ্রামে। তিনি সারলাদেবীর উপাসনা করিতেন, পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্র শুনিতেন। আরাধনার ফলে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন, 'তুই কবি হবি।' সেই সারলাদেবীর কৃপায় তিনি ওড়িশাভাষায় পদ্যে বিশাল মহাভারত রচনা করেন। তাঁহার রচিত পদ্যগুলি অতি মনোহর, হৃদয়গ্রাহী। উহাতে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা অতি সরল ; উপমা, উপমেয়গুলি সরস।

উহা হইতে কয়েকটি পদ্য উদ্ধৃত হইল :

পর্বত তুটে কি নাথ টেলারে মাইলে,
সমুদ্র পোতি হুত্র কি ধূলি পকাইলে।
মৃগরবলে কাঁহি যে সিংহ জিণি হুত্র,
তুলাদ্বারা পিটিলেকি লুহা তুটি যায়।

টেলাতে কি পর্বত ভাঙ্গে, ধূলা ফেলিলে কি সমুদ্র ভরিয়া যায়, মৃগের মত বল লইয়া কি সিংহকে জয় করা যায়, তুলার আঘাতে কি লৌহ চূর্ণ করা যায় ইত্যাদি। অনেকস্থলে সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে মিল নাই। সারলাদাসের রচিত মহাভারতকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না। উহাতে বহুবিষয় তাঁহার নিজের কল্পিত। জগন্নাথ মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও বিশদ বিবরণ উহাতে পাওয়া যায়।

তদবধি ঝঁকড়গ্রামে সারলাদেবী পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। দেবীর ভোগরাগাদির সুব্যবস্থার জন্য রাজারাও জমি, বাড়ী প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। কবি, বাদক, গায়ক হওয়ার মানসে অনেকে দেবীর কাছে হত্যা দিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবীর নিকট হইতে নিজের অভীষ্টবর লাভ করিয়া থাকে। সেখানে পুরাণপাঠ, বিশেষতঃ সারলাদাসের মহাভারত, চণ্ডীপাঠ, যাত্রা, মেলা সর্বদাই লাগিয়া থাকে। উৎকলে ঝঁকড়বাসিনী সারলাদেবী প্রসিদ্ধা।

যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীধামে আসেন, তখন ওড়িশার স্বাধীন রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র। প্রভুর দিব্য অলৌকিক প্রেমে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ ও বৈরাগ্য রাজাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি প্রভুর একান্ত অনুগত হইয়াছিলেন। সেই সময় উৎকলের অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দিব্য সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। রায় রামানন্দ, শিখী মাইতি, তাঁহার ভগিনী মাধবী, ইহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর যে মধুর ভাব হইত তাঁহারা ইহার মর্ম বুঝিতে পারিতেন।

অচ্যুতানন্দদাস, বলরামদাস, অনন্তদাস, যশোবন্ত দাস ও জগন্নাথদাস—ইঁহারা মহাপ্রভুর পঞ্চসখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অচ্যুতানন্দ প্রধান কবি এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জাতিতে গোপাল। তাঁহার পিতার নাম দীনবন্ধু খুন্টিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। স্বরচিত গ্রন্থে সুদামা বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে তিনি অনেকগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাদের উপাধি প্রথমে খুন্টিয়া ছিল, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর দাস উপাধি হয়।

অচ্যুতানন্দের রচিত গ্রন্থ—জ্যোতিসংহিতা, অনাহত-সংহিতা, বীজ-সংহিতা, অনাকর-সংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ। তিনি নিজরচিত অনাকর সংহিতাতে স্বরচিত গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। ৩৬টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, ২৭টি হরিবংশাদি চরিত, ১২টি উপবংশ রচিত, পুরাণ মালিকা প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

কেহ কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে নিরাকার নির্গুণের বর্ণনা অধিক দেখা যায়; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার রচিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সঙ্গলাভ ও বৈষ্ণবধর্ম-গ্রহণের উল্লেখ আছে। উৎকলের প্রত্যেক নরনারী তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন।

বলরামদাস—ইনি একজন ওড়িয়া সাহিত্যিক ছিলেন। ওড়িশা ভাষায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অতি সহজ সরল ওড়িশা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মহা উপকার করিয়াছেন। তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি যে বেদবেদান্ত-পারদর্শী ছিলেন ইহা সহজে বোঝা যায়। বলরামদাস মহাপ্রভুর ভক্ত পঞ্চসখার মধ্যে একজন। তিনি পরমভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, জগন্নাথ মহাপ্রভুর রথযাত্রা-সময়ে তিনি রথে উঠিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সেবকেরা তাঁহাকে তিরস্কার করে এবং রথে উঠিতে দেয় নাই। উহাতে বলরামদাস মনে আঘাত পান। বাকি মুহাণের নিকট আসিয়া বালির উপর পথ তৈরী করিয়া জগন্নাথদেবকে উহাতে বসাইয়া তিনি তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হন। এদিকে বড়দাণ্ডেতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ—সকলে জগন্নাথদেবের রথের রজ্জু ধরিয়া টানিতেছে, কিন্তু কোন প্রকারে আর রথ চলিতেছে না। পাণ্ডা, সেবক ও উচ্চকর্মচারীরা সকলেই হতাশ; রথ টানিবার আশা তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সকলেই চিন্তিত, প্রভু জগন্নাথের কাছে বোধ হয় কোন অপরাধ হইয়াছে; সেইজন্য রথ এমনভাবে অচল। রাত্রে জগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, সেবকেরা আমার ভক্তকে অপমান করিয়াছে, আমাকে বালিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, আমি পরমভক্তকে আনিতে পার তবে আবার রথ চলিবে। স্বপ্নাদেশে রাজা পরদিন সম্মানের সহিত তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। ইহার পর রথ ভালভাবে চলিল।

বেদান্তসার, গুপ্তগীতা, বিরাট গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি সহজ সরল ওড়িশা ভাষায় প্রায় ২৮খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ, ব্রহ্মপুরাণ, কান্তকোইলি, লক্ষ্মীপুরাণ, ভাবসমুদ্র, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মাণ্ডভূগোল, শরীরভূগোল, ভগবদ্গীতা, গুপ্তগীতা, ছত্তিশগীতা, গরুড়গীতা, বিরাটগীতা প্রভৃতি। পাঠশালায় তাঁহার রচিত গান ছেলেরা গান করিয়া থাকে। বলরামদাস বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি পণ্ডিতদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থও রচনা করেন।

তাঁহার পিতার নাম সোমনাথ, মাতার নাম মনোমায়া। পিতা সোমনাথ ওড়িশা রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তির অভাব ছিল না। বলরামদাস বিবাহিত, কিন্তু সারা জীবন ধর্মপ্রচারে ও গ্রন্থপ্রণয়নে রত ছিলেন।

অনন্তদাস—ইঁহার নাম অনন্ত মহান্তি। ইনি সন্ন্যাসী হওয়ার পরে দাস উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিও মহাপ্রভুর পার্ষদগণের অন্যতম। ইঁহার পিতার নাম কপিল মহান্তি। ইনিও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—শূন্যনামভেদ, হেতু-উদয়, ভাগবত ইত্যাদি।

যশোবন্ত দাস মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একজন। তিনিও ওড়িশা ভাষায় অনেক পারমার্থিক ভজন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, যাহা অদ্যাবধি এদেশের নরনারীরা গান করিয়া থাকে।

জগন্নাথ দাস—ইনি উৎকলে সুপরিচিত। উৎকলের আবালবৃদ্ধবনিতা, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই তাঁহার রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। ওড়িয়া ভাগবত তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। সহজ সরল ওড়িয়া ভাষায় শাস্ত্রাদি অনুবাদ করিয়া তিনি অমর হইয়াছেন। পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাসন

তাঁহার জন্মস্থান। জগন্নাথ দাসের পিতার নাম নারায়ণ দাস, মাতার নাম পদ্মাবতী। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্য ও বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠে মনোযোগী হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব ছিল। সর্বদা ভাগবত-পাঠ ও ভগবানের গুণানুকীর্তনে রত থাকিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। পুত্র পাছে সন্ন্যাসী হইয়া যায় সেইজন্য বাল্যকালেই পিতা তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু জগন্নাথ দাস পিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সংসারে আবদ্ধ হইতে চান নাই এবং পিতাকে বলেন: এ কার্য হইতে বিরত হউন, যে গুণের জন্য আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন, বিবাহ দিলে সে গুণ আমাতে দেখিবেন না। সংসারে আবদ্ধ হইলেই সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

তিনি বিবাহ না করিয়া সংসারত্যাগ পূর্বক পুরী জগন্নাথ ধামে চলিয়া আসেন। যে সময় চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে আসেন, তখন জগন্নাথ দাস পুরীধামে ভাগবত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেম ও ত্যাগ দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গলাভে কখনও বঞ্চিত হন নাই। যতদিন মহাপ্রভু নীলাচলে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহার কাছেই অবস্থান করিতেন। প্রভুর জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। জগন্নাথ দাসের ত্যাগবৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে সম্মান করিতেন ও তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মঠ এখন ওড়িয়া মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জগন্নাথ দাসের রচিত ওড়িয়া ভাগবত প্রত্যেক গ্রামে পঠিত হয়, উৎকলের প্রত্যেক গ্রামে ভাগবতের মন্দির বা কোন নির্দিষ্ট ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা সারাদিন কাজকর্ম শেষ করিয়া রাত্রে সেই নির্দিষ্ট মন্দিরে বসিয়া ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকে। অধিকাংশ বাড়ীতে ভাগবত গ্রন্থ পূজিত এবং ইহার পারায়ণ হয়। মুমূর্ষুর সদ্‌গতির জন্য ভাগবত পাঠ করিয়া শুনান হয়। পাঠশালায় বালকেরা ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে। যে বালক ভাগবত পাঠ করিতে পারে তাহার বিদ্যা যথেষ্ট বলিয়া অভিভাবকেরা মনে করিয়া থাকেন। লোকের কথায় কথায় ভাগবতের উদাহরণ দেয় ও ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকে। উৎকলের যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই ভাগবত গান হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য চাষীরা জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় ভাগবত গাহিতেছে। বালক পাঠশালায় ভাগবত পাঠ করিতেছে; ধনী, দরিদ্র সকলেই ভক্তিভরে ভাগবত গান করিতেছে। উৎকলের জনসাধারণের উপর ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব।

ভাগবত ব্যতীত আরো কতকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন—যথা গুপ্ত ভাগবত, দারুব্রহ্ম গীতা, গজস্তুতি, তুলাভিণা মনশিক্ষা, রাসক্রীড়া।

পঞ্চদশ শতাব্দীকে উৎকলে পঞ্চসখার যুগ বলা হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চসখাদিগের শিষ্যপ্রশিষ্যও অনেক। দীন কৃষ্ণদাস, সুদর্শন দাস, দিবাকর দাস, ঈশ্বর দাস, গোবিন্দশরণ দাস, বনমালী দাস, রামদাস প্রভৃতি ওড়িয়াতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জ—ইনি প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে সম্রাট বলিয়া অভিহিত। ওড়িয়া কবিদিগের মধ্যে ইনি প্রধান। তাঁহার রচনাপ্রণালী ও নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার বাস্তবিকই অতুলনীয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত লেখাকেই আদর করিতেন। প্রাকৃত ভাষায়

লিখিত গ্রন্থকে তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। তাহাদের গর্ব খর্ব করিবার জন্য উপেন্দ্র ভঞ্জ তাঁহার রচিত গ্রন্থে ওড়িয়া ভাষায় কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ এমন ব্যবহার করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন, তথাপি তাঁহার রচিত পদাবলী লোকেরা আবৃত্তি করে এবং কবি গায়কেরা গান করিয়া থাকেন। এক একটি পদের বত্রিশ প্রকার অর্থ। কবিরা তাঁহার রচিত পদাবলীর নানাপ্রকার অর্থ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল ঃ

গোগজবাহন-ভোজন-ভক্ষদুদ্‌ভবপক্ষবিপক্ষজশত্রোঃ।
আসনবৈরীকৃতাসনা তুষ্ট্বা মামিহ পাতু জগত্রয়ত্রষ্টা॥

—গো অর্থাৎ ষণ্ডের উপরে যিনি গমন করেন তিনি গোগ—শিব, তাহা হইতে জাত গোগজ —কার্তিকেয়, তাঁহার বাহন - ময়ূর, তাহার ভোজন —পবন, উহা হইতে জাত হনুমান্—সে যাঁহার পক্ষে তিনি রাম, তাঁহার বিপক্ষ রাবণ, তাহা হইতে জন্ম যাহার—ইন্দ্রজিৎ, তাহার শত্রু ইন্দ্র, তাঁহার বাহন হাতী, তাহার বৈরী সিংহ, উহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন— দুর্গা, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

কবিতাতে এমন অক্ষরের নিয়ম অন্যত্র দেখা যায় না। উপেন্দ্র ভঞ্জ-রচিত 'বৈদেহীবিলাস' শ্রেষ্ঠ কাব্য। উহাতে তিনি সীতারামের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি বিশাল। কিন্তু এত বড় বিরাট গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতার প্রত্যেক পদের আদ্য অক্ষর 'ব' রাখিয়াছেন। কবিতাতে যে সব ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন উহা মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য ও অতি জটিল।

তিনি যে সব কাব্য রচনা করিয়াছেন, উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত—গীতিকা, পৌরাণিক কাব্য, কাল্পনিক কাব্য, আলঙ্কারিক কাব্য ও বিবিধ রচনা। সর্বশুদ্ধ তিনি ৬৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।

উপেন্দ্র ভঞ্জ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ গঞ্জাম জেলান্তর্গত ঘুমুষর-এ রাজত্ব করিতেন। ইঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ ভঞ্জ। তিনিও ঘুমুষরে রাজা ছিলেন। উপেন্দ্র ভঞ্জ রাজা হন নাই। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন; কিছুকাল পরে পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় তিনি সমস্ত মনপ্রাণ সাহিত্য-রচনায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক আরো অনেক কবি উৎকলে জন্ম গ্রহণ করেন; যথা—ঘন ভঞ্জ, নীলাম্বর ভঞ্জ, গোপাল, ভূপতি পণ্ডিত ইত্যাদি। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিশ্বনাথ খুন্টিয়া, কৃষ্ণসিংহ, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক প্রভৃতি পণ্ডিত সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণের উড়িয়া ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন।

কবিসূর্য বলদেব রথ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে কিশোরচন্দ্রানন্দ-চম্পূ এবং ওড়িয়াতে চন্দ্রকলাকাব্য রচনা করেন। তাঁহার এই পুস্তক উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এর পাঠ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফকিরমোহন সেনাপতি, মধুসূদন রাও, শ্রীরামশঙ্কর রায়, গঙ্গাধর মেহর ও রাধানাথ রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে গদ্যে বহুবিধ পুস্তক রচনা করিয়া ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

হণ্টর সাহেব বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ওড়িয়া ইতিহাস রচনা করেন। উহাতে তিনি ৭৯ জন প্রধান কবি ও সাহিত্যিকের নাম দিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থগুলি বর্তমানে কতক ছাপা হইয়াছে, আরো অসংখ্য পুঁথি তালপাতায় লিখিত আকারে রহিয়াছে।

প্রাচীন উৎকলের সাধক, ভক্ত ও সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থগুলিতে বুদ্ধদেবের নিরাকার নির্বাণ—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা, সীতারামের গুণাবলী, প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জগন্নাথদেবের মহিমাবর্ণন করাও হইয়াছে। সর্বত্রই জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য পরিস্ফুট।

জগন্নাথদেবে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি যাবতীয় অবতারেরও আরোপ করা হইয়াছে।

এই উৎকল দেশ পুণ্যভূমি বলিয়া কথিত। প্রাচীনকাল হইতে এখানে বহু ভক্ত, সাধক, সিদ্ধ-পুরুষ বসবাস করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কি বেদান্তী, কি বৈষ্ণব, সকলেই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর এখানে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবাহ দেখা দেয়। জৈনদিগের প্রভাব যে এখানে কম ছিল তাহা বলা চলে না। বর্তমানে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি উহার নিদর্শন। খণ্ডগিরি জৈনদের, উদয়গিরি বৌদ্ধদের। উৎকলের সম্রাট খারবেল প্রথমে জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

একসময়ে এখানে যে বেদান্তের ডিণ্ডিম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিদর্শন শঙ্করাচার্যের গোবর্ধন মঠ। এতদ্ব্যতীত শৈব এবং শাক্তেরও ইহা লীলাভূমি ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরসমূহ দেখিলে তাহা মনে হয়। সর্বোপরি ভাগবত ধর্মের ত কথাই নাই। মহাপ্রভুর ওড়িশা আসার পূর্বেও ছিল, পরেও তাহার বিস্তার হইয়াছিল।

উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের সময় জগন্নাথদেব বুদ্ধ, বেদান্তের প্রাধান্যসময়ে জগন্নাথদেব নিরাকার নির্গুণ দারুব্রহ্ম। রামানুজের সময় তিনি নারায়ণ, বৈষ্ণবদের সময় রাধাকৃষ্ণ এবং শৈবদের সময় শিব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই শ্রীজগন্নাথ বা পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের প্রাচীনতা-বিষয়ে ঋগ্বেদে দারুব্রহ্মের কথা আছে :

'আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্
তদালভস্ব দুর্দানোতেন যাহি পরমস্থলম্'।

দারুময়-পুরুষোত্তমাখ্য দেবতার উপাসনা করিলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়—ইহা সায়ণাচার্য তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে নিম্নলিখিতরূপে পুরুষোত্তমের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার পরে বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভো! প্রাণীদিগের মোক্ষের উপায় কি?' তখন বিষ্ণু বলেন 'আমি নিজে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নীলগিরিতে নীলমাধবরূপে বিরাজ করিব, যাহারা আমাকে দর্শন করিবে তাহারা মুক্ত হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে যমের আর অধিকার থাকিবে না।' সকলেই মুক্ত হইলে যমের অধিকার থাকিবে কি প্রকারে? যম এই কথা নিবেদন করায় বিষ্ণু বলেন, 'আমি কিছুকাল পরে অন্তর্ধান করিলেও এ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য লুপ্ত হইবে না এবং যমের অধিকারও এখানে থাকিবে না।'

সত্যযুগে সূর্যবংশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক রাজা অবন্তীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব, শাস্ত্রজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য রাজা ব্যাকুল হন। একজন তীর্থপর্যটক তপস্বী আসিয়া রাজাকে বলেন, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান, তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের পুরোহিত বিদ্যাপতিকে পাঠাইলেন উৎকলে অনুসন্ধান করিবার জন্য। তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া এক শবরপল্লীতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বিশ্বাবসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বিদ্যাপতি বলেন, আমি না যাওয়া পর্যন্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন উপবাসী থাকিবেন। নীলমাধবকে যাহাতে আমি দর্শন করিয়া শীঘ্র ফিরিতে পারি উহার ব্যবস্থা করুন। বিদ্যাপতির নিকট রাজার ঐরূপ ভক্তি ও ব্যাকুলতা শ্রবণ করিয়া শবররাজের করুণা হইল। তখন সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া তিনি বিদ্যাপতির হাত ধরিয়া এক সংকীর্ণ পথ দিয়া নীলগিরির উপরে

অবস্থিত নীলমাধবকে দর্শন করাইলেন। তিনি দর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। ইতোমধ্যে নীলমাধবমূর্তি বালুকারাশি দ্বারা প্রোথিত হইল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব-মূর্তি দর্শনলালসায় কালবিলম্ব না করিয়া উৎকলে যাত্রা করিলেন। কত পর্বত পাহাড় নদনদী অতিক্রম করিতে হইল। ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, দেহের কষ্টবোধ নাই; স্বয়ং ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা, একমাত্র তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই অনুধ্যান! পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র নারদ রাজাকে সংবাদ দিলেন, নীলমাধব অন্তর্হিত হইয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার আর দর্শন ঘটিবে না। এই নিদারুণ বাক্যশ্রবণ করিয়া রাজা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। এত আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া গেল, তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি ধৈর্যহারা হইবেন না, অচিরে স্বয়ং ভগবান চতুর্ধা প্রকট হইবেন; তখন তাঁহাকে আপনি দর্শন করিতে পারিবেন। ঋষির বাক্যে রাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং কি উপায়ে দর্শন করা যায় তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

নারদের পরামর্শে রাজা গুড়িচা বাটীর নিকট প্রথম নৃসিংহমূর্তি স্থাপন করেন। পরে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞসমাপনে অবভৃত স্নান করিতে হয়; সেজন্য সমুদ্রের ধারে স্নানাগার নির্মিত হইল। স্নানাগারের নিকটে সমুদ্রের উপর ভাসমান চারিশাখাযুক্ত এক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা নারদকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ঋষি বলেন—ইনি শ্বেতদ্বীপবাসী বিষ্ণু। ইনি বৃক্ষদেহ ধারণ করিয়াছেন। এই বিষ্ণুরূপী বৃক্ষ আনিয়া মূর্তি গঠন কর। রাজা মহাসমারোহের সহিত বৃক্ষ আনিলেন। মূর্তিগঠন-সম্বন্ধে দেবর্ষির সহিত পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল—এই বৃদ্ধ বার্ধকী যাইতেছেন, ইনি মূর্তি গঠন করিবেন।

গঠনকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাহিরে নানারূপ বাদ্যের ব্যবস্থা কর, কারণ এই গঠন ধ্বনি যদি কেহ শ্রবণ করে তাহা হইলে সে বধির বা অন্ধ হইয়া যাইবে। সেজন্য এই বৃদ্ধ বার্ধকীকে মণ্ডপের ঘরে প্রবেশ করাইয়া পনর দিন বন্ধ রাখিবে। তাঁহার কার্য কেহ যেন না দেখে, অথবা কেহ যেন মণ্ডপে প্রবেশ না করে। দেখিলে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে।

দৈববাণী-অনুযায়ী রাজা বৃদ্ধ বার্ধকীকে মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহিরে নানারূপ বাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন, পনরদিনের পর দ্বার খুলিয়া দেওয়ায় দেখা গেল বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সুদর্শন চতুর্ধামূর্তি গঠিত হইয়াছে এবং সেই বৃদ্ধ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। রাজা এই চারিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মন্দির নির্মাণ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মন্দির-নির্মাণ শেষ হওয়ার পরে ব্রহ্মা আসিয়া উহাতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মা মন্দির ও মূর্তিচতুষ্টয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করেন—বৈশাখ শুক্লা অষ্টমীদিনে।

পুরুষসূক্তে জগন্নাথ, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে বলভদ্র এবং দেবীসূক্তে সুভদ্রা পূজিতা হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মপুরাণ এবং অন্যান্য পুরাণেও মোটামুটি ঐরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে সামান্য কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

শূদ্রমুনি সারলাদাস-লিখিত মহাভারতে জগন্নাথ-দেবের বর্ণনা নিম্নোক্ত প্রকারে আছে:

দ্বাপরযুগের শেষে যখন যদুবংশ ধ্বংস হইল এবং জায়াশবর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিতেই শ্রীকৃষ্ণ শরীর ত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দেহের সংকার করিবার জন্য অর্জুন ব্যাকুল হইলেন। জায়াশবর অগুরু কাষ্ঠ আনিবার জন্য বনে গেলেন। বনের মধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও অগুরু বৃক্ষ পাইলেন না। অগুরু বৃক্ষ দ্বারা বন পরিপূর্ণ থাকিলেও সেদিন তাঁহার দৃষ্টিতে একটিও পড়িল না। অর্জুনকে ঐকথা জানাইলে

তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরীর-সংকার হইল না বলিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন। পুনরায় খুঁজিতে খুঁজিতে অদূরে একটি অগুরু বৃক্ষ দেখা গেল। সেই বৃক্ষ কাটিয়া আনিলেন। শব দাহ করিবার জন্য উহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। অগুরু বৃক্ষ শেষ হইল, কিন্তু শব দগ্ধ হইল না! অর্জুন শোকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দৈববাণী হইল, এই শব অগ্নিতে পুড়িবে না। এই দেহ নীল সুন্দর পর্বতে থাকিয়া পূজা পাইবে। তুমি অগ্নি নির্বাপন করিয়া এই দেহকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও।

সেই দেহে আগুন ধরায় দুই হাত, দুই পদ, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তক পুড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধড়টি দগ্ধ হইল না। সেইটি অর্জুন সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। ইহাই দারুমূর্তি জগন্নাথ। সারদাদাসের মহাভারতেও অন্যান্য পুরাণাদির ন্যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন, গালমাধব, জায়াশবরের নাম উল্লেখ আছে।

উৎকলীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে নানা তত্ত্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কেহ ত্রিমূর্তিকে প্রণবরূপী অ-কার, উ-কার, ম-কার; কেহ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; কে শিব, দুর্গা, বিষ্ণু; কেহ বা রাম, কৃষ্ণ; কেহ বা জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম এবং সুদর্শনকে প্রদ্যুম্নাদি চতুর্ব্যূহরূপে অথবা চার বেদরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

কানিংহাম প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা পূর্বোক্ত ত্রিমূর্তিকে বুদ্ধদেবের ত্রিরত্ন-ত্রিমূর্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে (যামলে) বিমলাদেবী ভৈরবী এবং জগন্নাথ ভৈরব বলিয়া বর্ণিত। যথা:

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা চ মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

উৎকলে শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটি ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। নীলাচল বা পুরী শংখ, ভুবনেশ্বর চক্র, যাজপুর গদা, কোনার্ক পদ্মক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত। বিষ্ণু গয়াসুরকে নিহত করিবার পরে তাঁহার হস্ত-স্থিত শংখ, চক্র, গদা ও পদ্মকে পূর্বোক্ত চারিটি স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই হেতু স্থানগুলি ঐ সকল নামে পরিচিত।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান,
বিপুল-বিত্ত লুকায়ে কোথায়—দীপ্র বিবস্বান!
দিলে তুমি অধিকার,—
অবদান করুণার
স্ফুরিত বিভব নিশীথ-বংশী—তুলিলে অতুল তান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

জানি নি জীবনে র'য়েছে ঘিরিয়া সকল সুদূরতম,
মানি বিস্ময় নিহারি' গহনে সহসা পরমরম।
যায় দূরে আবরণ
এ কী সুধা আহরণ,
আঁধার গভীরে এ কী উদয়ের প্রদীপ্তি অম্লান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

সুচির মেঘের অন্তরালের বন্ধন করি' ক্ষয়
আনিলে মুক্ত ঊষা-অঙ্গনে সবিতা জ্যোতির্ময়।
সুগোপন-সম্বিতে
জাগে তব ইঙ্গিতে,
বহিলে তটিনী মরু-অন্তরে মুখরিয়া কলগান,
অন্ধের মত ছিনু অচেতন—দিলে তুমি সন্ধান।

সুখের সন্ধানে

বেলা দে

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-কাল থেকে মানুষ সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ চিরকাল বলে আসছে যে সুখ পৃথিবীতে নেই, যদিও থাকে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। পৃথিবী মানুষের কান্নায় ভরা। মানুষ বলে ভগবান মানুষের অদৃষ্টে সুখ লেখেন নি, দুঃখই লিখেছেন। তাই মানুষ চিরকাল দুঃখের কান্নাই কাঁদছে। ধর্মযাজকেরা সর্বদেশে সর্বসময়ে বলে থাকেন যে পৃথিবীতে সুখ নেই, সুখ স্বর্গে—এ জন্মে সুখ নেই, সুখ মৃত্যুর পর পরলোকে। এ পৃথিবীতে সুখ নেই। যাঁরা ধর্মযাজক নন, এমনি আমাদের মত মানুষ, তাঁরা সুখ খুঁজে বেড়ান, মনে করেন বুঝি সুখ কোন স্থানে বা কোনো জিনিসে লুকানো আছে। কিন্তু প্রকৃত কথাটা কি? সুখ কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে নেই? কবি বলেছেন "তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" তাই মনে হয় এই সামান্য কথাটি একটি অতি বড় দার্শনিক সত্য, যার ওপরে ভিত্তি করে এই গোটা জগৎটাই দাঁড়িয়ে আছে। এ জগতে সুখের প্রত্যাশী সবাই আমরা, কিন্তু সুখী আর কয়জনে? তবু সুখ যদি জীবনে নাও পেয়ে থাকি, অন্ততঃ সুখের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এ বিশ্বাসটা থাকলেও আমাদের খুব বড় একটি তৃপ্তি থাকে। সে যে কত বড় তৃপ্তি তা শুধু সেই জানে সব সুখের আশা যার ঘুচে গেছে। সুখের আশা আমাদের জীবনের মূল উৎস। সুখী হবো বলেই আমরা বড় হতে চাই, বিদ্বান হতে চাই, অর্থ চাই, প্রেম চাই, জীবনে মহৎ আদর্শের প্রেরণা ও পরিণতি চাই। এ সংসারে কি এমন আছে যা আমরা চাই কিন্তু সুখের জন্য চাই না? যখন আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের বস্তুকে বিসর্জন দিয়ে অপ্রিয় নীরস হলেও মঙ্গলকে বেছে নিই তখনো আমরা আমাদের সুখবোধের বৃত্তিকেই পরিতৃপ্ত করি। আমাদের সেই ত্যাগের দুঃখদহন অশ্রুঢাকা আগুনজ্বালা কষ্টবোধকে লঙ্ঘন করে কোথা থেকে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হতে থাকে একটা সূক্ষ্ম অমৃতময় সুখের বোধ, যা আমাদের সব দুঃখকষ্ট সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি দেয়। সুখ পাব এই ভরসাই তো আমাদের সমস্ত কর্মের উৎস, আমাদের জীবনের মূলভিত্তি। কিন্তু সেই সুখ বস্তুটি কি, যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবকে এমন করে টেনে নিয়ে সংসারের ঘানিতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? এর সংজ্ঞা নির্দেশ করা তো সহজ কথা নয়! মানুষের মনে তখন কত প্রশ্নই ভিড় করে। কোনটা সত্যি সুখ—happiness না pleasure? মনের আনন্দমিশ্রিত তৃপ্তিঢালা প্রাণ শীতল করা সুখ, না শরীর ও বাইরের মনের ক্ষণিক সুখ? কিন্তু জগতে সত্যি শ্রেয় এবং প্রেয় এর মধ্যে কাকে বলব? যে সুখ রক্তের অণুপরমাণুতে শিরায় শিরায় আগুন জেলে মনকে মাতাল করে তোলে, সমস্ত বিশ্বজগৎ এক অদ্ভুত তীব্র আনন্দের নেশায় গলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেয়, তার আকর্ষণী শক্তি মানুষ উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এই অপরূপ রূপ আর ঐশ্বর্যে ঢলঢল রক্তরাঙ্গা শতদল চোখে দেখেও মানুষের মন কি এক অদম্য টানে টানতে থাকে স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত, শ্বেত শতদলের মত রিক্ততার ঐশ্বর্যে গৌরবময় সুখের আর একটি মূর্তির দিকে। সেখানে সমস্ত জীবন অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে বিকিয়ে দেবার সুখের লোভে মন বার বার ভিখারী হয়ে ওঠে। অথচ মানুষ জানে আর তার অন্তরনিবাসী

বিধাতাও জানেন, যতক্ষণ কি সে সত্যিকার চায় তা নির্ধারিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সুখের সন্ধানে পাগলের মত ছুটে বেড়ালেও সুখলাভ তার ভাগ্যে কিছুতেই নেই। মনের ভেতর যে মন রয়েছে আমাদের সে সত্যিকারের জহুরী, তার নিক্তির মাপ নির্ভুল। নিজেকে সে কিছুতেই ঠকাতে দেবে না। বাইরের জগৎ কত ঐশ্বর্যের ডালি সাজিয়ে আমাদের সামনে প্রতিক্ষণ তুলে ধরছে। গ্রহণ করা বা উপেক্ষা করা সে আমাদের হাত। কিন্তু সুখবোধ করা না করার শক্তিটা তো মনের। তাকে জোর করে কোনো পথে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় নিজেকে চিনতে ভুল করে কাম্যসুখ বেছে নিতে ভুল করে ফেলা। তাই সব চেয়ে বড় কথা—সুখ অকৃত্রিমতায়, নিজেকে না ভোলানোয় নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকায়। তাহলে জীবনে অনুতাপ আসবে না, ভুল করলেও সে ভুল সত্যের দিকে আমাদের অগ্রসর করে নিয়ে যাবে। নিজেকে চেনার পথ সহজ হবে, আর সেই চিনতে পারাতেই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। ভেতর বার প্লাবিত করে দিয়ে কোথা থেকে আসবে একটা অপূর্ব পরিতৃপ্তি যাতে মনে হবে আর ভয় নেই—ঠিক স্থানটিতে এবার পৌঁছে যাওয়া গেছে, দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই। তরী মুখ ফিরিয়েছে বন্দরের দিকে, নাবিক ফিরবে গৃহে, শিকারী ফিরবে শিকার সন্ধান সমাপ্ত করে। অন্তর আর বহির্জীবন কোণায় কোণায় মিশে গেছে, উদ্ধত হয়ে কোন কোণ আর জেগে নেই। এই পরিতৃপ্তি-বোধই কাম্য সুখলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

অমৃতের পুত্র আমি, সুন্দরের দৃপ্ত উপাসনা,
জীবনে-মরণে আমি অনন্তের নিত্য পরিচয়,
কত যুগ যুগান্তের বেদনার তপ্ত অশ্র-কণা,—
পথভ্রষ্ট অমর্ত্যের—ধরিত্রীর অসীম বিস্ময় !

আপনার গতিবেগ উদ্দাম-উৎসাহ পেল কবে,
যাত্রা মোর কবে সেই আদিম প্রভাতে হেথা সুরু,
শিরায় শিরায় মত্ত রক্তধারা নৃত্যের উৎসবে,
মুহূর্ত ফুটিল সেই মৃদু মন্দ বক্ষে দুরু দুরু।

প্রথম সে দৃষ্টিপথে প্রবাহিত বোধশক্তিধারা,
প্রথম সে জাগরণে কি আনন্দ অন্তরে অন্তরে !
ফিরিয়া পেলাম শেষ বাকস্ফূর্তি আমি বাক্যহারা,
এলো কত স্নেহ-প্রীতি, দুঃখ-সুখপ্রবাহ মন্থরে।

শিখিলাম বনে বনে ধনুর্বাণ ধনুতে যোজনা,
জীবন-সংগ্রামে হাতে ধরিলাম অসি আর মসী,
তাম্র ও প্রস্তর যুগে করিলাম বস্তুর ভজনা,
সোঽহং মন্ত্রপূত টানিলাম ওঁ ব্রহ্ম-রশি।

অন্তহীন যজ্ঞধূমে প্রধূমিত করিনু আকাশ,
জীবনের শিক্ষাকল্পে খুলি হৃদি পৃথিবীর বুকে,
ধর্ম-মোক্ষ-কামপথে ধরিত্রীর সার্থক প্রকাশ,
দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম তাই মোর ফেরে মুখে মুখে।

সাধনার শেষ নাই—শেষ নাই তবু জীবনের,
মৃত্যু মোর মৃত্যু নয়, জীবনের সে ত পরাগতি,
ক্ষণিক বিশ্রাম তরে আসা-যাওয়া শুধু ক্ষণিকের,
সমুদ্রের নীলে যথা জলবিন্দু মেশে নিরবধি।

জীবনের জয়গানে আজি তাই প্লাবি দিগন্তর,
বঙ্কিম-সরল গতি মৃদু-মন্দ চলিয়াছি ছুটি',
চলনে বিরাম নাহি, ক্লান্ত নহে অভিযান মোর,
অশান্ত-চঞ্চল কভু অমৃতের তরে ঝরি-ফুটি।

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

একদিন বেলুড় মঠের বর্তমান মন্দিরের পূর্বদিকে মাঠে আমরা ভাঁটুই তুলছি। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন কাজ বিশেষ এগোয়নি, কেবল গল্পই চলছে। তিনি আমাদের কাজে যোগ দিয়ে বল্লেন, "স্বামীজী আমাদের একবার লিখেছিলেন. 'কমণ্ডারকাচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। তোমরা ত দেখছি চোরকাঁটাগুলোও তুলতে পার না।" একবার আমি যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) প্রভৃতি নানান রকমে ভুগছি। স্বামীজী লিখলেন, 'ওদের ঐ সব দীনা হীনা ভাবের জন্যই এত ভোগে। ক্ষীণাঃ স্মো দীনাঃ—এ সব দেহাত্মবাদ। আত্মার আবার ব্যাধি কি! আমি দীনহীন এই সব নাস্তিক মত আত্মাকে ছোট করে দেয়। রোজ একঘণ্টা কোরে ধ্যান করা উচিত যে, আমি আত্মা অজর অমর অভয়।' আমি ব্রহ্মময়ীর সন্তান আমার আবার ব্যাধি কি! ভয় কি! এই সব। নাস্তি ভাবটা স্বামীজী অকেবারে সহ্য করতে পারতেন না—'জানি না', 'পারি না', 'কি জানি', 'কি দরকার'—ইত্যাদি এ সব কথা শুনলে তিনি জ্বলে যেতেন। ঠাকুর গাইতেন, 'মা আমি কি আটাসে ছেলে আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।'" বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে ওজস্বিতার সহিত তাঁর দণ্ডটি হাতে কোরে বলতে লাগলেন, "ঠাকুর গাইতেন, কী বীর ভাব! কী তেজ!—

মন কেনরে ভাবিস এত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকে ভয় এ যে বড় অদ্ভুত।
তুই কি করিস কালের ভয় হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত।
মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী কার ভয়ে সে হয়রে ভীত॥ ইত্যাদি

"দীন হীন ভাব, মন্দ বৈরাগ্য এ সব ঠাকরও একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'রোক চাই', 'ভক্তির তমো ভাল', 'ডাকাতে ভক্তি জোর কোরে আদায় কোরে নেয়'। দাঁড়িয়ে তাল ঠুকে গাইতেন—'আয় মা সাধন সমরে'—সে কী বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি, ঠিক যেন বোধ হতো যেন সাক্ষাৎ জগদম্বা সামনে দাঁড়িয়ে, আর তিনি তাঁকে সমরে আহ্বান করছেন—

আয় মা সাধন সমরে।
দেখব মা হারে কি পুত্র হারে॥
আরোহণ করি দিব্য পুণ্য রথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তাতে,
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্মবাণ, বসে আছি ধরে॥
এবার এস আমার রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
আমার রসনা ঝঙ্কারে তারানাম হুংকারে কার সাধ্য আমার সনে রণ॥

বারে বারে তুমি দৈত্যরণজয়ী, এবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ি।
দ্বিজ রসিকচন্দ্র বলে মা তোমারি বলে জিনিব আমি তোমারে॥

"মাতৃভাবের এ একটা লক্ষণ, ছোট ছেলে জিনিস না পেলে মাকে মারে, ঝগড়া করে, জোর কোরে কেড়ে নেয়, মা মুখে শাসন করে, কিন্তু ভেতরে আনন্দ। আর চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। শুধু কৃত কর্মের অনুশোচনা কোরে কোন লাভ নেই। শুধু হায়! হায়! আমি মহা পাপী! এ সব তমোগুণের লক্ষণ। একজন পুত্র শোকে কাতর হয়ে অনুশোচনা করছে, দেখেই মালকোঁচা মেরে হুহুংকার করে গান ধরলেন—

'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান-তূণ রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান কোরে॥
আর এক যুক্তি, চাইনা রথ রথী, শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি।
রণভূমি যদি করে দাশরথি ভাগীরথীর তীরে॥

"সরল ও বিশ্বাসী হলে তিনি মহাপাতকীকেও স্থান দিতেন। একজনের খাবার থেকে তুলে খেলেন, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'মশাই করেন কি! করেন কি! আমি অখাদ্য খেয়েছি!' বললেন 'তা হোক তুমি সরল, সব খাদ্যই পঞ্চভূতে তৈরী।' পাপীদের তিনি 'পাপী পাপী' করতেন না এবং তারাও নিজেদের 'পাপী পাপী' বলে, এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের উৎসাহ দেবার জন্য গাইতেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করি॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা করি ভ্রূণ সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥
(যদি দুর্গা দুর্গা বলে মরি)।' "

এই সবগান গাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুকরণ করে হাত, পা চোখ নেড়ে নানান্ রকমে ঠাকুরের হাবভাব দেখাতেন। খুব উচ্চস্তর থেকে একজন পরমহংসের সহিত কিরূপ অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা হয়, তাও অনেকবার দেখাতেন। বলতেন, সে ভাষা সাধারণের বোঝবার উপায় নেই। লোকে অবাক হয়ে ভয়ে বিস্ময়ে শুনত।" এরই নাম লীলানুকরণ, যা ভক্তির সাধন, ব্রজ-গোপীদের ভেতর দেখা যেত।

* * * *

স্বামী প্রেমানন্দজী ধর্ম সম্বন্ধে এক একদিন এক একটি অদ্ভুত সংজ্ঞা দিতেন। একদিন নিমগাছ তলায়, ঠিক ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের সামনে (তখনও মন্দির হয় নি ; ওখানে আম, গুলচি এবং কলকে ফুলের গাছের বেশ ঘন ছায়া) বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, (তখন বেলা প্রায় চারটা ভাদ্র মাস, ১৯১৪) "ধর্ম কি জানিস্? যখন মানুষ সংসারের ঝালাপালায় বিরক্ত হয়ে পরমানন্দে বিশ্রাম করবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম। মানুষকে সেই পরমানন্দ পেতে হলে জাগতিক

লাভ লোকসান ভুলতে হবে, থাকবে শুধু অহৈতুকী ভালবাসা সেই সত্যং শিবং পরমপ্রেমাস্পদের প্রতি। এ ছাড়া ধর্মসম্বন্ধীয় আর যা কিছু জানবি সব সাংসারিক নানান রকমের ব্যবসায়ের মধ্যে একটা। তবে ঠাকুর একটু নেমে প্রাকৃত লোকদের জন্য বলতেন, 'খাদ নইলে গড়ন হয় না'—শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম সাধারণের পক্ষে নেওয়া বড় কঠিন।"

আর একদিন বল্লেন, "ধর্ম জিনিসটা কি জানিস? যা শক্তিপ্রদ, দেহে ও মনে বল সঞ্চার করে। যখন মানুষ বুঝতে পারে, আত্মা অবিনাশী, সুখ দুঃখ মানাপমান আকাশে ধূলোর মত আসে যায় তখনই মানুষ নির্ভীক হয়। মানুষ যখন বুঝতে পারে, 'আমি রামদাস, তখনই সে সত্য ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। 'আমি রামদাস', 'আমি শুদ্ধসত্ত্ব, অবিনাশী আত্মা' এইটে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী মনমুখ এক কোরে কাজ করার নামই ধর্ম। এই ধর্ম না থাকলেই মানুষ উঠতে বসতে কেবল ভয়ে মরে;—দেহকষ্টের ভয়, লোকের কথার ভয়, মানাপমানের ভয়। কিসের ভয়! অসত্যের সঙ্গে কখনও compromise (আপোষ) করা চলে না। দলের ভয়? ঠাকুর বলতেন, গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে। অসত্য দল জিতলেও পরিণামে তাদের নরক, আত্মার অধোগতি; সত্যের জন্য পরাজয় ও লাঞ্ছনাও মানুষকে কত বড় করে দেয়, কত শক্তিই না তার ভেতর স্ফুরিত হয়। এইটে জানবি, মনে রাখবি।"

সব পেয়েছি'র স্বপ্ন

কানাই সামন্ত

স্বভাবে ফিরে আত্মদর্শনই মানবজীবনের সুচির-বাঞ্ছিত আদর্শ। স্বভাব জীবননাট্যের রঙ্গমঞ্চ, জীবনযজ্ঞের বেদী, চিরদিন স্বভাবই জীবধাত্রী। মানবজীবন ভাগবত জীবনেরই ভূমিকা। মানুষের আত্মপরিচয়ের সম্পূর্ণতা থেকেই ভাগবত সত্তার পরিচয়ও সহজ এবং সম্ভবপর।

মানুষের অন্ন, বেশ, বাস, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, আচার, উৎসব, ধ্যানধারণা, কৃষি, বাণিজ্য, বিচার-ব্যবস্থা এমনকি সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি— সবই আজ যুগসন্ধিক্ষণে অভাবনীয় রূপান্তর অভিমুখে চলেছে। ভাবুকের মানস আকাশে আজ যা স্বপ্নরূপে বিলসিত কাল তাই বাস্তব সত্য হয়ে মানুষের মুখোমুখী হয়ে যে দাঁড়াবে না কে জানে?

জীবজগতে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে জীবনসংগ্রাম। এতদিনে সময় হল মানুষ প্রবর্তন করবে জীবনলীলা অর্থাৎ, এতদিন বিরোধের দ্বারাই সংসার যাত্রা চলছিল, এখন চলবে মৈত্রী ও প্রীতির দ্বারা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি মিলিত হোক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিলন হোক; সেই অশেষ মিলনে প্রেমের বা আনন্দেরই গৌরব পরম ও চরম। প্রেম বা আনন্দের চেয়ে বল নেই, নব যুগের এই নূতন বেদ।

ব্যক্তি সমস্ত সমাজের জন্য, সমস্ত সমাজ ব্যক্তির জন্য। প্রেমের বা আনন্দের রহস্য এই যে দেওয়া-নেওয়ায় প্রভেদ নেই; এমনকি সব দেওয়াই সব চেয়ে বেশি ক'রে পাওয়া। ঐশ্বর্য বাড়ে কেবল আনন্দের বাণিজ্যে। ব্যক্তি আনন্দে জ্ঞানে শক্তিতে

বা শ্রমে যা কিছু অর্জন করে, উৎপাদন করে, নিঃশেষে সব সমাজকেই দান করুক, আর আপন দেহমনবুদ্ধির বিকাশের প্রয়োজনে, আনন্দের প্রয়োজনে যা কিছু অপরিহার্য সবই সে অনায়াসে ও অবাধে গ্রহণ করুক নিখিল সমাজ থেকে। অন্ন, পরিচ্ছদ, আবাস, বিলাসের ও বিকাশের করণ-উপকরণ, কিছুই কোনো ব্যক্তির জন্য সঞ্চিত হওয়ার ঔচিত্য কোথায়? ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে কিছুই নেই, অথচ প্রতি ব্যক্তি সমস্ত সমাজের ধনে ধনী। স্বভাবের অপরিসীম ঐশ্বর্য সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও অভাব কেবল মানুষের লোভ মোহ অহমিকা প্রভৃতি অন্ধ প্রবৃত্তিরাজির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য। জড়বস্তু স্তূপীকৃত করতে গিয়েই মানুষ আজ এই মনুষ্যসমাজে আপনার ও পরের সকল অশান্তি আর অসুবিধা ঘটায়।

দার্শনিক স্পিনোজা বলেছিলেন, যে বস্তু একজন সঞ্চিত করলে অপরজন বঞ্চিত হয় মানুষের কোনই কল্যাণ নেই তাতে; কিন্তু একজনের যে সম্পদ স্বতঃই অন্যজনকে সমৃদ্ধি দান করে তা থেকেই মানুষের অশেষ কল্যাণ ঘটে। পরিমিত জড়বস্তুর বেলাতেই সঞ্চয় ও বঞ্চনা অবিচ্ছেদ্য, এককালীন। অপরিমিত চিদ্‌বস্তুর বেলায় যা গ্রহণ তাই দান; সঞ্চিত হওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ, সঞ্চারিত হওয়াই তার প্রকৃতি। অতঃপর বলাই বাহুল্য, কিরূপ সঞ্চয়-প্রবৃত্তি থেকে সমাজে সকল অশান্তি ও অসুখের উদ্ভব আর কোন্ সঞ্চয়েই বা আশা ও আহ্লাদ ভিন্ন আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

ভাবী আনন্দিত ও মুক্ত মানবসমাজ স্বভাবের বনে প্রান্তরে গিরিতটে নদীতটেই গড়ে উঠবে। গ্রামে বা নগরে মানুষের যে ঘরবাড়ি এখন দেখা যায় তা স্বভাবের সুষমাময় রূপের ছন্দে কিছুমাত্র মেলে না। কেবলমাত্র বিরল মঠে মন্দিরে, কুঁড়েঘরখানিতে, নদীবক্ষের নৌকাটিতে মানুষের দৃষ্টির ও দরদের অল্প-স্বল্প পরিচয় পাই; স্বভাবের সৃষ্টি আর মানুষের নির্মিতি কিছু যেন আত্মীয়ের সত্যে মিলেছে, মিশেছে। বনের গাছপালা, পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্রের ঢেউ, প্রান্তরের অবাধ প্রসার, এসবের সঙ্গে মানুষের আপন বাসগৃহের ভাবভঙ্গী ও আকৃতি মিলিয়ে নেওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য বা ব্যয়সাধ্য নয়; সে দৃষ্টি চাই, সে বোধ চাই, সে ইচ্ছা চাই কেবল। আর গৃহ আঁকড়ে পড়ে থাকবার জিনিসও নয়। জীবনের বেশির ভাগ কাটুক নীলাকাশের তলে, অরণ্য ছায়ায়, সরিৎসিন্ধুর আন্দোলনে, পাহাড় পর্বতে সানু-উপসানুতে। গৃহ, পথ, উভয়কে নিয়েই মানুষের জীবনযাত্রা। বহু যুগ ধরে মানুষ পথের চেয়ে গৃহকেই বেশী আপনার ব'লে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছে। এখন গৃহ পথ তুল্যমূল্য ব'লে কেন, মানুষ গৃহের তুলনায় পথকে বরং অমূল্য ব'লেই বরণ করবে, করতে চলেছে, এই আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃতির রূপরাজির সঙ্গে মিলিয়ে কোনো মানুষ বা কয়েক জন মানবমানবী যে বাসগৃহ গড়ে তুলল তাতে রইল বাসিন্দা জনের করের স্পর্শ, হৃদয়ের স্পর্শ। তবু পাখির সঙ্গে তার খড়কুটার বাসাখানির যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে তার স্বরচিত বাসগৃহেরও সেই একই সম্বন্ধ। হয়তো বা তার চেয়ে বেশি বন্ধনহীন সম্বন্ধ। যখন খুশি ঘরে এল, যে খুশি ঘরে এল, যেদিন খুশি গৃহকে পিছনে ফেলে দিগন্তরে দেশান্তরে চলে গেল অচেনা-অজানার আহ্বানে। নানা মানুষের রচিত নানাবিধ আলয় বা নিবাসমন্দির, স্বাভাবিক গুহাগৃহ, তরুতলবাস, পথে পথে, পদে পদে। দেশে দেশেই মানুষের সমাজ। কোথাও কারও যাওয়া-আসার, অর্থাৎ ঘরবাঁধার বা 'ঘরের লোক' হওয়ার, পথ খোঁজার বা পথের সঙ্গী হওয়ার কোনো বাধা নেই।

পথ—বাঁধা পথ শুধু নয়। পায়ে চলার পথ, আবার চিহ্নহীন অপূর্ব পথ। আজকের রাজপথকে অরাজক পথ বলাই উচিত; সেখানে প্রতিনিয়ত গতি-উন্মাদ ধনীর রথচক্রে দরিদ্র নরনারী ও নিরীহ

শিশুকে বলি দেওয়া হয়। রেলপথ তেমনি। বিজ্ঞানের প্রসাদে আকাশে যে বিমানপথের ব্যবস্থা হচ্ছে সেও কম বিপজ্জনক ও প্রাণস্পর্শহীন নয়। এ সবেই শক্তির পরিচয় আছে। কিন্তু সুষমার অবকাশ নেই। অথচ স্বভাবের সর্বত্র দেখি শক্তিকে সুষমারূপে প্রকাশের অপরূপ কৌশল। যন্ত্র যতক্ষণ সুন্দর হয়ে উঠল না, আর শক্তির মদে মানুষের প্রাণবলি দাবি করতে থাকল নানাভাবে, যন্ত্রকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে চলাই ভালো—নয়তো যন্ত্রকে ভেঙে নূতন করে সৃষ্টি করতে হয় নূতন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে। সৃষ্টির মানেই হল শক্তিতে ও সুষমায়, সত্য ও সুখে একান্ত মিলন। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির পরিণামে মানুষ সুন্দর অথচ শক্তিমান দুটি যন্ত্রের ডানা তৈরি ক'রে আকাশপারাবারে স্বচ্ছন্দচারী বিহঙ্গের মতো পারাপার করতে পারবে না কেন তা তো বুঝতে পারিনে।

মানুষের অশন-বসনের জটিলতা দূরীকৃত হয়ে সেও সহজ শোভন হওয়া দরকার। গ্রীক পুরাণে বলে প্রমীথ্‌স মানুষকে অগ্নির ব্যবহার শিখিয়েছেন ব'লে জিউসের আদেশে হিংস্র শ্যেনেরা তাঁর অন্ত্রতন্ত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। প্রমীথ্‌স কি সমষ্টিমানবেরই প্রতীক বা প্রতিভূ? অন্নপাকের জন্য অগ্নির যে ব্যবহার তার ফলে মানুষ অন্ত্র-তন্ত্রের নানা জটিল ও মারাত্মক রোগে ভুগে থাকে এ কথা সত্য। আর, অনেক যুগে, অনেক দেশে, নারীজীবনের প্রধান সার্থকতা হয়ে পড়েছে রন্ধন ও পরিবেশন; 'রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা' কলুর বলদের মতো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হয়ে তার শরীর-মনের বিশেষ বিকাশ-সাধনের অবকাশ অতি দুর্লভ। শারীরিক গঠন ও সহজ প্রবৃত্তি-অনুযায়ী মানুষকে মাংসাশী প্রাণী বলা চলে না; ফলমূলভোজী অন্যান্য প্রাণীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উভয়বিধ কল্যাণই আশা করা যায়। স্বাভাবিক জীবনে মানুষের পরিধানটিও বিরল ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন বটে, কিন্তু সব সময় বসন-ভূষণের অভাবকেই অলঙ্ঘ্য বিধিও বলা যায় না। শুধু বলা যায়, প্রকৃতির বৈদ্যুতিক স্পর্শেই প্রাণ থেকে প্রাণ সঞ্চারিত হয়; সুতরাং সর্ব অঙ্গে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে, সর্ব মনে মানুষ সেই স্পর্শের বুভুক্ষু থাকবে, সেই স্পর্শেই সুখী হবে। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝ-খানে—সত্যকার কোনো বাধা বা ব্যবধান থাকবে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নব নব পরিচয়ে মানবসভ্যতা নব নব সমৃদ্ধি লাভ করবে।

নিখিল পরিবর্তনপ্রবাহে মানুষের চারিত্র বা নীতি কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। নীতি-শাস্ত্রের দশ বা দশ শত বিধিনিষেধের স্থানে একটি বিধিই চিরস্মর্তব্য মনে হয়: To thy own self be true. অর্থাৎ, আত্মাই কবির মতো সতত সকল চেষ্টার সলীল ছন্দ রচনা করুন। মানুষ নিজের বাসনা ও অহম্‌ নিরাকৃত করলেই ছন্দপতনের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যথার্থ বিচিত্রতা এ সংসারে কী বা দেখা যায়, জটিলতার তবু অন্ত নেই। গুরু পুরোহিত রাজা শাস্ত্র ও লোকাচার মিলে গ্রন্থী যত খোলে ততই নূতন গ্রন্থি বেঁধে যায়। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ শতগুণে বিচিত্র হোক এবং সে সম্বন্ধ বাসনা ও অহমিকার বদলে আনন্দ ও চৈতন্যে ভ'রে ভ'রে উঠে, সম্যক্‌ বন্ধন নয়, সম্যক্‌ মুক্তি হয়ে উঠুক, যার-পর-নেই সরল ও গভীর হোক।

সাম্যবাদ বা সমূহবাদ (Socialism, Communism) যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করে তা বাইরের প্রতীক, বাইরের আয়োজন। আর, ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদ যে চিত্তশুদ্ধির আদর্শ প্রচার করে তা আন্তরিক সত্য, আন্তরিক হেতু। বাহিরের আয়োজন ও ভিতরের সত্য এরা পরস্পরের অপেক্ষা রাখে; পরস্পর সহযোগিতা থেকেই মানুষের জীবনে ভাবান্তর ও রূপান্তর এনে দিতে সমর্থ। সমূহবাদ জোর দিয়ে বলতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই; অধ্যাত্মবাদ

ততোধিক জোর দিয়ে বলুক, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নেই। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলনের ঐশ্বর্য হবে অজস্র। বাসনা-পরিহারের পরিণামে মানুষ বাঁধন থেকে পিছোয় না, মুক্তি থেকেও পিছোয় না, ভোগ থেকে পিছোয় না, ত্যাগ বা কর্তব্য থেকেও পিছোয় না; কিছুই তার সন্তর্পণে লুকোনো থাকে না, সবই প্রকাশধর্ম বরণ করে।

সৃষ্টির ভিতরে মানুষের স্বতন্ত্র সৃষ্ট হচ্ছে কাব্য-কলা। কাব্যকলার শৈশবে গিরিগুহায় অরণ্যে পল্লীতে ছড়ায় ও ছবিতে কোথাও স্রষ্টা বলে মানুষ-বিশেষের কোনো পরিচয় নেই। সে সবই মানব-সাধারণের সম্মিলিত প্রাণ থেকে, প্রেরণা থেকে বিকাশ পেয়েছে। তার পর বহু শতাব্দী ধরে কাব্যে কলায় সৃষ্টিতে এক-একজন মানুষ নিজের পরিচয়, এক-একজন মানুষ নিজের নামের মুদ্রাঙ্কন দিয়ে গেছে; যেন বা সত্যই তা একটি মাত্র মানুষের রচনা! ধনী, বিলাসী, বিদ্বান্, এঁরা প্রধানতঃ আপন আপন ভোগ-দখলে লাগিয়েছেন তা অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে; যেন তা সত্যই ভাগ ক'রে ভোগ করা যায়। কবিতায় ছবিতে নাচে গানে যে মানুষ সৃষ্টি করে সে জানুক নিজে সে স্রষ্টা নয়, স্রষ্টার প্রতিনিধি—পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই স্রষ্টা চৈতন্যময় সর্বগত এক সত্তা ও সর্বমানব। কবি বা শিল্পীর তাই কোনোরূপ অভিমান নেই, অক্ষয় আনন্দ আছে। আবার এক-একজন বিচ্ছিন্ন মানবকেই যে শিল্পসৃষ্টির উপলক্ষ্য হতে হবে তারও কোনো মানে নেই। ব্যষ্টির মতো সমষ্টিও আপন অন্তর-উৎস থেকে রসসৃষ্টির ধারা উৎসারিত করে দেবে না কেন? স্বভাবের মুক্ত অঙ্গনে উৎসবমিলিত নরনারী সকলে মিলে বিনা আয়াসে যা রচনা করবে বিনা অভ্যাসে তারই অভিনয় করবে; বাইরে থেকে কোনো কবি চিত্রকর গায়ক বা গুণীকে আহ্বান অপরিহার্য হবে না। আর, এই রচনা কখনো লিপিবদ্ধ হবে না হয়তো, বিধিবদ্ধ হবে না; যে ইচ্ছা বা যে আনন্দ থেকে এই কলাসৃষ্টির উদ্ভব তার নেই সঞ্চয়, তার নেই ক্ষয়। সঞ্চয় তেমনি আবশ্যিক নয় ব্যষ্টির রচনার; ক্ষয় নেই ব্যষ্টি রচয়িতারও ইচ্ছায়, আনন্দে। এই যে আমরা এত আয়াস ক'রে, পদে পদে এত সংস্কার ক'রে কবিতা বা ছবি বা মূর্তি রচনা করে, তবু নিজের রচনাতে নিজে কখনোই সন্তুষ্ট হতে পারি নে, তার কারণ আর কিছুই নয়—রচয়িতার অভিমান রচনা নিয়ে আমাদের সহজে খুশি হতে দেয় না, তা ছাড়া আন্তরিক ভাব অনুভূতি ও বাহ্যিক প্রকাশ উভয়ের মাঝখানে ভুল অভ্যাস, ভুল উপলব্ধি ও ভ্রান্ত জ্ঞানের বহু আবরণ ও বহু বাধা রচনাকে সহজেই সুন্দর হতে দেয় না, খুঁত লেগেই থাকে। চিত্তশুদ্ধির ফলে স্রষ্টার অন্তর থেকে সব বাধা, সব আবরণ অপসারিত হলে আর সমাজশুদ্ধির ফলে সামাজিকেরা সার্থক সৃষ্টিকে বরণ করে নিতে সদাই উদ্‌যুক্ত থাকলে মানুষের আশ্চর্য রচনা সব আশ্চর্য-ভাবেই সহজ হবে; তারপর নিজের স্বাধীন জীবন নিজেই যাপন করবে। কবি জর্জ রাশেল বলেন, সত্যকার সমষ্টিজীবনের অসদ্ভাবে এ যুগে মহাকাব্য সম্ভব হল না, হবারও নয়। কিন্তু আমাদের ধ্যানের ভুবনে এমন কি খণ্ড কবিতা-গানগুলিও ভিতরে ভিতরে এমন অটুট ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হতে থাকবে তাতেই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত নিখিল মানবের মহাজীবন প্রতিভাসিত হবে। অনেক কবিপ্রাণকে অথবা সমস্ত জাতির প্রাণকে সবলে আকর্ষণ করে নূতন নূতন মহাকাব্যের সম্ভাবনাও স্বপ্ন নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ সার্থকতা কী? অধুনা আমরা 'বিজ্ঞান' কথাটি এক অর্থে ব্যবহার করছি, আর প্রাচীন ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। এই শব্দটির পৃথক ব্যবহার থেকেই প্রাচীন সংস্কৃতির ও আধুনিক সভ্যতার মর্মগত পার্থক্য ধরা যায়। প্রাচীনেরা জীবনের সর্ববিষয়ে

সর্বস্তরে চলেছিলেন অন্বয়ের মুখে; ধ্যানে প্রথমেই সমগ্রকে ধারণা করা তাঁদের জ্ঞানের মার্গ ছিল। আধুনিক চলেছে বিশ্লেষণের মুখে, প্রথমেই বিচার ক'রে, বিতর্ক ক'রে, ভগ্নাংশকেও ভাগ ক'রে ক'রে; পরে সেই অংশগুলিকে পুনরায় একত্র ক'রে পূর্ণকে অবধারণ করবার ক্লেশসাধ্য অথচ ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়। প্রাচীন ঋষি বুঝতেন পূর্ণকে ধ্যানের দ্বারা ধারণা করাই জ্ঞানলাভের প্রথম ও শেষ কথা; অশেষ বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ কেবল মাঝখানে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অন্য ভাবে জ্ঞানের সাধনা করে অবশেষে আভাসে ইশারায় বুঝেছেন—অথবা আজও বোঝেন নি কি?—সমগ্রের সঙ্গেই জীবের প্রাণ-বাণিজ্য; অতএব সমগ্রকে দেখাই, সমগ্রকে উপলব্ধি করাই জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজন; প্রাণহীন খণ্ডগুলির যোগে অখণ্ডের কাঠামো একটি পেলেও তার বিশাল প্রাণ পাই না, কাজেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রবল সাক্ষ্য অস্বীকার ক'রেও বলতে হয় যে অখণ্ড তার খণ্ডগুলির যোগফলের একান্তই অতীত। ছায়া ও কায়া এক নয়। কাজেই দেখি প্রাচীন বিজ্ঞান অতি অন্তরঙ্গ অপরোক্ষানুভূতি; আর আজও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মুখ্য প্রমাণ বাইরে, অধিকাংশ উপায় ও অবলম্বন বাহিরেই। মানুষ আজ বিজ্ঞানবলে বাহ্য জগৎকে জয় করতে গিয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানে বিশ্বাসে ব্যবহারে চেষ্টায় বাহ্য জগতের ক্রীতদাস হয়ে পড়ছে। ধ্যানের অভ্যাসে ও প্রতিভার প্রেরণে মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাসের একান্ত পরনির্ভরতা ও জড়দাসত্ব মোচন করা প্রয়োজন। যন্ত্রকে যন্ত্রের স্থানে রেখে মানুষের চিন্তায় চেষ্টায় স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা আসুক। বর্তমান যুগে যান্ত্রিকতার বাহুল্যে জীবনে শিল্পকারুর স্থান নেই বড় একটা; বড়বাড়ি, তৈজসপত্রে দরদের ও হাতের নিপুণ স্পর্শের অভাব হয়েছে, সৌন্দর্য ও বিচিত্রতাও বিরল। ফলে, শিল্পকলা মানুষের চিত্তবৃত্তি ও আচার-আচরণের যেভাবে সুন্দর বিকাশ ও সমূহ উৎকর্ষ সাধন করে তা থেকে মানবসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতার আর এক অশুভ পরিণাম, লক্ষ লক্ষ মানুষকে যন্ত্র করে তুলেছে। মানুষের জন্য যন্ত্র না হয়ে যন্ত্রের জন্যই মানুষের মরণ-বাঁচন এর চেয়ে অস্বাভাবিক ও নির্মম নিয়তি আর কিছুই হতে পারে না। যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি হলে শক্তিলাভে ও প্রয়োজনপূরণে মানুষের কল্যাণ হয় সন্দেহ নেই। যন্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়া চাই। কিন্তু, সর্বাগ্রে মানুষ মানুষ হোক; মানুষ দেবতা হোক; মানবসাধারণ যন্ত্রের বশীভূত না হয়ে যন্ত্রই মানবসাধারণের সম্পূর্ণ বশে আসুক। বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করে হীনসংখ্য শ্রেণীর নিরর্থক মুনফার আশায় আর মুষ্টিমেয় মানুষের শাসনাধীনে অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ সাধন সংগত হয় না। বিরল ক্ষেত্রে কল-কারখানার প্রয়োজন থাক্; আর অনেক মানুষের একই কাজে একত্র মিলিত হওয়ার এখন বিশেষ মূল্য আছে, ভবিষ্যতেও কিছু হয়ত থাকবে। কিন্তু, বিজ্ঞান যেন প্রত্যেক মানুষের হাতে হাতে কার্যোপযোগী নব নব যন্ত্র তুলে দেয়, মানুষ যেন কলের কাছে হৃদয়-দরদের ও হাতের নিপুণতার যে চমৎকারিত্ব তা আশা না করে এবং ইচ্ছা হলেই যন্ত্র তুলে নেয় আর ইচ্ছা হলেই তা সরিয়ে রেখে দশ আঙুলের লীলায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। কাজের বাহ্যিক দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে বলে কাজের সারল্য প্রয়োজন। শ্রম প্রত্যেক মানুষের করণীয়। বিনা শ্রমে কোনো সুস্থ দেহীর জীবিকায় অধিকার নেই। মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সেই শ্রমে নিযুক্ত থাকুক; একা একা নিযুক্ত থাকলেই বা ক্ষতি কি? যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞানে ও আনন্দে মিলতে পারে তাদের যন্ত্রদানবের তামসিক উপাসনায় মিলতে হয় না।

আপন আপন যথার্থ পরিচয় পেলে বিজ্ঞান ও কবিতাকলা পরস্পরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উঁচিয়ে রাখবে না; ভাই-ভগিনীর মতোই মিলিত হতে বাধ্য। সমগ্রকে ধ্যানের দ্বারা জানা বিজ্ঞানের

উদ্দেশ্য। সমগ্রকে প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা ও মূর্তি দেওয়া কবিতাকলা বা জীবনেরও অভিলাষ। জ্ঞানযোগে আর প্রেমযোগে একই তীর্থদেবতার পদতলে উপনীত হওয়া যায়। বিতর্ক কোথা থেকে? তা ছাড়া, জ্ঞানেও প্রেম থাকে, প্রেমেও জ্ঞান না থাকলে অশেষ লীলার যে অপরিসীম মুক্তি তা তো মেলে না।

বলপ্রয়োগ এবং শাসনের উপর যা দাঁড়িয়ে আছে তাই রাষ্ট্র। ইচ্ছায়, আনন্দে, সর্বসাধারণ প্রয়োজনের সম্মিলিত বোধ থেকে যে সমবায় সংস্থিতি সেই হল সমাজ।

নিখিল মানবজাতিকে নিয়ে নিখিল মানব-সমাজ, এক মানবপরিবার। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন প্রতিভা, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, পৃথিবী ব্যাপী সবেরই স্থান আছে। কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে নয়, পরস্পর মিলিত হয়ে। এক পরিবারের অন্তর্গত স্ত্রীপুরুষ যখন পরস্পরকে লক্ষ্য করে অহর্নিশ ছোরা শানায় না বা বন্দুকে গুলি ভরে রাখে না, তখন উৎকট ভয়ে বা উৎকটতর লোভে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ বা জাতিগুলি সর্বদা রণ-সাজে সজ্জিত থাকবে, এক শ্রেণীর মানুষকে হত্যার যন্ত্র করে রাখবে, জাতীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের অর্ধেকের এইভাবে অপব্যয় করবে, মনের শান্তি বা প্রাণের প্রীতি কী জিনিষ জাতিগত ভাবে স্বপ্নেও তা জানবে না, এর চেয়ে অকল্যাণকর অস্বাভাবিকতা আর কী হতে পারে? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন প্রীতিসম্বন্ধ, জাতিতে জাতিতে তেমনি হওয়াই তো শোভন ও সংগত। ভাবী যুগে সকল মানুষের অন্তর থেকে হিংসা ভয় লোভ দূরে গিয়ে সহযোগিতা সাহস মৈত্রী বিরাজ করবে; ফলে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ও যুদ্ধসজ্জার সমস্ত জঞ্জাল দূর হয়ে যাবে। মানুষের যা কিছু দুর্বল মনোবৃত্তি তা থেকেই যুদ্ধাদির উদ্ভব এবং মনুষ্যত্বকে অঙ্গহীন ও দুর্বল করেই যুদ্ধের সৈনিক তৈরি হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের মানুষ স্বভাবসবল। সর্বাঙ্গীণ বললাভই সর্বাঙ্গীণ জীবনলীলার সাধন। সব জাতি ও সব সমাজ যদি দেহ প্রাণ হৃদয় বুদ্ধি ও চেতনার স্বাভাবিক বলে বলীয়ান হন, তবে জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, মিলন ও মিশ্রণের ফলে সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতি বৈ অবনতি হবে না এবং একই মানবধর্মের অন্তর্গত বিবিধ মানব সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশ হতে থাকবে।

কবে গো!

ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু, স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায় মানুষ তপস্যায় প্রবৃত্ত না হলে, সাধনায় উদ্-যুক্ত না হলে। স্বপ্ন আর সাধনা এক নয়। স্বপ্ন যেন ফুল—আকাশ ও ধরণীর, স্বর্গ ও মর্ত্যের, সত্য ও বাস্তবের, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝখানে খুসি হয়ে ফুটে উঠেছে। উভয়ের মিলনস্থল সে: উভয় ভুবন উভয় কাল থেকে মধুপগুলিকে গন্ধ-বেদন পাঠিয়ে ডেকে আনাই তার কাজ। পরে যখন মধুপপঙক্তির আনাগোনায় ফুলের গোপন ফল জাগতে থাকে তখন দলে দলে শেষ হাসি হেসে দীর্ণ হয়ে কীর্ণ হয়ে পথধূলিকে বিচিত্র করাই তার ভাগ্য। স্বপ্ন দিয়ে বেশী কিছু সম্ভব হয় না, অথচ সবকিছুরই সূচনা হয়। ভবিষ্যৎ মানবসমাজকে যদি মানুষের মনের মতো করে গড়তে হয় তবে সভাসমিতি বিধিব্যবস্থা যন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা কিছুতেই তা সম্ভব হবে না; যেটি মনের মতো তারই সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মানুষের সব মনটি বদলে ফেলা চাই। খুব সংক্ষেপে বলি, সাধনায় মানুষ যদি বিশ্বের সর্বভূতে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরে সর্বভূতকে দেখতে শেখে, আপনাতে নিখিল ও নিখিলেশ্বরকে আর ঈশ্বরসনাথ নিখিলে আপনাকে লাভ করে, তবেই সকল অসম্ভব স্বপ্ন সম্ভব হবে, মর্ত্যজীবনই দেব-জীবনে উত্তীর্ণ হবার শেষ সোপান হয়ে উঠবে।

চাওয়া-পাওয়া

(এক)

শ্রীমতী পুষ্প বসু

তোমার মাঝে হারিয়ে ফেলা,
সেই ত আমার চাওয়া।
তোমার পথে এগিয়ে চলা,
সেই ত আমার যাওয়া ॥
তোমার দান দুঃখ বেদন,
সেই ত আমার সওয়া।
তোমার সাধ রিক্ত-জীবন,
সেই ত আমার বওয়া ॥
তোমার কাছে হৃদয় বলি,
সেই ত আমার দেওয়া।
তোমার পায়ে প্রণাম করি,
সেই ত আমার পাওয়া ॥

(দুই)

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

যেথা কিছু নাই
সেথা তোমা পাই
তুমি তাই তুমি তাই গো ;
যেথা সব আছে
তুমি তার মাঝে
আঁখি মেলে যেথা চাই গো।
রূপে ও অরূপে
তুমি চুপে চুপে
রহ আপনায় মগ্ন,
তবু আমি আমি
কেন দিবা যামী
দিয়েছো মায়ার স্বপ্ন ?

হারা গান

'বৈভব'

হয়ত বা এ জীবনে
হবে নাকো শে: —
হয়ত রহিয়া যাবে
ক্ষীণ তার রে
জীবনে জীবনে পুন
উঠিবে বাজি
সে দিনের প্রিয় গান
স্বপ্ন আজি !
কত শত গান মোর
জাগালো পরাণ
জ্বালায়ে চলিয়া গেল'
সুদূরের টান,

সে দিনের হারা গান
উঠিবে জাগি
কবে মোর পরাণের
মুক্তি লাগি ?
কত শত হারা গান
আকুলে বাজে—
সুদূরের অতীতের
জীবন মাঝে,—
তারা কিগো আসিবে না
হৃদয়ে ফিরে—
আঁধারে লুকালো যারা
আকাশে ধীরে ?

রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

বেদান্ত তন্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থে বহু তত্ত্ব কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে—কিন্তু সেগুলি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করেন এমন ভক্ত সাধকের সংখ্যা অল্প। সাধক রামপ্রসাদ একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যখন তিনি স্বগৃহে বসিয়া ভজনপূজন করিতেন। তিনি তখনই সাধনায় ডুবিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই মায়াপাশে বাঁধা থাকার দরুন (মায়াপাশে আছি ঘেরা)। এইরূপ পাশ ছেদন করা, বন্ধন ছিন্ন করা বীরের যথার্থ কার্য। যাঁহারা এ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহারাই 'বীরাচারী'।

প্রসাদ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্তরবিভাগ-অনুসারে আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে প্রশস্ততর মার্গ অবলম্বন করিয়া, সকল কর্তব্য সমাধা করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। আমাদের গৌরবময় অধ্যাত্মভ্রমণপথের স্তরবিভাগ সাধারণভাবে এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরা। প্রসাদের পক্ষে প্রযোজ্য প্রথমের অন্তর্গত বাহ্য পূজা, অন্তরে মুণ্ডমালী-দর্শন, কল্পবৃক্ষতলে দেবীদর্শন ও শবসাধনা; দ্বিতীয়—অন্তর্মার্গাদি, ষট্‌চক্রসাধনা প্রভৃতি, ষড়রিপুর বিদায় (গানে—মনরসনা কালীর নামে দল বাঁধিয়াছে, ষড়রিপু ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে), মহাপুরশ্চরণ মন-রসনা ও আমিত্ব বা অহঙ্কার-ত্যাগ (ঘর ভেদি যে দুজন ছিল—মন ও রসনা—তাদের পরাজয় করেছি; ডঙ্কা মেরে বসে আছি); তৃতীয়—যোগসূচনা, ব্রহ্ম-সাধনা। রামপ্রসাদ পরমব্রহ্মের মাতৃভাবের সাধনা করিয়াছিলেন—"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীকে স্থানে স্থানে এলোকেশী আখ্যা দিয়াছেন। পরমকারণ স্বপ্রকাশ পরমশিব (পরমব্রহ্ম) স্বয়ং অগণিত বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন যে শক্তির দ্বারা তাহারই নাম এলোকেশী। শিব দ্রষ্টা, শক্তি দৃশ্য; শিব স্থির, শক্তি চঞ্চলা; উভয়যোগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শিব-শক্তির আকর্ষণ-বিক্ষেপণের যোগা-যোগের ফল, চৈতন্যের সান্নিধ্যে চঞ্চলার চাঞ্চল্যের ফল। নৃত্যপরায়ণা চঞ্চলা ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভ্রান্তি মায়া মোহ উৎপাদন করিতেছেন, প্রাণপুরুষ পরাণপুতলী শিবকে অন্তরালে রাখিয়াছেন। এই অদ্বিতীয় মহাশক্তির প্রভাব ঐ যোগাযোগের প্রবর্তক ও নিয়ামক, অনাদিকাল হইতে অনাগত চির ভবিষ্যৎ এই শক্তির অধীন। রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী ঐ মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী এলোকেশী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে অভিধেয় বিভিন্ন শক্তির মাঝে (বিরাজে গো ব্রহ্মময়ী অংশরূপা) ষড়রিপু মন রসনা অহঙ্কারের উৎপীড়ন সহ্য করিয়া উহাদের কেন্দ্রস্বরূপ সনাতনী জ্যোতির্ময়ী আদ্যাশক্তি এলোকেশীর দিব্য সৌম্যমূর্তি রামপ্রসাদ দেখিয়াছিলেন। করালবদনা কালীমূর্তির মধ্যে নিহিত তিনি অনন্ত স্নেহমণ্ডিত জননীর সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এতটাই আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন যে, যাবতীয় প্রসাদী রচনা (গান) এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। প্রসাদের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত যে বিরাগের সুর তাহা বিরাগ নহে,

অনুরাগের ছন্দরূপ "অভয় পাবার আশে।" সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার শেষ সম্বল 'ঝুলি কাঁথা'—তাহাও বিসর্জন দিতে তিনি প্রস্তুত। ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া আকুলভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়াছিলেন—"ঠাই দে মা তোর চরণতলে।" এই কান্না থামিয়াছিল যখন স্নেহময়ী জননী আপন ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন।

দুঃসহ দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও রামপ্রসাদ দৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেন নাই। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন, "সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন! সুখের আশে বড় কসা।" প্রসাদ ঐ দয়ালাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিয়াছেন, "আমি কি দুঃখেরে ডরাই। * * * দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।" দুঃখের মাঝে তিনি জননীর উপর রাগ-অভিমান যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমুদায় মায়ের দুরন্ত, আদুরে ছেলের কথা। নতুবা আবার কেন অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিবেন—

"পুরাও মনস্কাম, জপি তারানাম,
　　তারা তব নাম সংসারের সার।
কাল গেল কালী হল না সাধন,
　　প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভববন্ধন কর বিমোচন,
　　মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥"

রামপ্রসাদ অরণ্যে রোদন করেন নাই। এই সকল উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বাস্তব সংসারের যাবতীয় কথা-ব্যথা অভাব-অভিযোগ তৎসমুদয় ব্রহ্মময়ী জগন্মাতাতে নিজ গর্ভধারিণীর মত আপনি করিয়া লইয়া নিজ সংসারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়াছেন—"ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে। ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥" আরও লক্ষ্য করিতে হইবে গানগুলি হইতে যে তিনি আধ্যাত্মিক জগৎকে অতি বাস্তবের সহিত একাকার করিয়া দিয়াছিলেন, নিসর্গকে ঘরোয়া করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন একমাত্র মায়ামোহ-বিরহিত বিশ্বাস-ভক্তিপ্রধান নির্ভরশীলতার বলে—"মা শব্দ মমতাযুত কাঁদলে কোলে করে সুত, দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, তুমি কি ছাড়া জগৎ॥" মায়ের সাড়া না পাইয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়া বলিলেন—

"কেন মিছে মা মা কর, মা কি আর আছে ভাই।
থাকলে আসি দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই॥"

কে তাঁহার ইষ্টদেবীকে বলিতে পারেন—"গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হয়েছ কালী"—(পুং কালা, স্ত্রীং কালী)।

প্রসাদের গানগুলির পর্যালোচনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রের উপদেশ ও শঙ্করাচার্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণের দার্শনিক উক্তির আপন কর্মজাত জ্ঞানের সহিত সমন্বয় করিয়া গানে তাহার রূপ দিয়াছেন। যে কোন বস্তু-সামগ্রী প্রসাদের দৃষ্টিতে পড়িত, যে কোন দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে আসিত, সংসার বা সমাজের যে কোন ঘটনা তিনি লক্ষ্য করিতেন, তখনই উহা উপলক্ষ্য করিয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিতেন; উহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিষয়বস্তু যথেষ্ট ভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়। নদীবক্ষে ভাসমান তরী দেখিয়া নদী বা ভবসাগরকে সংসার ও জীবনকে তরী বলিয়াছেন, দাঁড়িমাঝির স্থানে মনমাঝি কর্ণধার ও "দাঁড়ি রিপু ছয় জন।" কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া মানবদেহকে জমীনের সহিত তুলনা করিলেন—

"দেহজমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি তায় সকল চষি,
হৃদয়মধ্যেতে আছে পাপরূপ তৃণরাশি॥"

পুনরায় বলিলেন—"মনরে কৃষিকাজ জান না। এমন মানবজমি রইলো পতিত আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।" ওঝা ব্যাধ প্রভৃতিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—

"মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপধরা জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে
বেড়াস ফাঁকি।
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে,
মনরে ওঝার·ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে
নাকি।
জাতি ধর্ম সর্পখেলা, এই মন্ত্রে করো না হেলা। * *
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায় তার চেয়ে কে অবোধ
ধরায়॥"
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকতে শিখে রাখি॥

জেলের উপমা দিয়া বলিয়াছেন—"জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে, ভবে আবার কি হইবে গো মা। পালাবার পথ নাইকো জলে পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে। রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥" দোল ও চড়ক উৎসবের দুটি গান সর্বজনবিদিত, (কুমারহট্ট গ্রামে দোল ও চড়ক-পূজা বহুদিন হইতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শিবের গলিতে অদ্যাপি চড়কপূজা হইয়া থাকে)। তদ্ভিন্ন আদালত, কলুর বলদ, দাবা, পাশা, ঘুড়ি, ডাণ্ডাগুলিও উল্লেখযোগ্য (কবাটি ও মার্বেল খেলা হয়ত তখনও প্রচলিত হয় নাই)। এই সমুদয় হইতে রামপ্রসাদ শিক্ষা সংগ্রহ করিতেন ও গানের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন; যেমন—

"তক্তুর তরী ভবের চড়ায় ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে
বেয়ে চলে যারে রে॥"

বাহ্যতঃ সংসারসমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জন-সাধারণের সমক্ষে তিনি দায়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব ইষ্টদেবীর উপর ন্যস্ত করিয়া নিজে তৃতীয় ব্যক্তির মত উপলক্ষ্যমাত্র থাকিয়া মায়ের আদেশ-নির্দেশ পালন করিতেন—"তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।"

কোন বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান ছিল না, তিনি "উপলক্ষ্যমাত্র, মায়াপাশে ঘেরা।" চাকরি করিয়াছেন, চাষ-আবাদ করেন নাই তাহাও নহে, আবার কাব্যাদি রচনাও করিযাছেন, পরন্তু এ সমুদয় মায়ার কার্য—"মায়ার এ পরম কৌতুক। মায়া বদ্ধজনে ধাবতি, আবদ্ধজনে লুটে সুখ।" কিন্তু সাধনমার্গে কিছু অগ্রসর হইয়া যখন বুঝিয়াছিলেন যে মায়ার অধীনে থাকিয়া তাঁহার পরাগতি লাভ হইবে না, তখনই কালীনাম-তীক্ষ্ণখড়্গে মায়াপাশ কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি মুক্ত, পুনরায় চাকরি প্রভৃতি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হন নাই, সমাজের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অনায়াসেই বলিতে পারিয়াছিলেন—

"তুমি পরের আশা আর করো না।
* * সুদিন দেখে অধীন জনে
করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে
সেদিন অধীন কেউ রবে না॥"

তিনি কর্মকে জয় করিয়াছিলেন কর্মের ভিতর দিয়া, সংসার ও ধর্মসাধনা এই উভয় ক্ষেত্রেই। কোন কিছুতেই কোন দিন তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না একমাত্র জননীর চরণকমল লাভ ব্যতিরেকে- "কাজ কি মা সামান্য ধনে। * * আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ও চরণে॥' রাজসম্মান-প্রলোভনাদিও উপেক্ষা করিয়া প্রসাদ দিন কাটাইয়াছিলেন 'হয়ে কালীর শরণাগত॥'

রামপ্রসাদ কর্মকে হেয়জ্ঞান করেন নাই, পক্ষান্তরে শ্রেয় বলিয়াছেন—"কর্মে কেন হওবে চাষা।" চাষা অশিক্ষিত, চলিত কথায় বোকা। সংসারপালন ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই এই উক্তি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে "মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা" এ বাক্যও স্পষ্ট বোঝা যাইবে।' এ সম্পর্কে "প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে সোজা হয়ে চল রে।" নতুবা "কালের

বশে কাজ হারালে * * * আমশী খাবে আম ফুরালে।" কাল আলস্য, জড়তা। ধর্মসাধনা-সম্বন্ধে জোর দিয়াই বলিয়াছেন—"তনুর তরী ভবের গোড়ায় ঠেকে রয়েছে রে। যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥" এখানে গুরু শব্দের ব্যবহার হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অশিক্ষিতের পক্ষে ধর্ম ও কর্মসাধনা-সংক্রান্ত উভয়বিধ শিক্ষা-গ্রহণের এবং 'বাদাম দিয়ে' অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। "তুমি দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও" বাক্যের 'দমসামর্থ্য' শিক্ষা ও অভ্যাসের কথা। নচেৎ "অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে উভয়েতে কূপে পড়ে। কর্মীকে কি কর্ম ছাড়ে তার কি প্রসঙ্গ॥" ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট দেহযুক্ত জীবকে কর্ম করিতেই হইবে এবং "যার যেম্নি কর্ম তেম্নি ফল" নিশ্চিত থাকায় ইন্দ্রিয়াদি সুনিয়ন্ত্রিত ও অনুষ্ঠানাদি-সম্পর্কে সতর্কতার আবশ্যকতা আছে, কেন না "ইন্দ্রিয় অবশ যার দেবতা কি বশ তার।" ইহাও ঠিক যে "কর্মসূত্রে যা আছে কেবা পাবে তার বাড়া॥" অতএব ইহাও অভিপ্রেত যে, সংসার-সমাজ ও ধর্মসাধনা উভয় পক্ষেই বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুষ্ঠানাদির প্রয়োজন। রামপ্রসাদ সকল রকম কর্মেরই শুদ্ধতা রক্ষার পরামর্শ দিয়া কপটাচারের নিন্দা করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "ভেবেছ কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা।" কিন্তু "যখন দণ্ডপাণি লবে টেনে কি করবে ও বাবাজী" তখন "(ওরে) কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে?" সুতরাং কপটতা ত্যাগ কর। তিনি স্বভাবতঃ স্পষ্টবক্তা ছিলেন, তাঁহার কথা হইল "লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর বয়ে গেল। আছে ভাল মন্দ দুটা কথা যা ভাল তাই করা ভাল।" ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই রকম ভালমন্দ-বিচারের সময় তিনি কোন দিক উপেক্ষা করেন নাই। স্বয়ং 'উপলক্ষ্যমাত্র হইয়া অকপট হৃদয়ে যত্নের সহিত কর্তব্যপালন করিতে হইবে ইহাই তাঁহার অভিমত এবং ভজনপূজন-সম্বন্ধে গৃহী লোকের পক্ষে বলিয়াছেন, "অষ্টযামের অর্ধ যাম আনন্দেতে সুখে থাক।"

রামপ্রসাদ সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকলের বাহিরে ছিলেন। সংসার প্রতিপালন করিয়াছেন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া কর্তব্যানুরোধে। সকল ভার জননীর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজের কর্মময় জীবন লইয়া তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। জীবনের প্রথমাবধি প্রসাদ তাঁহার জননীর অনুরাগী ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহা কুসুমিত হইয়াছিল ভক্তি-বিশ্বাস-নির্ভরশীলতায় এবং অন্তে এইরূপ পুষ্পস্তবকের অঞ্জলি দিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমি আর কি ভুলি, অভয় পদে জন্মের মত ডুবেছি রে॥" পরিশেষে তাঁহার যাবতীয় কর্ম ও কর্মফল জননী ব্রহ্মময়ী এলোকেশীর চরণে সমর্পণ করিয়া সকল অভাবের মোচন করিয়াছিলেন ব্রহ্মময়ীর সাক্ষ্যে শিবরাজ্যে বসতভিটার পাট্টা হস্তগত করিয়া। আয়াসসাধ্য সাধনার শেষে শিবশক্তির মিলন ঘটাইয়া গাহিলেন—

"আমার নাই অবকাশ হল সব কাজ
　　জন্ম-মৃত্যু দুটো অশৌচ ঘটেছে।
চিন্তা ভার্যা বন্ধ্যা ছিল,
　　সে ভার্যা প্রসব করেছে॥
কাল অনুক্রম সুসঙ্গমে
　　জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে।
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল
　　সেও আমায় ত্যাগ করেছে।
সেই পিতার লাগি হয়ে বিরাগী
　　মায়া নামে আমার মা মরেছে॥
*　　*　　*
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে
　　যত বিপদ গৃহবাসে
এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে
　　জয়কালী বলে বেড়াই নেচে॥"

কর্মে যোগ

শ্রীক্ষেত্রমোহন নাথ, বি-এল্

কর্মাকর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ের জন্য একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হাতে লইয়া আমাদিগকে পথ চলিতে হইবে। যে কর্মে জীবের অবনতি ঘটে তাহা অকর্ম এবং যাহাতে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হয় তাহাই কর্ম—এই মাপকাঠিই হইল দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। ইহা দেখিবার অর্থাৎ যন্ত্রটি ব্যবহারের কৌশলও জানা প্রয়োজন, এই কৌশলই হইল যোগ —'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' (গীতা ২।৫০)।

বিভিন্নরূপ বিভ্রান্তিকর কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি অনুসরণ করিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না, হইলেও নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যাইবে, তাহা কৌশলের সহিত নির্ধারণ করিতে হইবে। কৌশল আয়ত্ত করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কি ব্যবহারিক জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বত্রই এই কৌশল জানা দরকার। একজন ডাক্তার রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করিবেন। রোগীর বলাবল, দেহের গঠন, স্থানীয় শিরা-উপশিরা, মাংসপেশী, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিচয়, ক্ষতের প্রকৃতি প্রভৃতি যেমন জানা প্রয়োজন হস্তের নিপুণতাও সেইরূপ প্রয়োজন। লাঠিয়াল লাঠি চালায়, প্যাঁচে প্যাঁচে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে এবং নিজকে রক্ষা করে, এসমস্তই হস্তের নিপুণতা। নিপুণতার অভাব হইলে লাঠি প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারিবে না, পরন্তু নিজের লাঠিই নিজের মাথা ভাঙ্গিবে। ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের নিপুণতা, লাঠিয়ালের লাঠি পরিচালনার নিপুণতাই কৌশল।

কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া কর্ম করার নাম কর্মযোগ। যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম করেন তিনিই কর্মযোগী। যোগ একটা উন্নত মনের অবস্থা-বিশেষ। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম ও অকর্ম নিরূপণের কৌশল আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। যোগাভ্যাসের প্রথম সোপান হইল মনকে কোন স্থির লক্ষ্য বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট করা। ইন্দ্রিয়াদির অনুকূল বস্তুতে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বস্তুতে বিরাগ স্বাভাবিক। অনুকূল বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বশতঃ যখন কোন ইন্দ্রিয় সেই বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য মন কর্তৃক নিয়োজিত হয় তখন যোগী চেষ্টা করিবেন সেই বিষয়ে উদাসীন থাকিতে। তাঁহাকে মনে করিতে হইবে, 'গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।" (গীতা, ৩।২৮)—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি নহি। এই মনে করিয়া যোগী ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত বা মগ্ন হইবেন না। এই রকম অভ্যাস করিলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আসিবে এবং ধীরে ধীরে মন সংযত হইয়া স্থির লক্ষ্য বস্তুতে নিবিষ্ট ও বিক্ষেপবিহীন হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রাগদ্বেষ, শত্রুতা, মিত্রতা, স্তুতি বা নিন্দা দ্বারা মন চঞ্চল হয় না। ইহা মনের একটা উন্নত অবস্থা। এই অবস্থায় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসে, ব্যবহারিক জীবনও অতি সুসমঞ্জস হয়।

যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই তাহার বিষয়ভোগ, আর যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে তাঁহার বিষয়ভোগ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতে একই রকম, কিন্তু অযুক্ত ব্যক্তির ভোগের দ্বারা উত্তরোত্তর আসক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলেই তাহার মনে শান্তি থাকে না। পরন্তু যুক্তব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি না থাকায় ভোগ্য বস্তুর ভোগ বা অভোগের জন্য মনের কোন স্থৈর্যই

নষ্ট হয় না। তখন সাংসারিক কাজকর্ম করিতেও কোন বাধা হয় না। রাজর্ষি জনক যোগস্থ হইয়া রাজকর্ম পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহামুনি ব্যাস ও বশিষ্ঠ গৃহীই ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাজাই ছিলেন। মহাভারতের ধর্মব্যাধ সাধারণ দোকানদারের মতই দোকনদারী করিয়া জীবিকার্জন করিয়াছেন। পরমহংসদেব একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, ওরে দু'পয়সা দিয়ে একটা হাঁড়ি কিনলেও তিনবার বাজিয়ে নিবি। দোকানদার বোকা পেলে তোকে ঠকিয়ে দেবে; ভক্ত হবি ত, বোকা হবি কেন? ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধিরও তাঁহার অভাব ছিল না। তাহার ধর্মপত্নী শ্রীশ্রীসারদামণিদেবীকে তিনি সাংসারিক কাজকর্মে যে উপদেশ দিতেন তাহাতেই তাহা বেশ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রের বড় বড় কথা আওড়াইয়া তিনি কখনও উপদেশ দিতেন না। সাংসারিক লোক কিভাবে জীবন যাপন করিবে ভক্তগণকে তাহার উপদেশ দিতেছেন ঃ

"সংসারে থাকো, যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে, বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এ বাড়ী আমার নয়, এ ছেলেও আমার নয়। সে সব করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে; তেমনি সংসারে সব কর্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে, গৃহ, পরিবার, পুত্র, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

আমি মনে ত্যাগ করতে বলি। সংসার ত্যাগ বলি না, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।১৫) গীতার চরম উপদেশ— অনাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করা—এই সাধারণ উপমাতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যোগপ্রাপ্তি হইল গীতার মুখ্য সাধন। কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি যে পথেই যাই না কেন, সমস্তই— যোগযুক্ত হইয়া করিতে হইবে। গীতাশাস্ত্র-প্রণেতা গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে বস্তু-নির্দেশক বচন দিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" ইত্যাদি কথা আছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, গীতার প্রতিপাদ্য বস্তু হইতেছে 'ব্রহ্মবিদ্যা'। যোগের সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বস্তু লাভ করিতে হইবে। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তিরূপ করণ বা উপায়ের সঙ্গে 'যোগ' মিশ্রিত করিয়া পরম তত্ত্ব লাভের সাধন করিতে হইবে, এই ইঙ্গিতটুকুই ঐ ছোট বচনটির মধ্যে নিহিত আছে।

স্ব স্ব অধিকারে ও ক্ষেত্রে স্বভাবনিয়ত পথে সর্বদা কর্ম করিতে হইবে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে মনকে এক উন্নত অবস্থায় রাখিবার জন্য যোগাভ্যাসও প্রয়োজন। কৌশল অবলম্বন পূর্বক কর্মের গতি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে কর্মের মধ্যে অকর্ম আসিয়া না পড়ে তদ্বিষয়ে সর্বদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। কোন কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। কর্মের সমস্ত ফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় সমস্ত কর্ম করিয়া যাইতেছি জীবের এইরূপ বুদ্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। ইহাই হইল গীতার কর্মযোগ। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বমানবের প্রতি এই কর্মযোগ প্রযোজ্য।

বিবেকানন্দ-আবাহন

অনুরাধা দত্ত

দিগ্ দিগন্ত মুখর আজিকে তব বন্দনাগানে,
আঁধার-যাত্রী চেয়ে আছে যেন নেত্রপলকহীন ;
আশাভরা মহা আশ্বাসে ঐ অরুণ-অচল পানে,
প্রতীক্ষা করে উদয়-লগ্ন আঁধারের চির লীন।

হে মহাসূর্য, জাগো হে আবার রাঙ্গায়ে পূর্বাচলে
বিজয়-তূর্য নিনাদে তোমার ডাক দিয়া সবাকারে ;
নিখিল প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য লুটিবে চরণতলে
জাগিবেযে জড় তব আহ্বানে নবপ্রাণ সঞ্চারে।

পিছনের পানে চাহিবে না তারা দ্বিধা-সঙ্কোচে ত্রাসে,
চলিবে ছুটিয়া সমুখের পানে বাধা না মানিবে তারা ;
জীবনপথের অভিযাত্রীরা ধ্বজা তুলি নীলাকাশে,
ভাঙ্গিবে সবলে যতেক আগল যতেক বন্ধ কারা।

ভারতাত্মার হে বাণীমূর্তি অতীত ভবিষ্যের
কম্বু নিনাদে ধ্বনি তোল তব মহান মাভৈঃ গীতি ;
অসীমের মাঝে আসন তোমার সীমা ছাড়ি বিশ্বের
কালের অঙ্কে চির-অঙ্কিত তব জীবনের স্মৃতি।

পর্যটকের হিমালয়—মুক্তিনাথ

স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ পুরী

মুক্তিনাথ বা মুক্তিনারায়ণে যাত্রার প্রাক্কালে প্রয়াগে খ্রীঃ ১৯৪২ সালের পূর্ণকুম্ভযোগ উপলক্ষ্যে স্নানত্রয় এবং মাঘের কল্পবাস সমাপনান্তে তখনও হাতে যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া আরও দুই মাসাধিক কাল প্রয়াগেই থাকিয়া গেলাম। পূর্ব বৎসরের যাত্রিগণের নিকট শুনিয়াছিলাম পথ কঠিন নহে। তাহাতে আমি সাহস পাইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণপূর্বক বৈশাখ মাসের ১২ই যাত্রা আরম্ভ করিলাম। যদি তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী চৈত্রমাসের শেষাশেষি বাহির হইয়া বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে দর্শন শেষ করিতে পারিতাম তাহা হইলে ফিরিবার পথে ঝঞ্ঝাবাতাদিতে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা ভোগ করিতে হইত না।

এলাহাবাদ হইতে প্রথমতঃ গোরক্ষপুর ও পরে তথা হইতে শাখা রেলপথে নৌতনউয়া (Nautanwa) পৌছিলাম। স্টেশনের পরেই নেপালরাজ্য আরম্ভ। নৌতনুয়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরাভিমুখে হিমালয়ের পাদদেশে গণ্ডকীনদীকূলবর্তী বুট্ল (Butwal) মণ্ডা পর্যন্ত মোটর পথ আছে।

নেপালরাজ্যের অভ্যন্তরে বিদেশীয়গণ মাউডা পর্যন্ত ৫ মাইল মাত্র প্রবেশ করিতে পারেন ; এখানে পুলিস ফাঁড়িতে অনুমতিপত্র দেখাইলে তবে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়। ইহার ১ মাইল পরেই তহশিলের প্রধান নগর ভৈরোয়া (Bhairowa)। ভৈরোয়া হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবস্থান—লুম্বিনী উদ্যান ; তথায় বেষ্টনীর মধ্যে সুন্দর এক স্তম্ভ আছে, উহার গাত্রে ক্ষোদিত অনেক পালি লেখ দেখিলাম। বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর ধর্মশালা ও চত্বর। রক্ষক বলিলেন, বৌদ্ধ জগতের সর্বস্থান হইতেই এখানে যাত্রী আসিয়া থাকেন। নৌতনুয়া স্টেশন হইতে লুম্বিনী-উদ্যান পর্যন্ত আলাদা একটি রাস্তা আছে।

বুটল হইতে ১৮ মাইল দূরে পর্বতোপরি তানসিন অবস্থিত। গণ্ডকীর কূলে কূলে ক্রমাগত চড়াই-

ডুংরাই করিয়া মুক্তিনাথের রাস্তা গিয়াছে। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে পোখ্রা হইয়া ছোটবড় অনেকগুলি পাহাড়ের মাথা দিয়া আরেকটি পথও আছে। আমি প্রথমোক্ত পথেই গিয়াছিলাম। তানসিন পাল্লাজেলার অন্তর্গত। এখানে একজন বিভাগীয় শাস্তা থাকেন। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুইরাত্রি বিশ্রামের পর তানসিন হইতে নির্গত হইলাম। তথা হইতে তিন অবতরণ-পথে রাণীঘাট। রাণীঘাটে নৌকায় গণ্ডকী পার হইতে হইল। এখান হইতে বীর্ঘা ৭ মাইল, অতঃপর ৯ মাইল দূরবর্তী আন্দিঘাটে গিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লইলাম।

পরদিন ৬ মাইল দূরে শেতিবেনী এবং পরে বিহাদি (৬ মাইল) ও (২য়) বিহাদি (৪ মাইল) পর্যন্ত চলিয়া থামিলাম। পথে ধবলগিরির তুষারশিখা কয়েকবার দেখা গিযাছিল। পরদিন পরপর বাচ্ছা (২½ মাইল), বারাখানি (২½ মাইল), কর্ণাস (½ ক্রোশ) ও পরে আরও ৭ মাইল অতিক্রম করিয়া গোধূলিবেলায় ফলেবাস (=ফলেওয়াস) পৌঁছিলাম। পথিপার্শ্বে এক বাটীর বাহিরের বারান্দায় কম্বল পাতিলাম। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে গৃহস্থ প্রকাণ্ড একটি থালিতে ভুট্টার খই আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিলেন। লবণ-গোলমরিচচূর্ণের সাহায্যে ইহার দ্বারা উদর পূরণ করিয়া লওয়া গেল।

বারাখানি ও কর্ণাসের মধ্যে দুইটা পথ আছে। তন্মধ্যে যেটি নিম্নতরস্থান-বাহী উহা গণ্ডকী-উপত্যকাস্থিত জৈমিনিঘাট হইয়া গিয়াছে। জৈমিনিঘাটে অতিপুরাতন 'কাজিকী ফুলউয়ারী' অর্থাৎ কাজির পুষ্পবাটিকা বিদ্যমান। ইহার অপর নাম 'কাজিপাউয়া' (কাজির ধর্মশালা)। কোনো কাজি বা বিচারপতি বানপ্রস্থজীবন যাপন করিবার জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রারব্ধ সদাব্রত এখনও চলিতেছে, উদ্যানেও কয়েকটি সাধারণ পুষ্পবৃক্ষ দৃষ্ট হয়; অধুনা ইহা মহন্ত গিরিবর দাস বৈষ্ণবের আশ্রম। প্রত্যাবর্তনকালে একরাত্রি এখানে কাটাইয়াছিলাম। নীলবর্ণ নদীতীরে অবস্থিত নানাবর্ণ পুষ্পশোভিত উদ্যানসহ এই আশ্রমটি উপরের পথ হইতে ছবির ন্যায় দেখায়। কথিত আছে পুরাকালে জৈমিনি ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন।

ফলেবাস হইতে বাহির হইয়া পরদিন প্রথমেই ডমাহডুঙ্গা গ্রাম পাইলাম। তথায় রামদাস নামে এক বৈষ্ণব ত্যাগী[১] থাকেন। উহার চার মাইল পরে মাদিবেনী। এখানেও এক ত্যাগীর আখড়া বা আশ্রম আছে। নদীতটভূমির শুষ্কাংশের উপর দিয়া আরও সাত মাইল গিয়া খানিয়াঘাটে রাত্রির জন্য আশ্রয় লইলাম। আরেকটি পথ নদীতল হইতে অন্ততঃ ৫০০ ফুট উচ্চে কুস্মা নামক গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। উহা উক্ত মাদিবেনী ও খন্যাঘাটের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিযাত্রাকালে অত্রত্য নারায়ণ-মন্দিরে দ্বিপ্রহরে মহন্ত শরণগিরির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেপালের এই খণ্ডে সর্বত্র লোকে 'মন্দিরের' পরিবর্তে 'স্থান' শব্দ ব্যবহার করে, যথা নারায়ণ-থান (=স্থান), গণেশ-থান ইত্যাদি। আমি কুস্মার নিকটে এক ব্যক্তিকে নারায়ণ-মন্দির কতদূরে জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে সে আমার প্রশ্ন বুঝিল না, পরে থান-শব্দ উচ্চারণ করায় বুঝিল এবং ভবিষ্যতে কখনও মন্দির শব্দ ব্যবহার না করার উপদেশ দিয়া তবেই আমার কথার উত্তর দিল।

খন্যাঘাট হইতে বেণী ৮ মাইল। রাণীঘাটের ৭০ মাইল পরে আজ পঞ্চম দিনে দ্বিতীয়বার নদী পার হইতে হইল— তবে এবারে আর নৌকায় নহে, লম্বমান সেতুর উপর দিয়া। বেণী হইতে ২ মাইল পরে জলেশ্বর নামক ক্ষুদ্র গিরিনদী আসিল, উহা কাষ্ঠসেতুবদ্ধ। নিকটেই জনৈক ব্রহ্মচারীর বাস।

১ রামায়েৎ বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ পরস্পরকে ত্যাগী অভিহিত করিয়া থাকেন।

আরও ৩ মাইল পথ চলিয়া রাখু-গ্রামের মহারাণী পাউয়ায় (ধর্মশালায়) আসিয়া উঠিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে কিব্রিয়াং পর্যন্ত ৪ মাইল চলিবার পর লৌহরজ্জুর সেতু পাইলাম। তথা হইতে তাতাপানি ৪ মাইল। নিকটেই হয়ত তপ্ত-জলের কোনও ধারা আছে, পথিপার্শ্বে নাই। হিমালয়ে যেখানে যেখানে উষ্ণ ধারা আছে গ্রাম না হইলে অথবা গণ্ডগ্রাম হইলে সেই সেই স্থানের তাতাপানি বা এই জাতীয় নাম হইয়া থাকে। তাতাপানি হইতে প্রথমে ৪ মাইল কঠিন আরোহণ-শেষে দানায় পৌছিলাম ; শীতানুভব হইতে লাগিল, বুঝিলাম স্থানটির উচ্চতা যথেষ্ট। কঠিন আরোহণের পর আর সেদিন চলিতে ইচ্ছা হইল না। দানায় পদার্পণ করিয়া মনে হইল এক নূতন রাজ্যে আসিয়াছি। অত্রত্য অধিবাসিগণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার হিন্দু-বৌদ্ধের মিশ্রণ। ইহারাই ভেটীয় বা ভুটিয়া। আলমোড়া, গাঢ়োয়াল, টেহ্রি-গাঢ়োয়াল জেলাসমূহের এবং কাশ্মীর-সীমান্তাবধি হিমাচল প্রদেশের উত্তরপ্রান্তবর্তী সমস্ত সুদীর্ঘ হিমালয়খণ্ড ইহাদের বাসস্থান। মুক্তিনাথ হইতে ফিরিবার পথে এই দানা-তাতাপানির মধ্যে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীভগবান্ যে আর্ত ভক্তকে সত্যই রক্ষা করেন উহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঘটনাটি এখানেই বর্ণনা করিতেছি : সেদিন সকাল হইতেই আকাশে কতকগুলি মেঘ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। কেননা, মুক্তিনাথে থাকিবার সময় জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই দুই দিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত ও দূরে চতুর্দিকে শিখরগুলিতে তুষারপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। পূর্বাহ্ণে ২॥০ ক্রোশ পথ অবতরণ করিয়া দানার নিত্যক্রিয়া ও বিশ্রাম-সমাপনান্তে উঠিয়া দেখিলাম মেঘের বিকীর্ণ খণ্ডগুলি পরস্পর-মিলিত হইয়া সূর্যকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরেও সায়ংকাল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ইতস্ততঃ বড় বড় জলের ফোঁটাও পড়িতেছে। যাহা হউক, বিনা কালক্ষেপে অবতরণ আরম্ভ করিলাম। ক্রমেই বর্ষণবেগ বর্ধিত হইতে হইতে অবিরল মুষলধারে পরিণত হইল ; বায়ুও বিপরীতমুখে বহিয়া উভয়ে একযোগে আমার অবতরণে বাধা সৃষ্টি করিল, কিন্তু বৃথাই। দুর্যোগের মধ্যে দ্রুতগতির আশা করা যায় না। অর্ধেক পথ নামিবার পর লক্ষ্য করিলাম, সম্মুখে একটি বিরাট গাছ মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পড়িয়াই পথের অর্ধাংশ বিধ্বংস তথা আমার পথেরও গতিরোধ করিল। একহাতে ছাতা অন্য হাতে জলপাত্র ও পীঠে ভার লইয়া অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিলাম। অনন্তর নিরুপায় হইয়া কখনো তরুতলে ৫।১০ মিনিট অপেক্ষা করি, কখনও বা গিরিগাত্রের গুহাবৎ স্থানে অর্ধঘণ্টা বসিয়া লই। একেত এইরূপ অবস্থা, অপর দিকে পথে প্রবহমাণ বৃষ্টিজলের খরস্রোতের উপর দিয়া পিচ্ছিল পথে সাবধানে চলিতে হইতেছে। অবতরণ শেষ করিতে বহুক্ষণ লাগিল, সৌভাগ্যবশতঃ ইতো-মধ্যে ঝঞ্ঝার উপশম হইয়াছে। তখনও সন্ধ্যাগমের কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু সম্মুখেই বৃষ্টিজলে স্ফীতা খর স্রোতা এক পার্বত্য তটিনী। দূর হইতে যখন ইহার গর্জনরব কর্ণগোচর হইয়াছিল তখনই অভিজ্ঞতাবশে মনে হইয়াছিল অদ্য অদৃষ্টে বিপদ আছে, কারণ উর্ধ্বাভিমুখে যাত্রাকালে যে শান্ত নীরব সূত্রবৎ ক্ষীণ ধারা পিপাসু পথিকের বিশ্রামস্থান ছিল এবং অনেকের অলক্ষ্যীভূত থাকিয়া গিয়াছিল, অদ্য তাহারই বিস্ফুরণ ও বিস্ফূর্জন হেতু মূর্তি প্রচণ্ড হইয়াছে। পার হওয়া কঠিন।

অনন্যোপায় হইয়া বিপদ্ভঞ্জনকে স্মরণ করিতেছি। অকস্মাৎ দেখি মধ্য নদীতে আমারই তুল্য চারিজন খর্বকায় পুরুষ (বলা বাহুল্য সকলেই নেপালী) ওপারের দিকে যাইতেছে পরস্পর হাত-ধরাধরি

করিয়া। তাহাদিগকে দেখিয়া সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধারণা হইল যে, নদীটি ভীষণদর্শনা ও দুস্তরা হইলেও মাঝখানে অগভীর। উহারা এপারে থাকিতে থাকিতে যদি উহাদের সঙ্গ বা সহায়তা লইতে পারিতাম তবে উত্তম হইত। আমি একাকী লঙ্ঘন করিতে সাহস করি না। আবার এই ভাবিয়া হতাশ হইলাম যে, একবার ওপারে গিয়া পড়িলে উহারা সহস্র ডাকেও পুনরায় এপারে আসিবে না। মনোমধ্যে এইরূপ তর্কবিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় তাহারা পরপারে গিয়া পৌঁছিল। যদিও আমার মন ও নয়নদ্বয় সাগ্রহে তাহাদের অনুগমন করিতেছিল, তথাপি 'ডাকিলেও আসিবে না' এই ধারণাবশতঃ আমি নীরব ছিলাম। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই, অথবা তাঁহার ইচ্ছায় কি না হয়, অতএব আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে উক্ত ব্যক্তিগণের হঠাৎ যখন এপারে দৃষ্টিপাত হইল তাহারাও বিস্মিত হইয়া পরস্পর কি পরামর্শ করিল দেখিলাম। অনন্তর নদী পুনর্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। অনতিবিলম্বে তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঙ্গিতে সঙ্গে যাইবার অনুরোধ জানাইল। দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিলাম। আবার হাত হইতে তাহারা স্বতই ছত্র ও জলপাত্রটিও গ্রহণ করায় চলিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধা হইল। স্রোতোবেগ যথেষ্ট আছে, অধিকন্তু লুক্কায়িত, বিষমাকার উপলখণ্ডগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল, অবহিতচিত্তে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে ; তথাপি অনভ্যাস-হেতু দুই একবার পদস্খলন হওয়াতে আমার উপকারী সুহৃদগণকেও টলাইয়া দিয়াছিলাম।' যাহা হউক, অবশেষে এই তটিনীটি নিরাপদে পার হইলাম।

এইবার ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার বিবরণে ফিরিয়া আসা যাক। দানা ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে পূর্বাহ্নে বহুক্ষণ পরে এক সেতু আসিল। বহু পুরাতন ও জীর্ণ সেতু। অগ্রসর হইয়া ইহাতে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাইলাম স্থলদেশে কয়েকটা কাষ্ঠখণ্ডের বহুলাংশ নষ্ট হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে কয়েকটা খণ্ডের অস্তিত্বই নাই। সেতুটি ভীষণ দুলিতে লাগিল। পার না হইলে চলিবে না ; সুতরাং ছত্র-পাত্রকে পৃষ্ঠালম্বী কম্বলাদির সহিত একত্র বাঁধিয়া লইয়া রজ্জু ধরিবার জন্য হস্তদ্বয়কেও মুক্ত করিলাম। এইবার অগ্নি-পরীক্ষা। বহুনিম্নে গর্জনরতা ফেনিলা হিমাঙ্গী গণ্ডকী প্রবাহিতা। চাহিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। পড়িলে রক্ষা নাই। যাহা হউক, শ্রীনারায়ণ-কৃপায় সাহসবলে একাকীই সেই দোদুল্যমান জীর্ণ সেতুর উপর দিয়া এই বৈতরণী উত্তীর্ণ হইলাম। অনন্তর কৃতজ্ঞচিত্তে রক্ষাকর্তার চিন্তা করিতে করিতে ঘাসা পর্যন্ত পথ অতিবাহিত করিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আরেকবার এইভাবেই এই ভয়াবহ সেতুটিকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছিল। আশা হয় এতদিনে নেপালরাজ ইহার সংস্কারসাধন করিয়াছেন।

ঘাসা উক্ত সেতুর নিকটেই দানা হইতে ৫ মাইল এখানে একজন সদ্‌গৃহস্থ যাত্রীদিগকে যবের ছাতু প্রদান করেন। উহা ভোজনান্তে বিশ্রাম লইবার জন্য ধীর আরোহপথে আরও ৫ মাইল গিয়া লেটায় আসিলাম। ইহার নিকটে যে সেতুটি আছে তাহা দারুনির্মিত দেখিলাম, রজ্জু ধরিবার আবশ্যকতা হয় নাই, কারণ গণ্ডকী এখানে ক্ষীণা। আমাদের ত্যক্ত রাখু-গ্রাম পর্যন্ত পথের দুইধারে মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, তজ্জন্য পথিকের পার্বত্যপথে ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের অত্যন্ত সুবিধা।

এযাবৎ উষ্ণস্থানসমূহে প্রত্যহ প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই পথে বহির্গত হইয়া পড়িতাম, কিন্তু ২।১ দিবস হইতে তাহা আর পারা যাইতেছে না ; কারণ শৈত্যবশতঃ পার্বতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত ধর্মশালাসমূহ এরূপভাবে রুদ্ধ থাকে যে, বায়ুরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব আভ্যন্তরীণ অন্ধকার সামান্য অপগত হওয়ার পর বাহিরে আসিলে দেখা

যায় অনেক বেলা হইয়াছে। পরদিন প্রাতে সূর্যোদয়ান্তে নির্গত হইলাম। দুই বা ততোধিক ক্রোশ গিয়া দেখিলাম পথ উপলাস্তীর্ণ গণ্ডকীগর্ভের শুষ্কাংশের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরেও ইহা বহুদূর পর্যন্ত উর্ধ্বগ সমতলভূমি ধরিয়া গিয়াছে। এই পথে আমি টুক্‌চে বা থাক্‌পর্যন্ত আসিলাম—৭ মাইল লেটা হইতে। এখানে আসিয়া মনে হয় যেন মুক্তিনাথের বায়ু গাত্র স্পর্শ করিতেছে। ক্ষেত্রের যতই সন্নিধানবর্তী হইতেছি শীঘ্র পৌছিবার জন্য ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল। থাক্ ভুটিযাদের শেষ গ্রাম। আগামী কল্যই দর্শনের দৃঢ়সংকল্প, তাই অপরাহ্ণে ভোটসীমা অতিক্রমপূর্বক আরও ৪ মাইল আগে গিয়া ঝুঁসুম্মার ধর্মশালায় উঠিলাম। ইহা হূণীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। দূরে-নিকটে কেবল হূণীয় বসতি। এই হূণ-খণ্ড নেপালরাজ্যের অন্তর্গত; তিব্বতীয় হূণ আরও উত্তরে। রাত্রি আসিল, আমিও প্রাপ্ত সদাব্রতের সদ্ব্যবহারপূর্বক শয়ন করিলাম।

ঝুঁসুম্মা হইতে পরদিবস একটু সকাল সকালই নিষ্ক্রান্ত হইলাম। কাঠের সেতু লঙ্ঘনের পর গণ্ডকীধারাকে ডান দিকে রাখিয়া চলিতে চলিতে ১ মাইল পরে কাকবেণী প্রাপ্ত হইলাম। অদ্য যেন তেন প্রকারেণ এই দীর্ঘ যাত্রার পরিসমাপ্তি করিতেই হইবে বিবেচনা করিয়া এখানে আর বিশ্রাম বা অপেক্ষা করিলাম না, ঐ পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর আসিয়াছি এমন সময়ে দূর হইতে এক হূণিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার পথভ্রান্তির কথা জ্ঞাপন করিল। অগত্যা, তন্নির্দিষ্ট পথ ধরিবার জন্য পুনরায় কাকবেণীতে আসিতে হইল। এই পর্যন্ত আসিয়া পথ অকস্মাৎ দ্বিমুখী হইয়াছে, গন্তব্য পথটি অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট এবং কোনো ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল না, তজ্জন্য প্রথমে ইহার নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছিলাম। হায় অদৃষ্ট, যতই শীঘ্র পৌছিবার চেষ্টা করিতেছি ততই বিলম্ব হইতেছে! যাহা হউক, অনন্তর একাদশদিবস-সঙ্গিনী ক্ষীণা ত্রিধাবিভক্তা গণ্ডকীর বিমুক্তা ধারা এই শেষবার উল্লঙ্ঘন করিয়া পাহাড় চড়াই করিতে করিতে এক সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এ ভূমিতে গুল্ম বৃক্ষাদি কিছুই নাই, চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশাবধি দৃষ্টি অবাধ। কেদারনাথ, বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানে ক্রোশাধিক দূর হইতে মন্দিরচূড়া দৃষ্ট হয়। এখানেও তৎপ্রতীক্ষায় পথ অতিবাহিত করিতেছি। সুখের বিষয় অধিক দূর না যাইতেই, অনুমান এক ক্রোশ দূর হইতে চূড়া লক্ষিত হইল। এখন মনের আনন্দে পথের অন্তিমাংশ অতিক্রমপূর্বক সর্বাগ্রে নারায়ণের দর্শন-প্রণামাদি সমাপন করিলাম। কাকবেণী হইতে মুক্তিনারায়ণ ৪ মাইল।

মুক্তি-অধিত্যকা বহুদূরবিস্তৃত ও হূণীয়াধ্যুষিত, বদরীনারায়ণের ন্যায় বৈশাখমাসে এখানে তুষার থাকে না বটে, কিন্তু চলিতে ফিরিতে যে শ্বাসকষ্ট হয় তাহা ইহার উচ্চতাধিক্যের পরিচায়ক। ইহারই পূর্বধারে পর্বতের নিকটে দক্ষিণমুখী মন্দির; চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রস্তরবিগ্রহ। উক্ত পর্বত হইতে আগত তুষারগলিত এক ঝরণাকে মন্দিরের পার্শ্বেই পতনশীল ধারাসমষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে। শুনিলাম শীতের চারিমাস প্রাত্যহিক পূজা (কে জানে বৌদ্ধদেবতার অথবা নারায়ণের?) স্থানীয় হূণীয়দের দ্বারাই হইয়া থাকে। হিন্দুপূজকদের বাসস্থান প্রায় ৪০ মাইল দূরে—রাখু বা তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহে।

পশুপতিনাথের মন্দিরের ন্যায় মুক্তিনাথ মন্দিরও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন; ইহার একাধিক-সংখ্যক চাল দেখিলে মনে হয় চতুর্ভুজাকার কয়েকটা কাষ্ঠ ছত্র উপর্যুপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে। মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ইহার নিম্নাংশ প্রস্তরনির্মিত, গর্ভগৃহ অপ্রশস্ত, মর্মর-প্রস্তরের গৃহতল জল ফেলিতে ফেলিতে সদাই সিক্ত থাকে, তদুপরি কাষ্ঠাসন ও কম্বলখণ্ডাদি পাতিয়া উত্তরমুখে পুরোহিত পূজায় বসেন।

এইস্থানে আগমনকালে মন্দিরের দুই পরাব্যাধ[১] পশ্চিমে রাজকীয় ধর্মশালা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। কৃত্যসমূহ সমাপনান্তে তথায় ফিরিবার পথে ১০।১২ পদ অগ্রসর হইয়া একটি বস্তির পার্শ্বে আসিয়াছি, এমন সময়ে তদভ্যন্তর হইতে একজন 'ত্যাগী' আমাকে ডাকিয়া ঐ বাটীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শুনিলাম ইহা তাঁহার আশ্রম, বৎসরে ৬ মাস কাল এখানে থাকেন। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ধর্মশালা হইতে সদাব্রতে দিবসত্রয়-প্রাপ্ত তণ্ডুল দাল ঘৃত লবণাদি আমার নিকট হইতে লইয়া স্বকীয় পাকের সহিত একত্রে পাক করিয়া দিতেন। ঐ কালের পরেও চারিদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে ছাড়েন নাই। শাস্ত্রালোচনায় সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যাইত জানিতে পারিতাম না। ইতোমধ্যে বহু ত্যাগী দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ধুনী, সদাব্রত ও অনুরোধ সত্ত্বেও কেহই এক রাত্রির অধিক থাকেন নাই। অনন্তর অষ্টমদিবসে আমাদের প্রথমোক্ত ত্যাগী যখন চারিজন সন্ন্যাসিসহ পূর্ণ-কুম্ভমেলা উপলক্ষে কৈলাস-যাত্রায় বহির্গত হইলেন, দলের সকলে আমাকেও তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বেই ১৯২৮ সালে একবার যাত্রা হইয়াছিল বলিয়া এবার আর যাইতে ইচ্ছা হইল না।

নারায়ণ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণে হূণীয়দের এক মন্দির বিদ্যমান। ইহার আকৃতি পূর্বোক্তেরই অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে কতকগুলি কাঠের থামের উপরে দণ্ডায়মান। মন্দিরের নিম্নতলের চতুর্দিক্ বস্ত্রাবগুণ্ঠিত। পয়সা না দিলে অভ্যন্তরে কি আছে কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না। আমি গিয়া বলাতে বৌদ্ধ-পূজয়িত্রী আমার সহিত উহাদের মন্দিরগৃহ হইতে নামিয়া আসিলেন এবং বিনা দক্ষিণায় অবগুণ্ঠনের এক বস্ত্রখণ্ড উন্মোচনপূর্বক দেখিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিলেন। দেখিলাম ইতস্ততঃ দ্বাদশাধিক নীলবর্ণ জলন্ত জিহ্বা নড়িতেছে ও তৎসঙ্গে ঘনীভূত গন্ধকলবণ-বাষ্পের উগ্রগন্ধ। শিখাগুলি চট্টগ্রামের নিকটস্থ সীতাকুণ্ড বা পাঞ্জাব-হিমালয়ের কাংড়া-উপত্যকাস্থ জ্বালামুখীতে দৃষ্ট অনুরূপ অগ্নিশিখা হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘতর এবং সংখ্যাতেও অধিকতর।

মুক্তিক্ষেত্র যে সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকার উপর অধিষ্ঠিত তাহা সমতলপ্রায় হইলেও ইহার প্রান্ত-প্রান্তান্তরে গমনাগমন সুকঠিন ব্যাপার। কারণ, উচ্চতাধিক্যবশতঃ শ্বাসকষ্ট ও মধ্যে মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধিশীল গিরিনদীর অস্তিত্ব। দিনমানের প্রথম প্রহরে ইহাদের ধারা অতিশয় ক্ষীণ থাকে, তাহার পরেই বৃদ্ধি। এই ক্ষেত্রেই অবস্থিত সুলক্ষণ শালগ্রামশিলা-বহুল দামোদর কুণ্ড মন্দিরের ৩ ক্রোশ উত্তরে—জল দেখা যায় না বটে, কিন্তু উচ্চ তীরভূমি স্পষ্টই দৃশ্যমান।

এক সপ্তাহ বাসের পর প্রতিযাত্রায় নিম্নপ্রবণ পথ পাইয়া অক্লেশে থাক্ (টুক্‌চে) পর্যন্ত ৯ মাইল নামিয়া আসিলাম। তথায় হিন্দুগৃহ দেখিয়া সুব্বা হিতমানের অতিথি হইলাম। ইঁহার অপর ভ্রাতার নাম সুব্বা মোহনমান শেরচন্দ্। ধনী ও গণ্যমান্য বলিয়া লোকে ইঁহাদিগকে সুব্বা কহে, ইহার আরেক অর্থ কালেক্টর। ইঁহারা কথাবার্তার মত হিন্দি মন্দ জানেন না; প্রতিবেশ মিশ্র—ভোটীয় ও হূণীয় উভয়ই। হূণীয় হইতে ইঁহাদের ভাষাগত, পরিধেয়গত ও ভক্ষ্যগত পার্থক্য যথেষ্ট আছে। ভাষা নিজস্ব, নাম হিন্দুদের ন্যায়। হূণীয়গণ খদিরবর্ণরঞ্জিত বহিঃ-পরিধেয় ব্যবহার করে, ইঁহারা তাহা করেন না। আলমোড়া জেলার ধার্চুলায় শীতকালে তিব্বতাগত হূণীয়দিগকে রোগে মৃত প্রোথিত মহিষকে মৃদ্গর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া উহার মাংস খাইতে দেখিয়াছি। আমাদের সুব্বাভ্রাতৃগণ কিন্তু এরূপ নহেন যদিও তাঁহারা মাংসাশী। প্রাতঃকালে হিত-মানকে বোধ হয় পালি ভাষায় শাস্ত্রীয় প্রবচন আবৃত্তি

১ লোষ্ট্র-নিক্ষেপ ব্যবধান।

করিতে শুনিয়াছি। স্বকীয় গৃহচ্ছাদ কৃষ্ণলেখাঙ্কিত দীর্ঘ শ্বেতপতাকাবলীর দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এগুলি ইঁহাদের ধর্মপতাকা স্থূণ ও এদিক্‌কার ভোটভূমিতে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

গৃহচালের উপরে মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘ দণ্ড থাকে, ঐ দণ্ড হইতে বাটীর বাহিরে কিঞ্চিদ্ ব্যবধানে চতুষ্কোণে ভূমির উপরি দণ্ডায়মান চারিটি উচ্চ স্থূণা পর্যন্ত অথবা বৃক্ষশাখা পর্যন্ত দীর্ঘ রশ্মিচতুষ্টয় বিলম্বিত থাকে এবং পালিভাষায় শাস্ত্রীর প্রবচনাঙ্কিত বহু পত্রখণ্ড বহু পতাকাকারে প্রত্যেকটি রশ্মির সহিত সংলগ্ন থাকে। কোথাও ঐ নেপাল-প্রস্তুত পত্রখণ্ডসমূহ শিরঃপাদভাবে সংযোজিত থাকায় এক একটি রশ্মিতে এক একটি দীর্ঘ পতাকা সৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ধর্মপতাকা স্থূণীয় মন্দিরেই দৃষ্ট হয় বলিয়া দূর হইতে দেখিলে গৃহস্থাবাসও মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। কোনো কোনো গৃহে কোণস্থ প্রত্যেক স্থূণা পার্শ্ববর্তী স্থূণাদ্বয়ের সহিত পতাকাবলীর দ্বারা সংযোজিত থাকায় বাটীর চতুর্দিক্ শোভাসম্পন্ন হয়। কেহ কেহ কেবল বাটীর সম্মুখদ্বারের দুই পার্শ্ব মাত্র ঐরূপে সজ্জিত করে। দুর্জয়লিঙ্গ পতনের এক সানুস্থিত মন্দিরে (Darjeeling Observatory Hillএ) ধর্মপতাকার নিদর্শন আছে, অনেকে হয়ত দেখিয়া থাকিবেন।

থাক্ হইতে ১৭ মাইল দূরে দানা। ইহা ত্যাগ করিয়া দুই ক্রোশ অবতরণকালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা উপরেই লিখিয়াছি। জয় মুক্তিনাথ।

বৎসর বিদায়

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

চৈতি হাওয়ার ঘূর্ণি লেগেছে বরষের শেষ সাঁঝে,
ঝরাপাতা তার মৃদু গুঞ্জনে গাহিয়া চলেছে কাজে,
বিদ্রোহ সুর প্রকৃতি-মেলায় আনেনিত তো বৈশাখী,
ত্বরা তিরোভাব কেন তর্পণ ?—এখনো সময় বাকী।
এখনো গাহিছে কুহুডাকা দূতী বসন্ত-বীথিকায়,
এখনো নিথর চূত-কিশলয় মধুপের মদিরায়।
এখনো আসেনি ঈশানের তীরে ধূমল মেঘের স্তূপ,
নটরাজ তার নৃত্যের পায়ে তোলেনি ধ্বংসরূপ ;
এখনো দহিয়া বহ্নির তাপে সবুজের কমদেহ
জীবনের মাঝে আনেনি নিদাঘ মরুর তৃষিত লেহ।
এখনো প্রহর ক্ষণ গুনি গুনি তোমার কাছেতে আসি,
নিয়ে যায় তব দান অফুরান, তোমারেই পরকাশি।
এখনো রয়েছ স্মরণেতে ভরি মঞ্জুমোহন রূপ
এখনো মানব আশাপথ চাহি জ্বালায়ে রেখেছে ধূপ
এখনো মায়ার ফুলঝুরি ঝরা নিঃশেষে নহে শেষ,
এখনো জাগে যে তব বিদায়েতে অভিমান-ভরা রেশ
বিস্ময়মাখা তব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিমেষগুলি,
ইতিহাস তার স্বর্ণ আখরে এখনো রাখেনি তুলি!
অগুরু সুবাস রাখা ছিল যত দিনের শিশিতে বন্ধ,
শিশি ভেঙ্গে যায়, চারিদিকে তাই ভাসে অপরূপ গন্ধ।

সমালোচনা

স্তবকুসুমাঞ্জলি—সম্পাদক : শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী; প্রকাশক—মুকুল দে, চিত্রলেখা, শান্তিনিকেতন ; পৃষ্ঠা : ২০৭ ; মূল্য : পাঁচ টাকা।

ডুমুরদহ (হুগলী) শ্রীবামাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বহুমানিত সাধু শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঁকারনাথের উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথিতে অনুরাগী ভক্ত এবং মনীষিগণের লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলির (কয়েকটি পদ্যে, বাকীগুলি স্মৃতিকথার আকারে) সংকলন।

শ্রীমৎ সীতারামদাসজীর অনেকগুলি চিত্র ও পত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধু ভক্ত ও ধর্মানুরাগিগণকে পুস্তকখানি সাধন-প্রেরণা এবং আনন্দ দান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা—৩২ ; পৃষ্ঠা—২৪ ; মূল্য : তিন আনা।

এই পুস্তিকাখানি চাণ্ডিল সর্বোদয় কর্মিসম্মেলনে আচার্য বিনোবার ৭।৩।৫৩ তারিখের ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। সর্বোদয় সমাজভূদান ও সম্পত্তিদান যজ্ঞসম্বন্ধে বিনোবাজীর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই ভাষণটিতে পাওয়া যায়।

রং ও ছাপ—শ্রীসত্যেন্দ্র মোহন শর্মারায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশশিভূষণ গাঙ্গুলী, ইষ্টার্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫৮বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠা : ২৪২ ; মূল্য : ৩৸০ আনা।

রঞ্জনশিল্প-সম্বন্ধে এরূপ ধরনের কার্যকর বৈজ্ঞানিক বই বাংলা ভাষায় নাই। ইংরেজীতে যে সব পাঠ্যপুস্তক ছাপা আছে তাহার মূল্য ১০।১২ টাকার নিম্নে নয়। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের অথচ আধুনিকতম আবিষ্কার সহ পৃথিবীর সকল প্রস্তুতিকারিগণের সকল রকম রং ও রাসায়নিক একই সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে বলিয়াই পুস্তকখানি ছাত্র, কারিগর, শিক্ষক ও তাঁতশিল্পিগণের নিকট বিশেষ উপকারী হইবে আশা করি। ভাষা সহজ ও সরল। পরিভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি বুঝাইতে গেলে ছাত্রগণ বা অল্পশিক্ষিত তন্তুবায়গণ বুঝিবেন না বলিয়াই যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া সরল ভাষায় উহাই কিছুটা ঘুরাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। রঞ্জনবিজ্ঞান-সম্বন্ধে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থকার এই তথ্যপূর্ণ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া রং ও ছাপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

Book of Daily Thoughts and Prayers—স্বামী পরমানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—আনন্দ আশ্রম ; ২১এ, দমদম রোড, কলিকাতা ৩০ ; পৃষ্ঠা : ৪০৮ ; মূল্য : ৬৷০ আনা।

বর্তমান পুস্তকটি পরলোকগত গ্রন্থকারের বহুবর্ষপূর্বে আমেরিকায় প্রকাশিত গ্রন্থের ভারতীয় সংস্করণ। স্মরণ মনন, ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তিগুলি চরিত্রে মূর্ত হইয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থে বৎসরের প্রতি দিনটির জন্য এক একটি অনুধ্যান ও প্রার্থনা সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধক-সাধিকাগণ পুস্তকখানি পাঠে প্রকৃত উপকার ও শান্তি লাভ করিবেন।

আশ্রম—(অষ্টম বর্ষ, ১৩৬০)—রহড়া (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বার্ষিকী। বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে নানাবিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি বালকাশ্রমের কিশোর বিদ্যার্থিগণের সুস্থ রুচি, আদর্শনিষ্ঠা এবং বিদ্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। জাতির

ভবিষ্যৎ এই তরুণ বন্ধুগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতীজী মহারাজ—সঙ্কলক : স্বামী শান্তানন্দ ভারতী; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী; ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা : ১০৫; মূল্য : ১৲ টাকা।

ধর্ম ও দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থপ্রণেতা ৮২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সন্ন্যাসীর (পূর্বাশ্রমে শ্রীদুর্গানাথ তত্ত্বভূষণ নামে পরিচিত) সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তত্ত্বনিষ্ঠ সাধক-জীবনের কাহিনী পড়িলে ভক্তি-বিশ্বাস-বৈরাগ্য উদ্বুদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবা—শ্যামলাতাল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (পোঃ সুখীঢাং, জেলা আলমোড়া) ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎস্বামী বিরজানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৪ সালে হিমালয়ের সৌন্দর্যের একটি লীলানিকেতনে স্থাপিত। সেবাশ্রমটি গত ৪০ বৎসর যাবৎ পার্বত্য অধিবাসী-দিগের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। এই অঞ্চলে অন্য কোন চিকিৎসালয় না থাকায় বহুদূর হইতেও রোগাক্রান্ত দরিদ্র অসহায় নরনারীগণ চিকিৎসার জন্য এই সেবাশ্রমে আসে। আলোচ্যবর্ষে ৭৯০৭ জন (নূতন ৫০৯০) রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হইয়াছেন। সেবাশ্রমের ১২টি শয্যা-সমন্বিত একটি অন্তর্বিভাগও আছে। এই বিভাগে রোগিসংখ্যা ছিল—১৩২। সেবাশ্রমে একটি পশু-চিকিৎসালয় আছে। উহাতে আলোচ্যবর্ষে ২৮০০ গবাদি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। পার্বত্য প্রদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি বদান্য ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম সমগ্র ব্রহ্ম-দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান এবং গর্বের বস্তু। ১৯৫২ সালে ইহার বহির্বিভাগের ছয়টি কেন্দ্রে মোট ২২৩, ৬৭৮ জন এবং ১৩৫টি শয্যা-সমন্বিত অন্তর্বিভাগে মোট ৫৬৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। Physiotherapy, Clinical Laboratory, রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কার্যকুশলতা উল্লেখযোগ্য। সেবাশ্রমে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগেরও সুচিকিৎসা করা হয়। ১৯৫২ সালে সেবাশ্রমের মোট আয় ৩,০৫,৪৮৭৸১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৩,০৭,২৮১৷৷১১ পাই।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫০-৫১-৫২ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাশ্রমের প্রচেষ্টা তিন ভাগে বিভক্ত—ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার ও আর্তসেবা। আলোচ্য বৎসর-গুলিতে সমস্ত বিভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হাসপাতালে বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে ৬২৭৩, ৬০০৩ ও ৮৪৩৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা, সরস্বতীপূজা ও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি অবতারগণের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের জন্মতিথি প্রতিবৎসরই পালন করা হইয়া থাকে। ১৯৫০সালে ময়না থানায় বন্যায় সেবা এবং তমলুক শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলেরায় সেবা এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কার্য।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা ষ্টুডেন্ট্‌স্ হোম: ২০, হরিনাথ দে রোড; শাখা—সোদপুর, পোঃ শুকচর, ২৪ পরগনা) ৩৩ বর্ষ পূর্ণ হইল। আলোচ্য বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠে প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসনীয় কর্মধারার প্রতি চিত্ত স্বতই আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা কোনও রকমে গতানুগতিক ভাবে 'পুস্তকে স্থাপিতা বিদ্যা' গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষা পাশ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। কি স্কুলে কি কলেজে সর্বত্রই প্রায় এই অবস্থা। বাস্তব বৃহৎ জীবনের সহিত প্রায়শই তাহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না, তথা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিও তাহাদের কোন শ্রদ্ধা গড়িয়া উঠে না। ছাত্রগণকে সত্যকার 'মানুষ' করিয়া তুলিবার জন্য যে আদর্শ শিক্ষা-প্রণালীর ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দ দিয়া যান, তাহারই প্রতিরূপ এই বিদ্যার্থী আশ্রম—অতীতের এবং বর্তমান প্রগতিমূলক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ মিলন-ক্ষেত্র। এই বিদ্যার্থী আশ্রম একাধারে আধুনিক কলেজ হোষ্টেল ও প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রম; ছেলেরা একদিকে কলেজে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চলতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসে, অপরদিকে আশ্রমপরিবেশে অভিজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের দ্বারা পূর্বতন গুরুকুল-ধারার ধর্মকেন্দ্রিক কর্মময় জীবনাদর্শে তাহারা পরিচালিত হয়। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত উপাসনা, স্বাবলম্বনসূচক গৃহকর্ম, ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, পীড়িতের সেবা, উৎসবাদি সমষ্টিগত অনুষ্ঠান, হস্ত-লিখিত পত্রিকা-পরিচালনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পর্যটন এই সকল হইতেছে আশ্রম-শিক্ষার কতকগুলি ব্যবস্থা। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের পরিচালনকালে তাহাদের ভাবগত বৈশিষ্ট্যের উপর যথাযথ দৃষ্টি রাখা হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমে আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৮ জন; তন্মধ্যে বিনা খরচে ২৫জন, ৮জন আংশিক খরচে ও বাকী ১৫জন সম্পূর্ণ খরচ দিয়া ছিল। ১৭টি আই-এ ও আই-এস্‌সি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬জন (সকলেই প্রথম বিভাগে) উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৪জন সরকারী বৃত্তি পাইয়াছে এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ৪টি ছাত্র বি-এস্‌সি (দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ) এবং একজন বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাহিরের ৫৩টি ছাত্রকে 'ভানু দাশগুপ্ত স্মৃতি তহবিল' হইতে ৬৮০্ টাকা পরীক্ষার ফি বাবদ সাহায্য করা হইয়াছিল।

বিদ্যার্থী আশ্রমের দমদমস্থ (গৌরীপুর) আবাস ১৯৪১ সালে গত যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়। বর্তমানে শিয়ালদহ হইতে ৮ মাইল দূরে বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট ৩৫ একর জমির উপর একটি সুপরিকল্পিত স্থায়ী আশ্রমাবাস গড়িয়া উঠিতেছে। কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এখানে থাকিবে একটি ঝিল (১০০০´×১৫০´), ছোট পুষ্করিণী (৩টি), খেলার মাঠ, ফুল বাগান, তরিতরকারীর ক্ষেত, গোচারণ-ভূমি, ব্যায়ামাগার, উপাসনা-মন্দির, ৯৬টি ছাত্রের থাকিবার উপযোগী চারটি একতলা এবং দুটি দ্বিতল গৃহ, শিল্প-বিভাগ ইত্যাদি। সমগ্র পরিকল্পনাটির (জমি, জমি-উন্নয়ন, গৃহাদি এবং সকল সাজসরঞ্জাম সহ) আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ১২ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৬লক্ষ ৭০হাজার টাকা (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দান ১ লক্ষ টাকা লইয়া) সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী অর্থের জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের

১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া বাস্তবিকই আনন্দ হইল। আলোচ্য বৎসরে ১৯৯ জন বিদ্যার্থী আশ্রমস্থ ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের পূত পরিবেশে পাঠাভ্যাস করিয়াছে। বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য বিভিন্নমুখী—তন্মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য, উন্মুক্ত প্রশস্তমাঠে আধুনিক বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলা, নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলন, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা, ছাত্রগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবোধ, প্রার্থনা-ভজনাদি, গণতন্ত্রসম্মত প্রতিনিধি-সমিতি, সেবকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত বিচারালয়, আলোচনা ও বিতর্কসভা, হস্তলিখিত 'বিবেক'ও 'কিশলয়' পত্রিকা, ছাত্রগণ-পরিচালিত *নৈশবিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক ও সমবায় ভাণ্ডার,* সব্জী ও ফুলবাগান, সঙ্গীত ও কলাভবন, সুন্দর গ্রন্থাগার এবং গোপালন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকলাপ ও ছাত্রগণের উৎসাহ ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লক্ষ্য করিলে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ রূপায়িত হইতেছে ইহার মধ্যে।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দিরের (৫, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩) ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি।

বিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগ: (১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক (৩) শিল্প। প্রথম দুটি বিভাগে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৬৪৬ ও ৬৬১। শিল্প-বিভাগের শিক্ষার্থিনী-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯ ও ৪৫। বিদ্যালয়-সংলগ্ন আশ্রমে (সারদামন্দিরে) ৩০ জন ছাত্রীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যায়তনটির উত্তরোত্তর উন্নতি ইহার ত্যাগব্রতধারিণী পরিচালিকা-বৃন্দের কর্মকুশলতা ও ঐকান্তিকতারই পরিচায়ক। ১৯৫২ সালে বিদ্যালয়ের ভগিনী নিবেদিতা সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিস্তারিত বিবরণ ১৩৫৯ সালের মাঘ সংখ্যার উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, কইম্বাটোর ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির ১৯৫২-৫৩ সালের বিবরণী আমরা পাইয়াছি। বিভিন্ন বিভাগ প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭২ জন ছাত্রের জন্ম একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, ইন্জিনিয়ারিং স্কুল, চিকিৎসালয়, গবেষণাগার ইহার প্রধান প্রধান অঙ্গ। ত্রিচুরাপল্লী, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম, মাদ্রাজ, তিরুপতি প্রভৃতি স্থানে শিক্ষক ও ছাত্রগণের ভ্রমণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের *পরিচালকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতার পরিচয়* প্রদান করে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির ১৯৪৬-৫২ সনের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া জানা গেল এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বিপুলায়তন গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ে বক্তৃতা, সবাক্‌চিত্রের মাধ্যমে জনশিক্ষা, ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠচক্র ও আলোচনা-সভা এবং উৎসবাদির মধ্য দিয়া ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান্ ১০,০০০ পুস্তক আছে। বক্তৃতা-সভায় বর্তমানে ৮০০ হইতে ১০০০ লোকের সমাগম হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৫২ সনের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ ৪টি উচ্চ, ৩টি মধ্য, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি ছাত্রাবাস সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা সত্যই প্রশংসনীয়। আলোচ্য বৎসরে অধ্যয়নরত বালক-বালিকার সংখ্যা মোট ৩৩২১, প্রধান গ্রন্থাগারের

পুস্তক সংখ্যা ১৭৫৫। নানা উৎসবাদির মধ্য দিয়া প্রভাবপূর্ণ আবহাওয়ায় বর্ধিষ্ণু বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় অধিবাসীদিগের গর্বের বস্তু হইয়া উঠিতেছে।

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (জানুয়ারী ৫২ হইতে জুন ৫৩)—সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত আশ্রমটি একটি সাধনার স্থান। সাধুব্রহ্মচারিগণের তপস্যার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ ধর্ম ও কৃষ্টি-সম্বন্ধে আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি বক্তৃতা দিয়াছেন এবং ২৬০টি আলোচনা-সভা পরিচালনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনায় ধর্মপিপাসু ভক্ত নরনারী-মাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছেন। আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ৯৬৬২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্মে যখন পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হয় তখন শতশত পিপাসার্ত পথচারীর মধ্যে কিঞ্চিৎ গুড় ও ছোলাসহ জলদান এই আশ্রমের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য। আশ্রমস্থ গ্রন্থাগারটির পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে। বর্তমানে ইহাতে ৪৮৮ খানি পুস্তক আছে। গ্রন্থাগারটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ফিজি রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৩) ভারত মহাসাগরস্থ ফিজি দ্বীপের রামকৃষ্ণ মিশন-কেন্দ্রের বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে টাইলেভু-নামক স্থানে একটি নূতন মিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ফিজির কৃষি-অধিকর্তা মিঃ সি হার্ভে ইহার উদ্বোধন করেন।

উৎসব-দিবসে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও ভজন হয়। দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাঁচশতাধিক ভক্ত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অপরাহ্ণে আহূত এক জনসভায় ফিজি মিশন-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী বাণীর গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কেবলমাত্র পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নহে; সকল ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন অনুপম সাধনা দ্বারা সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ হইল ত্যাগ ও সেবা। এই উপলক্ষ্যে শ্রী এ ডি প্যাটেল, মিঃ হার্ভে ও মিঃ এলিয়ট মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। মিঃ হার্ভে মনে করেন, মিশনের প্রচেষ্টায় কৃষিপ্রধান ফিজি দ্বীপের উন্নতি সাধিত হইবে। মিঃ প্যাটেল ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদর্শের ব্যাখ্যা করেন। মিঃ এলিয়ট ইউরোপীয়গণকে পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, মিশনের উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষেই অনুসরণীয়। শ্রী কে বি সিং এবং শ্রীভাস্করন্‌ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন।

২রা অক্টোবর ফিজিদ্বীপস্থ নাদি শ্রীবিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব এবং গান্ধী-জয়ন্তীর পৌরোহিত্য করেন শ্রী এ ডি প্যাটেল। সুসজ্জিত বিদ্যালয়-গৃহে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়। পশ্চিম ফিজির শিক্ষা-অধিকর্তা মিঃ ডব্লিউ এফ রিড সমাবর্তন-ভাষণ প্রদান-পূর্বক উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সার্টিফিকেট দান করেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী পি এন্ দামোদরন্ মোসাদ প্রারম্ভে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব-সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ নবভারত-সৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর অপূর্ব অবদানের উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। মিঃ রিড্ স্নাতক ছাত্রগণকে জীবনের পক্ষে কার্যকর উপদেশ দেন। স্বামী রুদ্রানন্দ ছাত্রগণকে আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক ফিজিদ্বীপে মাধ্যমিক শিক্ষার অপরিহার্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীলোধিয়ার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 'গান্ধীজীর ছাত্রজীবন'। শ্রীভাস্করন্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হইতে গান্ধীজীর প্রিয় আঠারটি শ্লোকের আবৃত্তি করেন। শ্রীসুন্দরজী মহাত্মাজী-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও মহাত্মাজীর জীবনীতে প্রদত্ত কয়েকটি ভজন গান করেন। শ্রী কে এস্ রেড্ডি কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

নিউইয়র্কে প্রচারকার্য—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী গত অক্টোবর মাসের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে যথাক্রমে 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি', 'ধর্মসাধনারূপে কর্ম' 'ঈশ্বরের মাতৃত্ব', 'জগতের মহান আচার্যগণ'—ডিসেম্বর মাসের রবিবাসরীয় বক্তৃতা হিসাবে 'আত্মার সন্ধানে মানুষ' (মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে), 'পবিত্রতার শক্তি', 'মানবে দেবত্ব', যীশুখ্রীষ্টের শৈলোপদেশ ও ইহার আধুনিক ব্যাখ্যা', 'ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ শ্রীমা' এবং জানুয়ারী মাসের রবিবারগুলিতে 'আত্মসংযমে আত্মজ্ঞান', 'আধ্যাত্মিক জীবনের নীতি', 'বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ', 'জগতের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ', ও 'মানবপ্রস্তুতিতে বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্তসমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী নিউইয়র্কের এই আশ্রমটির উপাসনালয়ে 'ভগবৎপ্রেমের অনুশীলন'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী— শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বোধন-উৎসব মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সাড়ম্বরে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি ও ভজনে এই শুভদিনের কার্যারম্ভ হয়। তৎপরে গীতা ও উপনিষৎপাঠ এবং ৭।৪৫ হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিশেষ পূজা, দুর্গাসপ্তশতী পাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে কীর্তন সমবেত ভক্তবৃন্দের চিত্তে অপার আনন্দ দিয়াছিল। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৭০০ দরিদ্র নারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পাঠ এবং শ্রীবালসুব্রহ্মণ্য আয়ার তামিল ভাষায় শ্রীমার পুণ্যচরিত আলোচনা করেন। স্বামী কৈলাসানন্দ ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও তাঁহার সহজসরল অনাড়ম্বর আদর্শ জীবনের অনুধ্যান করিতে বলেন। ১৯শে পৌষ (৩রা জানুয়ারী) রবিবার অপরাহ্নে একটি বিরাট জনসভায় তামিল তেলেগু ও ইংরেজীতে বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং পুরস্কারবিতরণ হয়। মাদ্রাজের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী শকুন্তলা সুব্রহ্মণ্যম্ সভায় নেত্রীত্ব করেন। সভার উদ্বোধনে সারদা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের সঙ্গীত, অভয় নিবাস ও শ্রীনিবাস গান্ধী নিলয়ম্ এর ভজন অতি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। ডক্টর মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন,—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর যাঁহারা দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালিকাকেই শ্রীমায়ের পুণ্য জীবনের ভাব উপলব্ধি করিতে ও তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করিতে হইবে। ভগিনী শুভলক্ষ্মী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পাঠ করেন। সভানেত্রী তাঁহার ভাষণে বলেন, সীতা-সাবিত্রীর মত আদর্শ-জীবন ছিল শ্রীশ্রীমার, তাই তিনি আজ সর্বত্র সকলের পূজা পাইতেছেন। শ্রীমতী কৃষ্ণারাও তেলেগু ভাষায় শ্রীশ্রীমার জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীমার জীবন ছিল ঐশ্বরিক ভক্তিতে পূর্ণ এবং মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত। প্রতিটি কর্মে তাঁহার দেবভাব ফুটিয়া উঠিত। বর্তমান জগতের নারীজাতির শ্রীমার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রীমতী নাগলক্ষ্মী চিন্নায় পিল্লাই তামিল ভাষায় বলেন, শ্রীসারদাদেবীর বাল্যজীবন ছিল অপূর্ব।

এরূপ ঈশ্বরানুরাগ ও আত্মবিলুপ্তি বিরল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিক বিবাহ শ্রীমতী লক্ষ্মী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে জগন্মাতৃত্ব অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। আজ তিনি জগতের মা—শ্রীমা। ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন শ্রীমতী রামসুব্রহ্মণ্যম্। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজগতে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে। গীতার কর্মযোগের দেবীমূর্তি ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁহার অফুরন্ত ভালবাসা জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আপামর সকলে সমভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহার ভালবাসায় কোথাও একটুও কার্পণ্য ছিল না। বক্তৃতা-সমাপ্তির পর শ্রীমতী পালনী বিজয়লক্ষ্মীর যন্ত্রসংগীত, তৎপর আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারবিতরণ হয়। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য শেষ হয়।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব ৯ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতি মনোহর সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের মধ্য ভাগে শ্রীশ্রীমায়ের জয়রাম বাটীকুটিরের অনুকরণে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করা হয়। মায়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি ও তৎসহিত তাঁহার অমূল্য বাণীগুলি বিভিন্ন ভাষায় ঐ কুটিরের ভিতরে ও বাহিরে টাঙ্গাইয়া দেওয়ায় উহা আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসব ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হয় ও ২১শে ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। প্রথম দিনে বিশেষ পূজা পাঠ হোম ও ভজনাদি, দ্বিতীয়দিনে শ্রীযুক্তা এস ভি সোহানা কর্তৃক মহিলাদিগের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও সাধারণসভা, তৃতীয় দিনে মহিলাদিগের প্রবন্ধপাঠ ও কীর্তনাদি, চতুর্থ দিনে শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসারের সভানেত্রীত্বে মহিলাসভা, পঞ্চম দিনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিত লইয়া ভজনাদি সহযোগে একটি কথকতার অনুষ্ঠান, ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম দিনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও সন্ধ্যায় ছায়াচিত্র-সহযোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিষয়ে বক্তৃতা ও শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। সাধারণ সভা পরিচালনা করেন স্থানীয় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস কে দাশ। উহাতে বিচারপতি এস সি মিশ্র, স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, শ্রীবিনয় রায় ও বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মহিলা-সভায় অধ্যাপিকা অরুণা হালদার, অধ্যাপিকা অদিতি দে, শ্রীমতী শকুন্তলা শুক্লা ও শ্রীযুক্তা এস ভি সোহনী ভাষণ দেন। দরিদ্রনারায়ণ-সেবার দিনে প্রায় ২৫০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ-সহকারে খিচুড়ি, তরকারী মিষ্টাদি খাওয়ানো হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১২ই পৌষ পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্নে আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। মহিলাগণও বক্তৃতা এবং শ্রীশ্রীমায়ের চরিত ও বাণীপাঠ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। খেজুরী গ্রামে গঠিত উৎসব সমিতির উদ্যোগে অধ্যাপক শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী-উৎসবের একটি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্বামী অন্নদানন্দ, অধ্যাপক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়, খেজুরী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা এবং অন্যান্য শিক্ষক ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গত ৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ৫ দিন তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিশেষপূজা, সপ্তশতী হোম,

ভজনকীর্তন, চণ্ডীর গান, নরনারায়ণ নাটিকা অভিনয়, শোভাযাত্রা, চণ্ডী ও ভাগবতপাঠ, কথকতা, প্রসাদ-বিতরণ প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবস শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মুন্সেফ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজগদীশ-চন্দ্র দাস শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। চতুর্থ দিবসের বক্তা ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী রামেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ। শ্রীভূপতিচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভাগবতপাঠ ও কথকতা করেন। কয়দিনে দশ সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতি অনুষ্ঠানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব মহা সমারোহে বহুবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়। বোষ্টন রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির নেতা স্বামী পবিত্রানন্দজী এবং এই কেন্দ্রের পরিচালক স্বামী নিখিলানন্দজীর সহযোগিতায় বিশেষ পূজা ও হোমাদি সুসম্পন্ন করেন। নিউইয়র্কের দুইটি কেন্দ্রের বহু ভক্ত এই পূজা দর্শন করিতে আগমন করিয়া-ছিলেন। বিবিধ কুসুমসম্ভারে সুসজ্জিত মন্দিরা-ভ্যন্তর অপূর্ব দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। ঊষা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পূজানুষ্ঠান চলে। পূজান্তে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার একটি সাধারণ উপাসনা-সভা হয়। স্বামী নিখিলানন্দজী 'ভারতীয় নারীগণের আদর্শ- শ্রীমা'-বিষয়ক বক্তৃতায় দেখান কিভাবে সারদাদেবী তাঁহার অপূর্ব সারল্য পবিত্রতা ত্যাগ ও প্রেমমণ্ডিত জীবন দ্বারা জগতের সকল নারীগণেরই অনুকরণীয় একটি মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বক্তা বলেন, উহার আংশিক মাত্র জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলে পাশ্চাত্ত্য নারী-সমাজে এক গৌরবোজ্জ্বল নবযুগের আবির্ভাব হইবে। বক্তৃতা এরূপ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, উপস্থিত সকলেরই মনে হইতেছিল যেন প্রত্যেকেই একটি পবিত্রতার রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। বিচিত্রবর্ণের উজ্জ্বল পুষ্পমাল্যে সুশোভিত সভামণ্ডপস্থ বেদির উপর শ্রীশ্রীমার বিরাট প্রতিকৃতি-দর্শনে বোধ হইতেছিল যেন বেদিতে সমাসীনা শ্রীমা শ্রোতৃ-বৃন্দের উপর শুভাশিস্ বর্ষণ করিতেছেন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রের উপাসনা-গৃহে ১৯শে ফেব্রুয়ারী আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রধান অতিথি ও বক্ত্রী ছিলেন আমেরিকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত জি এল মেহ্‌তার পত্নী শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা। স্বামী অখিলানন্দজী এবং স্বামী পবিত্রানন্দজীও সভায় বক্তৃতা করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল, রাষ্ট্রদূত শ্রী জি এল মেহ্‌তা, ভারতের কনসাল্ জেনারেল শ্রীআর্থার এস্ লাল এবং তাঁহার পত্নী অন্যতম। স্বামী নিখিলানন্দজী পবিত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার শুভ উদ্বোধন করার পর সংক্ষেপে শ্রীমার জীবনী বিবৃত করেন। বাংলার একটি নগণ্য ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন সাধারণভাবে জীবন যাপন করিলেও শ্রীসারদাদেবী আজ জগতের পূজার্হা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে কিভাবে তিনি নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁহার তিরোভাবের পর কি ভাবে রামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী-রূপে শত শত সন্তানের পথপ্রদর্শিকা হন—বক্তা আবেগময়ী ভাষায় তাহা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী সৌদামিনী মেহ্‌তা শ্রীশ্রীমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ এবং স্ত্রীধর্ম-সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেন। স্বামী অখিলানন্দজী ও স্বামী পবিত্রানন্দজী শ্রীশ্রীমার মধুর স্মৃতিকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন, এরূপ দয়া নম্রতা সরলতা শুচিতা

ক্ষমা, মাতৃস্নেহ নিজে না দেখিলে ধারণা করাও কঠিন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের পূর্ণতম অধীশ্বরী হইয়াও সম্পূর্ণরূপে নিজের ভাব কি ভাবে যে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতেন তাহা কল্পনারও অতীত। স্বামী নিখিলানন্দজী বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বেদের একটি আশীর্বাণী পাঠ করিলে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

বোম্বাই নগরে ও এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী জয়ন্তী উৎসব' ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হইয়াছে। খার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ১২ই পৌষ শ্রীশ্রীমার ১০১ তম জন্মতিথি-দিবসে প্রাতঃকালে মঙ্গলারতি, তৎপরে বিশেষ পূজা, ভজনগান, দ্বিপ্রহরে হোম, ভোগরাগ, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে আশ্রমস্থ বিবেকানন্দ হলে একটি বিরাট সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর বাণী পঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মহিলাসঙ্ঘের সহাধ্যক্ষা শ্রীমতী তারাবেন প্রেমচাঁদ সভানেত্রী হন। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ 'নারীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শ শ্রীমা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রী এস্ সি দাশগুপ্ত ইংরেজীতে, শ্রীমতী ববীবেন মুলজী দয়াল (অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) গুজরাটীতে, শ্রীমতী এম্ এস্ এইচ্ ঝাবওয়ালা (অখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অধ্যক্ষা) হিন্দীতে এবং শ্রীমতী কুসুমবাঈ মাসটেকর মারাঠীতে শ্রীমার জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) একটি মহিলা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাতে সভানেত্রীত্ব করেন বোম্বাই রাজ্যপালপত্নী শ্রীযুক্তা বাজপেয়ী। সভানেত্রী মহোদয়া অসুস্থতাবশতঃ কোন ভাষণ দিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার উপস্থিতিতে সভার কার্য সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খ্যাতনামা সুরশিল্পিগণের সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্ধন করে।

প্রাচীন সন্ন্যাসি-দ্বয়ের দেহত্যাগ— শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী মোক্ষদানন্দজী (মুদ্দাপ্পা বা 'ব্রাদার' মহারাজ নামে পরিচিত) গত ১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৬৪ বৎসর বয়সে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি উদরে ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। কুর্গদেশবাসী মুদ্দাপ্পা ১৯১৫ সালে মঠে যোগদান এবং ১৯২৩ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার শান্ত অমায়িক ব্যবহার এবং সেবাপরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। বহুবৎসর তিনি আলমোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ কুটিরে ধ্যানধারণা এবং আশ্রম সেবা লইয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহবিমুক্ত আত্মার পরমা শান্তি কামনা করি।

গত বুধবার ৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ৩টা ১৫ মিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী অমেয়ানন্দজীর (মোক্ষ মহারাজ) নশ্বর দেহ পরম পদে বিলীন হইয়াছে। ইনি ১৯১৮ সালে পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের পুতসংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগদান ও পরে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সংঘে আসিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে যোগদান করিবার বহুপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আর্তত্রাণাদি সেবাকার্য হইতেই তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় ও পরে সন্ন্যাস জীবনে গড়বেতা চণ্ডীপুর ও তমলুকে তাঁহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে ইঁহার জন্ম হয় এবং এই দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই জেলার নানা জনহিতকর কার্যে অতিবাহিত হয়। এই জেলার বহু গৃহী নরনারী ও ধর্মপ্রাণ যুবক তাঁহার চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাব গ্রহণের অধিকারী হইয়াছেন এবং এই সকল যুবকের কেহ কেহ আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান

করিয়াও জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রায় শেষ ছয় বৎসর কাল তমলুক আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে নানা জনহিতকর কর্মদ্বারা তিনি যে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর যে বিরাট শোভাযাত্রা হয় তাহার দ্বারাই সূচিত হয়। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতেই তিনি করোনারী থম্বোসিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন ও নিজের অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শুভ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। তবে জয়ন্তী-উৎসব আরম্ভ করিয়া আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃভক্ত বালক 'মা মা' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার বিদেহ আত্মা মায়ের অভয় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই জগদম্বার শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

জামসেদপুরে অনুষ্ঠান—জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত ১১টি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণী সভাও হয়। সভায় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, কলিকাতাস্থ জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং জামসেদপুরের শ্রীমতী বীণারাণী দত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ছাত্রছাত্রীগণের আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির খুব প্রশংসা করেন। স্বামীজীর উৎসব উপলক্ষ্যে দুইটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। একটি বিষ্টুপুর সোসাইটিতে অপরটি বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উভয় সভাতেই বিরাট জনসমাগম হয়। সুবক্তাগণ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়া তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯ তম জন্মতিথি গত ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ) শনিবার, বেলুড়মঠে সারাদিনব্যাপী পূজা, হোম, পাঠ, কীর্তনাদি সহ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বহুসহস্র নরনারী এই উপলক্ষ্যে মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রায় দশহাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের সুপ্রশস্ত নাট-মন্দিরে সন্ধ্যায় শত শত স্ত্রীপুরুষ ভক্তিতদ্‌গতচিত্তে ঠাকুরের আরতি দর্শন করেন। আরতির পর গভীর রাত্রি পর্যন্ত মূল মন্দিরে দশমহাবিদ্যার পূজা সম্পন্ন হয়। শেষ রাত্রে সমবেত সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে ও যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ৭ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং ১২ জন ব্রতীকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দান করেন।

অপরাহ্নে মন্দিরের পূর্বদিকের প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ-স্বামী মাধবানন্দজীর পরিচালনায় একটি মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী ইংরেজীতে এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার বাঙলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য আলোচনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী মাধবানন্দজী বলেন যে, রামকৃষ্ণদেব শুধু বাঙলা দেশের নন, সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। তিনি জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ঠাকুর সমগ্র জাতিকে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বর্তমানে বহুমুখী উন্নত বৈজ্ঞানিক জগতে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরম শান্তির পথ দেখা যায় না। সেইজন্য রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মপথে শান্তির আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডুলিপি—

লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে যে প্রাচ্য পুস্তকাবলী এবং পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে ঋগ্বেদ এবং রামায়ণের ন্যায় পুরাতন ভারতীয় পাণ্ডুলিপিগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচ্য সভ্যতা এবং মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং দূর প্রাচ্যসম্বন্ধে পরিচয় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫০টি বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডুলিপি এবং পুস্তকাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহাদ্বারা ভারতের ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের একটি সুষম চিত্র লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ এবং রামায়ণের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মপুস্তক এবং মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি যেমন এই প্রদর্শনীতে আছে তেমনই আছে বিভিন্ন যুগের বিশুদ্ধ ক্লাসিক্যাল সাহিত্য। তালপত্র, স্বর্ণথালি, তাম্র, কাঠের বোর্ড এবং অন্যান্য বহুবিধ উপকরণের উপর লিখিত অহমিয়া, বর্মী, হিন্দী, মারাঠী, সিন্ধী, সিংহলী, তামিল প্রভৃতি ভাষার পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ইহা ছাড়া প্রদর্শনীতে আছে পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন বৌদ্ধ পালিপুঁথি। এই সঙ্গে আছে ভারতীয় ভাষায় এবং বিশেষ ভাবে দক্ষিণী ভাষায় অনূদিত বাইবেলের পাণ্ডুলিপি। (ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস)

ফলতায় (২৪ পরগনা) জনসেবা

বিগত ১৯৫০ সালে অশিক্ষিত, দরিদ্র ফলতা অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর আদর্শে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কলিকাতার কতিপয় উদারচেতা ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা ও বদান্যতায় এই সেবাশ্রমের সেবা, শিক্ষা ও প্রচার-কার্য ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যালয় নামে জুনিয়ার হাই স্কুল চলিতেছে এবং উহা গভর্নমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন সেবাশ্রমে রোগীর সেবা, বস্ত্রাদি দান, দুগ্ধবিতরণ, ঔষধ-বিতরণ, ক্ষুধাতুর বালক, বালিকা ও প্রসূতিদের সাধ্যমত অন্নদান প্রভৃতি সেবাকার্য হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর মহাপুরুষদের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৺মানবেন্দ্রনাথ রায়—গত ১১ই মাঘ সোমবার বঙ্গমাতার সুসন্তান ও বিশ্বের একজন অন্যতম বিপ্লবী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্র রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ছিল প্রখরতম যুক্তি ও অসামান্য সাহসিকতায় সমুজ্জ্বল। বর্তমান প্রগতিশীল জীবনে তাঁহার চিন্তাধারার মূল্য অনেকখানি। মানবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, কর্মনিষ্ঠা ও আদর্শ যুবসমাজের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়—গত ১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) ৺জগদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা এবং সলিসিটর শ্রীরতনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে একজন বরেণ্যা আদর্শ মহিলার অভাব ঘটিল। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, সেবাপরায়ণতা ও সামাজিক সৌজন্যের জন্য তিনি সকলের প্রীতিভাজন ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও লেখিকা বলিয়াও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 'উদ্বোধনে'ও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার

উর্ধ্বগতি কামনা করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনকে সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী—গত ১২ই পৌষ আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ভোর ৬টায় মঙ্গল-আরতি, প্রার্থনা ও ভজনগান হইয়াছিল। অতঃপর বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। বৈকাল চার ঘটিকায় এক জনসভার অধিবেশন হয়। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বহু মহিলা এবং দিল্লী হইতে আগত অন্যতম উপমন্ত্রী শ্রীজয় সুখলাল হাথী এই সভায় যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মবার্ষিকী-উপলক্ষ্যে ১৭ই পৌষ দেওঘর নাগরিকবৃন্দ স্থানীয় রাজনারায়ণ বসু পাঠাগারে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। ধূপের সৌগন্ধ্য, শঙ্খধ্বনি ও সঙ্গীতের পবিত্র পরিবেশে মায়ের পূজা ও অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অবসরে হুগলী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্মের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী, ভাগবতভারতী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-অবলম্বনে স্বরচিত মাতৃভাগবত পাঠ করেন। স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ, মহকুমা হাকিম শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনন্দন সহায় বক্তৃতা দেন।

দরং তেজপুর (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১২ই পৌষ পূজাপাঠ, দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও প্রসাদ-গ্রহণাদির মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাঁদপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ১৮ই এবং ১৯শে পৌষ (২রা ও ৩রা জানুয়ারী) শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হয়। পূজা পাঠ হোম শাস্ত্রাবৃত্তি নগরকীর্তন নাট্যাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী শর্মানন্দ, পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত আলোচনাসভায় ভাষণ দেন।

বাগুইআটি (২৪ পরগনা) পল্লীকল্যাণ সংঘের উদ্যোগে ১লা জানুয়ারী হইতে ৩রা জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান যথাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুণ্য উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে সকালে বাগুইআটি হরিসভা ও নেতাজী কিশোর সংঘ কীর্তনসহকারে পল্লী পরিভ্রমণ করে। তৎপরে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, হোমাদি ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দের ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, কথামৃত পাঠ ও কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে। উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশনে অপরাহ্নে হিন্দু বিদ্যাপীঠ ছাত্রসংসদের পরিচালনায় সাহিত্যিক শ্রীকুমারেশ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'ছোটদের আসর' বসে। সন্ধ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভক্তিরত্ন কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং রঘুনাথপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন হয়। উৎসবের শেষদিন তৃতীয় অধিবেশনের অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। স্থানীয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিও আলোচনায় যোগদান করেন।

বলরামপুর (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে ১২ই পৌষ রবিবার দিন পূর্বাহ্নে গ্রামের বালক, বালিকা ও মহিলাবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুষ্পসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া সমবেত কণ্ঠে মাতৃসংগীত সহ শোভাযাত্রায় সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম যথাবিধি সম্পন্ন হয় ও পরে প্রায় দুই হাজার নরনারী মায়ের প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হন। অপরাহ্নে একটি মহিলাসভা হয়। সন্ধ্যারতির পর ভজনগান খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

দেবগ্রামে (নদীয়া) গত ১২ই পৌষ শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও নামকীর্তনান্তে "জয়ন্তীসঙ্গীত" সহ প্রভাতফেরী গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর শোভাযাত্রা ৺সতীমায়ের ভিটায় আসিয়া শেষ হয় এবং সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐদিন পূজাগৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপর প্রসাদ-বিতরণ ও নর-নারায়ণের সেবামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ৺সতীমায়ের ভিটাতেই একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপধামবাসী পরম ভাগবত শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াশী, এম্ এ মহোদয় জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের দমদম (২১এ, দমদম রোড) এবং টালিগঞ্জ (১১, অচনা এভিনিউ, নাকতলা) এই উভয়কেন্দ্রে ১লা ফাল্গুন শনিবার হইতে ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার পর্যন্ত সপ্তাদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

১লা ফাল্গুন, শনিবার : সমস্তদিনব্যাপী পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ। প্রায় সাত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২রা ফাল্গুন, রবিবার :—দমদম আশ্রম হইতে সকাল ৮॥ টায় পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্যা ও অন্যান্য মহিলা ভক্ত পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত একটি দোলায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে কীর্তন, জয়ধ্বনি ও শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে বরাহনগর ও আলামবাজার হইয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেখানে পূজা সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পবিত্র স্থানসকল দর্শনান্তে শোভাযাত্রা পুনরায় দমদম আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে। এই শোভাযাত্রা পথিপার্শ্বে অপেক্ষমাণ জনগণের, বিশেষতঃ আশ্রম-কন্যাদের অন্তরে বিপুল আশা, আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ৩রা ফাল্গুন, সোমবার অপরাহ্নে দমদম আশ্রমে বেলুড়মঠের স্বামী জপানন্দজীর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সভায় শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার একটি সুলিখিত প্রবন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন। তৎপরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষাসম্বন্ধে ভাষণ দেন।

অনুরূপ ভাবে ৫ই ফাল্গুন বুধবার টালিগঞ্জ নাকতলা আশ্রমে সমস্তদিনব্যাপী পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন ও সহস্রাধিক লোকের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ হয়। ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার নাকতলা আশ্রম হইতে পঞ্চশতাধিক আশ্রমকন্যা সুসজ্জিত দোলায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের প্রতিকৃতি বহন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে কুসুমকাননস্থিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর মন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর বিশেষ অভ্যর্থনা ও ভোগরাগের দ্বারা পূজিত হইলে শোভাযাত্রা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে। ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্নে স্বামী জপানন্দজীর পরিচালনায় এক সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী জপানন্দ এবং আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ আশ্রমের উভয়কেন্দ্রে প্রতিবেশী মায়েদের লইয়া মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্বোধন হয়।

গত ২৬শে পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ধীপুরের স্বর্গত সুরেন্দ্রকান্ত সরকার মহোদয়ের বসত বাটিতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিক্রমপুর অঞ্চলের সর্বপ্রথম সাধারণ উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণমঠের স্বামী সত্যকামানন্দ ও স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ এবং বিভিন্ন গ্রাম হইতে অল্পাধিক ছয় হাজার লোক উক্ত বাটিতে সমাগত হন। প্রত্যুষে সন্ন্যাসিদ্বয়ের পরিচালনাধীনে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও

মায়ের প্রতিকৃতি পুরোভাগে লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা নগরকীর্তন করিতে করিতে রাউৎ ভোগ, ধীপুর ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে সুশোভিত মণ্ডপে স্থিত উক্ত পটের সম্মুখে কীর্তনীয়াদল মধুর কীর্তনগান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। দ্বিপ্রহরে স্থানীয় ব্রাহ্মণভিটা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে স্বামী সত্যকামানন্দ বক্তৃতা এবং স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ ঠাকুর ও মায়ের পূজা সম্পন্ন করেন। ভক্তপ্রবর সরকার মহোদয় যে ঘরে থাকিতেন সেই কক্ষে বসিয়া প্রবীণ ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের ও তাঁহার সহচরী শ্রীশ্রীযোগীন মার প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অপরাহ্ণে একটি জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ পুনরায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া একটি ভাষণ দেন। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রিতে কুমিল্লা রামকৃষ্ণ আশ্রমের বালকবৃন্দ ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করিলে পর রামায়ণগান হয়। রাউৎভোগ ধীপুর ইউনিয়নের অধিবাসিগণের সমবেত চেষ্টার ফলে এবং উক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শ্রীসুনীল কুমার বসু, শ্রীরাধামাধব দাস, শ্রীঅনন্তকুমার ঘটক, শ্রীশৈলেন্দ্রকান্ত সরকার এবং শ্রীনরেশচন্দ্র দাস মহোদয়গণের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১২ই পৌষ সুনামগঞ্জ (শ্রীহট্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার্চনা, বেদমন্ত্র ও দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, ভজনসঙ্গীত; অপরাহ্ণে সমবেত প্রার্থনা এবং সন্ধ্যায় ধর্মসম্মেলন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—"পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাগণের জীবনী আলোচনা ও তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অবদান"। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জমিদার ও বিশিষ্ট উকিল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় এবং বক্তৃতা করেন মৌলবী আমির আলী জোয়ারদার মুন্সেফ, মৌলবী সিরাজুদ্দিন আহাম্মদ মুন্সেফ, রেভারেণ্ড সুরেশচন্দ্র দাস এবং অধ্যাপক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ও শতবার্ষিক-জন্মোৎসব

৮ই এপ্রিল ১৯৫৪, (বাং ৫ই চৈত্র) শুক্রবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব ও মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই পুণ্যস্থানে ৭ই হইতে ৯ই এপ্রিল (বাং ২৪শে হইতে ২৬শে চৈত্র) তীর্থ যাত্রীদের খুব ভিড় হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জয়রামবাটী একটি ছোট গ্রাম, সমাগত যাত্রীদের সুখ-সুবিধা ও স্থানসংকুলান করার জন্য সাময়িক যাত্রিনিবাস নির্মাণ করা হইতেছে।

এই সব কাযে সময় এবং অর্থ দুইই প্রয়োজন। অতএব যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, তাঁহারা যেন ২০শে মার্চের মধ্যে নীচে লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহ পত্র আমাদের নিকট লিখেন এবং আসিবার সময় বিছানা, মশারি ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনেন।

উৎসবের তিন দিনের প্রতিদিন প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত যাত্রী প্রসাদ পাইবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে কোন দান সাদরে গৃহীত হইবে।

জয়রামবাটী যাইবার সহজ পথ ঃ

কলিকাতা হইতে ট্রেনে বিষ্ণুপুর ও সেখান হইতে বাসে জয়রামবাটী।

ট্রেনের সময় ঃ—

যাইবার—	১।	হাওড়া ছাড়ে	সকাল	৭টা	বিষ্ণুপুর পৌছায়	২-১১	বিকাল
	২।	„ „	রাত্রি	৯-১০	„ „	২-২৯	রাত্রি
ফিরিবার	১।	বিষ্ণুপুর „	সকাল	১১-৫৩	হাওড়া „	৭টা	সন্ধ্যা
	২।	„ „	রাত্রি	১০-১৩	„ „	৪-১০	ভোর

বিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী ২৮ মাইল, বাস সব সময় পাওয়া যাইবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ— ১। নাম ও ঠিকানা…………………………

২। যাত্রিসংখ্যা (শুধু বয়স্কেরা আসিবেন) পুরুষ ………মহিলা………

৩। পৌছানর তারিখ………… …… ৪। অন্যান্য কিছু জানাইবার থাকিলে……………

স্বামী মাধবানন্দ (সাধারণ সম্পাদক)— শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)

প্রিয় ও অপ্রিয়

মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং।
পিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং ॥
তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ পিয়াপায়ো হি পাপকো।
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিয়াপ্পিয়ং ॥
পিয়তো জায়তী সোকো পিয়তো জায়তী ভয়ং।
পিয়তো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ॥
পেমতো জায়তী সোকো পেমতো জায়তী ভয়ং।
পেমতো বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং ॥

—বুদ্ধবাণী (ধম্মপদং, পিয়বগ্‌গো, ২-৫)

[পরমশ্রেয়পথের যাত্রীকে প্রিয় এবং অপ্রিয় রূপ দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। দুইটাই মনকে সংসারে টানিয়া রাখে, দুইটাই বন্ধন। দুইটির প্রতিই অভ্যাস করিতে হইবে বিবেক-প্রখর উদাসীনতা।]

যাহা প্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার সহিত কখনও নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না, আর যাহা অপ্রিয় তাহারও সংস্পর্শে গিয়া দুঃখ ডাকিয়া আনিও না। প্রিয়ের অদর্শনে দুঃখ, অপ্রিয়ের দর্শনে দুঃখ। (প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় হইতে চিত্তকে বিমুক্ত রাখিয়া দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।)

কোন কিছুকেই অতএব, প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না, কেননা একদিন প্রিয়ের বিচ্ছেদ আসিয়া নিদারুণ দুঃখভার মাথায় চাপাইয়া দিবে। প্রিয়-অপ্রিয়কে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাদের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়-বুদ্ধি হইতেই আসে শোক, প্রিয়-চিন্তা হইতেই তো উদ্‌বুদ্ধ হয় শঙ্কা। প্রিয়-ভাবনা হইতে যিনি মুক্ত হইতে পারিয়াছেন তাঁহার কোন সন্তাপ নাই। তাঁহার ভয়ই বা কিসের ?

আসক্তি-মলিন ভালবাসার পরিণাম ক্লেশ, ঐরূপ ভালবাসা আবার, ভয়েরও জনক। অনিত্য বৈষয়িক প্রীতি হইতে যিনি বিমুক্ত তাঁহার কখনও চিত্ত-বিকলতা আসে না। ভয়ই বা তাঁহার কাছে আসিবে কেমন করিয়া ?

কথাপ্রসঙ্গে

বৈশাখে

নূতন বর্ষের প্রথম প্রভাতে দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও মৈত্রী নিয়োজিত হউক। বাহিরের বিচিত্র পরিবেশ মানুষের অন্তরের মিলনকে যেন প্রতিহত করিতে না পারে। মানুষ যে জায়গায় এক, সেই জায়গাটির দিকে সে চোখ বুঁজিয়া থাকে বলিয়াই তো তাহার এত দ্বন্দ্ব, এত সংঘর্ষ। বৈশাখের প্রখর কিরণ আমাদের নয়নের জড়তা দূর করুক, আমরা চোখ খুলিয়া নিজের দিকে তাকাই, বিশ্বের দিকে তাকাই, নিজের মধ্যে বিশ্বকে, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করি। সেই আবিষ্কার আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্কলুষ করুক, আচরণকে নিঃস্বার্থ করুক, হৃদয়াবেগকে উদার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করুক!

*　　　*　　　*

বৈশাখীপূর্ণিমা তিথি স্বতই আমাদের স্মরণপথে আসিতেছে। মানবের পরম মিত্র ভগবান বুদ্ধদেব এই পুণ্যতিথিতে জন্মগ্রহণ, তথা সম্বোধি- ও নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তাঁহার দেবচরিত্র এবং মুক্তি ও সেবার বাণী পৃথিবীর নানা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে শান্তি ও শক্তি দিয়া আসিতেছে। মানুষ যদি জিতেন্দ্রিয়, দ্বেষ-লোভ-মোহ-বিমুক্ত, শান্ত এবং নিঃস্বার্থ জীব-প্রেমিক হইতে পারে তাহা হইলেই সে প্রকৃত ধার্মিক, তবেই সে প্রকৃত মহান। পুঁথিপত্রের বড়বড় তত্ত্বকথা, লোকাচার, দেশাচার, এবং অন্ধ গতানুগতিকতার মধ্যে ধর্ম নাই, ধর্ম মানুষের আত্মিক উৎকর্ষে—গৌতম বুদ্ধ এই কথাটিই তাঁহার জীবন ও সরল উপদেশের মধ্য দিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন। সত্য যে মতের অপেক্ষা বড়, বেদের এই সর্বোত্তম শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অনুসরণকারী হেঁয়ালীর মতো শুনাইলেও বলিতে বাধা নাই—ছিলেন বেদেরই নিন্দাকারী ভগবান শাক্যমুনি। নিন্দা তিনি করিয়াছিলেন বেদের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগকে, বেদ-সত্যকে নয়। বেদের প্রকৃত মর্ম তাঁহার জীবনে যেমন মূর্তিগ্রহণ করিয়াছিল এমন লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর এক-জনের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধ বেদ-সত্যেরই অভিব্যক্তি। সনাতন ভারতবর্ষ তাই তাঁহাকে অবতার বলিয়াই পূজা করে। আমরা এই সংখ্যায় তাঁহার স্মৃতিপূজা হিসাবে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ ও কবিতা সন্নিবদ্ধ করিলাম।

*　　　*　　　*

বৈশাখের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ভগবান শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজে এই মহামনীষীর বলিষ্ঠ চিন্তা ও ভাবধারা একদিন প্রচুর শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। এখনও উহার ক্রিয়া চলিতেছে। 'সর্বংখল্বিদংব্রহ্ম'—ক্ষুদ্র বৃহৎ চেতন অচেতন যাহা কিছু দেখিতেছ সকলই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—বহু-বৈচিত্র্যময় জগতে প্রকৃতপক্ষে বিভেদ কিছু নাই, সব কিছুই চৈতন্যসত্তায় দেদীপ্যমান—উপনিষদের এই একত্বের বাণীই শঙ্করাচার্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই একত্বের শিক্ষা মানুষের হৃদয়-মন হইতে সকল দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দেয়, নিজের অজর অমর আত্মস্বরূপে আস্থা আনিয়া তাহাকে নির্ভীক, সবল ও নিঃস্বার্থ করে। আচার্যের অদ্বৈতবাদ পরাজয়ের, পলায়নের দর্শন

নয়—বিশ্বপ্রকৃতির মর্মোপলব্ধির দর্শন—জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তমরূপে গ্রহণের দর্শন।

* * *

বাঙলায় এবং বাঙলার বাহিরে শিক্ষিত বাঙ্গালী ২৫শে বৈশাখ তারিখটিকে একটি জাতীয় উৎসব দিন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কবিতায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে তথা স্বাদেশিকতা ও দেশসেবায় যিনি বাঙ্গালীর প্রাণে এক অভিনব উদ্দীপনা ও শক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন ২৫শে বৈশাখে সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী তাহার জাতীয় গৌরবেরই পূজা করে। বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোথায়, শত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও তাহার জীবনের ঐক্য কোথায়, এই বোধটি রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন অতি নিবিড়ভাবে। তিনি যে একজন সত্যকারের বিশ্বমানব ছিলেন, সর্বদেশের সকল মানুষের হৃদয়মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহরণ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে বোধ করি এই জিনিসের অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান কবির বাঙ্গালীত্ব-চেতনা। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী বাঙলার মাটিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তাহার সামাজিক ঐতিহ্যের উপর গভীর অনুরাগ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহার ভাষা ও জীবনধারার প্রতি একটি নূতনতর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। তবুও কিন্তু কবির মধ্যে একটুও প্রাদেশিকতা ছিল না। বাঙ্গালীর যাহা কিছু সুন্দর তাহার সহিত ভারতের যাহা কিছু সুন্দরের একটুও বিরোধ নাই—এই সত্য কবির জীবনে ও রচনায় কী স্পষ্টভাবেই না আমরা দেখিতে পাইয়াছি! তাঁহার জীবনের ও বাণীর এই দিগ্‌দর্শন আজ বাঙ্গালীকে সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। সমকালে তাহাকে হইতে হইবে পূর্ণ বাঙ্গালী এবং পূর্ণ ভারতীয়।

পূজা-আরতির স্বপক্ষে

"এই যুগের ঠাকুরকে ও তাঁহার মন্ত্রদীক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে তাঁহার অনুবর্তীরাই বুঝিল না। বুঝিল না যে, এ যুগপ্রবর্তক ঠাকুর পূজারতির ঠাকুর নয়, মঠ-মন্দিরের চারটি দেয়ালের ঠাকুর নয়, এ দরিদ্রনারায়ণের জাগরণকারী ঠাকুর কাঙ্গালী ভোজনের তুচ্ছ ঠাকুর নয়। * * * ঠাকুরের পাষাণ মূর্তি ঘিরিয়া তোমাদের শঙ্খঘণ্টা পূজারতির ম্লান দীপ এমনই ব্যর্থতায় ডুবিয়া যাইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দের দেওয়া অজস্র সাধনসম্পদ তোমরা পাইয়াও হিন্দুত্বের বাণী কতটুকু দিকে দিকে বহিয়া লইলে! * * * তোমাদের ব্যর্থতার মূলে আছে অন্ধপূজা আর ব্যর্থ ভোগলোলুপতা। যুগের ঠাকুরকে, বিশ্বের ঠাকুরকে, নবযুগের ঠাকুরকে গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলুর মাঝে ঢাকিয়া রাখিতে গিয়া তোমরা ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছ।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি ২২শে ফাল্গুনের দৈনিক বসুমতীর 'যুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে লওয়া। উদ্ধৃতির কঠিন কথাগুলির লক্ষ্য কাহারা—লেখায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু কথাগুলির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এক ধরনের আচরণের অর্থাৎ পূজা-আরতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানমূলক শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। লেখকের মতে এই সকল বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা ঠাকুরের যুগকার্যকে ব্যাহত করা হইতেছে।

পূজা-আরতির প্রতিবাদ—উহাদের যিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ—তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই শুনিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শুনিয়াও তাঁহার অনুবর্তীদের পূজারতি বন্ধ করিতে বলেন নাই। ঠাকুর যে মন্দিরের ঠাকুর নন্, বিশ্বের ঠাকুর, ইহাও আবার, তাঁহারই সতর্কবাণী। কিন্তু এই সতর্কবাণীর অর্থ নিশ্চিতই ইহা ছিল না যে যাহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিতে চ তাহারা ভয়ানক অন্যায় করে। তাহা হইে শ্রীরামকৃষ্ণই বা তাঁহার নিজের ফটোর দিে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 'কালে ঘরে ঘরে এ

পূজা হবে'—ইহা বলিয়া যাইবেন কেন? স্বামী বিবেকানন্দই বা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটের পূজার প্রবর্তন করিয়া যাইবেন কেন? তাঁহার দেহত্যাগের দিনও তিনি ঠাকুরঘরে গিয়া বেলা ৮টা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যগণও এই পূজা-সেবার ব্যবস্থাকে সমর্থন ও পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছেন। সত্য, স্বামীজীর 'ঠাকুরঘরে' 'ভয়' ছিল; স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৪ সালে আমেরিকা হইতে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আমার মহাভয় ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all (সর্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাই ভয়।"

বলা বাহুল্য, এই 'ভয়' শঙ্খঘণ্টা চামরের বাড়াবাড়িরই ভয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার গভীরতর, ব্যাপকতর বাস্তব প্রয়োগকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহ্যিক মাতামাতির ভয়। স্বামীজীর উক্ত আশঙ্কা যদি কোন ক্ষেত্রে সত্য হইয়া থাকে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর প্রধান অঙ্গ ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবার কথা ভুলিয়া যদি কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-পটের সম্মুখে পূজারতিকেই সার করিয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই উহা সমর্থন করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনের সর্বাঙ্গীন আদর্শকে সর্বদা পুরোভাগে রাখিয়া যাঁহারা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির জন্য মন্দিরে পূজা পাঠ আরতি হোমাদিতে কয়েকঘণ্টা কাটাইয়া বাকী সময় অতন্দ্রিত লোকহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে বলা চলে না। আদর্শকে ভাবুকতা দ্বারা দূর হইতে নিরীক্ষণ করা এক কথা আর উহাকে শরীর মনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিশাইয়া ফেলা স্বতন্ত্র কথা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বহু ত্যাগ স্বীকার, বহু ধৈর্য-অধ্যবসায়-উদ্যমের প্রয়োজন হয়, অনেক 'খুন ঔর পসীনা' (রক্ত ও ঘাম) ফেলিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর তাঁহাদের 'অনুবর্তী'গণ বহুতর বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও যে অবিচলিত বিশ্বাস, অকুণ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, সাহস ও চরিত্রবল লইয়া দিগ্-দিগন্তরে যুগপুরুষদ্বয়ের বাণীর প্রচার ও নানাভাবে বাস্তব রূপদান করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেশে ও বিদেশে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইয়া থাকেন। অনেকে অবশ্য দেখিতে পান না, কারণ তাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা নাই।

চরিত্রের শক্তি, সেবার শক্তি আকাশ হইতে নামিয়া আসেনা—আসে তদ্গত আত্মসংযম, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মত্যাগ, অন্তর্মুখীনতা হইতে, গভীর ভগবদ্বিশ্বাস এবং ভগবৎপ্রেম হইতে। এইগুলি অনুশীলন করিতে হয়, দিনের পর দিন—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় 'ত্রেকেটে তাক্' তবলায় তুলিতে গেলে দীর্ঘকাল হাত সাধিতে হয় সেইরূপ। এই অনুশীলনের পথে মঠ-মন্দিরের চারটি দেওয়ালের মধ্যে পাষাণ-প্রতিমা, পূজারতির দীপ, শঙ্খ-ঘণ্টা, দণ্ড-কমণ্ডলু যদি আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলে আঁৎকাইয়া উঠিবার কিছুই নাই। এগুলি পথের প্রয়োজন, শতকরা ৯৫ জনের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন; কিন্তু ইহারা পথের চির-সাথী নয়, এগুলিকে ডিঙ্গাইয়া পথ যে আরও বহু বহু দূর চলিয়া গিয়াছে—সে তথ্য সমালোচকগণের ভ্রূকুটি-লক্ষিত 'অনুবর্তিগণে'র হয়তো ভাল করিয়াই জানা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর তাৎপর্য কে কতটা বুঝিয়াছে, বুঝিতে কে কোথায় কতটা ভুল করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে রায় দেওয়া সহজ নয়। এ কথা নিশ্চিতই নিঃসন্দিগ্ধ সত্য যে তাঁহারা শুধু ভারতের নন, সারা বিশ্বের; শুধু

মঠ মন্দিরের নন, মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রের ; শুধু সন্ন্যাসী ও ভক্তের নন, সমাজের ও দেশের সর্বস্তরীয় নরনারীর। তাঁহাদিগের বাণীর মধ্যে যিনি যেরূপ প্রেরণা পাইবেন উহা লইয়াই চলিতে তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। 'অনুবর্তী'রা যদি তাঁহাদের নিজেদের দিক দিয়া সেই বাণীর পরিপালনে কখনো একটুখানি শঙ্খঘন্টা বাজাইয়াই থাকেন তাহাতে তাঁহাদের এতটুকুও লজ্জিত হইবার নাই, কারণ তাঁহারা জানেন পূজা-আরতি ছাড়াও তাঁহারা অনেক কিছু করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিতে চাহিতেছেন। সবটা মিলিয়া তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিশক্তি-অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যে ভাবে অনুসরণ করিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়।

দেশে এবং বিদেশে যুগাবতারের প্রভাব ও কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তে কোন ব্যর্থতার নৈরাশ্য নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা চোখের সম্মুখে এবং অন্তরালে অভাবনীয় ভাবে মানুষের মনে ও কর্মে কিরূপ ক্রিয়া করিয়া যাইতেছে ইহা নিত্য দেখিয়া ও শুনিয়া তাঁহারা সর্বদাই আশায় বুক বাঁধিয়া চলেন। তবে তাঁহারা কাহাকেও অনাবশ্যক কটূক্তি না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলেন,—যাহা করিয়াছ বেশ করিয়াছ, আরও ভাল কর, যতদূর আসিয়াছ বেশ আসিয়াছ, আরও সম্মুখে আগাইয়া চলো।

তাঁহাদের মন্দিরকোণে পাষাণ-প্রতিমার সম্মুখে দীপালোক ঐরূপই জ্বলিয়া চলিবে, পার্থিব আলোর ম্লান রশ্মি ধরিয়া ভাস্বর চৈতন্যের জ্যোতিষ্মান্ প্রভাকে আবিষ্কার করিবার জন্যই—তাঁহাদের বাহ্যপূজায় শঙ্খঘন্টাও ঐরূপই বাজিয়া চলিবে, অন্তরলোকে সঞ্জাত মহাপ্রেমের উদাত্ত আহ্বান সারাবিশ্বে ধ্বনিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই—দণ্ড কমণ্ডলু গৈরিক রুদ্রাক্ষও তাঁহাদের ভূষণ থাকিয়াই যাইবে, সকল দেশের সকল মানুষের সহিত আত্মাত্মবোধ করিবার নিমিত্তই, অকিঞ্চন হইয়া শ্রেষ্ঠবিত্তের সন্ধান দ্বারা ঐশ্বর্য-গর্বিতগণের হৃদয়ের দৈন্য ঘুচাইবার জন্যই।

শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষা

কয়েকমাস পূর্বে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্তন-উৎসব হইয়া গেল তাহাতে চ্যান্সেলার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণ সংস্কৃত ভাষায় দিয়াছেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের এবং ভাইস্‌চ্যান্সেলারের বক্তৃতা ব্যতীত অনুষ্ঠানের অন্যান্য কার্যসূচীও সংস্কৃতভাষাতেই নির্বাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। একথা সত্য যে, দেশের শিক্ষিত সর্বসাধারণ বুঝিতে পারিবে সংস্কৃতের প্রচার সেই স্তরে পৌঁছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে এবং এই কারণেই উপরোক্ত সমাবর্তন উৎসবে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কিছু বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়াছিল—কিন্তু তৎসত্ত্বেও একটি উচ্চ কল্যাণকর আদর্শকে বাস্তব রূপদানের যে নির্ভীক মনোভাব নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উক্ত প্রচেষ্টায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অভিনন্দিত করি। অন্তর্জাতীয়তা, আধুনিকতা, বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি বড় বড় শব্দ যিনি যতই বলুন ভারতীয় জাতির আত্মসম্বিৎ যথাযথভাবে ফিরিয়া পাইতে হইলে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা ও প্রচার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনিতে হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'হইলেও চলে, না হইলেও চলে' এইরূপ মনোভাব প্রযোজ্য নহে। ইহা কোন গোষ্ঠী-বিশেষের কাজ মনে করা ভুল, ইহা জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ। অতএব যাহাদিগকে আমরা যথার্থ ভারতীয় বলিয়া দেখিতে চাই তাহারা যাহাতে ভারত-ঐতিহ্যের সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে পারে সেই আয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই থাকা

প্রয়োজন। সংস্কৃতভাষাকে দূরে রাখিয়া ঐ আয়োজন সফল হইতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন :—

"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ভগবান রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্ন জাতিগণকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় অদ্ভুত ফললাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই মহান্ আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতির প্রতিরোধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতিসমূহকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। এমন কি, এত বড় যে বুদ্ধ তিনিও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া দিয়া এক বিষম ভুল করিয়াছিলেন। * * * জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববুদ্ধি' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত না হইলে শুধু কতকগুলা জ্ঞানসমষ্টি কখনও নানা ভাববিপ্লবের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে না।"

যোগসিদ্ধা ভারতীয় নারী

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে দুই একজন মাত্র জীবনের সম্যক্ কৃতার্থতালাভের নিমিত্ত প্রযত্নশীল হয়, এবং যাহারা প্রযত্নশীল হয়, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যকই সিদ্ধিলাভ করে; যাহারা বিশেষ বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যেও কচিৎ কেহ ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং সম্যক্‌সিদ্ধ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যের সংখ্যা মানবসমাজে চিরকালই খুব কম। তাঁহারা অসাধারণ। আবার, এই অসাধারণ মনুষ্যদের মধ্যেও অনেকেরই নাম ও চরিত শাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে জনশ্রুতিতে স্থান পায় না। ভগবদ্‌বিধানে সমাজের ভিতরে যাঁহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ নিরভিমান অনাসক্ত সর্ববন্ধন-বিনির্মুক্ত 'উদাসীনবদাসীন' হইয়াও ভাগবতী বিদ্যা-শক্তির প্রেরণায় লোককল্যাণার্থে উপদেশপ্রদান সম্প্রদায়-সংগঠন প্রভৃতি কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই স্মৃতি মানবসমাজ বহন করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই চরিতকথা ও অনুভূতির বর্ণনা বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাঁহারা বিশেষভাবে অসাধারণ।

ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্য ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থে এইরূপ যেসব অতি-অসাধারণ সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ তত্ত্বোপদেষ্টার বিষয় বর্ণিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাপুরুষও যেমন আছেন, মহানারীও তেমনি আছেন, ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলের নরনারীও যেমন আছেন, সমাজের নিম্নস্তরে সঞ্জাত নরনারীও তেমনি আছেন, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীও যেমন আছেন, গার্হস্থ্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীও তেমনি আছেন। এই সব গ্রন্থের প্রামাণ্যে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, মানবজীবনের সম্যক্ কৃতার্থতালাভ,— সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্ ভক্তি, সম্যক্ যোগসিদ্ধি — কোন বর্ণ বা আশ্রমের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, পুরুষ-জাতির মধ্যেও আবদ্ধ নয়। মনুষ্যমাত্রই জীবনের পূর্ণত্বলাভে অধিকারী; অথচ এরূপ পূর্ণজীবন সকল যুগে, সকল দেশে, সকল শ্রেণীর মধ্যেই অতি বিরল। সর্বত্রই তাঁহারা অসাধারণ,— বৈদিক যুগেও যেমন, বর্তমান যুগেও তেমনি। আবার,

কোন যুগেই,— বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এরূপ অসাধারণ নর ও নারীর অভাব হয় না। ধর্মশাস্ত্রে, সমাজ-বিধানে, সাম্প্রদায়িক উপদেশে, যে সব অধিকারভেদ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ নরনারীর জীবন গঠনের জন্যই বিহিত এবং সমাজসংরক্ষণের জন্য আবশ্যক। অসাধারণ মহাপুরুষ ও মহানারীর অসাধারণ অধিকার তদ্দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না। তাঁহারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারে আপনাদের জীবনকে বিকসিত করেন।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তিনটি যুগের তিনজন মহাসিদ্ধা ভারতীয়া মহানারীর পবিত্র মূর্তি ধ্যানপথে উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি।

সর্বপ্রথম স্মরণ করি অতি প্রাচীন যুগের অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ দেবীকে। তাঁহার জীবনকথা কিছুই জানি না। কিন্তু তাঁহার অনুভূতির পরিচয় পাই ঋগ্বেদের অহংসূক্তে বা দেবী-সূক্তে, তাহার পর আর অন্য কোন পরিচয় আবশ্যক হয় না। সারা ঋগ্বেদেও এরূপ অন্য একটি সূক্ত দুর্লভ। বাক্দেবী এই সূক্তের ঋষি-দ্রষ্ট্রী। যোগের চরম ভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ না হইলে, এই প্রকার সর্বাত্ম-ভাব অনুভূত হয় না। সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বান্তর্যামী বিচিত্র ভাববিলাসী এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বাগ্দেবীর অনুভূতিতে কেবল 'তৎ'-শব্দবাচ্য নহে, 'অহং'-শব্দ বাচ্য,—অহং-ভাবে অনুভূত। তাঁহার 'আমি' সর্ববিলক্ষণ সর্বাতীত সর্বোপাধিবর্জিত সর্বভেদবিরহিত আত্মা মাত্রই নয়; তাঁহার 'আমি' সর্ববিলক্ষণ হইয়াও সর্বভাববিলাসী, সর্বাতীত হইয়াও সর্বময়, সর্বভেদবিরহিত হইয়াও বিচিত্র ভেদের মধ্যে লীলায়মান। তিনি দেখিতেছেন জগতে বিচিত্র শক্তির খেলা, বিচিত্র ভাবের তরঙ্গ, বিচিত্র জড়-চেতনের, স্থাবর-জঙ্গমের, ক্ষুদ্র-বৃহতের, ভোগ্য-ভোক্তার সমাবেশ, বিচিত্র শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের প্রবাহ; আর সকলেরই মধ্যে আস্বাদন করিতেছেন নিজেকে। সবই তাঁর আপনার আনন্দময় প্রকাশ। রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ,—মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,—সোম, ত্বষ্টা, পূষণ, ভগ,—সবরূপে সবভাবে তাঁর 'আমি'ই বিচিত্র খেলা খেলিতেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি,—কর্ম, কর্মফলভোগ, কর্মফলপ্রদান,—সবই তাঁর 'আমি'র বিলাস। তাঁর 'আমি'ই সর্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা, সর্ব-ভোক্তা। মানুষের আমিত্বানুভূতির পূর্ণতম উৎকর্ষেরপরিচয় বাক্-দেবীর এই আটটি মাত্র মন্ত্রে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ভাগবত-আমিত্বের বিশদ কবিত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল বেদোক্ত এই মহামানবীর মহাযোগানুভূতিতে। মানুষ আপনাকে বিশ্বরূপে, বিশ্বাতীতরূপে, বিশ্ব-নিয়ন্তারূপে, পূর্ণনিষ্ক্রিয়রূপে ও পূর্ণসক্রিয়রূপে, কেমন ভাবে আস্বাদন করিতে পারে, তাহার প্রথম সুস্পষ্ট নিদর্শন বাক্দেবীর বৈদিক মন্ত্রে!

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বচক্নুর কন্যা ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মচারিণী গার্গী জ্ঞানযোগের মহিমার একটি সমুজ্জ্বল মূর্তি। বিদেহরাজ জনকের সভায় ব্রহ্মবিদ্যার বিচারসময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সমান আসনে সমাসীনা। তৎকালে ব্রহ্মবিদ্গণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসনের অধিকারী কে, এক সভায় তাহার বিচার হইল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মুখে আপনাকে ব্রহ্মবিদ্গণের দাস বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াও প্রকারান্তরে এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করিলেন। সভায় তাহার পরীক্ষা হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ একে একে তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বাচক্নবী গার্গী দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন,— আমি মহাত্মা যাজ্ঞবল্ক্যকে দুটিই মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; তিনি যদি এই দুইটি প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি যে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ, ইহা নিঃসংশয়ে সকলেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবেন। গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার

চরম অনুভূতি পরিব্যক্ত করিলেন। গার্গী সন্তুষ্ট হইয়া যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, তখন তাঁহার পূর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে কার্যতঃ সকলেই নিঃসংশয় হইলেন। তাৎকালীন ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্কের পরেই যে গার্গীর স্থান, তিনিও অক্ষয়ব্রহ্মানুভূতিতে দেদীপ্যমানা, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে বর্ণনা আরো অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শিনীরূপে এই মহীয়সী নারীর পবিত্র স্মৃতি ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসু সমাজ চিরকাল শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্তরে পোষণ করিতেছে।

অতঃপর মহাভারতে বর্ণিত এক যোগসিদ্ধা মহানারীকে স্মরণ করিব। তিনি মহাযোগিনী সুলভা। এই অনিকেতা স্থিরমতি তত্ত্বদর্শিনী যোগৈশ্বর্যবিভূষিতা মহানারী লোককল্যাণকল্পে বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি রাজর্ষি জনকের সভায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। লজ্জা ঘৃণা ভয় সঙ্কোচ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না; নারী ও পুরুষের ভেদবুদ্ধি তাঁহার অন্তর হইতে তিরোহিত; সর্বজীবে এক অদ্বয় পরমাত্মারই বিচিত্র প্রকাশ তিনি দর্শন ও আস্বাদন করিতেন। রাজর্ষি জনকের প্রতি সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগবলে তিনি তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—নারী হইয়া আপনি এই পুরুষের দেহে প্রবেশ করিলেন কেন? মহাযোগিনী যে জবাব দিলেন, তাহার মর্মার্থ এই:—আমি স্বদেহ ও পরদেহের কোন ভেদ মানি না, নারীদেহ ও পুরুষদেহেরও কোন ভেদ জানি না। আমার নিজস্ব কোন দেহ নাই; যখন যে দেহে খুশী, একটু আরাম করি। সব দেহই ত এক পরমাত্মারই দেহ,—এক পরমাত্মারই বিলাসক্ষেত্র। সব দেহেই জীবাত্ম-ভাবে পরমাত্মার বিলাস। বিদেহরাজের দেহটি সুন্দর পবিত্র একটি বিলাসক্ষেত্র দেখিয়া, আমিও তাহার মধ্যে একটু বিশ্রাম ও আরাম অনুভব করিবার জন্য প্রবিষ্ট হইলাম। তাহাতে তোমার আপত্তির কারণ ত দেখি না। সকলেই বলে,—জনক পূর্ণজ্ঞানী, তিনি বিদেহ, তাঁহার কোন দেহাত্মবোধ নাই। তাহাও একটু পরীক্ষা করিতে কৌতূহল হইল। এই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ, স্বদেহ-পরদেহ-ভেদ,—ইহা কি দেহাত্মবোধের নিদর্শন নয়? অজ্ঞানের লক্ষণ নয়? এতদুপলক্ষে রাজর্ষি জনক ও মহাযোগিনী সুলভার যে সব প্রশ্নোত্তর হইল, সুলভা দেবী পরম তত্ত্ব ও সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জনককে যে সব উপদেশ প্রদান করিলেন, মহাভারতের মধ্যে তাহা একটি মনোহর পঠনীয় ও বিচারণীয় অংশ। এই মহাযোগিনী প্রকারান্তরে রাজর্ষি জনকের গুরুপদে অধিষ্ঠিতা হইলেন;—অন্তরে বিদেহ হইয়া, দেহাভিমান হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া, কিভাবে দেহে অবস্থান ও কর্তব্যসম্পাদন চলে, তাহার আদর্শ দেখাইলেন।

ক্ষতিপূরণ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ইন্দুর শোকে কাঁদিতেছি যবে, আঁধারে লুপ্ত সবি,
পূর্বগগনে সহসা চাহিয়া দেখি উদিতেছে রবি।
গেল ফুলে ভরা বসন্ত বলি' করিনু অশ্রুপাত,
নিদাঘ অমনি বাড়াইয়া দিল ফলেভরা দুটি হাত।
অশোকের দিন ফুরাল বলিয়া যখনই করিনু শোক,
হাজার হাজার চম্পক ফুটি জুড়াইয়া দিল চোখ।

কৈশোর-সখা সব দূরে গেল, বক্ষে বাজিল ব্যথা,
একটি বন্ধু প্রিয়ারূপে আসি ভুলাল তাদের কথা।
চারিদিকে এবে সকলি নীরস বিস্বাদ বিষময়,
জীবনে আমার আসিবে না নামি এসময় রসময়?
সকল ক্ষতির পূরণ হয়েছে নিরাশ হইনি কভু,
তুমি ছাড়া আর শেষ ক্ষতিটার পূরণ কে করে প্রভু?

জীবন-মৃত্যুর রহস্য *

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানুষের চিন্তাজগৎকে যা সর্বাধিক আলোড়িত করেছে তা হচ্ছে মানুষ নিজেই। ইতিহাসের আদিম প্রত্যূষ থেকে কত রহস্যের উদ্ঘাটনে মানুষ নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, কিন্তু তার নিজের প্রকৃতির রহস্য যেন আজও নিতান্ত দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে—এ সমস্যা যেন সকল সমস্যাকে ছাপিয়ে তার মনকে ঘিরে রয়েছে। তাই স্বামীজী তাঁর 'পুনর্জন্ম' (Reincarnation)-নামীয় বক্তৃতায় বলেছেন, মানুষের জ্ঞান, অনুভূতি আর কর্মের উৎস এবং আধার যে মানব-প্রকৃতি, তা' থেকে মাথা ঘামানোর বিরাম কোন দিনই মানুষ পাবে না।

বংশানুক্রমে এই রহস্য একের পর অন্যের চিন্তায় আশ্রয় নিচ্ছে—জীবন-মৃত্যুর রহস্য দুর্জ্ঞেয় থেকে যাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কখনও কখনও ক্ষণজন্মা আত্মানুসন্ধানী মানবও এ লোকে আবির্ভূত হন,—আত্মোপলব্ধির দ্বারা এই রহস্য-ভেদের প্রয়াস পান। এঁদের পদাঙ্ক বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করলে, এঁদের সাধনপদ্ধতিকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করলে হয়ত বা এই দুরূহ সমস্যার দ্বার আমাদের সামনেও খুলে যেতে পারে। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ,—কিন্তু সত্য সত্যই আমাদের ক'জন এই তত্ত্বটি নিয়ে চিন্তা করেন? তবু স্বল্পসংখ্যক লোকের চিন্তাধারায় এই রহস্য আলোড়ন জাগিয়ে আসছে,—তাঁদের মনে জাগছে এই প্রশ্ন: কোথা থেকে আমাদের সৃষ্টি? চারিদিকে আর যে শত সহস্র রকমের জিনিস, আমাদের সৃষ্টিও কি তাদেরই মত? এই জগতে জন্মগ্রহণের আগেও কি আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল,—মৃত্যুর পরেও তা থাকবে কি? যুগ হ'তে যুগান্তরে এই প্রশ্নই বারংবার এসব অনুসন্ধিৎসু মনকে তোলপাড় করে এসেছে।

হুইট্‌ম্যানও তাই এক জায়গায় বলেছেন, যে দুটি অতি পুরাতন সাধারণ সমস্যা নিতান্ত দুরূহ, দুর্ভেদ্য অথচ নির্মম সত্যের রূপে পুরুষানুক্রমে আমরা পেয়ে আসছি এবং দিয়ে যাচ্ছি উত্তর-পুরুষদের, এ-দুটিই হচ্ছে সেই সমস্যা।

জীববিদ্যা-বিশারদগণ জীবদেহের বিকাশ ও বিবৃদ্ধির পাঁচটি স্তর নির্ণয় করে থাকেন,—যার শেষ স্তর হচ্ছে মৃত্যু। অধিকাংশ জীববিদের মতে জীবদেহের যে যন্ত্রকৌশল আর তার রকমারি বিশিষ্টতা, বংশানুক্রমিক তার ধারা। এঁদের মতে ব্যক্তির বা ব্যক্তিবিশেষের অমরত্বের কোন স্থান নেই: অমরত্ব যা কিছু, সে শুধু বংশ-পরম্পরায়, পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যে। যে জীব-জগৎ এই বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিক ধারায় অনুসরণ করে না, তা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দু অধ্যাত্মবিদ্‌গণ কিন্তু একেবারে পৃথক একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে এসেছেন। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক জীবের জৈবিক অস্তিত্বে ছয়টি স্তর-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: যথা, (১) জন্ম (২) কিছুকাল এই অস্তিত্বের স্থিতি (৩) বহুবিধ পরিবর্তন (৪) বার্ধক্য (৫) জরা এবং (৬) মৃত্যু। 'মৃত্যু' অর্থে, জীবের জৈবিক অস্তিত্বই শুধু লোপ পায়, অস্তিত্ব লোপ পায় না, এক অদৃশ্যলোকে জীবনের গতি চলমান থাকে,—সে লোক সৃষ্টিমূলের অতি নিকটে।

* Prabuddha Bharata (September, 1953) পত্রিকায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ '*The Mystery of Life and Death*', হইতে শ্রীমনকুমার সেন কর্তৃক সঙ্কলিত।

ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বলে বেদান্তবিদ্‌গণ আমাদের বলেন, আত্মা বা আধ্যাত্মিক যে সত্তা, নিজে তা শাশ্বত,—শুধু বারবার জৈবিক জীবনের প্রবাহকে সে স্বীকার করে নেয়। জন্মের আগেও এ বিদ্যমান ছিল, পরেও অনন্ত কাল ধরে থাকবে—হয়ত বা জন্ম ও মৃত্যুর চক্রপথে বারবার তার গমনাগমন চলবে। উপনিষদের ঋষি বলছেন, দৃশ্যতঃ দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ হলেও আত্মা স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, ক্লীবলিঙ্গও নয়। পরমসত্তার উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার এই জাগতিক রূপ বর্তমান থাকে মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মানুষের যত রকমের তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, তন্মধ্যে আত্মার অবিনাশী পৃথক সত্তার ধারণাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং যাঁদের এই বিশ্বাস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীল অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তি আত্মার পূর্ব অস্তিত্বেও বিশ্বাসবান। দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, এই দেহের বন্দিশালায় আসবার আগে আত্মার পৃথক সত্তা ছিল,—কেননা আত্মা শাশ্বত। একমাত্র আত্মজ্ঞানের ফলেই জীবাত্মা দেহের এই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে। এই জ্ঞানও নূতন কিছু নয়, পুরাতন; বিস্মৃত সত্যেরই পুনঃস্মরণমাত্র। শুধু প্লেটোই নয়, প্রাচীনকালের বহু চিন্তানায়কই আত্মার পূর্ব-অস্তিত্ব ও নিত্যতা-সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। যেমন প্লটিনাস বলতেন, মানবাত্মা বৃহত্তর জগদাত্মারই অংশ। বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়াতেই আত্মিক অবস্থা হতে তার পতন হয়। বস্তুজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তাকে সংগ্রাম করতেই হবে; এই সংগ্রামে যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন মৃত্যুর পরে দেহান্তরে সে প্রবেশ করে। এমনিভাবে বারবার জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলে তার সংগ্রাম, যতদিন না বস্তুজগতের অশুদ্ধ পরিবেশ থেকে তার মুক্তিলাভ ঘটে। বারংবার শোধন ও পরিশোধন-প্রক্রিয়ায় জীবাত্মার যখন পূর্ণ শুদ্ধতা লাভ হয়, তখন জগদাত্মার সঙ্গে এবং অবশেষে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে। ডারুইনের অনুগামী টমাস্ হাক্সলী বলছেন, প্রত্যেক প্রাণী—যে যেমন কর্ম করেছে, এ জন্মে তেমনি ফল পাচ্ছে, কিংবা এ জন্মে না হলেও পূর্বের কোন না কোন জন্মে পেয়েছে। বিজ্ঞানী রূপে তিনি বলছেন, কারণ ছাড়া কোন কার্য হতে পারে না। এমার্সন ও নব্য-ইংলণ্ডে তাঁর সমসাময়িক বহু মনীষীও অনুরূপ মতবাদ পোষণ করতেন। এমার্সন নিজে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন, যেখানে আমরা আরোহণ করেছি তার নীচে যেমন সিঁড়ির ধাপ আছে, তেমনি আছে উপরেও—ক্রমে তা ঊর্ধ্বদিকে উঠে গেছে—দৃষ্টির অন্তরালে।

কবির জীবনে আত্মার অনুভূতি অত্যন্ত নিবিড়—তাই কবির দৃষ্টিতে যা সত্য, তা-ই তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে প্রকাশলাভ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই বললেন, 'আমাদের জন্ম—এ এক অচেতন, বিস্মৃতির অবস্থামাত্র। আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, অন্তর্লোকের যে আত্মায় রয়েছে আমাদের স্থিতি, তার নিজের স্থিতি রয়েছে অন্য কোথাও, অন্য কোন খানে; বহু দূর থেকে আগত সে।' টেনিসনের মতে নিম্নতর বহু পর্যায় আত্মা অতিক্রম করে এসেছে—যা তার স্মরণ নেই। যোগগুরু পতঞ্জলি বলেন, মানুষ যখন লোভবিনির্মুক্ত হয় অর্থাৎ মন শুদ্ধ হয়, পূর্ব জীবনের সকল তত্ত্ব তখন যোগীর জ্ঞানগোচর হয়ে থাকে। নিজের মনের শিলালিপিতে বিস্মৃত দিনের ইতিহাসের অক্ষরগুলি তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

অনন্যমনা হয়ে, বিশুদ্ধ মনকে আধার করে যদি অনুসন্ধান করি, তাহলে অতীতের অন্তত একটা অস্পষ্ট ছবিও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর তাই দিয়ে বর্তমানে উপলব্ধি

করা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া সহজ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "আমি যেমন বহু জীবন অতিক্রম করে এসেছি, তেমনি তুমিও। এই অতীত জীবন-সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত, কিন্তু তুমি জ্ঞাত নও।" যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, 'এব্রাহাম যখন ছিলেন না তখনও আমি ছিলাম।' ঈশ্বরকল্প পুরুষগণ এমনিই বলে থাকেন। এক অনন্ত জ্ঞানের অধিকার নিয়ে তাঁরা আবির্ভূত হন, যা অতীত-সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত রাখে, আর তারই জন্য এই সব মহাপুরুষের পদচিহ্ন সার্থক জীবন-পরিক্রমায় প্রোজ্জ্বল। বুদ্ধ কখনও নিজেকে অবতার বলে দাবী করেন নি, কিন্তু পরে তাঁর অনুগামিগণ তাকে তাই মনে করতেন। বুদ্ধ-বাণী পড়লেও মনে হয়—বার বার জন্ম-পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি পরিশুদ্ধির বহু পর্যায় পেরিয়ে এসেছেন,—অবশেষে তাঁর নির্বাণ বা পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটল। রাজার ছেলে ছিলেন তিনি,—সত্যের সন্ধানে সব কিছু পরিত্যাগ করলেন। বোধিলাভের পর তিনি সর্বজনের মধ্যে তাঁর সেই অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে চাইলেন; দ্বারে দ্বারে তাই ভিক্ষাপাত্র নিয়ে চলল তাঁর পরিক্রমা। পুত্রের এই কাণ্ড দেখে রাজা কুপিত হলেন,—বুদ্ধকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'রাজ-পরিবারের কারুর পক্ষে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা অনুচিত।' কিন্তু এতে বুদ্ধকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করা গেল না: উত্তর করলেন তিনি, 'মহারাজ, আপনি রাজবংশজাত বলে দাবী করেন,—আমার জন্ম কিন্তু বুদ্ধসমাজ থেকে; তাই তাঁরা যেমন পরার্থপর ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাদ্য চেয়ে নিতেন আমিও তাই করছি, অন্যথা করতে পারব না।'

সাধারণের থেকে তাঁর চৈতন্য ছিল ভিন্নরূপ। আত্মার অনন্ত অধিকারকে তিনি পরিবারের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির নিকট খর্ব হতে দেন নি।

প্রশ্ন হতে পারে, এই সব মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আগেও বেঁচেছিলেন যদি ধরেও নেওয়া যায়, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের অবস্থা? বেদান্ত-মতে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে যে আত্মা (spirit), তা জন্ম-মৃত্যুর অতীত। কিন্তু অজ্ঞানতা আর অজ্ঞানতাজনিত কামনার বন্ধন আত্মাকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বোধিপ্রাপ্ত যাঁরা নন, জীবনে হঠাৎ যখন ছেদ পড়ে, দেহের তাঁদের শেষ হয়ে যায় বটে, কিন্তু দেহ হতে দেহান্তরে তাঁদের আত্মার পরিক্রমা চলতে থাকে যতদিন না তার মোহমুক্তি ঘটে—এবং তদনন্তর জীবন-মৃত্যুর অতীত পূর্ণবোধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের পূর্বাচার্যগণ বলেন, মানবজীবন দুর্লভ জীবন। এই জীবনেই পূর্ণতালাভ এবং 'সত্য-প্রতিষ্ঠ হবার শ্রেষ্ঠতম সুযোগ পাওয়া যায়। কেন না, শুধু অবতারকল্প, বোধিপ্রাপ্ত পুরুষগণই নন, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারাও সেই একই ভগবৎসত্তা হতে উদ্ভূত: মূল সত্তা থেকে প্রকাশিত সত্তার অংশগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে— যেমন রয়েছে মহাসমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গ-মালা, আবার রয়েছে বুদ্বুদও—অথচ উভয়েরই সৃষ্টিমূল এক— তেমনি আমাদের মধ্যে ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলগত ঐশী প্রেরণা একটিই। স্বামীজীও বারংবার বলেছেন, প্রত্যেক আত্মাই বস্তুত: ঐশী-শক্তিসম্পন্ন,— অন্তর্লোকে প্রসুপ্ত এই শক্তিকে প্রকাশ করাই মনুষ্য-জন্মের লক্ষ্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা বন্ধনহীন ও শাশ্বত; সেটা দেহ নয়, মনও নয়। দেহ তো প্রতিমুহূর্তেই ক্ষয়ে যাচ্ছে, মনেরও অবি-রাম পরিবর্তন চলছে। বহু কিছুর সমষ্টিতে দেহ, মনও তাই: সুতরাং এরা কখনই পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু এই দৃশ্যমান বস্তুজগতের বাইরে মনের সূক্ষ্ম-লোকেরও অন্তরালে রয়েছে আত্মা, মানুষের প্রকৃত

সত্তা— যা শাশ্বত, সদা-বন্ধনবিহীন। এই সত্তাই প্রতিনিয়ত আমাদের শক্তি-প্রকৃতি চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে, নাম ও রূপের বিচিত্রতায় ভ্রূক্ষেপ না করে' আপনাকে প্রকাশিত করতে চাইছে। অজ্ঞানতার ঘোর তমিস্রার মধ্যেও এরই মৃত্যুহীন, বন্ধনহীন, স্বচ্ছন্দ দৈবীগতি আলোক বিকিরণ করছে। ভয়হীন, মৃত্যুহীন, বন্ধনহীন মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব এইখানে। এর কোন পরিবর্তন নেই,— তাই জন্ম কিংবা মৃত্যুও নেই। তাই এই মানবাত্মা সনাতন, শাশ্বত। বিশ্বাস, ভক্তি আর সাধনা এই তিনে এক হলে আত্মার উপলব্ধি ঘটে। আমাদের তথা সমুদয় জীবের আত্মাতেই এই একই আত্মার আলোক উৎকীর্ণ হচ্ছে। এই এক ও অভিন্ন অবিনাশী সত্তাই বিভিন্ন ব্যক্তি-সত্তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। ব্যক্তিক আত্মা যে মৌলিক আত্মারই অংশ— এই অনুভূতিই হচ্ছে আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতার সব অন্ধকার ভয়ে পলায়ন করে; কামনা-বাসনার অন্তর্ধান ঘটে, কণামাত্র আর থাকে না। তাই আমরা বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমাদের আত্ম-সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে পারি। বোধিলাভের পরেও হয়ত আমাদের ফিরে আসতে হতে পারে এই লোকে,— কিন্তু সে শুধু মানুষের মধ্যে ঐশী শক্তির এই যে প্রেরণা এবং প্রকাশ তার উপলব্ধিতে অন্যকে সাহায্য করবার জন্যই।

মুক্তি

(বৌদ্ধ-কাহিনী)

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

নর্তকী অলকানন্দা শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী রূপসী
তাম্রলিপ্তি নগরীর একমাত্র যেন সে উর্বশী।
যৌবনের সর্বৈশ্বর্যে ভরা তা'র তন্বীদেহতীর
কৃষ্ণায়ত আঁখিযুগ কী সুন্দর, মায়ায় মদির!
তনু-তনিমায় নিতি নবরূপ লীলার হিল্লোল,
চটুল চরণে কিবা নিত্য নব ছন্দের হিন্দোল!
নিত্য নব স্বপ্নজাল রচিতো সে নিবিড় নয়নে,
প্রচ্ছন্ন যাদুর স্পর্শ ছিল তার নূপুর-নিক্বণে।
বসন্ত-উৎসবময়ী সন্ধ্যা এক আছিল সেদিন:
পশ্চিমের মেঘ-মাখা অস্তরাগ হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পূর্বাশার পূর্ণিমার তরলিত সোনালী ধারায়
ধীরে ধীরে ক্রমে-ক্রমে আঁখি-পুটে স্বপ্নাবেশ-প্রায়।
নগরী-উপান্তে দূরে পূর্ণ ইন্দু নীলিমার বুকে
লজ্জা-রাগ-জড়া নববধূ সম জেগে ওঠে সুখে।

নৃত্যের আসর জমে নর্তকীর রম্য নিকেতন,
কক্ষতলে সমাস্তৃত মখমলী রক্ত আস্তরণ।
ভিত্তিগাত্রে পুষ্পাধারে স্তবকিত পেলব পুষ্পিকা,
মহার্ঘ আলোকাধারে সমুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা।
সমাগত নগরীর যত ধনী ভকতপ্রবর,
স্বয়ং আসর-পতি ধনিশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী পুরন্দর।
মোহ রচি নাচে নটী ভঙ্গিমার নব ব্যঞ্জনায়,
যন্ত্র খেলে সর্বগ্রামে তালে-মানে সুরের লীলায়।
ক্রীড়াপদ্ম নটী-করে, বর অঙ্গে রক্ত পট্টবাস,
শিরে কেশরের চূড়া, বালকুন্দে বন্ধ বেণী-পাশ,
অশোকের কর্ণভূষা, পদ্মমালা পীন বক্ষে দুলে,
নর্তকী নাচিয়া চলে, মুগ্ধ মূক দর্শকেরা ভুলে।

হেনকালে দ্বার-প্রান্তে অসঙ্কোচে দাঁড়াইল আসি',
মুণ্ডিত-মস্তক, সৌম্য, গৌরকান্তি, দীর্ঘাঙ্গ সন্ন্যাসী।
পীত প্রাবরণ, বাস, চক্ষে জ্ঞান-প্রতিভার জ্যোতি ;
কহিল : "নর্তকি, ভিক্ষা দাও মোরে"—কম-কণ্ঠে অতি।
নর্তকী থামিয়া গেল চমকিয়া নৃত্যের মাঝারে,
থামিল বিস্মিত যন্ত্রী, ভুলে গেল সুর-উৎস-ধারে।
চাহিল দর্শকদল অসন্তোষে তুলিয়া নয়ন ;
কহিল গম্ভীর স্বরে : "ভিক্ষা দাও"—আবার শ্রমণ।
রুষ্ট শ্রেষ্ঠী ভিক্ষু প্রতি বিষদৃষ্টি কহিল হানিয়া :
—"হেথা কেন ? ভিক্ষা মেলে গৃহি-দ্বারে, লহ সেথা গিয়া।"
ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পুরন্দর আহ্বানিয়া শুধা'লো দাসীরে :
—"কে দিল আসিতে হেথা ? এই গৃহ ভিক্ষা-সত্র কি রে ?"
নিরুত্তর ভয়ে দাসী ; শ্রমণও না উচ্চারিল বাণী,
চেয়ে র'ল নর্তকীর পানে মেলি' শান্ত দৃষ্টিখানি।
নিরুত্তেজে নটী কহে : "ভিক্ষা দাও ভিক্ষুরে বিনতা !
আসিতে দিও না কা'রো, আর কভু মনে রেখো কথা।"
দাসী যায়। প্রশ্ন করে বিস্মিতা-সে অলকানন্দাই :
—"ওকি, গেলে না যে তুমি ?" ভিক্ষু কয় : "অর্থ নাহি চাই।"

—"তবে ? অলঙ্কার চাও ? ল'বে মোর হীরক কঙ্কণ ?"
উত্তরিল ভিক্ষু : "নয়"—মুখে তা'র কৌতুক-স্ফুরণ।
—"কি তবে তোমার চাই ?"—কহে নটী : "মোতির এ মালা ?"
হুঙ্কারিল পুরন্দর, কণ্ঠে তা'র তীব্র ক্রোধ-জ্বালা।
বিমূঢ়া নর্তকী বলে : "মুক্তাহার ল'বে কি সন্ন্যাসী ?"
সন্ন্যাসীর মুখে ফোটে পুনরায় কৌতুকের হাসি।
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠী ; ভাষা, স্বর ক্রোধেতে বিকৃত :
—"অলকা, ও যাহা চায় দিয়া তাই কর বিতাড়িত।
ওর দৃষ্টি বিঁধিতেছে মোরে তপ্ত শলাকার মত।"
সন্ন্যাসী সে মৃদু হাসে ; তিক্ত হয় চাটুকার যত।
কৌতুহলা নটী বলে : "জানো না, কী মহার্ঘ এ হার,
পাবে না এমন রত্ন খুঁজি কোন রাজার ভাণ্ডার।
এ রত্ন পা'বার লোভ প্রতি রাজা পোষেন হৃদয়ে,
বিশাল রাজত্ব মেলে অনায়াসে এর বিনিময়ে।"
ভিক্ষু কয় : "চাহি ভিক্ষা···রাজ্যে লোভ নাই।"
—"ভিক্ষা যদি"—শ্রেষ্ঠী ফুঁসে : "বিচারের কেন এ বালাই ?"
প্রতিটি কথায় ঘৃণা, বর্ণে বর্ণে তীক্ষ্ণ শ্লেষরাশি ;
স্তাবকের মুখে মুখে খেলে যায় অবজ্ঞার হাসি।
গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে নটী হাসে : "কি চাহিছ তবে ?"
শ্রমণ : "তোমারে ভিক্ষা চাহি আমি"—কহে শান্ত রবে।
—অপূর্ব দৃঢ়তা মুখে, চক্ষে তা'র বিজয়ীর বিভা।
উন্মাদ ভিক্ষুক ভিক্ষু ! সারা সভা বজ্রাহত কিবা !
লক্ষ মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষণতরে যে নহে সুলভ,
ফুটা'তে যাহার হাসি শূন্য হয় রাজার বিভব,
নগণ্য ভিখারী এই সন্ন্যাসীর—তা'রে অভিলাষ !
মূর্খ বামনের যেন ইহা চন্দ্র-ধারণ-প্রয়াস !
উচ্চে হাসে পুরন্দর ; হাসি-স্রোত দর্শকের দলে,
নর্তকীও হাসে : "মোরে—কেন চাও ?"—তথাপি সে বলে।
ভিক্ষু কয় : "কেন ? চাহি—ভগবান্ বুদ্ধের আদেশ।"
নর্তকী : "কে তুমি ভিক্ষু ?"—মুখে তা'র বিস্ময়ের লেশ।

সন্ন্যাসী ঃ "সুদত্ত আমি, ভগবান্ বুদ্ধের সেবক।"
নটী ঃ "কিন্তু, ভোগসুখত্যাগী তুমি প্রব্রজ্যা-বাহক।"
—"তবু আমি তোমা' চাই নটি !"—ভিক্ষু কহে পুনর্বার।
নর্তকী ঃ "নর্তকী আমি, সত্যধর্ম কোথায় আমার ?
বিলাস আমার অঙ্গ, নিলাজতা আমার ভূষণ,
মোরে নিয়া হে সন্ন্যাসী, হ'বে তব ক্ষতির কারণ।"
ভিক্ষু ঃ "মোরা যে শ্রমণ ! লাভ-ক্ষতি-হিসাব না ধরি,
কর্মে শুধু অধিকার, ফল-আশা মোরা নাহি করি।"
—"কিন্তু, মোরে গ্রহণিলে ধর্মচ্যুতি তোমার ঘটিবে।"
—"ধর্ম নহে কাঁচখণ্ড যে সামান্য আঘাতে ভাঙিবে।
ধর্ম যে শাশ্বত, সত্য, অনশ্বর, ধর্ম চিরন্তন,
তাহারে লভেছি, নাহি ভয়"—বলি' হাসিল শ্রমণ।
ভিক্ষুর জ্ঞানের আর বিশ্বাসের গভীরতা হেরে
বিস্মিতা নর্তকী ঃ "কোথা' যা'ব আমি"—শুধে শ্রমণেরে।
ভিক্ষু কহে ঃ "ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধ-পদতলে।"
নর্তকী ঃ "কি লাভ তাতে ?" "মুক্তি"—ভিক্ষু স্থির কণ্ঠে বলে।
নর্তকী কহিল ঃ মুক্তি ! "মুক্তি আমি চাহি না সন্ন্যাসী !
অতৃপ্ত এখনো মোর জীবনের কামনার রাশি,
অপূর্ণ বাসনা আজো। এই খ্যাতি, ঐশ্বর্য, সম্ভোগ—
ইহা ছাড়ি—ক্ষিপ্তা নহি জীবনের হারাব সুযোগ।
স্বেচ্ছায় চাহি না আমি জীবনে এ ঘটাতে প্রমাদ।"
—নর্তকীর কণ্ঠস্বরে যেন এক চাপা আর্তনাদ।

কী ভাষা ফুটিয়া ওঠে সন্ন্যাসীর দৃষ্টির ভিতরে !
সারা মুখ ভ'রে যায় বিশ্বজয়ী হাসির লহরে।
ঘৃণা নাই, শ্লেষ-নাই—সে হাসিতে হ'য়ে গেছে হারা,
সে হাসিতে আছে শুধু ক্ষেম, ক্ষমা, করুণার ধারা।
ভিক্ষু কয় ঃ "বিলাসিতা, সম্ভোগের আবরণে ঢাকি'
রাখা যায় হে অলকা, অন্তরের গূঢ় দীনতা কি ?
তুষানল সম জ্বলি' জ্বালাইয়া দেয় চিত্তটাকে
মানুষের দৈন্য-ছায়া জাগে তাই তার মুখে-আঁখে।

বঞ্চনা করেছ নিজে সেইভাবে তুমি নিজেরেই ;
মিথ্যা আবরণ দেবি, কামনার শেষ কভু নেই।
ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সম কামনা যে ক্রমপুষ্টি লয়,
হে অতৃপ্তা ব্যর্থ নারি, ত্যাগে তৃপ্তি, ভোগে তৃপ্তি নয়।"
নর্তকী নির্বাক স্তব্ধা, অশ্রু-বাষ্প জমে আঁখি-ছেয়ে,
সন্ন্যাসীর তেজোদীপ্ত মুখপানে শুধু রহে চেয়ে।
রুষ্ট স্তাবকেরা করে কোলাহল নিস্ফল আক্রোশে ;
ভ্রূক্ষেপ না করি ভিক্ষু কহি' চলে মনের সন্তোষে ঃ
—"দুঃখ, ব্যথা, অশ্রুভরা কেন তুমি চাও এ জীবন ?
এস মোর সাথে দেবি, আমি দিব জীবন নূতন।
সে জীবনে দুঃখ নাই, ব্যথা নাই, নাহিক বিষাদ,
আছে শুধু সীমাহীন হাসি আর আনন্দ অগাধ।
ইহা তো আনন্দ নয়, সুখ নয়, দুঃখের এ ফাঁসি,
সুখভ্রমে নিজ গলে পরে'ছ তা' বড় ভালবাসি।
এ তব সম্ভোগ নয়, নহে খ্যাতি—আত্মহত্যা এ যে ;
তুমি তব সত্যপথ হারা'য়েছ ভোগ-বাসনে যে !
খুলে ফেল বিলাসের উপচার বস্ত্র-আভরণ,
মুছে ফেল আঁখি হ'তে কামনার রঙীন্ অঞ্জন।
পথের সন্ধান দিতে আসিয়াছি ত্যাগের দীক্ষায়,
লহ প্রাবরণ মাতঃ দেখ তৃপ্তি, শান্তি কত তা'য়।"
অলকা পারে না আর, লুটে পড়ে ভিক্ষুর চরণে ঃ
—"তোমার বাণীই প্রভু, সত্য হোক্ এ মোর জীবনে।"
সন্ন্যাসী মায়ের স্নেহে ধূলি হ'তে তুলে তারে লয় ;
কী আনন্দ ভিক্ষু-আঁখে, কী সে গর্ব সারা মুখময় !
অকুণ্ঠিতে ভিক্ষুবর নিজ হাতে অঙ্গ হ'তে তার
উন্মোচিয়া একে-একে ফেলি' দিল রত্ন-অলঙ্কার।
আপনার প্রাবরণে চারু অঙ্গ দিল তা'র ঢাকি',
চন্দনের শুভ্র ফোঁটা দিল তার ললাটেতে আঁকি।
থামিল সন্ন্যাসী তবে পূর্ণভাবে অলকায় জিনি' ;
সাজিল রিক্তার বেশে নগরীর, শ্রেষ্ঠা বিলাসিনী।

প্রণয়ী সে পুরন্দর করি' উঠে ক্ষুব্ধ হাহাকার :
—"অলকা, যেওনা ছাড়ি' তাম্রলিপ্তি করিয়া আঁধার।"
—"ফিরায়ো না বন্ধু মোরে"—উত্তরিল অলকা আহ্বানে ঃ
"জীবনে পাইনি যাহা, চলিলাম তাহার সন্ধানে ;
আমার যাত্রার পথে আর পিছু ডেকো না আমায় "—
—বলি' ভিক্ষু-সাথে আসি' রাজপথে অলকা দাঁড়ায়।

বুদ্ধদেবের দর্শন

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

বস্তুতঃ বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। তিনি এক নূতন ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। জগতের আদি ও অন্ত আছে কি? ভগবান্ আছেন কি? আত্মা কি? মৃত্যুর পর মানুষের গতি কি? বুদ্ধদেব দর্শনের এই সকল মূল প্রশ্নের উত্তরপ্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি মনে করিতেন যে, এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক। দর্শনের এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে, এই জন্যই নানা দার্শনিকের নানা মতবাদ। তিনি দেখিলেন,— মানবজীবন দুঃখময়। মরণান্তং জীবিতম্। মৃত্যুর হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। তিনি দেখিলেন,—ব্যাধির কবলে পতিত হইয়া মানব আর্ত্তনাদ করিতেছে। জরা মনুষ্য-জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। মৃত্যু মানব-সংসারকে শোকাগারে পরিণত করিতেছে। আর্তমানবের ক্রন্দন গৌতমের কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে মানবকে ব্যাধি ও জরামরণের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া পথের সন্ধানে বাহির হইলেন।

তিনি নানাস্থানে নানা পণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিলেন, নানা শাস্ত্র তিনি গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু পথের সন্ধান মিলিল না। তিনি কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু পথ পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, কঠোর তপস্যা দ্বারা বা কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর নহে। অবশেষে তিনি গয়ার নিকটে নিরঞ্জনা নদীর তীরে যখন সমস্যা-সমাধানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি মুক্তি-পথের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার নাম হইল বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

গভীর চিন্তার ফলে তিনি নিম্নলিখিত চারিটি সত্য (চত্বারি আর্যসত্যানি—four noble truths) আবিষ্কার করিলেন :

১। জরামরণাদি দুঃখ আছে। জীবন যে দুঃখময় তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ব্যাধি, জরা ও মরণের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। শরীর থাকিলেই ব্যাধি, জরা ও মরণ থাকিবে। ভোগলালসা বা ইন্দ্রিয়সুখ পরিণামে দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে।

২। দুঃখসমুদয় অর্থাৎ জরামরণের কারণ আছে। বুদ্ধদেব দেখিলেন, জগতের কোন বস্তুই স্বয়ম্ভু নহে। কোন ঘটনাই কারণ ব্যতীত ঘটে না।

জরামরণও কারণমূলক। তিনি জরামরণের নিম্নলিখিত কারণকার্য-পরম্পরা প্রদর্শন করিলেন। জরামরণের মূল বা আদি কারণ (১) অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যাহেতু মানুষ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই অবিদ্যা হইতে (২) সংস্কার জন্মে। অবিদ্যা-প্রভাবে মানুষ যে যে চিন্তা বা কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাদের সংস্কার মনকে এইরূপভাবে গঠিত করে যে, এই সংস্কারগুলি পরবর্তী জীবনের চিন্তা ও কার্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। পূর্ববর্তী জীবনের সংস্কার বর্তমান জীবনে (৩) বিজ্ঞানরূপে প্রথমে মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয় এবং এই বিজ্ঞান বা চেতনা হইতে (৪) নামরূপ অর্থাৎ দেহ ও মন আসিয়া থাকে। নামরূপ হইতে (৫) ষড়ায়তন (ইন্দ্রিয়সমূহ) আবির্ভূত হয়। ষড়ায়তন হইতে (৬) স্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। সংযোগহেতু (৭) বেদনা বা ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হয় এবং এই বেদনার জন্য (৮) তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা জন্মে। তৃষ্ণাহেতু (৯) উপাদান অর্থাৎ বিষয়ানুরক্তি এবং বিষয়ানুরক্তি হইতে (১০) ভব অর্থাৎ আমাদের সত্তা। বিষয়ানুরক্তিই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে এবং বিষয়ানুরাগহেতু আমাদের (১১) জাতি অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া (১২) জরামরণের কবলে পুনরায় পতিত হইতে হয়।

উপরোক্ত কারণকার্য-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অবিদ্যাবশতঃ আমরা জগতের প্রতি আসক্ত হই এবং ইন্দ্রিয়সুখকেই পরমসুখ বলিয়া মনে করি। ইন্দ্রিয়সুখে ভোগের স্পৃহা বাড়িতেই থাকে। এই ভোগতৃষ্ণার জন্য আমাদের বারবার জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। অজ্ঞানহেতুই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনকে নিত্য বলিয়া মনে করি এবং পার্থিব সুখে নিমগ্ন থাকি।

৩। দুঃখনিবৃত্তি বা নির্বাণ। বুদ্ধদেব নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। দুঃখই জীবনের চরম পরিণতি, তিনি ইহা স্বীকার করেন নাই। জীবন দুঃখময় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিও মানুষ নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিতে পারে। তিনি আশাবাদী ছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন—দুঃখ থাকিলেও দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব। তিনি দুঃখ-নিবৃত্তিকেই নির্বাণ-আখ্যা দিলেন। নির্বাণ-সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন—নির্বাণের অর্থ চির-বিলুপ্তি, ইহা একটি নিষ্ক্রিয় শূন্য অবস্থা। কিন্তু নির্বাণের এই অর্থ অনেকেই স্বীকার করেন না; নির্বাণং শান্তম্ ইহা একটি স্থিতিশীল আনন্দ-পূর্ণ শান্ত অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্তের কোন ক্ষোভ থাকে না। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে লোক ক্লেশের হাত হইতে চির মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তাহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া জরামরণের কবলে পতিত হইতে হয় না।

জীবন দুঃখময় হইলেও এবং লোকে দুঃখকষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি চাহিলেও কেহই জীবনের চির-বিলোপ চাহে না। চিরবিলুপ্তি কাহারও কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং চির-বিলুপ্তিকেই জীবনের কাম্য বলিয়া বুদ্ধদেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। লোকে নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে—ইহাও ঠিক নহে। বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভ করিয়াও জীবের কল্যাণের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নির্বাণলাভ করিয়া শূন্যতাপ্রাপ্ত হন নাই। আনন্দপূর্ণ শান্ত, মুক্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাই নির্বাণ।

৪। দুঃখনিবৃত্তি-মার্গ। মোক্ষ কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহার সন্ধানও বুদ্ধদেব প্রদান করিলেন। তিনি নিম্নলিখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করিলেন।

(১) সম্যগ্‌দৃষ্টি :—মুমুক্ষু ব্যক্তি দুঃখ এবং

ইহার উৎপত্তি ও বিলোপ-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অবশ্য লাভ করিবে। *যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত নির্বাণলাভ* সম্ভবপর নহে।

(২) সম্যক্‌সঙ্কল্প :—মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই পার্থিব বস্তুর প্রতি অনুরাগ এবং জীবের প্রতি হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহার সকলকে ভালবাসিতে হইবে। সকলের দুঃখকষ্ট নিজের দুঃখকষ্ট—ইহা মনে করিয়া নিজের কল্যাণের সহিত অপরের কল্যাণও সাধন করিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ ও আসক্তি চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, এবং পরিণামে দুঃখই প্রদান করে।

(৩) সম্যক্ বাক্ :—যে দুঃখত্রাণ চাহে, সে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। সে কখনও অপরের নিন্দা করিবে না। সে অপরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ এবং অসার কথাবার্তায় কালক্ষেপ করিবে না।

(৪) সম্যক্‌কর্মান্ত :—জীবের প্রতি হিংসা এবং অসার ইন্দ্রিয়-সুখভোগ অবশ্য বর্জনীয়।

(৫) সম্যগাজীব :—অসৎ জীবন ত্যাগ করিয়া সৎ জীবনলাভ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকে সেই কেবলমাত্র নির্বাণলাভের যোগ্যতা অর্জন করে।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম :—যে মুক্তিপথের পথিক, সে মন হইতে সর্ববিধ কুচিন্তা পরিহার করিবে এবং সকল সময় মনকে সুচিন্তায় ব্যাপৃত রাখিবে। যাহাতে মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৭) সম্যক্‌স্মৃতি :—শরীরমন যে পরিবর্তনশীল, ইহা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে। অনিত্য দেহ ও মনকে অনিত্য বলিয়া ভাবিতে হইবে। ইহাদিগকে নিত্য বলিয়া ধারণা করা অজ্ঞানতার পরিচয়।

(৮) সম্যক্‌সমাধি :—সমাধির প্রথম পর্যায়ে মন হইতে হিংসা, দ্বেষ এবং কুপ্রবৃত্তিসমূহকে অপসারিত করিতে হইবে। মনকে চিন্তা ও বিচারের উপর নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মন যখন সর্ববিধ চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে, তখন যে শান্তি ও আনন্দ চিত্তে অনুভূত হয়, সেই আনন্দ ও শান্তির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। সমাধির তৃতীয় পর্যায়ে সমাধি হইতে যে শান্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিতে হইবে। শেষ পর্যায়ে পরম নির্বাণলাভ হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেব এক নীতির ধর্ম প্রচার করিলেন এই ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর আছেন কি নাই—এ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভবপর নহে। কিরূপে জরামরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, ইহাই জীবনের বড় সমস্যা। তাঁহার মতে তিনি যে নীতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথে নিষ্ঠার সহিত চলিলে মানব দুঃখত্রাণ লাভ করিতে পারে; পূজা, প্রার্থনা ও যাগযজ্ঞাদি বা কঠোর-তপস্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যদিও বুদ্ধদেব কোন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই, তাঁহার ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের মূলে একটি দার্শনিক মতবাদ রহিয়াছে। এই দার্শনিক মতবাদটি হইল—সর্বম্ অনিত্যম্। জগতের কোন জিনিস নিত্য বা স্থায়ী নহে। প্রত্যেক জিনিস পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক ঘটনাই কারণকার্য-সম্পর্কে আবদ্ধ। কারণ ব্যতীত কোন ঘটনাই ঘটিতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনারই উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয় ও লয় রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিস যখন পরিবর্তনশীল, তখন প্রতিক্ষণেই ইহার পরিবর্তন হইতেছে। কাজেই যৎ ক্ষণিকং তৎ সৎ। যদিও প্রতি জিনিসের ক্ষণের জন্য সত্তা রহিয়াছে, তথাপি প্রতি জিনিসের অর্থক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে—অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণম্ সৎ। তাহা না হইলে কারণকার্য-সম্পর্ক থাকে না। প্রতি ঘটনাই

ক্ষণের জন্য আবির্ভূত হইয়া অপর একটি ঘটনার উৎপত্তি ঘটাইয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাই সংসার।

বুদ্ধদেবের মতে সর্বম্ অনাত্মম্। তিনি কেবলমাত্র জগতের পশ্চাতে ঈশ্বর বা শাশ্বত চেতনা-শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, তিনি আত্মার সত্তাও অস্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু সর্বম্ অনিত্যম্, সেই কারণে স্থায়ী আত্মা থাকিতে পারে না। নিত্য পরিবর্তনশীল মানসিক ঘটনাসমূহের স্রোত বা প্রবাহই আত্মা। যদিও বুদ্ধদেব আত্মার সত্তা স্বীকার করেন নাই, তিনি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে পর্যন্ত না জীব নির্বাণ লাভ করিতে পারে, সে পর্যন্ত সুখদুঃখ, চিন্তাভাব, প্রবৃত্তি প্রভৃতির স্রোত অনবরত চলিতে থাকে।

বুদ্ধদেব কার্যকারণবাদ অনুসরণ করিয়া কর্মবাদের প্রবর্তন করেন। প্রতি কর্মই ফলপ্রসূ। যে যেরূপ কর্ম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে। কর্মফলের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ভোগজনিত কর্ম করিয়া জীব বার বার সংসারে আসিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অনাসক্তভাবে কর্ম করাই নির্বাণলাভের একমাত্র সোপান :

"Commit no wrong, but good deeds do,
And let thy heart be pure,
All Buddhas teach this truth
Which will for age endure."

প্রাচীন গৌড় ও বর্তমান মালদহ জেলা

স্বামী পরশিবানন্দ

উত্থানপতন প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। এই এক জাতি তার গৌরবের চরম সীমায় উন্নীত হলো, আবার দেখতে দেখতে কিছু কালের মধ্যেই অবনতির নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছল। বিশেষ বিশেষ স্থান, দেশ ও ব্যক্তিকে অবলম্বন করেই এই উত্থান-পতনের সূচনা হয়। পার্থিব জগতে যদিও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবুও মা বসুন্ধরা এমনিতর বহু উত্থান-পতনের স্মৃতিকে সযত্নে স্বীয় বক্ষে ধারণ করে ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর জন্য রেখে গিয়েছেন ও রেখে যাচ্ছেন এক অভিনব অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা। এই সব প্রাচীন সুখদুঃখ, যশ-অপযশ, জয়পরাজয়-চিহ্নিত স্মৃতিগুলি দুর্বল মানব-মনে আনয়ন করে অসীম শক্তি ও সাহস, আর অহংকারী অভিমানীদের হৃদয়ে এনে দেয় শান্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের আলো।

আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলে ঐরূপ প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শনগুলি ভ্রমণকারীকে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। ভারতমাতা কত দেশী বিদেশী নরনারীর স্মৃতিকেই না বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন! পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মালদহ জেলা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র হলেও বহু প্রাচীন কীর্তি তাকে ঘিরে রেখেছে। এখানেই ছিল বাংলার সেই প্রাচীন গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী নগরী। দীর্ঘ এগার শত বর্ষব্যাপী এস্থানে বহু রাজা বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। তন্মধ্যে পাল ও সেনবংশীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু নরপতিগণ প্রায় ৬০০ বৎসর এবং পাঠান বাদশাহগণ ৫০০ বৎসরের অধিক কাল এখানে রাজধানী স্থাপন করে এস্থানটিকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন। সেন আমলের প্রায় শেষাশেষি লক্ষ্মণ সেন এই মালদাতে লক্ষ্মণাবতী নামে এক সুবিস্তৃত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে এই

নগরীটি গঙ্গা ও মহানন্দার সংযোগস্থলে প্রায় ১৪।১৫ মাইল ব্যেপে বিস্তারলাভ করেছিল। এখন অবশ্য উভয় নদীর খাতই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেন আমলের এই লক্ষ্মণাবতী নগরীকে অবলম্বন করেই তুর্কী সুলতানগণ গৌড়ের বাদশাহরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গৌড় ও লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান থেকে প্রাচীন নগরের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করছে।

কাহারো মতে এস্থানে রাজনীতি, সমাজনীতি, ন্যায়দর্শন, শিল্পবাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যার সহিত সঙ্গীতচর্চারও বিশেষ ব্যবস্থা ও সমাদর ছিল বলে গৌড় সারঙ্গ, গৌড়ী প্রভৃতি রাগরাগিণীর সহিত মিল রেখে এই নগরীর নামকরণ হয় গৌড়। স্কন্দপুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার এই গৌড়ের সমৃদ্ধিদর্শনেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই নামে নগর স্থাপিত হয়েছিল বলেই অনুমান। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন—বঙ্গদেশীয় গৌড়, সারস্বত গৌড় (পাঞ্জাবের পূর্বভাগ), কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল এই পাঁচটি দেশই গৌড় আখ্যা পেয়েছিল। সপ্তম শতকে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন স্বতন্ত্র নরপতিরূপে ছিলেন। সুতরাং তাঁরই সময় হতে কিংবা ধর্মপালদেবের সময় হতেই বা এঁদের পূর্বেই এই নামের উৎপত্তি হয়—বলা কঠিন। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশকেই গৌড় রাজ্য বলা হত এবং পরবর্তী কালে মালদহ জেলায় গৌড়নামে রাজধানী স্থাপিত হয়। সপ্তম হতে অষ্টম শতকে বাংলার এই গৌড়নগরের এত উন্নতি সাধিত হয়েছিল যে, গৌড়ীয় রীতি বলে একটি কাব্যরচনার ধারা প্রবর্তিত হয় এবং উহা সর্বভারতে পরিচয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে।

ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে তিনি তাঁর রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মালদহ জেলায় খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসনের একটি মাত্র শ্লোকে জানতে পারা যায় —"তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের সামন্ত নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ, চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলে কীর্তন করাতে করাতে হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃন্দ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করে কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করেছিলেন।" এই শ্লোকে বর্ণিত গন্ধার, মদ্র, কুরু, ও কীর দেশ যথাক্রমে—পঞ্চনদের পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব ও উত্তরে অবস্থিত। যবনদেশ সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের তীরবর্তী মুসলমান-অধিকৃত কোন রাজ্য হবে। অবন্তি মালবের এবং মৎস্যদেশ আলোয়ার ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজরাজ্য বোধ হয় বর্তমান বেরার এবং যদুরাজ্য পাঞ্জাবে অথবা সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মপালদেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজত্বকাল প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী ছিল। বাঙ্গালীর ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি এই ধর্মপালের সময়েই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ইহাকেই বাঙ্গালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ বলা যায়। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস—যাঁর কীর্তি ধনিনির্ধন ও আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলে একবাক্যে ঘোষণা করত, তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এবিষয়ে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—এই মহাশয়ত্রয়ের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী। তাঁরা বহু কষ্ট স্বীকার করে বাংলার এবং বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা উদ্ধার করেছেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুদের প্রতি

বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার কীর্তি মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জেলার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। বহুস্থানে নারায়ণের জন্য মন্দির নির্মাণোদ্দেশ্যে তিনি নিষ্কর ভূমিদান করেছেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার তাঁরই নির্মিত বলে অনুমিত হয়। এতবড় বৌদ্ধ বিহার ভারতে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে বহু ভিক্ষু বিদ্যাভ্যাস করতেন। বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি মূর্তি গৌড়ে এবং মালদহ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত মালদহ জেলার পূর্বসীমানার সন্নিকটে পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার শাবগাছি নামক গ্রামে বটবৃক্ষের গাত্রে জড়িত কষ্টিপাথরের একটি নিখুঁত সুন্দর মূর্তি এখনও দর্শককে মুগ্ধ করে।

বর্তমানে গৌড়-লক্ষ্ণাবতী নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪।১৫ মাইল এবং প্রস্থে ৩।৪ মাইল ছিল বলে অনুমিত হয়। এই নগরীটিকে বন্যা এবং শত্রুর হস্ত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ৪।৫টি সু-উচ্চ বাঁধ এবং পরিখার দ্বারা সুরক্ষিত করা ছিল। এখনও ঐ বাঁধ এবং পরিখাগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নগরীর প্রায় চারিদিকেই নদী। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকারের সুবিধা এই এখানে ছিল। নগরী-প্রবেশের পথে বর্তমানেও তিনদিকে তিনটি দ্বাররক্ষাদেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পূর্বে জহরা-দেবী, উত্তরপশ্চিম কোণে দ্বার-বাসিনী, এবং পশ্চিমে পাতালচণ্ডী অবস্থিতা। এই তিনটি দেবীর কাহারো প্রতিকৃতি বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এখনও বেদীতেই অর্চনা হয়ে থাকে। বেদী প্রস্তরনির্মিত। প্রতি বৈশাখ-মাসে শনিমঙ্গলবারে জহরা মায়ের নিকট পূজা ও বলি প্রদান করা হয় এবং মেলা বসে। দ্বার-বাসিনীতেও ভক্তেরা পূজা-অর্চনা দিয়ে থাকেন। এখানে মন্দিরসংলগ্ন একটি বড় পুকুর আছে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের নরনারী উহাতে স্নানাদি করে থাকেন। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটি দণ্ডায়মান থেকে ইহার প্রাচীনত্বকে এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করে চলেছে। এতদ্ব্যতীত গৌড়ের রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথ সু-উচ্চ প্রাচীরসংলগ্ন একটি দেবা-মন্দির (গৌড়েশ্বরী) ছিল বলে অনেকের ধারণা। এস্থানে কোন মন্দির বা বিগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। কয়েক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর শুধু সাক্ষি-স্বরূপ পড়ে আছে। আমাদের মনে হয়, মুসলমানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রাচীন গৌড় নগরকে দখল করেন, তখন হয় হিন্দুগণ তাঁদের উপাস্য দেবীকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন অথবা বিজেতৃগণই উহাদের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছেন। গৌড়স্থিত মুসলমান বাদশাহদের তৈরী মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারতাদিতে এখনও অনেক হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তি-বিশিষ্ট-প্রস্তর দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বাদশাহগণ হিন্দুরাজগণের নির্মিত প্রাসাদাদির মালমসলা দিয়েই তাঁদের মনোমত ইমারতাদি নির্মাণ করিয়ে ছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে আলাউদ্দিন হুশেন শা এই গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৈষ্ণব ভক্ত চূড়ামণি রূপ ও সনাতন গোস্বামী—রাজস্ব মন্ত্রী এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী—সাকর মল্লিক ও দবীর খাশ রূপে এই গৌড়ে বাস করতেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে গৌড় নগরে উপনীত হয়ে রূপ ও সনাতনকে কৃপা করেন। অদ্যাপি মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান—রামকেলী গ্রামের তমাল ও কেলীকদম্বমূলে নির্দেশিত হয়ে আসছে। মহাপ্রভুর প্রস্তর খোদিত পদচিহ্নও তথায় রক্ষিত আছে। কথিত আছে রূপ গোস্বামী যখন

বৃন্দাবনে চলে যান বাদশাহের এই উচ্চ পদ পরিত্যাগ করে, তখন সনাতন গোস্বামীও রূপ গোস্বামীরই পদাঙ্কানুসরণে স্থিরসংকল্প হয়েছেন জেনে বাদশাহ বহু অর্থব্যয়ে রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে রামকেলী গ্রামে বৃন্দাবনের অনুরূপ একটি দেবস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখনও শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দির, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি বিদ্যমান থেকে বাদশাহ এবং সনাতন গোস্বামীর কীর্তি ঘোষণা করছে। প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই স্থানে মহাপ্রভুর আগমন-উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে কীর্তন, মহোৎসব বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হয়ে আসছে। বহুদূর দেশ থেকেও ভক্ত সমাগম হয়। ৬।৭ দিন ব্যাপী মেলা থাকে। এস্থানটিকে বৈষ্ণবভক্তগণ গুপ্ত বৃন্দাবন আখ্যা দিয়ে থাকেন।

সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এই প্রাচীন গৌড় নগরটি ম্যালেরিয়াতে ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ও নানাবিধ বন্যপশুর আবাসস্থলে পরিণত হয়! বহু বড় দীঘি এবং পুষ্করিণী এই নগরে ছিল। উহার নিদর্শন এখনও বর্তমান। বর্তমানে নগরের অধিকাংশ স্থানই চাষোপযোগী করা হয়েছে।

প্রাচীন কীর্তির মধ্যে দ্রষ্টব্য:—রামকেলী গ্রামে গুপ্তবৃন্দাবন, বারদুয়ারী, রূপ-সাগর, দখিল-দরজা, ফিরোজ-মিনার, রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে সু-উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, চিকা-মসজিদ, লুকোচুরী গেট, লোটন ও তাঁতী পাড়া মসজিদ, বড় ও ছোট সাগর দীঘি ও মিউজিয়ম্। পাঁচশত বৎসরের পূর্বেকার এনামেল করা ইট এখনও কয়েকটি মসজিদ গাত্রে বিদ্যমান থেকে দর্শককে মুগ্ধ করে থাকে। গৌড়ের সীমানার মধ্যে সরকারী রেশমের নার্সারীটিও দ্রষ্টব্য। ইংরেজ বাজার সহর থেকে মোটরে বা ঘোড়ার গাড়ীতে গৌড়ে যাওয়া যায়; যাতায়াতে ২৫।২৬ মাইল রাস্তা।

দমাদিত্রয় সাধনা

আচার্য শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শান্তিনিকেতন

গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে 'অভয়' প্রভৃতি দৈব সম্পদ্ এবং দম্ভাদি আসুর সম্পদের নির্দেশ করিয়াছেন। মুখ্যার্থে দৈব সম্পদ দেবতারই, আসুর সম্পদ্ অসুরেরই। কিন্তু গীতায় এই সম্পৎসমূহ গৌণার্থক—অর্থাৎ দৈব সম্পদে অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, দেবতার কার্য হেতু দেবভাবাপন্ন মনুষ্য; এইরূপ, আসুর সম্পদে অভিজাত মনুষ্য, মনুষ্য হইলেও, অসুরের কার্যহেতু অসুরপ্রকৃতি মনুষ্য। অর্জুন দৈব সম্পদে অভিজাত দেবোপম মনুষ্য, কংস প্রভৃতি মনুষ্য হইলেও, অসুরপ্রকৃতি হেতু পুরাণে কংসাসুর (কংস-অসুর) ইত্যাদি 'অসুর' বিশেষণ বিশিষ্ট-ভাবে অভিহিত, বস্তুত অর্জুন ও কংস উভয়েই মনুষ্যজাতি ক্ষত্রিয়, দৈব ও আসুর সম্পদ্ হেতুই একের দেবত্ব ও অন্যের আসুর স্বভাব। পূর্বোক্ত দৈব সম্পদের মধ্যে যে দম দান দয়া এই সম্পৎত্রয়ের গণনা আছে, বৃহদারণ্যকে সেই দমাদিত্রয়ের সাধনা পরবর্তী আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে।

প্রজাপতির পুত্র দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ

পিতার নিকটে ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিলেন এবং শিষ্যভাবে প্রজাপতিকে বলিলেন—"পিতঃ, যাহা অনুশাসন, তাহা আমাদিগকে বলুন।" তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি 'দ' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি যে উপদেশাক্ষর 'দ' উচ্চারণ করিলাম, তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই?" দেবগণ উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি।" প্রজাপতি বলিলেন যদি বুঝিয়া থাক, বল আমি কি বলিয়াছি। দেবগণ বলিলেন—"আপনার অনুশাসনাক্ষর বুঝিয়াছি 'দাম্যত' অর্থাৎ তোমরা দমন কর, তোমরা স্বভাবত অদান্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমরহিত বা অজিতেন্দ্রিয়, অতএব দান্ত বা জিতেন্দ্রিয় হও, ইহাই আমাদিগকে উপদেশ দিলেন।" তখন পিতা বলিলেন,—"ওম্" অর্থাৎ দেবগণের বাক্য স্বীকার করিয়া বলিলেন—"হাঁ ঠিকই বুঝিয়াছ।"

মনুষ্যেরা বলিলেন,—"পিতঃ, আমাদিগকে অনুশাসন করুন।" তাঁহাদের এই প্রার্থনায় প্রজাপতি আবার 'দ,' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যে 'দ' বলিলাম তাহা তোমরা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই।" মনুষ্যেরা বলিলেন—"আমরা আপনার উপদিষ্ট অক্ষর বুঝিয়াছি।" প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"'দ' কারে কি বুঝিয়াছ বল।" মনুষ্যেরা উত্তরে বলিলেন—"'দ' দত্ত, তোমরা দান কর। তোমরা স্বভাবত লুব্ধ বা লোভপরায়ণ, অতএব যথাশক্তি লোভ সংবরণ কর, দান কর।"

গীতায় ভগবদুক্তি—লোভ, তমোদ্বার, অর্থাৎ নরকে প্রবেশের পথ, আত্মজ্ঞাননাশক। ইহা হইতে বিমুক্ত মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধন করিয়া পরমগতি বা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।২১-২২)।

অসুরগণ প্রার্থনা করিলেন,—"পিতঃ, আমাদিগকে উপদেশ দিন।" প্রজাপতি পুনর্বার 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"আমি যে 'দ' বলিয়াছি তাহা বুঝিয়াছ, না বুঝিতে পার নাই?" অসুরগণ উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি" পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বুঝিয়াছ বল।" অসুরগণ বলিলেন,—"'দ' অর্থাৎ দয়ধ্বম্, তোমরা দয়া কর। তোমরা ক্রূর, হিংসাপরায়ণ পরধন হরণাদি কুকার্যে আসক্ত, অতএব তোমরা সকল প্রাণীর প্রতি দয়া কর—এই উপদেশ দিলেন।" প্রজাপতি বলিলেন,—"ওম্", অর্থাৎ "হাঁ, ঠিকই বুঝিয়াছ।"

প্রজাপতি, দেবগণ মানবগণ ও অসুরগণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। এখনও মেঘগর্জনরূপে দৈববাক্য অনুশাসন করিতেছেন;—'দাম্যত' 'দত্ত' 'দয়ধ্বম্', অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর, দান কর, দয়া কর। অতএব এই দমাদিত্রয় শিক্ষা করিবে। এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য দমাদিত্রয়ের সাধন-বিধান। গীতায় যে দৈবী বা সাত্ত্বিকী সম্পদের বর্ণনা আছে, দম দান দয়া তাহাদের মধ্যে মুখ্যতম। এই তিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে, দেব মানব বা অসুর সকলেই বস্তুত জিতেন্দ্রিয় লোভ-পাশমুক্ত ও হিংসাদি-পরিশূন্য হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে দমাদিসিদ্ধিবিহীন অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় দেবতা, নামমাত্র দেবতা লোভপরায়ণ মনুষ্য বা হিংসাপরায়ণ অসুরের ত কথাই নাই।

আখ্যায়িকায় প্রজাপতির কথিত অনুশাসন চিরকালই সুফলপ্রসূ। ইন্দ্রিয়দমন, দীনে দান, জীবে দয়া—ইহা কার্যত অনুষ্ঠিত হইলে, মানব চারিত্রপুজায় দেবতারও উর্ধ্বে পদলাভের অধিকারী হয়। বর্তমান ভারতে এই অনুশাসনত্রয়ের পরিশীলন ও পরিপালন অত্যাবশ্যক মনে হয়।

"আসবে তুমি ইচ্ছা যবে"

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্‌-এ

আসবে তুমি ইচ্ছা যবে হবে তোমার মনে ;
—হয়তো বিনা আমন্ত্রণে, হয়তো অকারণে !
আমার শুধু রাখতে হবে খোলা সকল দ্বার ;
পথের ধূলা আমায় হবে করতে পরিষ্কার ;
আঁধার রাতে জ্বালতে হবে প্রদীপ সযতনে !

হয়তো কভু আসবে তুমি, হয়তো রবে ভুলে ;
চলার পথে হয়তো কভু চাবে না চোখ তুলে !
আমায় তবু রাখতে হবে রচি বরণডালা ;
সকাল সাঁঝে গাঁথতে হবে হৃদয়রাগে মালা ;
নয়ননীরে ভাসতে হবে বিয়োগবিধুর ক্ষণে !

একটি জাতকের গল্প

শ্রীফণীন্দ্রমোহন মিত্র

জাতক-কাহিনীগুলি ভগবান বুদ্ধের পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত। তিনি এখানে বোধিসত্ত্ব, মহাসত্ত্ব, ইত্যাদি নামে পরিচিত, এবং শুধু মনুষ্যরূপেই নহে, ইতর পশুপক্ষী সরীসৃপাদি যোনিতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে তাঁহার অভিনীত ভূমিকাগুলিও অতি অপূর্ব। কখনও তিনি রাজা—মনুষ্যরাজ বা পশুরাজ; কখনও রাজপুত্র বা রাজমাতা, কখনও ঋষি, বৃক্ষদেবতা, বা আচার্য, আবার কখনও ব্রাহ্মণ, ভূম্যধিকারী, পণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠী, কখনও শক্র (ইন্দ্র), কখনও ব্রহ্মা, এমন কি কোন কোন জাতকে বোধি-সত্ত্বকে চোর, ধূর্ত ইত্যাদি ভূমিকাতেও দেখা যায়। বিচিত্র জগৎ-সংসারের অগণিত মনুষ্যপশুপক্ষি-বৃক্ষপতঙ্গ-সংবলিত বিরাট অভিব্যক্তির (evolution) চেহারাটিই যেন এই বিরাট ধর্মসাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে, আর ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে সংখ্যাতীত নায়ক-নায়িকার বহুরূপ লীলা-বৈচিত্র্য। এই কাহিনীগুলিতে আমরা পাই একাধারে ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও লোক-নীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির এক মনোরম সমাবেশ। এককথায় জাতক কাহিনীগুলিকে বলা যায় আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান বিষয়গুলি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস, অহিংসা, ক্ষান্তি, শান্তিপ্রিয়তা ইত্যাদির যে বিশেষ প্রাধান্য জাতকে থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জাতক-গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এইগুলিতে শুধু উক্ত নীতিগুলিই পরিস্ফুট হয় নাই, পরন্তু বহুস্থানে বহুবার বহুরূপে ও আকারে উহাদের বিপরীত বহুনীতি ও তত্ত্ব স্থান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছে। শুধু অহিংসা নয়,—হিংসা ও অহিংসা, শুধু ক্ষমাধর্ম নয়,—দণ্ড, শাস্তি ও ক্ষমা, শুধু শান্তিসর্বস্বতা নয়,—যুদ্ধোদ্যম ও শান্তি, এইরূপ বিরুদ্ধনীতিতত্ত্বের সংঘাত ও মিলনে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক জগতের এক পূর্ণ বাস্তব সমগ্র উজ্জ্বল চিত্ররূপে! পাশাপাশি চলিয়াছে সাম ও দণ্ড, সত্য ও হত্যা, সন্ন্যাস ও রাজধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রতেজ, ত্যাগ ও ভোগ, যতিধর্ম ও বৈশ্য-ঐশ্বর্যরূপ! বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধজগৎ ও বৌদ্ধসাহিত্য এককালে এই পরিপূর্ণ সমগ্র

বাস্তবতার (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই বৌদ্ধবিজয়-বৈজয়ন্তী এককালে সমগ্র এশিয়ার দূরদূরান্তরে উড্ডীন হইয়াছিল এবং দেশ নগর জনপদ রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তি ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। রাজনীতি ধর্মনীতি ও সমাজনীতির সমন্বয়ের অপূর্ব সুফলরূপে শিল্পকলা বাণিজ্য জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিশ্বজগৎকে চমকিত করিয়াছিল, আজও যাহা বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু। আর যখন বৌদ্ধজগৎ এই অপূর্ব বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি হারাইয়া শুধু হিংসা-অহিংসার কূটতর্কে জড়াইয়া গেল, একতরফা শান্তিসর্বস্বতার চোরা বালিতে আটকাইয়া গেল একতরফা সন্ন্যাসধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনে মসগুল হইল,—ইতিহাস আজ পরিষ্কার কণ্ঠে সাক্ষ্য দিতেছে যে, তখন হইতেই শুরু হইল বৌদ্ধজগতের অবনতি ও অধঃপতন।

সজীব প্রাণবন্ত (Dynamic) প্রাচীন বৌদ্ধ-জগতের বাস্তবতার কোন্ রূপটি জাতকগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, তাহাই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়।

আমাদের আলোচ্য জাতকটি হইতেছে মহাশীলবানজাতক।* পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুস্তকে দেখা যায়—'শাস্তা', অর্থাৎ বুদ্ধদেব, "জেতবনে কোন বীর্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন" (১০৯ পৃঃ)। উক্ত ভিক্ষু নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে উৎসাহ ও ধর্মের গৌরব শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন পণ্ডিতেরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও অদম্য উৎসাহবলে প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনঃ লাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

*পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত জাতক-গ্রন্থমালার ১ম খণ্ড, ১৩২৩

এখানে গল্পটির মুখবন্ধেই আমরা দুইটি তত্ত্বের পরিচয় পাইতেছি :—

(১) বীর্যমহিমা—নিরুৎসাহ বা নিষ্ফল হইলে চলিবে না। "অদম্য উৎসাহবলে" বারবার চেষ্টা করিতে হইবে, বীর্য অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব, তবেই "প্রনষ্ট সৌভাগ্য পুনর্লাভ" সম্ভব। বীর্যের এইরূপ মহিমা-কীর্তন বহুজাতকে দেখা যায়। যেমন ১ম খণ্ডের ৫২ নং চুল্লজনক-জাতক ; ২য় খণ্ডের ২৬৫ নং ক্ষুরপ্র-জাতক।

বর্তমান কাহিনীটির উপসংহারে আমরা পুনরায় উৎসাহ, "অদম্য বীর্য" ইত্যাদির পরিচয় পাইব।

(২) রাজগৌরব—রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া রাজার পক্ষে গর্হিত কাজ, রাজধর্মবিরুদ্ধ। সুতরাং নষ্ট রাজ্য পুনর্লাভ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, উহাই রাজধর্মসম্মত।

এই সঙ্গে আর একটি অত্যাশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, রাজধর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সন্ন্যাসী ভিক্ষুকে বুদ্ধদেব শিক্ষা দিতেছেন !

যে রাজপুত্র রাজ্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন, তিনি কেন সেই রাষ্ট্রজগতের নজির দিয়া সন্ন্যাসীর মোহভঙ্গ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।

এইবার আসল গল্পটিতে আসা যাক্—

"পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।" (১০৯ পৃঃ) বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কে ছিলেন, কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। এখানে আমাদের শুধু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটুকু যে—

রাজধর্মের পটভূমিকায় বৈরাগ্যধর্মী কাহিনীর প্রারম্ভ। রাজার নাম লইয়াই ধর্ম-কথার সূত্রপাত। রাজা ও রাজপ্রতাপ নহিলে

ধর্মের কাহিনীই আরম্ভ হইতে পারে না! দেশে যখন "যথাধর্ম প্রজাপালনকারী মহাশীলবান্" কোন রাজা রাজতক্তে আসীন, তখনই কোন ধর্মের কাহিনীতে কান দেওয়া জনগণের পক্ষে সম্ভব। বৈরাগ্যই বল, আর অহিংসাই বল, অরাজক দেশে ইহাদের কোন কথাই আরম্ভ হইতে পারে না। সর্বাগ্রে চাই "সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত" "যথাধর্ম"-শাসনকারী একজন রাজা।

এক্ষণে গল্পটির অনুসরণ করা যাক্—বোধিসত্ত্ব ষোড়শ বৎসর বয়সেই "সর্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত" হইয়া উঠেন এবং পিতার মৃত্যুর পর "মহাশীলবান্" নামে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম প্রজাপালনপূর্বক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গল্পের শেষে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে বলিতেছেন, "আমি ছিলাম রাজা মহাশীলবান্"। এখানে স্বতই এই প্রশ্নটি উঠে :

বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার শ্রীমুখকথিত কাহিনীটিতে দেখা যায়, পূর্ব জন্মে তিনি মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন, এবং রাজসিংহাসন ত্যাগ করা দূরে থাকুক, নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত বীর্যপ্রকাশে বিরত হন নাই বলিয়া গিয়াছেন ও এইরূপ দৃষ্টান্তই উপস্থাপিত করিয়াছেন।

রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য অবৈধ প্রণয়ের অপরাধে রাজাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া কোশলরাজ্যে গমন করেন এবং সে রাজ্যের রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। একদিন তিনি কোশলরাজকে বলেন, "'মহারাজ, কাশীরাজ্য মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ; তত্রত্য রাজার প্রকৃতি অতি মৃদু; সহজেই উহা অধিকার করিতে পারা যাইবে।' তাহার কথা পরীক্ষা করিবার জন্য কোশলরাজ কতকগুলি লোক পাঠাইয়া কাশীরাজ্যের একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম (border village) আক্রমণ করাইলেন।" (১১০ পৃঃ) এখানে দেখা যাইতেছে :

দুর্বল মৃদুপ্রকৃতি রাজার রাজ্য সহজেই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অর্থাৎ মৃদুতা, দুর্বলতা ইত্যাদি রাজদোষই রাজ্যের বিপদ ডাকিয়া আনে। গল্পটিতে আছে—প্রত্যন্ত (border) গ্রাম আক্রান্ত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের দুর্গত পরিস্থিতির সহিত কি অপরূপ মিল এখানে দেখা যাইতেছে!

রাজ্যের প্রত্যন্তগ্রাম শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইল। কিন্তু রাজা মহাশীলবান কি করিলেন? আক্রমণকারিগণ ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে রাজ মহাশীলবানের প্রশ্নে তাহারা বলিল যে, জীবিকানির্বাহের উপায়াভাবেই তাহারা এই দুষ্কার্য করিয়াছে। শুনিয়া মৃদুপ্রকৃতি বিশ্বাসপরায়ণ রাজা দুঃখে গলিয়া গিয়া মিথ্যাবাদী ভণ্ড আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত ধন দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্', ঘৃতে আগুন নিভে না, বাড়িয়াই যায়। সুতরাং পররাজ্যলোভী কোশলরাজ এবার কাশীরাজ্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিবার জন্য পুনরায় লোক পাঠাইলেন। উদারহৃদয় ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ ইহাদিগকে পূর্বের ন্যায় ধন দিয়া বিদায় করিলেন। তারপর কোশলসেনারা আসিয়া বারাণসীর রাজপথসমূহে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এবারও তাহারা শাস্তি বা নিগ্রহের পরিবর্তে ধনরত্ন পুরস্কার পাইল। দেখা যাইতেছে, বারবার, তিনবারেও কাশীরাজের শিক্ষা হইল না। তাঁহার অদৃষ্টে নিতান্তই দুর্ভোগ আছে।

কোশলরাজ এইবার নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, "কাশীরাজ অতীব নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ," (১১০ পৃঃ)। কাশীরাজের যে সৈন্যবলের অভাব ছিল, তাহা নয়। "এই সময়ে কাশীরাজের এক সহস্র মহাযোদ্ধা ছিল। তাহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর্যবান্।...মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা জম্বুদ্বীপের, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য জয় করিতে সমর্থ ছিল।" (১১০ পৃঃ) আর এই

বীরপুরুষেরা কাশীরাজকে যুদ্ধার্থ অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমাপরায়ণ কাশী-রাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য যেন অপরের কোন অনিষ্ট না হয়। মহারাজের রাজ্যলোভ আছে, তাহারা ইচ্ছা করে ত আমার রাজ্য অধিকার করুক।"

এদিকে কোশলরাজ কাশীরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলে অমাত্যেরা কাশীরাজের নিকট যুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। ইতোমধ্যে কোশল-রাজ রাজধানীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দূতমুখে কাশীরাজকে জানাইলেন, 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।' ক্ষমাপরায়ণ কাশীরাজ উত্তর দিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না, কোশলরাজ ইচ্ছা করিলে রাজ্যগ্রহণ করিতে পারেন। অমাত্যেরা তখনও যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, শেষ অনুমতি। কিন্তু রাজা মহাশীলবান্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নগরদ্বার খুলিয়া দিয়া সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

হায় রাজা মহাশীলবান্! একতরফা ক্ষমা ও অহিংসাধর্মের মাহাত্ম্যে অন্ধ হইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি কিরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন না ক্ষমা ও অহিংসারও বাড়া-বাড়ি আছে এবং সকল বাড়াবাড়িই সর্বনাশের কারণ। এখানে আমরা জাতকগ্রন্থমালার আর একটি প্রধান শিক্ষার পরিচয় পাই। সেটি এই—

"কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না কখন;
শিখিবে অত্যন্ত সর্ব করিতে বর্জন।
(৫৯ নং ভেরীবাদ জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃঃ;
৬০নং শঙ্খধ্ম-জাতক, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

বাড়াবাড়ির যে কী ভীষণ পরিণতি তাহাই এখন দেখা যাইবে।

এদিকে কোশলরাজ নির্বিবাদে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া কাশীরাজ ও তাঁহার অমাত্যগণকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহার আদেশে বন্দিগণকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া শ্মশানে গর্ত খুঁড়িয়া গলা পর্যন্ত মাটিতে পোতা হইল শৃগাল-কুকুরের খাদ্যের জন্য। সকলে চলিয়া গেলে মহাত্মা শীলবান্ (তিনি আর এখন রাজা নহেন) আকণ্ঠ প্রোথিত অমাত্য-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ কর; অন্য কোন ভাবকে স্থান দিও না।" (১১১ পৃঃ)

মনুষ্যমাংসের গন্ধে শীঘ্রই একপাল শৃগাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। "তাহাদিগকে দেখিয়া 'রাজা' ও অমাত্যগণ এক সঙ্গে এমন বিকট চীৎকার করিলেন যে, শৃগালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল।" (১১১ পৃঃ)

একি! মৈত্রীভাবনা কোথায় গেল? একমুহূর্ত আগে যে 'মৈত্রীপোষণে'র চমৎকার গালভরা কথা হইতেছিল! এক মুহূর্তেই তাহা উঠিয়া গেল? শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইবার ভয়ে না কি? তবে কি এতদিন মহাত্মার কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হইল? একেবারে রসাতলে যাইবার মুখে কি শুভবুদ্ধির উদয় হইল?

মহাত্মা ও তাঁহার অমাত্যগণ তিন তিনবার 'বিকট চীৎকর' করিয়া দুর্ভাগ্য শৃগালগণকে মৈত্রীর অপূর্ব রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিলেন। তৎপরও যখন শৃগালেরা দেখিল যে কেহই তাড়া করিতেছেন না, "তখন তাহাদের সাহস বাড়িল" ও তাহারা আবার মহাত্মাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। শৃগাল-দলপতি যেমন কাশীরাজকে দংশন করিতে উদ্যত হইল, "উপায়-কুশল কাশীরাজ" "অমনি তাহারই গ্রীবা দংশন করিয়া ধরিলেন।" (১১১ পৃঃ)

একি অহিংসাবিরুদ্ধ আক্রমণ! "মহাশীলবানের একি দুঃশীলতা! কিন্তু দেখা যাইতেছে মহাশীলবান একেবারে মহামরণের অন্ধগর্তে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে উপায়কুশল হইয়া উঠিতেছেন, এবং "মৈত্রী-পোষণ" আপাততঃ মুলতুবি রাখিয়া আত্মপোষণার্থে

আক্রমণাত্মক উপায়কুশলতা অবলম্বন করিতেছেন, end এর মোড় ঘুরাইয়া দিয়া তদুপযুক্ত means আবিষ্কার করিয়া লইতেছেন। এখানে জাতকমালার আর একটি প্রধানতত্ত্বে আমরা উপনীত হইতেছি। সেটি হইতেছে—

উপায়কুশলতা, মূর্খতা-পরিহার :—বহু জাতকের গল্পে নানারূপে এই উপায়কুশলতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, মূর্খতার দোষ ও তাহাতে যে কী ভীষণ সর্বনাশ হয় তাহা দেখান হইয়াছে, জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা কিভাবে স্বার্থসিদ্ধি করেন ও বাস্তবজগতের সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া টিকিয়া থাকেন, তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন ১ম খণ্ডের ২০নং কুরঙ্গজাতকের পরিশেষে কাহিনীর সমাধান-রূপে বুদ্ধদেব কহিতেছেন, "আমি ছিলাম সেই উপায়কুশল বানররাজ।" (৪৯ পৃঃ) তৃতীয় খণ্ডের ৩৪২নং বানরজাতকের শেষে বোধিসত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন—

"আকস্মিক বিপদের প্রতিকারোপায়
যে না পারে নির্ধারিতে অবিলম্বে হায়,
নিশ্চয় পড়িবে সেই শত্রুর কবলে,
পাইবে যাতনা মূঢ় অনুপাতানলে।"

(জাতক, ৩য় খণ্ড, ৮০ পৃঃ)

১ম খণ্ডের ৪৫নং রোহিণী-জাতকে বোধিসত্ত্ব এই গাথাটি বলিতেছেন :—

"হিতে করে বিপরীত মূর্খ যদি মিত্র হয়"···

তার পরেই আছে "এই গাথাদ্বারা পণ্ডিতজনের প্রশংসা করিয়া বোধিসত্ত্ব ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন।" (১ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ) ধর্মোপদেশের মধ্যে তখন বীর্যস্তুতি, উপায়কুশলতা-কীর্তন ইত্যাদিও থাকিত।

গল্পটি এবার ধরা যাউক— কাশীরাজ শৃগালপতির গলা দংশন করিয়া ধরিলেন। "তাঁহার হনুতে যন্ত্রের মত এবং দেহে হস্তীর মত বল ছিল, কাজেই শৃগাল তাহার দশনপঙ্‌ক্তি হইতে মুক্তিলাভ, করিতে না পারিয়া মরণভয়ে বিকট রব করিয়া উঠিল।" (১১১ পৃঃ) তাহার চীৎকারে অন্যান্য শৃগাল প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এদিকে শৃগালপতির লাফালাফিতে চারিদেকের মৃত্তিকা শিথিল হইয়া যাওয়ায় 'রাজা' শৃগালকে ছাড়িয়া দিলেন এবং "গজোপম বলপ্রয়োগপূর্বক" বিবর হইতে নিজেকে বাহির করিয়া আনিলেন এবং অমাত্যগণকেও উদ্ধার করিলেন।

এক্ষণে এই চমৎকার প্রশ্নটি উঠিতেছে—

সেই যদি মৈত্রীভাবনাই পরিত্যাগ করিতে হইল, সেই বীর্যপ্রকাশ, আক্রমণ, উপায়কুশলতা, "গজোপম বলপ্রয়োগ"ই যদি করিতে হইল, তবে প্রথমেই এসব করিতে বাধা কি ছিল? একেবারে প্রথমে না হউক বারবার দুইবার শত্রুকে মৈত্রীভাবনাগুণে ক্ষমা করিয়া তৃতীয়বার যখন আক্রমণ হইল, তখন বীর্যপ্রকাশ, পাল্টা আক্রমণ 'গজোপম বলপ্রয়োগ' ইত্যাদি করিলে কি মৈত্রীপোষণ, অহিংসা, ক্ষমাগুণ ইত্যাদি অশুদ্ধ হইয়া যাইত, বিশেষতঃ যখন একটু পরেই এ সকল মৈত্রীবিরুদ্ধ ক্রিয়া অপরিহার্য হইয়াছিল?

আমাদের মনে হয় জাতক-কথক এইখানে উভয়রক্ষা করিতে পারেন নাই। একদিকে বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া অন্যদিক্ বজায় থাকে নাই। "কিছুতেই বাড়াবাড়ি করো না যখন," ইহা ত জাতকেরই শিক্ষা। অহিংসা, মৈত্রীপোষণ, ক্ষমাধর্ম ইত্যাদির কি বাড়াবাড়ি নাই? আছে বলিয়াই দেশে দেশে যুগে যুগে প্রচলিত লোকনীতি বিধান দিয়াছে— বারবার দুইবার, তিনবার না।

তাহার পর গল্পটি এই— উক্ত শ্মশানে বহু যক্ষ থাকিত। সেইদিন এক ব্যক্তি একটা শব দুই যক্ষের সীমার উপর ফেলিয়া যাওয়ায় ঐ শবের অধিকার লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে যক্ষদ্বয় 'রাজা' শীলবানের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত হইল। কিন্তু শীলবান তখনও অশুচি। সুতরাং যক্ষদ্বয় "প্রভাববলে" কোশলরাজের অন্ন সংগৃহীত

সুবাসিত জল, পরিচ্ছদ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, 'নানারস-সমন্বিত অন্ন'-পান-তাম্বুলাদি লইয়া আসিয়া তাহা দ্বারা মহাশীলবানকে শুচি-শুদ্ধ করিল। এখানে দেখা যাইতেছে—

অদত্তাদান* বৌদ্ধশাস্ত্রের বিখ্যাত দশ-শীলবিরুদ্ধ কার্য। কোশলরাজের দ্রব্যাদি বিনাদানে মহাশীলবানের গ্রহণ নিশ্চয় শীলবিরুদ্ধ কার্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে— মহাশীলবান রাজার পক্ষে দশ-শীলবিরুদ্ধ কার্যও কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধশাস্ত্র-সম্মত বটে। তাই রাজা মহাশীলবান অনায়াসে শৃগালের গ্রীবা দংশন করিতে পারিয়াছিলেন।

শুচিস্নাত হইয়া মহাশীলবান্ আপনার খড়্গ আনাইলেন এবং উহা দ্বারা শবটির "মস্তকে আঘাত করিয়া সমান দুই ভাগে চিরিয়া যক্ষদ্বয়কে এক এক অংশ দিলেন এবং খড়্গ ধুইয়া কোষের মধ্যে রাখিলেন। যক্ষেরা মনুষ্যমাংস খাইয়া পরিতৃপ্ত হইল।" (১১২ পৃঃ)

তারপর রাজা মহাশীলবান (তিনি তখনও পুনরায় রাজা হন নাই) যক্ষপ্রভাববলে স্বীয় রাজপ্রাসাদমধ্যে নীত হইলেন। চোররাজ অর্থাৎ তস্কর কোশলরাজ, নিদ্রা যাইতেছিলেন। "কাশীরাজ খড়্গাতলদ্বারা তাঁহার উদরে আঘাত করিলেন।" (১১২ পৃঃ) এই আর একটি অহিংসাবিরুদ্ধ কার্য, রাজার পক্ষে তাহা বৌদ্ধশাস্ত্র-সম্মত। তারপর যাহা হইল, তাহা সহজেই বুঝা যায়— পরাভূত কোশলরাজ কাশীরাজের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার খড়্গাস্পর্শপূর্বক শপথ করিলেন যে, তিনি আর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শুধু তাহাই নয়। তিনি তখনই "কাশীরাজকে রাজশয্যায় শয়ন করাইলেন এবং নিজে একটি সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিলেন।" (১১২ পৃঃ) শুধু তাহাই নয়। পরদিন প্রাতে "কোশলরাজ ভেরীবাদন দ্বারা সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগকে সমবেত করাইয়া তাহাদের সমক্ষে" মহাশীলবানের গুণকীর্তন করিলেন এবং "সভামধ্যে পুনর্বার তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্ব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, অদ্যাবধি এ রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করিবার ভার আমি লইলাম; আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব, আপনি প্রজাপালন করুন।"

এখানে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবার— শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ও অনুগত সেবকে পরিণত না করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকার ক্ষান্ত হন নাই। শুধু পরাজয় নয়, শুধু মৌখিক আনুগত্য-স্বীকারও নয়— বিজয়ীর খড়্গাস্পর্শপূর্বক শপথ-গ্রহণ; দুই দুইবার ক্ষমাপ্রার্থনা, তন্মধ্যে একবার সর্বজনসমক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা, সর্বজনসমক্ষে বিজয়ীর গুণকীর্তন ও বিজয়ীর অনুগত সেবকত্বগ্রহণ, শত্রুকে এই সব করাইয়া তবে বুদ্ধদেব বা জাতক-কথক তাহাকে রেহাই দিয়াছেন। শত্রুতা এমনই সাংঘাতিক জিনিস, শত্রুকে এইভাবে বশে না আনা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৌদ্ধধর্মের ন্যায় নির্বিরোধ ধর্মশাস্ত্রে পর্যন্ত এককালে এইরূপ রাষ্ট্রনীতিই কীর্তিত হইয়াছিল।

এইবার গল্পের উপসংহার করা যাক্— সালঙ্কার শীলবান্ রাজা মৃগপাদযুক্ত স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহার মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি নিজের মহিমা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,— 'উৎসাহ-বলেই আমি আবার রাজপদ পাইলাম, অমাত্য-দিগেরও প্রাণরক্ষা হইল। অহো! উৎসাহের কি অদ্ভুত ফল!' 'অনন্তর তিনি হৃদয়ের আবেগে এই গাথা বলিলেন :—

ছাড়িও না আশা, মন, কর চেষ্টা অবিরাম;
অদম্য বীর্যের বলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।

(১১৩ পৃঃ)

* অর্থাৎ পরদ্রব্য দত্ত না হইলেও গ্রহণ

রাজা বা রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাকর্তব্য কি, কি তাহার বর্জনীয় দোষ, কি তাহার গ্রহণীয় গুণ, কিসে তাঁহার ও তৎপক্ষীয়দিগের অনুগ্রহ, কিসে তাহাদের নিষ্কৃতি ও জয়,— এসকলের যে অপূর্ব চিত্র অহিংসাসর্বস্ব নির্বিরোধ একটি ধর্মশাস্ত্রে পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্তমান কালে আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

শ্রীতারাকালী বসু, এম্-এ

ফেলিয়া কোমল দিঠি পৃথ্বী আছে চেয়ে —
রোমাঞ্চিত বক্ষে যেন অভিমানী মেয়ে।
মৃত্তিকার শ্যাম অঙ্গে নব তৃণ জাগি —
জিজ্ঞাসিনু,—'কে গো তুমি? আছ কার লাগি?
ভাবিল সে,— 'আমি সৃষ্টি, না জানি সন্ধান
স্রষ্টা কোথা, তুমি কবি, গাহ তাঁর গান।'

নীল সিন্ধু ঊর্মিমালা দুলে দুলে চলে,
ফেনায় ফেনায় তার উচ্ছল যৌবন;
আপনি প্রমত্তা সে যে রত্নপ্রসবিনী,
শত প্রাণ প্রবাহের ফুল্ল উপবন।
ডাকিয়া শুধানু তারে— 'হে রহস্যময়ি,
জানি না রহস্য তব, কেগো তুমি অয়ি?'
'মোরা সৃষ্টি, তুচ্ছ মোরা, নহি স্রষ্টা, কবি,
দূরের সন্ধানে তুমি আঁকো তাঁর ছবি।'

চঞ্চল দখিনা বায়ু পুষ্পবাস বহি,
মৃদুমন্দ নবছন্দে চলে রহি রহি,
পুছিয়া জানিনু শুধু সৃষ্টির বিস্ময়—
'স্রষ্টা,— সে অনেক দূরে,' কহিল মলয়।

জলভরা ছল ছল চক্ষে চাহে তারা,
নীরব আকাশ মাঝে আলোর ঈশারা।
শুভ্র লঘু মেঘরাশি বলাকার মত
চকিতে ছুটিয়া চলে, যেন দিশাহারা
ডাকিনু, ক্ষণেক থামি বলে গেল তারা—
'খুঁজিছ স্রষ্টারে কবি, সৃষ্টি যে আমরা।'

বিস্মিত মৃত্তিকা পানে তাকানু আবার
ডাকিনু সিন্ধুর নীরে দক্ষিণা সমীরে—
বলিনু গ্রহেরে ডাকি পুঞ্জনীহারিকা,
তোমাদেরই মাঝে আছে স্রষ্টা ভগবান।
উত্তরিলা পুনঃ সবে 'মোরা তাঁর দান।'
বুঝিনু আমার প্রশ্ন, রহস্য এ নয়
স্রষ্টা যে সৃষ্টির মাঝে হয়ে আছে লয়।

বুদ্ধ-ধর্ম

ব্রহ্মচারী চিত্তরঞ্জন

যদি নীতি আর ধর্মের মধ্যে একটা সীমারেখা টানবার চেষ্টা করা যায়, তাহ'লে বুদ্ধদেব যে ধর্ম-প্রচার করে গেছেন, অনেকেই তাকে ধর্ম বলতে কুণ্ঠিত হবেন। ঈশ্বর বা আত্মা বা ব্রহ্ম বা অতি-মানব কোন সত্তার স্থান যেখানে নেই তাকে ধর্ম বলতে দ্বিধা বোধ করা নিতান্তই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব যা প্রচার করলেন, আসলে তা হ'লো 'কতকগুলি নীতি। কিন্তু সেই নীতিই ধর্ম ব'লে

বিশ্বে ছড়িয়েছে এবং শত সহস্র মানবের শান্তির উৎস হ'য়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধ-ধর্ম ধর্ম হোক বা নাই হোক, একটু অনুধাবন করলেই এ কথাটা বুঝা যায় যে—জগতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সমস্ত ধর্মের মর্মকে, সাধারণ ভিত্তিভূমিকে বুদ্ধধর্ম এত প্রাধান্য দিয়ে, এত শ্রদ্ধা-সমীহ ক'রে, এত পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করে জগতের সামনে ধরেছে, যা জগতের অন্য কোন ধর্ম করেছে বলে মনে হয় না। অন্যান্য ধর্মে নীতি একটা অঙ্গ, একটা অংশ, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সেই নীতি অঙ্গ-অঙ্গী দুইই। নিঃস্বার্থপরতা অন্যধর্মের একটা প্রধান সাধন। বুদ্ধধর্মে সেটাই প্রধানতম সাধন ও ঈপ্সিততম লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বার্থের নিঃশেষ বিলুপ্তি ও নির্বাণ সেখানে সমপর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং বুদ্ধের জীবনই এই উক্তির প্রমাণ। এ কথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, চরম নিঃস্বার্থপরতা সমস্ত ধর্মের চরম লক্ষ্যের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। তবে বুদ্ধধর্ম তাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে।[১]

কোন অর্থে কোন দৃষ্টিতে বুদ্ধধর্ম[২] অন্য সমস্ত ধর্মের ভিত্তিভূমি এখন তা বিশেষ করে জানা দরকার। শুধু বুদ্ধকে বুঝবার জন্য নয়, নিজের ধর্মকে চিনবার জন্যও বটে।

ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব'লে কেউ আছেন কি না, থাকলে তাঁর স্বরূপ, তাঁর কার্যকলাপ কিরূপ, তাঁর সাথে জীবের কি সম্পর্ক, তাঁকে লাভ করবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, প্রয়োজনীয়তা থাকলে উপায় আছে কি না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন কি না, করলে কি ভাবে করেছেন, কোথা থেকে,—তাঁর নিজের মধ্য থেকে না অন্য কোনখান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন—কী উদ্দেশ্যেই বা এই সৃষ্টি করতে গেলেন—এ রূপ হাজার রকমের প্রশ্ন ও তার সমাধান মিলবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে। সোজা কথায় সব ধর্মই চায় যে, তাঁরা পারমার্থিক সত্য (Absolute Reality) কী সেটা আগে আমাদের ধারণা করিয়ে দেবেন। আমরা যেন বুদ্ধি দিয়ে সত্যসম্বন্ধে ধারণা করে সেই সত্যলাভের আশায় সচেষ্ট হই,—এটাই সে সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কোনও ধর্মশাস্ত্র হয়ত বলেন, ঈশ্বর যদি তোমার সত্যিকারের পিতা হ'ন, যদি তুমি সত্য সত্যই তাঁর অংশ হও, তবে তাঁর কাছে যা'তে তুমি যেতে পার, সেই চেষ্টা করাই তোমার উচিত। আর সেই চেষ্টা করা মানেই ধর্মকে মেনে চলা। কোন ধর্ম হয়ত স্বর্গ আছে প্রমাণ ক'রে সেই স্বর্গলাভের জন্য আমাদের ধর্ম-কার্যে প্রণোদিত করেন। ইন্দ্রিয়াতীত ও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য তত্ত্বের অবতারণা করলেও সব ধর্মই যে সব প্রাথমিক করণীয়ের নির্দেশ দেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ঈশ্বর, জীব, জগৎসৃষ্টি, মুক্তি—তত্ত্বের দিক দিয়ে এ সব বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু সব ধর্মই প্রবর্তক সাধককে বলবেন: সত্যকথা বল, সৎপথে চল, সাধ্যমত অপরের কল্যাণ কর, হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ চরম লক্ষ্যের স্বরূপ যাই হোক না কেন, তাকে লাভ করবার জন্য এই প্রাথমিক নীতিগুলির আবশ্যকতা সকল ধর্মই স্বীকার করেন। কেনোপনিষদ্ ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁকে চিন্তা করার উপায় প্রভৃতি সব বলার পরে বল্লেন—'তস্যৈ তপোদমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা'—

১ "বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম দেশগত, জাতিগত নহে; ইহা মনুষ্যকুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান কেহই এ ধর্মের বিরোধী নয়।" —'বৌদ্ধধর্ম', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬২

"যে দিন বিমল বোধিলাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে, সে দিন তোমার স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর কল্যাণ হইবে।"

'বুদ্ধের জীবনী ও বাণী,' শরৎকুমার রায়, পৃঃ ১১২ (৪র্থ সংস্করণ)

২ বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে পার্থক্য আছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং যা প্রচার করে গেছেন তাকেই বলছি বুদ্ধধর্ম এবং পরবর্তী কালে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য সংযোজনের ফলে বুদ্ধধর্ম যে রূপ লাভ ক'রেছে তাকেই বলছি বৌদ্ধধর্ম।

তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম, এ সব হল যেন ব্রহ্মের ভিত্তিভূমি—অর্থাৎ তাঁকে লাভ করবার অপরিহার্য করণ। এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রেও। সবধর্মের এই সাধারণ জিনিসগুলিই বুদ্ধধর্মের মূল উপাদান।

বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও কয়েক প্রকার শীলের বিধান দিলেন, সেও এই একই নীতিকথা—(১) তোমার দৃষ্টি সাধু কর (২) সংকল্প সাধু কর (৩) বাক্য সাধু কর (৪) ব্যবহার সাধু কর (৫) জীবিকার্জন সাধু কর (৬) সর্ব চেষ্টা সাধু কর (৭) চিন্তা সাধু কর (৮) সাধু ধ্যানে তোমার চিত্ত সমাহিত কর।

"নির্বাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বলিতেছেন—(১) তুমি যে পুণ্যলাভ করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর, (২) নব নব পুণ্যলাভের চেষ্টা কর, (৩) পূর্বের সঞ্চিত পাপ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর, (৪) নূতন পাপ তোমাকে আক্রমণ না করে তজ্জন্য সতর্ক হও।" বলিতেছেন, কিসে জীবকুলের দুঃখমোচন ও সুখবর্ধন হয়, তাহার চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখ। উচ্চনীচ, শত্রুমিত্র, সকলের রোগশোক পাপতাপ বিমুক্তির চিন্তা দ্বারা নিখিল বিশ্বের সহিত আপনার মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় কর। কামনা কর:

দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ বসন্তি অবিদূরে।
ভূতো বা সম্ভবেসী বা
সর্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা॥

"যাঁরা দৃষ্ট, যাঁরা অদৃষ্ট, যাঁরা নিকটে বাস করছেন কিংবা দূরে বাস করছেন, বর্তমানে যাঁরা আছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা হবেন তাঁদের সকলেই সুখী হউন।"

বুদ্ধদেব নীতিপ্রচার করেছেন সত্য, তবে নীতিতে মানুষকে প্রণোদিত করবার জন্য ব্রহ্ম, ভগবান্‌, আত্মা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অবতারণা মোটেই করেন নি। নীতির প্রয়োজন ও উপযোগিতা তিনি অন্য দিক থেকে দেখালেন। তিনি বল্লেন, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে না গিয়ে শুধু আমাদের এই জগতের জীবনটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, মানুষের জীবনটা দুঃখময়। বিলাস-ব্যসন, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে যে কোনও সুখ নেই, তা' তিনি বলেন নি, বলেছেন—এই সব সুখ নিতান্ত সাময়িক ব'লে, পরিণামে তারা উদ্বেগ ও অবসাদ আনে বলে, বিশেষতঃ কোন সুখই মানুষকে জন্মজরামৃত্যুর হাত থেকে চরম নিষ্কৃতি দিতে পারে না ব'লে চিন্তাশীলের কাছে জগতের তথাকথিত সুখদুঃখ সবই একাকার—সবই অতৃপ্তিদায়ক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত এই যে দুঃখ এর হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা সবাই চাই। আমাদের এই দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা একটা বাস্তব সত্য,—যা প্রমাণের জন্য কোন জটিল তত্ত্ব অবতারণার প্রয়োজন হয় না। প্রমাণ শুধু নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। মানব-জীবনের এই যে সর্বজনীন একটা চাহিদা, তা' মেটাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা মানুষমাত্রেরই রয়েছে। বুদ্ধদেব এই স্বাভাবিক চেষ্টাকে সংশোধিত করবার জন্য দিলেন নীতির বিধান :—অষ্টাংগিক মার্গ ও শীলবর্গ, যেন বল্লেন—সম্পদ্‌বিভব বাড়িয়ে, আত্মীয়-স্বজনের বেড়া দিয়ে প্রিয়তম অহংটাকে সর্বদা নিরাপদ রাখবার যে সহস্র প্রচেষ্টা আমরা করছি—আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করছে সে সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক। কারণ এরূপ কোন চেষ্টা দ্বারাই মানুষকে সম্পূর্ণ সুখী হতে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি; যাবে না। সম্পূর্ণ সুখী হওয়া যাবে—অথবা বুদ্ধদেবের ভাষায় (যেহেতু সুখদুঃখ একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ) দুঃখকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা যাবে একমাত্র উপায়ে—অষ্টাংগিক মার্গ ও শীলবর্গের অনুশীলনে। বাসনাই যত দুঃখের আকর—নীতির অনুশীলনে বাসনার বহ্নি যখন নির্বাপিত হ'বে, তখন যে দুঃখোত্তর অবস্থা বিরাজ করবে—তাই নির্বাণ—জীবনের

অভীষ্টতম লক্ষ্য, নিখিল বিশ্বে চরম সত্য যদি কিছু থাকে তাও এই নির্বাণ।

দার্শনিকেরা পরবর্তীকালে—এই আধুনিক কালেও—বহু বিচার, বহু গবেষণা করেছেন নির্বাণের স্বরূপ নিয়ে। অনেকেই এই বিষয়ে একমত যে, বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম মূলতঃ একই বস্তু। যে সত্যের অস্তিবাচক রূপ (Positive) হলো ব্রহ্ম, ঠিক সেই সত্যেরই নেতি-বাচক রূপ (Negative) হলো নির্বাণ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব'লে বেদান্ত তা'কে বলেন—শুধু সৎ, শুধু চিৎ, শুধু আনন্দ, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি জগতের লেশমাত্রও তা'তে নেই ব'লে বুদ্ধ তাকে বলেন শুধু নির্বাণ—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের শুধু নিঃশেষ বিলুপ্তি।

বুদ্ধদেব যে এ তত্ত্ব জানতেন না তা' নয়—ববং তিনি জেনেও তার প্রচার করেন নি, এরূপ মনে করবার সংগত কারণ আছে। কেন প্রচার করেন নি—সে আলোচনাও আজ অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ সে 'কেন'র মূলে পাওয়া যাবে এই বিশ্বদরদী, আপন-ভোলা মরমীর অফুরন্ত মানব-প্রেম, যে প্রেমের মূর্তবিগ্রহরূপে জন্মেছিলেন তিনি।

কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে বিশ্বের চরম সত্য-সৌধে উপনীত হবার জন্য বুদ্ধদেব দুঃখ-নিবৃত্তি-আকাঙ্ক্ষা-রূপ যে তোরণ দিয়ে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে আহ্বান করেছেন, তার উপযোগিতা সম্পর্কে দু'এক কথা আলোচনা করা অসমীচীন হবে না। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি, এই তিন উপাদান দিয়ে মানবমনের গঠন—পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিক একথা বলেন, মানুষের মধ্যে প্রকৃতি-ভেদে কারু কারু মধ্যে এই তিনের কোন একটা শক্তি প্রবল থাকে। সত্যলাভের ইচ্ছা কারুমধ্যে প্রবল, ইচ্ছা ও কর্মশক্তি কারুমধ্যে অদম্য, সুখদুঃখের অনুভবশক্তি কারু কারু মধ্যে অতিতীব্র। সাধারণতঃ দেখা যায়, জ্ঞানশক্তি ও অনুভবশক্তি এই দুয়ের কোন একটায় অথবা উভয়ের সম্যক্ বিকাশের দ্বারা মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানার্থী মানব এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যলাভের চেষ্টায় নিষ্ফল হ'য়ে নিত্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে প্রয়াসী হন। আর অনুভবপ্রবণ মানব চিরস্থায়ী আনন্দ, পরমকল্যাণ ও সুন্দরতমকে অনুভবের আকাঙ্ক্ষায় ধর্মপথের পথিক হন, কিন্তু সত্যের খাতিরে ধর্মকে চাওয়ার অধিকারী জগতে বিরল—অধিকাংশ মানুষই অনুভবের তাড়নায় অস্থির। বুদ্ধবাণীর আবেদন—বিশেষ করে মানুষের এই দুঃখ-অনুভব এড়াবার প্রবৃত্তির কাছে—যা অধিকাংশ মানুষের জীবনে একান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য বুদ্ধদেব যে কৌশল ক'রে এই প্রবৃত্তির কাছে আবেদন করেছিলেন তা' নয়। তিনি আপনার অন্তরে মানবগোষ্ঠীর নিদারুণ দুঃখের জ্বালা অনুভব করেছিলেন—তাই তাঁকে এ-পথ বেছে নিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত করেছিল। জগতের ইতিহাসে ইনিই বোধ হয় একমাত্র মহাপুরুষ, মহানির্বাণ পর্যন্ত যাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এমনকি নিজের সাধনতপস্যা পর্যন্ত সজ্ঞানে কেবল মানুষের দুঃখমোচনের ইচ্ছা দ্বারাই প্রণোদিত হ'য়েছে।

পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি তত্ত্বসম্বন্ধে বুদ্ধদেব উপলব্ধিমান্ পুরুষই ছিলেন, তবে এ সকল কথা তিনি তখনকার দিনে লোককল্যাণের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে প্রচার করেন নি। এ সমস্ত আছে কিনা প্রশ্ন করা হ'লে তিনি অনেক সময় নীরব থাকতেন—হাঁ, না কিছুই বলতেন না। যে সকল দুরূহ সত্য মানববুদ্ধির অগম্য, তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

এই নীরবতার, এই সত্যগোপনের কারণ বুদ্ধদেব নিজেই ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। তাঁর শিষ্য মালুঙ্ক্য-পুত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু হ'লে তিনি তাঁকে যে উপাখ্যানটি ব'লেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "বুদ্ধদেব কহিলেন—'একব্যক্তি বিষাক্তবাণে আহত

হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত—আগে আমাকে বল, কার বাণে আমি আহত হইয়াছি, যে বাণ মারিয়াছে সে লোকটা কে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র? তাহার নাম কি? নিবাস কোথায়? সে বাণই বা কি রকমের বাণ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে? ফলে দাঁড়াইত এই যে, কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই বাণাহত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে।

হে মালুঙ্খ্য পুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ। আমি তোমার আরোগ্যের উপযোগী ঔষধ বলিয়া দিয়াছি। **আমি যাহা প্রকাশ করি নাই তাহা অপ্রকাশিত থাকুক, যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক।' "**

মানুষের দুঃখ এত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই মানুষ যাতে সেই দুঃখ-মোচনে আগে অগ্রসর হয়, তাই ছিল বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা।

কিন্তু সত্যকে জানালে কি মানুষের নীতিপালনে কোন অসুবিধা হোত? অন্ততঃ তখনকার দিনে ঐরূপ হবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। বুদ্ধের সময়ে প্রাণহীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে দেশ ভরে গেছে। শাস্ত্রের মর্ম ফেলে খোসা নিয়ে মহোৎসব আরম্ভ হ'য়েছে। অথচ উৎসব-উদ্যোক্তৃগণ মনে করতেন যে, তাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশিত পথেই চলেছেন। বুদ্ধদেব যদি শাস্ত্রের অপর একটি ব্যাখ্যা বের ক'রেছেন ব'লে দাবী করতেন তবে এই নিয়ে শুধু বাদবিচারই বাড়ত বেশী; সত্যকারের ধর্মপ্রচার কতখানি হোত বলা শক্ত। তা' ছাড়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, আত্মা ভগবান ও পরলোকের দোহাই দিয়ে পুরোহিতকুল সাধারণ মানুষকে যে অশেষ লাঞ্ছনা দিতেন এবং নিজেরাও আত্মহিতে প্রবঞ্চিত হ'তেন তার নিদারুণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বুদ্ধদেবের ছিল। সাধারণ মানুষ বেদ কি, আত্মা কি কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বেদরূপ বিরাট একটা বোঝা তার ঘাড়ে চেপে তাকে চালাবে—তাকে এমন কল্যাণের দোহাই দেবে যার ফলে সে যে কি কল্যাণ তাই সে বুঝতেই পারবে না, রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধের জ্বালা তার বিন্দুমাত্র কমবে না!

এমনি ক্লিষ্ট, ব্যথিত, লাঞ্ছিত, গর্বিত—পুরোহিত-কুলের আভিজাত্য-দলিত মানবের সত্যিকারের দরদী ছিলেন ব'লেই বুদ্ধদেব বেদের একভাগকে—কর্মকাণ্ডের তথ্যকে—একেবারে অস্বীকার করলেন, আর জ্ঞানকাণ্ডের সম্বন্ধে নীরব রইলেন। ভাব যেন এই, ওতে সত্য থাকে থাকুক—তবে আপাততঃ তার প্রয়োজন নেই। যে সমাজের নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে তত্ত্বকথা শুনিয়ে লাভ নেই। আগে ভিত্তি সুদৃঢ় করা চাই। বুদ্ধ বললেন—'হে মানুষ, কোন পুরাণো কথা, কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যের ভাঁওতা দিয়ে তোমায় ভুলাব না, পরের কথায় বিশ্বাস করবে ব'লে তোমার বিচার-বুদ্ধিকে কিংকর সাজাব না। তোমাকে যা বলব তা তোমার নিজের চোখ দিয়ে দেখে নাও, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ কর। এর সুফলের জন্য পরলোকের দিকে তোমায় চেয়ে থাকতে হবে না, হাতে হাতে এর ফল প্রত্যক্ষ করতে পারবে।'

অতীন্দ্রিয় সত্যের কাছে না গিয়ে বুদ্ধ বললেন, 'তোমার আমার সকলের জীবনে যে সত্য অনুভূত হয়, তারই ধ্যান কর, তাকেই ভিত্তি ক'রে অগ্রসর হও। সে সত্য এই—(১) জীবনে দুঃখ আছে, (২) এই দুঃখের কারণ আছে, (৩) কারণ নাশের দ্বারা এই দুঃখ অতিক্রম করা যায়, (৪) দুঃখ অতিক্রমের পন্থা হোল অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা।'

এই সাধনায় অগ্রসর হবার জন্য বুদ্ধদেব মানুষের

আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করলেন। কোন দৈবশক্তি, কোন গুরু, কোন কৃপা মানুষকে সাহায্য করবে না—নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হবে। এই রকম করার সামর্থ্যও সকলের আছে—এই হলো বুদ্ধের মত।

সূক্ষ্ম বিচার করলে এই তত্ত্বগুলি আংশিক সত্য ব'লে প্রতীত হতেও পারে এবং উত্তরকালে সেরূপ হয়ে নানা কুফলের সৃষ্টি করেছিলো, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই জটিলতায় বুদ্ধিজীবীদের সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক, বুদ্ধদেব সাধারণের জন্য যে পথ তৈরী করেছেন, তা যে তাদের পক্ষে রাজপথ, তাতে সন্দেহ নেই। স্নেহশীলা মা যেমন সন্তানকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল কথা না জানিয়ে তাকে ঠিক তার প্রয়োজনমত দু'চার কথা জানিয়ে কল্যাণের পথে চালান, মানব-জাতির মাতৃরূপী বুদ্ধও যেন আমাদের সেভাবে কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর বাণীর পেছনে রয়েছে—তাঁর স্নেহপ্রেমে উদ্বেল একটি মাতৃ-হৃদয়—বাণীর চেয়ে যা আরও মধুর, আরও স্নিগ্ধ, আরও একান্ত আপন!

বোধিসত্ত্বের হস্তীজন্ম

শ্রীবনমালী জানা

বোধিসত্ত্বের হস্তী জনম অপরূপ অবদান
ঘুচে যাহে ভেদ স্বার্থের ক্লেদ মুক্তির সন্ধান।

অতি বলবান উন্নতদেহ যূথপতি সুন্দর
কাটে বহুকাল সাথে সাথীপাল নয়নমুগ্ধকর।

বিরাগের বশে ত্যজি সম্পদ ভ্রমণে চলেন একা
রুক্ষ বনানী আর মরু দূরে দিগ্‌বলয়ের রেখা।

ভ্রমণের ক্রমে আর্তের স্বরে কাঁদিল তাঁহার প্রাণ
নির্বাসনেতে পাঁচশত নর রাজরোষে চাহে ত্রাণ।

মরু-বেষ্টনে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল অশ্রু ঝরে
অসহায় সবে কাঁদিয়া শুধালো 'পথ কোথা?' করি-বরে।

শুণ্ড তুলিয়া কন্ গজরাজ, 'সমুখে উচ্চ গিরি
তারি সানুদেশে স্বচ্ছ শীতল ঘননীল হ্রদ ঘিরি।

শান্তি পাইয়া ক্ষণেক তথায় আগুসরি পথরেখা
তুঙ্গ গিরির সদ্য-পতিত মৃত করী পাবে দেখা।

আহারীয় রূপে মাংসে উহার মিলিবে নবীন বল
হস্তী-অন্ত্রে আধার রচিয়া লবে নীল হ্রদ জল।

পার হবে মরু বাঁচিবে জীবন দুখ হবে অবসান'
পথ নির্দেশি ত্বরা করিরাজ দৃষ্টির পারে যান।

দূর পাশ ফিরি গিরিশিরোপরি আরোহি প্রান্তে তায়
নীচু শিলাতলে আছড়ি আপনা পরহিতে দিলা কায়।

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের ঐতিহ্য

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

বর্তমান কালে কাপড়ের কল এদেশে বিস্তার লাভ করা সত্ত্বেও হাতে সুতাকাটা, বয়ন ও রঞ্জন হস্তশিল্পরূপে দেশে স্থিতি ও প্রসার লাভ করিতেছে। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য হাতে কাটা সুতায় বয়ন হইতেছে না। অনেক স্থানেই কলের সুতায় তাঁত চলিতেছে। গৃহশিল্পে, কুটিরশিল্পে, পল্লীশিল্পে তাঁত আপনাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। সর্বশেষ ধাপে দেশের বিদ্যালয়েও তাঁত ও সুতা-কাটার প্রবর্তন বাড়িতেছে। স্বদেশী আন্দোলন এই শিল্প প্রবর্তনের প্রেরণা আনিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এরূপ মনে করার যুক্তিসংগত কারণও আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অর্থাৎ প্রাক্-স্বাধীনতার আমলে চরকা জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু কার্পাস শিল্পের পুনর্জীবন-লাভের মূলে অন্য একটি গূঢ় কারণ রহিয়াছে। আসলে সূত্র কর্তন, বয়ন ও রঞ্জন ছিল এদেশের অতি প্রাচীন নিজস্ব শিল্প এবং সাধারণের সৃজনী শক্তির বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন-পূরণের একটি ব্যাপকক্ষেত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত বিপর্যয়ে এই শিল্পের চর্চা আট নয় দশক লোকজীবনে নিতান্ত সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল।

অতি প্রাচীন কালে এদেশে কার্পাস হইতে সুতা ও সেই সুতায় বস্ত্রবয়নপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশ হইতেই কার্পাসজাত শিল্পবিজ্ঞান ক্রমে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য দেশসমূহে বিস্তারলাভ করে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কার্পাস-শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কার্পাসী'। ভারতীয় কার্পাস-সভ্যতা দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করার সংগে সংগে ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও শব্দটি অপভ্রংশ হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে।

বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় কার্পাস ও কার্পাসশিল্প সম্বন্ধে প্রথম পরিচয় লাভ করে গ্রীকেরা। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ সালে ভারতীয় কার্পাসের নিম্নলিখিত বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষে একপ্রকার বন্য গাছের ফলের রেশ হইতে যে সুতা হয়, তাহা গুণে ও সৌন্দর্যে পশম (মেষজাত লোম) হইতেও উৎকৃষ্ট। ভারতীয়েরা ইহার সুতায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে।"* হেরদটাস কার্পাসের নাম উল্লেখ করেন নাই, একপ্রকার বন্যগাছ বলিয়াই কার্পাসের পরিচয় দিয়াছেন।

গ্রীকদের উপর কার্পাস-সভ্যতার প্রভাব

আরবেরা স্থলপথে ভারতবর্ষের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগস্থাপন করিয়াছিল। আরবদেশীয় ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় কার্পাসশিল্পের তথ্য খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচার করিয়াছিল।

ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী দেশসমূহে কার্পাস-শিল্পের প্রসার

* The wild trees in that country (India) bear for their fruit a fleece surpassing those of sheep in beauty and quality and the natives clothe themselves in cloth made therefrom. (Herodotus in 425 B. C.)

খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৯ অব্দে রচিত এক গ্রীকনাট্যে 'কারবাসিনা' (carbasina) শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের রূপান্তর মাত্র। সেই সময়কার গ্রীকসাহিত্যে কার্বাসা অর্থাৎ কার্পাসজাত সূতা, আর 'কারবাসাম,' অর্থাৎ তুলার রেশ, এই দুইটি শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ অব্দে কার্বাসামের তাঁবুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রীকসাহিত্যে কার্পাসের অপভ্রংশ 'কারবাসিনা' শব্দের প্রয়োগ

কার্পাস ও কার্পাস-শিল্পের আদি দেশ যে ভারতবর্ষ গ্রীকেরা তাহা ভাল করিয়াই জানিত। কিন্তু দক্ষ আরব-বণিকদের কল্যাণে কার্পাসশিল্প-সম্বন্ধে জ্ঞান ইউরোপীয় দেশসমূহে বিস্তার লাভ করে।

'কটন' শব্দের উৎপত্তি

মধ্যযুগে স্পেন দেশে কার্পাসশিল্প প্রচারের গৌরব মূরদের প্রাপ্য। আধুনিক 'কটন' শব্দের ব্যুৎপত্তিস্থল আরবী শব্দ 'কটুন' (Kotn)। ইহা মধ্যযুগীয় ল্যাটিন 'কটনাম' (cotonum) শব্দের অপভ্রংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইটালীয় বণিকদের হিসাবের খাতায় 'কটনাম' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে 'কটনাম' শব্দ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অপভ্রংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে—যেমন ইংরাজীতে cotton, ইতালী ভাষায় coton, ফরাসী ভাষায় coton (কঁতো), জার্মান ভাষায় Kattum, রুশ ভাষায় Kotnja, রুমানিয়ান ভাষায় Kutnic ইত্যাদি।

প্রাচীন সংস্কৃত 'কার্পাসী' শব্দের অর্থ কার্পাস তুলার গাছ। বাংলা ও রাষ্ট্রভাষায় কার্পাসকে কাপাসও বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীন ইতিহাসে কার্পাসসূতার বস্ত্র ও পরিধেয়

কার্পাস ভিন্ন অন্য রেশজ বস্ত্রাদি,—যথা সিল্ক, পশম বস্ত্রাদিও ব্যবহৃত হইত; কিন্তু কার্পাস-সূতায় তৈরী বস্ত্র আজ যেমন তেমনি অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও এদেশবাসীর দেহাভরণের কাজ করিত।

ভারত-অভিযানকারী আলেকজেণ্ডারের সেনাপতি নেয়ারচস খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এদেশ-বাসীর পোষাকপরিচ্ছদের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীরা কার্পাস-সূতায় কাপড় বুনে, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জামা পরিধান করে, ভাঁজ করা কাপড়ের টুকরা (চাদর) গলায় জড়ায়, এবং মাথায় পাগড়ী পরিধান করে।" [১] গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এদেশে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শিরূপে এ দেশবাসীর পোষাকের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন—"ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী সরল বটে, কিন্তু তাহারা সূক্ষ্ম ও সুরুচিসম্পন্ন বস্ত্র ও অলংকারাদি ভালবাসে। তাহাদের পোষাকে জরির কাজ থাকে, বহুমূল্য পাথরও ব্যবহৃত হয়; সূক্ষ্মতম মসলিনের রঙীন পোষাকও তাহারা পরিধান করিয়া থাকে।" [২]

নেয়ারচসের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, সে সময় হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানেও

১ The native made linen (cotton) garments, wearing a shirt which reached to the middle of the leg, a sheet folded over the shoulders and a turban round the head—Nearchos in 300 B. C.

২ In contrast to the general simplicity of their lives, the Indians love finery and ornament. Their robes are worked in gold and ornamented with precious stones and they wear also flowered garments made of the finest muslins.

ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের মৌলিক পরিবর্তন সামান্যই ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনায় আমাদের পুরুষদের পোষাকই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অজন্তার গুহাচিত্রেও দেখা যায় প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের পোষাকের মৌলিক ধারা আজও অপ্রতিহত। প্রাচীনকালে পুরুষেরা পরনে ধুতি, গায়ে ঢিলা জামা অর্থাৎ পাঞ্জাবী ও গলায় চাদর পরিত, মাথায় পাগড়ী শোভা পাইত; পুরুষের অনুরূপ দেহাচ্ছাদন আজও প্রচলিত। প্রাচীনকালে মেয়েরা শাড়ী পরিত, আজও তাহারা পরিয়া থাকে। গোশকটের ন্যায় এতদ্দেশীয় পোষাকের ধারাও অতি প্রাচীন। বিজাতীয় শাসকদের প্রভাবও দেশীপ্রথা লুপ্ত করিতে পারে নাই।

গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে ধুতি, চাদর ও শাড়ীর ব্যবহার কত আরামদায়ক তাহা বুঝিতে অনুমানের সাহায্য লইতে হয় না। আমাদের বস্ত্রাদিতে, বিশেষ করিয়া ধুতি চাদর ও শাড়ীতে কাটা ছাঁটা—এক কথায় সেলাইয়ের কাজ একেবারেই নাই। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ভারতীয় পরিচ্ছদ-প্রণালী দর্জীর কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সত্য বটে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ইদানীং আমাদের পোষাকে দর্জীর কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের মাতারাও ব্লাউস, গাউন বিশেষ পরিতেন না। বিগত দুই দশক মধ্যে ইহাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দর্জীর কাজ বৃদ্ধির সংগে আমাদের দেহাভরণের সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা রুচির কথা এবং সেক্ষেত্রে কোন মতামত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থানকালে অবস্থাপন্ন লোকদের সংগেই বেশী মেলামেশা করিয়াছিলেন,—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ এ দেশের সর্বসাধারণ হয়তো বা বহুমূল্য মসলিন কাপড় পরিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সূক্ষ্ম মসলিন, কাপড় রংগাইবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, কাপড়ে সূক্ষ্মতম জরীর কাজ তখন এদেশে প্রচলিত ছিল। আজকাল দেশের স্থানে স্থানে (যেমন বেনারসী শাড়ীতে ও কাশ্মীরী শালে) সোনা-রূপার সূত্রে যে জরির কাজ হয়, তাহা প্রাচীন প্রথারই ধারা,—উত্তরাধিকারীসূত্রে চলিয়া আসিয়াছে।

বিদেশী সাহিত্যে ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্ররঞ্জন

সূতা ও কাপড় রঙাইবার প্রথাসম্বন্ধে মেগাস্থিনিসেরও পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরদটাস খ্রীষ্ট পূর্ব-৪৫০ অব্দে লিখিয়াছেন—"তাহাদের দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) এমন একপ্রকার গাছ জন্মে, যার পাতার গুণ অদ্ভুত। সেই পাতাকে গুঁড়া করিয়া জলে মিশাইলে রং প্রস্তুত হয়; পোষাকের উপর সেই রঙের ছবি আঁকা যায়। এই রং এত পাকা যে ধুইলেও মুছিয়া যায় না, মনে হয় যেন বুনার সংগে এক হইয়া আছে। কাপড় যতদিন টেকে, রংও ততদিন অটুট থাকে।"[১] গ্রীক ঐতিহাসিক যে নীলের গাছসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষে কাপড় রঙাইবার জন্য নীলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

টেসিয়াস নামক জনৈক গ্রীক বৈদ্য খ্রীষ্ট পূর্ব-৪০০ অব্দে ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন-সম্পর্কে আর এক বর্ণনা

১ They have trees whose leaves possess a most singular property. They beat them into powder and then steep them into water. This forms a dye with which they paint figures of animals on a garment. The impression is so strong that it cannot be washed out and it appears to be interwoven in the cloth and wears as long as the garment.

রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, ভারতে তৈরী অপূর্ব রংগীন বস্ত্রাদি পারস্য দেশের সৌখীন রমণীগণ বিশেষ পছন্দ ও সমাদর করিতেন।[১]

সূতা ও কাপড় রংগাইবার বিভিন্ন প্রণালী এদেশে সে যুগেই দৃঢভাবে স্থিতিলাভ করিয়াছিল, এরূপ মনে করা মোটেই অসংগত নয়। ইহার অর্থ এই যে আরও প্রাচীন কাল হইতে বস্ত্ররঞ্জনের চর্চা এদেশে হইতেছিল। সেই সময় সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে হইলে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি খ্রীষ্টপূর্ব-৭০ অব্দে ইজিপ্টের রঞ্জনপ্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন; সেই বর্ণনার সংগে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী যেসুইট কর্তৃক ভারতীয় কাপড় রঞ্জনপ্রণালীর অপরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।[২]

ভারতীয় প্রাচীন বস্ত্রশিল্প-সম্পর্কে বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে কার্পাস বস্ত্রশিল্পের অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সংগে ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত যোগাযোগ কমপক্ষে আলেকজেণ্ডারের সময় হইতেই সূচিত হইয়াছিল। আরব বণিকেরাই প্রধানতঃ স্থলপথে আন্তর্জাতিক এই ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করে। আরব বণিকেরা ইউরোপীয় পশম বস্ত্রাদি, প্রাণ, প্রবাল, মদ, ইত্যাদি ভারতের বাজারে আমদানী করিত, আর এই দেশ হইতে সিল্ক, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, মূল্যবান মণিমুক্তা, গুড়্চ্যাদি গন্ধ-দ্রব্য, আইভরি ইউরোপের বাজারে লইয়া যাইত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মার্কোপলো ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে করমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি মসলীপট্টমের রঙ্গীন ছাপের কাপড় ও অতুলনীয় মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।[৩]

মোট কথা, ভারতীয় বস্ত্ররঞ্জন তখনকার বিদেশীদিগকে মোহিত করিয়াছিল। প্রাচীন কালেই অন্ততঃ চারিপ্রকার কাপড় রংগাইবার প্রণালী এদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই চারিপ্রকার রঞ্জনের কাজের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে :—

(১) কাপড়ের উপর ছাপ করা ডিজাইন (২) হাতে আঁকা ডিজাইনের কাজ (৩) বাটিকের কাজ ও (৪) রাসায়নিক রংগের কাজ।

(ক) ছাপের কাজ :—কাঠের ব্লকে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন কাটিয়া ইহা দ্বারা কাপড়ের উপর রংয়ের ছাপ দেওয়া হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। শুধু যে কাঠের ব্লকে খুদিয়াই ডিজাইন কাটা হইত এমন নয়, কাঠের গায়ে রিবণ বসাইয়াও ডিজাইন করা হইত। ছাপের ব্লকের গায়ে তুলি বা তুলার দ্বারা রং লাগানো হইত।

১ The Greek physician Ktesias in 400 B. C. mentions the flowered cottons emblazened with glowing colours much coveted by the fair Persian women and exported from India.

(Crowford : Heritage of Cotton)

২ The art of resist dying spread among all the people, who came in contact directly or indirectly with Indian influence, and there is still a reminiscence of this among the peasants of Europe. These facts seem to establish India as the home, not only of cotton, but of certain processes of dyeing and printing cotton.

৩ Marco Polo (1256-1326), the famous Venetian traveller and explorer, who made journeys through China, India and other Eastern countries and published the record of his various wanderngs.........(Pear's Cyclopaedia)

(খ) বাটিক :—বাটিকও অতি প্রাচীন বস্ত্রশিল্পকলা, গলানো মোম অথবা কাদা দ্বারা কাপড়ের উপরের ডিজাইন চিত্রিত করা হইত ; পরে কাপড় রঙে ভিজান হইত ; মোম বা কাদার স্থানে রং লাগিত না। এই ভাবে মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। জাভাতে বাটিক প্রবর্তিত হইয়া ছিল। একই প্রথার অনুসরণে একটু ভিন্ন প্রণালীর বাটিকও প্রচলিত ছিল, তাহাকে গিঁট প্রথা (tie dyeing) বলা যাইতে পারে। এই প্রথায় মনোরম ডিজাইনের কাজ হইত। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথা সহজ মনে হইলেও এই কাজে বিশেষ দক্ষ হস্তের প্রয়োজন হইত। এই প্রথা প্রাচীন কালেই তিব্বত, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ও পশ্চিমে বলকান অতিক্রম করিয়া মধ্য ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

রাসায়নিক বস্ত্ররঞ্জনসম্বন্ধে বলা যায় যে, ডিজাইন-সম্বলিত ষ্ট্যাম্প অথবা তুলি দিয়া বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ কাপড়ের গায়ে লাগাইয়া পরে কাপড় রংবিশেষে ভিজান হইত। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণে একই রং বিভিন্ন রঙে ফুটিয়া উঠিত। এই প্রথায় রং করিতে অবশ্য রসায়ন-সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হইত ; সেজন্য হয়ত ইহা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইত না। ক্যালিকো প্রিন্টিং এর ইতিহাসে রাসায়নিক প্রথা প্রাচীন, যদিও কার্য-কারণের সমাবেশে ইহার ক্ষেত্র পরে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। প্রাচীন বস্ত্রাদি সংরক্ষণের পক্ষে এদেশের জলবায়ু অনুকূল নহে। সে জন্য কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কালের বস্ত্রাদির নিদর্শন সামান্যই রক্ষিত হইয়াছে। ইজিপ্টের পিরামিডে সহস্রাধিক বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় মসলিন পাওয়া গিয়াছে। গোবি মরুভূমিতে প্রাচীন ছাপের রঙীন বস্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কালের বস্ত্রকলার অভূতপূর্ব উন্নতির নিদর্শন প্রাচীন চিত্রকলা দেখিলে বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অজন্তাগুহার ফ্রেস্কোর উল্লেখ করা যাইতে পারে। তখনকার প্রচলিত বস্ত্রাদি ও পোষাকের ব্যবহারই সেখানে চিত্রিত হইয়াছে। এদেশে মুসলমান-অভিযানের পূর্বে বস্ত্রশিল্পকলা বিশেষ উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছিল। মুসলমান রাজা-বাদশাদের আমলে সৌখীন নবাবেরা শিল্পানুরাগী ছিলেন ; নিছক শিল্পকলার দিক দিয়া বিচার করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমান রাজাদের আমলেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকলা নূতন ভাবধারায় পুষ্ট হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরিত্যক্ত অম্বর শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে কতকগুলি মনোরম প্রাচীন কার্পাসবস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে ; সেগুলি এখন যত্নসহকারে আমেরিকার ব্রুকলিন শহরের মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের অধিকাংশই চিত্রিত এবং দেওয়ালের বস্ত্রাভরণ।

মনুসংহিতা-রচনার কালে বস্ত্রশিল্প

হিন্দু আইন ও অনুশাসন-প্রণেতা মনুর সময়ে এদেশে বস্ত্রশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; ইহার বহু প্রমাণ মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০-৭০০ অব্দে মনুসংহিতা রচিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে মনুসংহিতা আরও প্রাচীন গ্রন্থ। সে যাহা হোক, মনুসংহিতা যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পরিধেয় বস্ত্র সংক্রান্ত বহু অনুশাসন মনুসংহিতায় আছে। তাঁতিদের সম্বন্ধে মনু লিখিয়াছেন—

"তন্তুবায় বস্ত্রবয়নপণ্য দশপলপরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে পিষ্টভক্তাদির অনুপ্রবেশ-হেতু একাদশ পল পরিমিত বস্ত্র ফিরাইয়া দিবে।"*

* "তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" (অষ্টম অধ্যায়ঃ, শ্লোক ৩৯৭)

পিষ্টভক্তাদি বলিতে 'মাড়' বা মাড়জাতীয় জিনিস বুঝায়। এ দেশের তাঁতিরা আজ যেমন টানার সূতায় মাড় দেয়, মনুর যুগেও সেই রীতিই বিদ্যমান ছিল। বরং উল্‌টাইয়া একথা বলা সংগত যে, মনুর যুগের প্রচলিত প্রথা আজিও বিদ্যমান। যাঁহারা আপন হস্তে সূতা কাটিয়া তাঁতিদ্বারা কাপড় বুনাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বয়নকালে হাতে কাটা সূতার শক্তির অসমতা হেতু অল্পবিস্তর অপচয় ঘটিয়া থাকে। এই অপচয় হয় না, যদি সূতা উত্তমগুণবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে হাতে সূতাকাটার কৌশল, জ্ঞান ও দক্ষতা কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছিল। মনুর উক্ত বচন হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কার্পাসশিল্প তখন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গৃহস্থেরা অবসরমত সূতা কাটিত আর তাঁতি কাপড় বুনিত। কর্মের এই জাতিগত শ্রেণীবিভাগ এদেশে এখনও চলিয়া আসিতেছে। মনুর অনুশাসন হইতে আরও অনুমান করা যায় যে, একশ্রেণীর লোক বস্ত্রব্যবসায়ী ছিল। তাহারা গৃহস্থদের কাটা সূতা সংগ্রহ করিয়া তাঁতিদ্বারা বস্ত্র বুনাইয়া বস্ত্রের ব্যবসা করিত। কিন্তু সকল প্রকার বস্ত্রের ব্যবসা চলিত না। এ সম্বন্ধে মনুর অনুশাসন এই যে,—"কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রবিনির্মিত বস্ত্র,—রক্তবর্ণ না হইলেও শণ ও অতসী তন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম-বিনির্মিত কম্বলাদি বিক্রয় নিষেধ।"[১] বিভিন্ন তন্তুজাত বস্ত্রাদির পরিষ্করণ-পদ্ধতি সম্বন্ধেও মনুর নির্দেশ আছে। যথা:—"কৌষেয় ও আবিক বস্ত্রাদি ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কুতপ বস্ত্র অরিষ্ট অর্থাৎ রিঠাফলচূর্ণ দ্বারা, অংশুপট্ট—বিল্বফলের নির্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেত সর্ষপ চূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়।"[২]

বস্ত্রনির্মাণে কোন্ কোন্ তন্তু সেই যুগে ব্যবহৃত হইত, তাহা উপরি-উক্ত শ্লোক দুইটি হইতে জানা যায়। যথা:—কার্পাসবস্ত্র, শণবস্ত্র, অতসীতন্তুময় বস্ত্র, মেষলোমজাত কম্বল, কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী বা সিল্কের বস্ত্র, অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কলবিশেষের বস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র।

জন্তুর লোম অর্থাৎ পশমজাতীয় গরম কাপড়ও বিভিন্ন প্রকারের বর্তমান ছিল। আবিক শব্দের অর্থ মেষলোমজাত কম্বলাদি বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। 'কুতপ' নেপালদেশীয় কম্বল। ক্ষৌমবস্ত্র বলিতে তিসির (শণ?) তন্তুদ্বারা তৈরি বস্ত্র বুঝায়। বল্কলবিশেষের বস্ত্রকে অংশুপট্ট বলা হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের বস্ত্র ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বস্ত্র আজও তৈরি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ গাছের বল্কল যে পরিধানোপযোগী করার প্রথা এদেশে বর্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ধা শহরের সর্বভারতীয় পল্লীশিল্পাগারে (All India Village Industry Museum, Wardha) জাভায় তৈরি একটি বল্কলবস্ত্রের নমুনা রক্ষিত আছে।[৩]

জাভা ও সুদূর পূর্বদেশসমূহে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব বহুকাল পূর্বেই বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণাদি ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও বল্কলবস্ত্রের উল্লেখ আছে।

১ "সর্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধীঃ॥"
(মনুসংহিতা: দশম অধ্যায়, ৮৭ শ্লোক)

২ "কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥"
(মনুসংহিতা: পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক)

৩ ইহা কোন জাভাবাসী মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়াছিল, তিনি তাহা শিল্পাগারে দান করিয়াছিলেন।

মুনি-ঋষিরা বল্কলবস্ত্র পরিধান করিতেন। বল্কলবস্ত্রের অস্তিত্ব কাল্পনিক নহে; অসভ্য আদিম মানুষের দেহাভরণ ভিন্নও জ্ঞানী, গুণী, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোনকালে বল্কল পরিধান করিতেন। এমন হইতে পারে তন্তু দ্বারা বস্ত্র তৈরির প্রথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বল্কলবস্ত্রই প্রচলিত ছিল এবং তন্তুজ বস্ত্রাদি আবিষ্কারের পরেও বল্কলবস্ত্রের ব্যবহার বর্তমান ছিল। অন্ততঃ প্রাচীন সাহিত্য তাহাই নির্দেশ করে। জাভায় তৈরি যে বল্কলবস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শিল্প ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহা একটি মনোরম বস্তু।

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী 'জাপানভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৪) বল্কল-বস্ত্রের যে সন্ধান দিয়াছেন তাহা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। —"সিংগাপুরের র‍্যাফেলস মিউজিয়মে সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত কাপড় ও গহনার চটক সহজেই চোখে পড়ে।" অন্য এক জায়গায়—"গাছের বাকলের পোষাকও অনেক রকমের আছে। এসব অন্য দেশে বড় দেখিনি। ······যারা নানা দেশের বিশেষতঃ প্রাচ্যের পোষাক সম্বন্ধে ভাল করে জানতে চান সিংগাপুর মিউজিয়মের পোষাকগুলি তাদের নিশ্চয়ই দেখা উচিত।"

ভিন্ন ভিন্ন রেশের তন্তু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদি পরিষ্কারপ্রকরণ খ্রীষ্টজন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসীরা আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাও মনুর অনুশাসন হইতে জানা যায়।—"অনেক বস্ত্র অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প বস্ত্র-স্থলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধিসম্পাদন করিতে হয়।"[১] যে সকল হিন্দুপরিবারে প্রাচীন শৌচাশৌচভেদ এখনও চিরাচরিত প্রথায় বর্তমান, তাঁহারা উক্ত অনুশাসনের অর্থ সহজেই গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাভারত[২] প্রভৃতি গ্রন্থেও বস্ত্রসম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। প্রধান কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে এ দেশে বস্ত্রশিল্প বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনে দেহাভরণের জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর রুচি, কল্পনা ও সৃজনী শক্তির বিকাশের অংগরূপে ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির একটি বিশেষ আধারে পরিণত হইয়াছিল; সেই আধার এদেশবাসীর বস্ত্রস্বাধীনতাকে স্থায়ী রূপ দান করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর এই প্রথা পরিবর্তনশীল কালের প্রগতি উপেক্ষা করিয়া প্রয়োজনপূরণের সংগে এদেশবাসীর সুরুচি ও শিল্প-জ্ঞানকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর পথে চালনা করিয়াছিল। ভারতবাসীর অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ও নৈপুণ্য সর্বসাধারণের করায়ত্ত ছিল, বলাই বাহুল্য। ইহা কি উপায়ে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। তাছাড়া গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদেরও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিস্ময়ের কারণ ছিল। প্রশ্ন এই, ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত এই অপরূপ শিল্পসাধনা ও বস্ত্রস্বাতন্ত্র্যের দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস হইতেই পাইতে হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

১ "অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্তবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥"
(মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক)

২ "যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখীরা বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভীষ্মদ্রোণাদিকে জয় করে আমাদের পুত্তলিকার জন্য বিচিত্র সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্র এনো।" (মহাভারত, বিরাটপর্ব—রাজশেখর বসু)

অতৃপ্তি

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

আমারি নিভৃত চিতে
রহিছ তা জানি'
পেয়েও পাইনি যেন
সেই প্রীতিখানি।
পূর্ণ করিয়াছ যদি
আমার ভুবন,
অভাব মেটে না কভু
চাহি যতক্ষণ।

নাহিক তোমার শেষ
তাও বুঝি মনে;
তবু কেন খুঁজি দেব
নিশীথস্বপনে ?
অক্ষয় ভাণ্ডার তব—
তুমি কল্পতরু,
তবু তো নিরাশ হই—
হে জীবনগুরু।

সুখ কি এবং কোথায় ?

(এক)

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী

সবাই চায় শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি, কিন্তু অনেকেই তা চায় বিপথে। যাঁরা সে পথে চলেছেন, জেনে তার সন্ধান দিয়েছেন, তাঁদের অবজ্ঞা করে, না মেনে? তাই বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরান এবং সাধু-মহাপুরুষদের বাণীর সন্দেহাত্মক চর্চায় হীরা ফেলে কাচের জলুসে প্রলুব্ধ হয় তারা। ফলে যা চায় বলে, তা পায় না।

জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ কেন এই সন্দেহাত্মক বৃত্তিতে এত সব থাকতেও গুটিপোকার মতো বদ্ধতা ও আত্মসঙ্কোচনকেই জীবনসর্বস্ব করবে? কথা সেইটাই। যাতে আছি তাতে যদি শান্তি না পাই, তৃপ্ত না হই, তবে যা নই, তাই হবার সাধনা চাই। এখন যে কোন অনুপ্রেরণার মূলেই আছে কল্পনা, যা সর্বাগ্রে ধরে নিতে হয়। তাই সৃষ্টির প্রারম্ভেই দেখি, শিক্ষার গোড়াপত্তনই হয় অপরের দেখে শুনে,—আর তা পাকতে থাকে বয়সের আধিক্যে। নিজেকে এই দৃঢ় করাকেই বলে নীতি।

তাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন। যেখানে যা যত ভাল, তার সঞ্চয়ে প্রাণকে ভরে রাখাই হবে ভাল হবার বা পাবার প্রথম সাধনা। অবিরাম গেলাম-গেলাম, দুঃখের নাকে-কান্না, অপরের দোষত্রুটি দেখা, সন্দেহাত্মক ভেদবুদ্ধি আর প্রকৃতির দিন-মজুরী-করা পশু-জীবনের খাওয়া-পরার চাহিদায় নিজেকে বিকিয়ে দিলে কোথা হতে আসবে তার শান্তি-সুখ-সমৃদ্ধি? যার যা পথ, তাকে সেই পথেই চলতে হবে লক্ষ্য বস্তু পেতে হলে,—সংযম ও নিবৃত্তিতে মনের বিক্ষেপনাশই যার প্রধান কেন্দ্র (Power House); কারণ 'রোমান্স' চিত্তকে করে মোহ-গ্রস্ত,—তার ফলই দুঃখ।

যতই নীচে নামি ততই বিভেদ দেখি, কিন্তু বিমানে যতই উপরে উঠি, ততই সাম্য দৃষ্ট হয়। আর প্রকৃত দৃষ্টি বা জ্ঞান আমাদের বাহিরের নয় ভিতরের, কারণ সে-ই বস্তুকে রূপায়িত দেখে সত্যে। আর আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুকে স্থূল চোখে দেখাতেও যে অনেক সময় ভুল দেখা হয়, সেটা বুঝতে হবে। গাড়ীতে যেতে বাহিরের গাছপালাকে ছুটে যেতে দেখা, সূর্যকে পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যে দেখার ভুল, এ আসল জ্ঞান যেন না হারাই কখনও।

কেউ বলেন, সামান্য খাওয়া-পরার সমাধানই যাদের হয় না, তাদের এ চিন্তার সময় কোথা ? তাহলে ব'লব, বেঁচে থাকার প্রশ্ন এটা আদৌ নয়। কেন এ জীবন ? কি তার সার্থকতা ? একটা অনেকদিনের শুকনো গাছের কাছে দু'এক দিনের রঙীন প্রজাপতি কি কিছু কম সার্থক ? শুধু এইটুকুই চাই যে, সেইটুকুই যেন ব্যর্থতায় না কাটে। তাই মানুষের বাঁচা জন্তুর মত খাওয়াপরার কাড়াকাড়িতে নয়, ত্যাগের প্রয়োজনে মরেও।

আসলে মনকে ভরে রাখতে হবে সারা-ক্ষণের জন্যে এক বিরাট, অব্যক্ত, অসীম ও আনন্দময় পরিপূর্ণসত্তায়, চাইতে হবে ভূমাকে, যা অল্পে লভ্য নয়। সংযম ও নিবৃত্তির সুদৃঢ় বেড়ায় এই চাহিদার বীজকে বাড়িয়ে তুলতে হবে সর্বাগ্রে, তবেই তার শান্তির সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আর যা কিছু সবই পাওয়া সম্ভব হবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

(দুই)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্‌-এ, বি-এস্‌সি, এল্‌এল্‌-বি

সুখে দুঃখে ভরা এই পৃথিবী। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন—এই পৃথিবী শুধু দুঃখ-বিষাদে ভরপুর—এখানে সুখের লেশমাত্র নাই। আবার কেহ কেহ বলেন—পৃথিবীতে সুখও আছে, দুঃখও আছে। এই শেষোক্ত মতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। মানুষ সুখদুঃখ উভয়ই ভোগ করে। উহারা যেন একবৃন্তে দুইটি ফুল।

এখন প্রশ্ন, সুখ কিরূপে লাভ করা যায় ? সুখলাভের জন্য মানুষকে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। বস্তুতঃ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনই সুখ। অকর্মা নিষ্কর্মা ব্যক্তি কোনও দিন সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে—বিরুদ্ধ পক্ষে আপন আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া মহাবীর পার্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। গাণ্ডীব তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে—হে পার্থ, ক্লীবতা ত্যাগ কর। এরূপ কার্য তোমার পক্ষে শোভন নয়। কর্তব্য-সম্পাদন কর। কর্তব্য-সম্পাদনই তোমার ধর্ম।

কিন্তু কর্তব্য-সম্পাদনের পূর্বে কর্তব্যসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অজ্ঞানে কাজ করিলে সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভের সম্ভাবনাই খুব বেশী। অতএব সর্বপ্রথমে জ্ঞান অর্জন করা দরকার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ছাতা লইয়াই বাহির হইবে। তাহার বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে অজ্ঞান সে হয়ত বিনা ছাতাতেই বাহির হইয়া পড়িবে ও অচিরেই জলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কষ্ট পাইবে।

যদি রোগীর শিয়রে একটি ঔষধের ও আর একটি এসিডের শিশি থাকে এবং সেবক যদি কোন্‌টি ঔষধের শিশি তাহা না জানে, তবে সে তো রোগীকে ঔষধের পরিবর্তে এসিডও খাওয়াইতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর রোগ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার রোগ উত্তরোত্তর বাড়িবে —এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও ঘটিতে পারে। কাজ করা হইল ঠিকই। কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য এই দুঃখভোগ।

প্রাচীন কালে মানুষের যখন কোনও জ্ঞান ছিল না, তখন সে পাহাড়ে পর্বতে মাঠে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। শীত রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি হইতে নিজকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিল—ঝড়বৃষ্টির আর ভয় রহিল না, মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। এখনও যাহারা অসভ্য—যাহারা জ্ঞানের আলোক হইতে এখনও বঞ্চিত, অজ্ঞান-তিমিরে এখনও যাহারা আচ্ছন্ন, সেই সব মানুষ আজও সুখলাভে অসমর্থ। প্রতিনিয়ত কত দুঃখকষ্টে যে তাহাদের কালাতিপাত করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

জ্ঞানলাভের পর আমাদিগকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। জমি যদি যথাসময়ে যথা-নিয়মে কর্ষিত না হয়, তাহা হইলে ভাল ফসল হয় না। সেইরূপ যথারীতি কর্তব্য সম্পাদিত না হইলে সুখলাভ অসম্ভব। সমাজে প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি সমাজের প্রত্যেকে আপন কাজ করিয়া যায়, তবে আমাদের সমাজ অতি সুন্দর হইতে পারে।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—Ye are the salt of the earth.—তোমরা পৃথিবীর লবণ। লবণের তিনটি গুণ আছে। লবণ খাদ্যকে সুস্বাদু করে, উহাকে পচিতে দেয় না, উহার সমস্ত ক্লেদ দূর করে। সেইরূপ আমাদেরও তিনটি কাজ আছে। সমাজের ক্লেদ দূর করিতে হইবে। সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। উহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। এইরূপে যদি আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাই, তবে দুঃখ কোনও দিন আমাদের নিকট আসিতে পারিবে না। সুখলাভ তখন হইবেই।

সমালোচনা

নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম—স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড কোং, ৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ আনা।

প্রসরণশীলতাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্ম। নানা ভাবে নানাজনের মাধ্যমে উহা সুপ্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি এই বিস্তারধর্মকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে স্বামী শঙ্করানন্দ (বিশ্বভারতী) আধুনিক যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিশ্বজনীনতা সংক্ষিপ্ত-ইতিহাসাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল আদর্শ ব্যক্তি ও ধর্মপ্রাণ পুরুষের দৌত্যে বিশ্বময় ভারতের ধর্ম ও মর্মবাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মোহনদাস, করমচাঁদ গান্ধী, স্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অপর কয়েকজন সন্ন্যাসীর মহান প্রয়াসের বৃত্তান্ত বইটিতে মনোজ্ঞরূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রবাসী ভারতীয়দের একটা মোটামুটি হিসাব এবং বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র-সমূহের নামধাম, পরিচালনা ও কর্মসূচীর বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Vivekananda—By Devaprasad Goswami, M. A. 14, Deshapriya park East, Calcutta-29, Price —/12/- only.

'হিন্দুস্থানের দ্বাদশ পুরুষ'—এই শিরোনামায় গ্রন্থাবলীর অন্যতম গ্রন্থরূপে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্মধারার বিবরণ। স্বামীজীর বিরাট জীবনের অতি সামান্য পরিচয়ই অর্ধশত

পৃষ্ঠার মধ্যে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে, তবু গ্রন্থকার এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেও কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। মূল বক্তব্যের ধারা রক্ষা করিয়া রচনাটি গতিশীল করার প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশেষরূপে গ্রন্থাগার-গুলিতে ও ইংরেজীজানা কিশোরদের নিকট বইটিব সমাদর হইবে আশা করি।

ভিখারিণী রাজকন্যা :—শ্রীদিলীপকুমার রায়-প্রণীত, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যাণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ১৬৪ ; মূল্য আড়াই টাকা।

মেবারের মহারানী মীরাবাই—যিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়া ভিখারিণীব বেশ ধারণ করিয়া-ছিলেন—তাঁহারই জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। নাট্যকাবের লিপিকুশলতা সুপরিজ্ঞাত, তদুপরি তিনি নিজে একজন সাধকরূপে পরিচিত। সুতবাং ভক্তিমতী মীবাবাই-এব জীবনেতিহাসেব নাট্যরূপ তাঁহার লেখনীতে সার্থক হওয়াই স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও। কিন্তু জীবন 'ইতিহাস' কথাটি এস্থলে ভিন্ন অর্থে আমরা ব্যবহার করিয়াছি। ভূমিকায় নাট্যকাব বলিয়াছেন : "মীবা সম্বন্ধে আমি এ নাটকে যা যা লিখেছি, সে সব মূলতঃ তারই কাছ থেকে পাওয়া—সজাগ অবস্থায় শোনা, দিনেব পব দিন।" তিনি আবও বলিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যা শ্রীইন্দিরা দেবী সমাধিস্থ অবস্থায় সশরীবী মীরাব কণ্ঠস্বব হইতে যে বৃত্তান্ত পাইয়াছেন, তাহাও উপাদানরূপে এই নাটকে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত বা ঐতিহাসিক কাহিনী নহে. নাট্যকারের নিজস্ব বিষয়বস্তুই সমালোচ্য নাটকটির মূল অবলম্বন। অতএব সাধারণ ঐতিহাসিক বিচাবে উহার সমালোচনা করা নিরর্থক। হয়ত নাট্যগুণ-সৃষ্টির জন্যই নাটকটির বহুস্থানে রং চড়াইতে হইয়াছে। নাটকরচনায় ইহা তেমন দোষের নাও হইতে পারে। কিন্তু রানীর ভগিনী উদয়বাই-এর চরিত্র-চিত্রণে আমরা খুশী হইতে পারি নাই। উদয়বাই মীরাবাই-এর সহমর্মিণী ছিলেন এবং রাণার অত্যাচারের কবল হইতে মীরাকে বার বার তিনি রক্ষা করিয়াছেন ইহাই উদয়বাই-চরিত্রের বহুজ্ঞাত ও পরিণত ঐতিহাসিক রূপ। নাট্যকার তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এইরূপ পরিবর্তন না ঘটাইলেও চরিত্রটির নাটকীয়তার অভাব ঘটিত বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক, নাটকহিসাবে 'ভিখারিণী বাজকন্যা' সার্থক হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই।

শ্রীমনকুমার সেন

সত্যদর্শন—শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিব-প্রণীত ; প্রকাশক—নালন্দা বিদ্যাভবন ; ১, বৃদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : পৃষ্ঠা—১৮৫ ; মূল্য—৩৲ টাকা।

গ্রন্থকাব এই পুস্তকে বৌদ্ধধর্মেব প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা ও সাধনসমূহকে একটি স্বাধীন যুক্তি-সবল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ধারা তুলনা-মূলক। এই আলোচনায় তিনি বেদান্তদর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের ভাবগত দূরত্ব অনেকটা কমাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। লেখকের সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত বিচারপ্রণালী প্রশংসনীয়। বৌদ্ধ-ধর্ম ও দর্শনের ভূয়িষ্ঠ প্রচারের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। আজিকার বুধমণ্ডলীর মানসিক গঠন ও সমীক্ষা বৈজ্ঞানিক রীতিতে বস্তুতে বস্তুতে, ভাবে ভাবে ঐক্য ও সামঞ্জস্যই খুঁজিয়া বেড়ায় ; শব্দের জাল বুনিয়া মতপ্রতিষ্ঠার দিন এখন আর নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থখানি কালোপযোগী হইয়াছে বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই।

শ্রীমা সারদামণি—শ্রীতামসরঞ্জন রায়-প্রণীত ; প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়

লিমিটেড, ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা—১৭৫ ; মূল্য—৩৲ টাকা।

লেখক গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছেন—'পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানমানসী দেবী সারদামণির পূত চরিতকাহিনী নিয়ে আমাদের এ আখ্যায়িকা।' এই 'আখ্যায়িকা'টি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সারদাদেবীর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির বর্ণনার সহিত লেখক তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল ভাষা এবং সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের যে একটি মাধুর্যমণ্ডিত ভাবচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা হৃদয়কে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে বইখানি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ছাপা ও কাগজ অতি সুন্দর।

পরমারাধ্যা শ্রীমা—মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত-প্রণীত ; প্রকাশক—ভারতী বুক ষ্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ; পৃষ্ঠা—১৫৪ ; মূল্য—২৲ টাকা।

শ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর অবসরে তাঁহার সম্বন্ধে অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন এবং নবীন—প্রখ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখক নিজ নিজ ভাব এবং শক্তি দিয়া এই মহীয়সী মানবী-দেবীর উদ্দেশে বাক্যপুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন ও দিতেছেন। আলোচ্য পুস্তকটি এইরূপই একটি প্রচেষ্টা এবং এই ধরনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার ভূমিকায় নবীন লেখকের উদ্যমকে এই ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। আমরাও করিলাম। তবে 'সারদা বলতে লাগল,' 'জিজ্ঞেস করে রামকৃষ্ণ' ইত্যাদি কর্তা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ আমাদের কানে কটু লাগে। অনেক বানান ভুলও চোখে পড়িল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ আরও সাবধানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইবে।

মহিলা-মহল (শ্রীশ্রীসারদাদেবী শ্রদ্ধাস্মরণ-সংখ্যা)—অনেক বিশিষ্ট লেখিকার রচনায় সমৃদ্ধ মহিলা-মহল পত্রিকার (৭ম বর্ষ চলিতেছে) এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি। সব প্রবন্ধ এবং কবিতাই শ্রীমাকে অবলম্বন করিয়া। অনেকগুলি ছবি এবং একটি গানের স্বরলিপিও আছে

মীরাবাঈ—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রণীত, প্রকাশক—সঙ্গীতপ্রচারণী, ৬১, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা—১২ ; পৃষ্ঠা—(রয়াল আট-পেজী) ৪২ ; মূল্য—২॥০ টাকা।

মীরাবাঈএর ১৬টি সুনির্বাচিত ভজনের এই স্বরলিপি-গ্রন্থ মীরার ভজনানুরাগী শিক্ষার্থিগণের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। গানগুলির অধিকাংশ সুর 'সঙ্গীতবিদ্যালঙ্কার' সুগায়িকা রচয়িত্রীর নিজেরই দেওয়া, অবশিষ্ট কয়েকটির সুর অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ গুণীর। পুস্তকের প্রারম্ভে ভজনগুলির একটি 'অভিজ্ঞান' দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের পটভূমিকার মাধ্যমে সাধিকা মীরাবাঈ-এর জীবনকাহিনী সরস হৃদয়স্পর্শী ভাষায় উহাতে বর্ণিত। বইএর শেষে প্রদত্ত হিন্দী উচ্চারণ এবং বাণার অন্তর্গত বহু শব্দের বাঙলা অর্থ—ভজনগুলির উচ্চারণ ও রসোপলব্ধিতে সহায়তা করিবে। এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া লেখিকা সঙ্গীতামোদিগণের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ভজনমালা—শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার প্রণীত ; প্রকাশক—উপরোক্ত পুস্তকের ; পৃষ্ঠা—৫০ , মূল্য—২॥০ টাকা।

১৬টি হিন্দী ভজন স্বরলিপিসহ সংগ্রথিত হইয়াছে। বইটি মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য স্মরণে উৎসর্গীকৃত। ভজনগুলির কয়েকটি সুপরিচিত সন্ত মহাপুরুষদের, অপরগুলি ইদানীন্তন ভাব-রসিকগণের রচিত। সঙ্গীতজ্ঞগণের নিকট লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গায়িকার এই গ্রন্থ সমাদৃত হউক ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রহড়া বালকাশ্রমে অনুষ্ঠান—৭ই চৈত্র, অপরাহ্নে বালকাশ্রম-প্রাঙ্গণে বিশেষভাবে নির্মিত একটি মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পুরস্কার বিতরণী সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানের অপর একটি অঙ্গ ছিল আশ্রমের কিশোর বালকগণ কর্তৃক আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা। আশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও সভাপতি মহাশয়কে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন, আজ এই রহড়া বালকাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এই আশ্রমে ২৫৩ জন ছেলের জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হইবে, এ আশা আছে। আমাদের দেশের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গেল, তাহাতে অনেকে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে। আমাদের দেশের উপর দিয়া বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। যে বালকেরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়াছে তাহারা ভাগ্যবান।

অতঃপর আচার্য সরকার আশ্রমের বালকদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই আশ্রমে আছেন, তাঁহারা আরও সুন্দরভাবে তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন। এইস্থানে তোমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছ তাহা সুন্দর। তোমরা এই আশ্রমে স্থান লাভ করিয়া এই সুশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছ। তোমরা এই আশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এমন সৎ ও মহৎ কার্য করিবে, যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

আচার্য সরকার আরও বলেন, এই সকল ছাত্র বড় হইয়া এক বিশেষ শ্রেণীর কর্মী হইবে, ইহাতে আমি নিঃসন্দেহ। চরিত্র মহামূল্যবান বস্তু। এই চরিত্র না থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও স্বামীজীদের শিক্ষা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে বিপুল সাহায্য করিবে এবং তাহারা অধিকতর শিক্ষালাভ করিবে। এইস্থানে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, বাড়ীতেও সেইরূপ শিক্ষাদান করা হয় না। শুধু ইহাই নহে, এই আশ্রমে কারিগরী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা আছে।

আচার্য সরকার বলেন যে, বিনয়ের অপর নাম সংযম। ছেলেদের মধ্যে প্রয়োজন শৃঙ্খলা-বোধ। এই স্থানে উহা আছে। বিনয়ের অভাবে আজ বাঙ্গালীদের দুর্নাম ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এই দুর্নাম না রটিতে পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই আশ্রমের মত যদি শত শত আশ্রম গড়িয়া উঠিত, তবে দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। এই আশ্রমের ছাত্রেরা বড় হইয়া যে কার্য করিবে তাহা যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। ছাত্রদের সব চাইতে প্রয়োজন চরিত্রগঠন। এই আশ্রম ও মিশনের কর্মিবৃন্দ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের ও আর্ত জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

উপসংহারে আচার্য সরকার ছাত্রদিগকে সর্বতোভাবে এই আশ্রমের উপযুক্ত হইতে আহ্বান জানান এবং আশ্রমের ছাত্রদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হউক বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আশীর্বাদ করেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠান—ঢাকা কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিনবতিতম জন্মোৎসব ছয় দিনব্যাপী (২৬শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী) নানা অনুষ্ঠান দ্বারা সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মগ্রন্থপাঠ এবং স্বামীজীর

জীবন ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঐদিন প্রায় ছয়শত ভক্তের মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ এবং আলোচনা হয়। এই দুই দিন মিশন স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক 'কর্ণার্জুন' নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

চতুর্থ দিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ আলহজ্জ্ খান বাহাদুর আবদর রহমান খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী কেইন, শ্রীমতী মমতা দাস প্রভৃতি কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে শ্রীসুবোধকুমার রায় স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় দর্শন স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রেমের আদর্শ ও দুর্গতের সেবাসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন শ্রীমতী সন্তোষ বালি। পাকিস্থান রেড় ক্রশ সোসাইটীর সেক্রেটারী জনাব এ হাফিজ সারা দুনিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিধ জনসেবামূলক কাজের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীরামদাস (ভারতীয় হাই কমিশন) বলেন, স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের অন্তরে যে দেবত্ব বিরাজমান তার উপলব্ধিই ধর্ম। কেন্দ্র-সেবক স্বামী সত্যকামানন্দও বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব স্বামীজীর জীবনদর্শন, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেমের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মানবপ্রীতি জীবনাদর্শ হওয়া উচিত। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য প্রতিভা ছিল। প্রেম ও সেবা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ। সভার শেষে জনাব আবদুল লতিফ ও শ্রীমতী কণিকার সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

সাধারণ সভার পূর্বে মিশন স্কুলের ছাত্রদের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পঞ্চম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিবৃন্দের আনন্দ অপেরা কর্তৃক 'মুক্তি-যজ্ঞ' যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবের শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। প্রায় চার সহস্র দরিদ্র নরনারী ও শিশুকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যায় ভারতীয় প্রচারবিভাগের সৌজন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভুবনেশ্বরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব—গত ২২শে মাঘ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের একনবতিতম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রাত ৪৷৷৹ হইতে মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও স্থানীয় কীর্তনীয়াদের দ্বারা পালাগান ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৪৷৷৹ টায় মঠ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামিজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতিকৃতির সম্মুখে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন উড়িষ্যার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী। স্বামী জগন্নাথানন্দ কর্তৃক বৈদিক শান্তিপাঠ ও তৎপর প্রারম্ভিক সঙ্গীত গীত হইবার পরে সভার কার্য আরম্ভ হয়। প্রথমে বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী ওঁকারানন্দজী বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনী ও বাণীর তাৎপর্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং প্রকৃত ধর্মের স্বরূপ ও উহার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে বলেন। উড়িষ্যা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ কাশীনাথ মিত্র ওড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা পূর্বক দেশবাসীকে সেই সব আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান জানান। তৎপরে স্বামী জপানন্দ হিন্দীতে সংক্ষেপে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভাপতি

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী তাঁহার উদ্দীপনাময় ভাষণে বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই আজ আমরা ধর্মকে সহজভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতেছি।

উৎসবদিনে মঠে সমবেত ভক্ত নরনারীগণ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজকে দর্শন ও তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণে বিশেষ আনন্দানুভব করেন।

পাথুরিয়াঘাটা শিক্ষা-কেন্দ্রে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—বিগত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র (২৭শে ও ২৮শে মার্চ) পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণে আশ্রম-হিতৈষীদের উদ্যোগে স্বামীজীর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও সঙ্গীতাদির পর অপরাহ্নে মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, স্বামী অনন্তানন্দ এবং শ্রীতামসরঞ্জন রায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভার পর আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ করে। ১৪ই চৈত্র, রবিবার আশ্রমের প্রাক্তনছাত্র-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় আহূত ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। উৎসব-অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন বেতারশিল্পী শ্রীকিশোর ভড়, শ্রীদিলীপ ঘোষ এবং বারাণসী কালীকীর্তন দল। উৎসব-মণ্ডপের সজ্জা-সম্পাদন করেন আশ্রম-পরিচালিত "বিবেকানন্দ-নৈশ বিদ্যালয়ে'র ছাত্রবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে বিগত ১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ) হইতে ১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ) পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দুই দিন সোসাইটি-প্রাঙ্গণে দুইটি জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ ব্যতীত শহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উহাতে যোগদান করেন। অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা) অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী (রাঁচী কলেজ) এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দজী তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৪ই চৈত্র সোসাইটী-প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ৪ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা বীণাপাণি দত্তরায়ের সভাপতিত্বে একটি মহিলা সভায় স্বামী জপানন্দ এবং শ্রীমতী স্নেহলতা দাশগুপ্তা মাতৃজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। উৎসবের বাকী তিন দিন বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয় (সাকচী), টিন্‌প্লেট্‌ সান্ধ্যক্লাব, কদমা মধ্য বিদ্যালয় এবং টেল্‌কো অঞ্চলেও পৃথক সভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের উদার শিক্ষার আলোচনা হয়। বক্তা ছিলেন শহরের কতিপয় সুধী ব্যক্তি এবং স্বামী জপানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ।

বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রসৈকতস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবসূচি তিন দিন (৬ই, ৭ই এবং ২১শে মার্চ) ধরিয়া উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিবসে পূজা, বেদপাঠ, ভজন এবং প্রসাদবিতরণ; দ্বিতীয় দিনে কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীত এবং তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে অন্ধ্রের রাজ্যপাল শ্রী সি এম্‌ ত্রিবেদী মহোদয়ের পরিচালনায় জনসভা। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক এস্‌ বেঙ্কটরমণ (ইংরেজী), শ্রী কে ভি রত্নম্‌ (তেলেগু) এবং শ্রী আই আর শাস্ত্রী (হিন্দী)। স্থানীয় জনসাধারণ এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোৎসাহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পূর্বপাকিস্থানের বাগেরহাট কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণের উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভজন-সঙ্গীত

পরিচালনা করেন বাগেরহাটের কৃতী গায়ক ফণী বাবু, পাঠ ও আলোচনায় অংশ লইয়াছিলেন শ্রীভুবন মোহন চক্রবর্তী ও শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল হইতে বিশেষ পূজাদি সমাগত ভক্তগণকে প্রভূত আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিয়াছিল।

ঢাকা কেন্দ্রে তিথিপূজা উপলক্ষ্যে সারাদিন-ব্যাপী পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠাদি পরিনির্বাহ হয়। সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের (২নং) যাত্রাদল 'সমাজের বলি' অভিনয় করেন। ২৩শে ফাল্গুন রবিবারে শ্রীসুশীলপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় আশ্রম-সেবক স্বামী সত্যকামানন্দ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রী সর্বাধিকারী বাল্যজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণ সকলের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ঐ দিন রাত্রে পূর্বোক্ত যাত্রাদলের অভিনীত আর একটি নাটক—'ফুল্লরা' সমবেত জনগণকে বিমল আনন্দ দিয়াছিল।

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১২ই চৈত্র এবং ১৪ই চৈত্র। প্রথম দিন ভোরে ভজন, মঙ্গলারাত্রিক, হোম ও পূজা এবং বৈকালে সমবেত পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রচুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শেষ দিন রবিবার বৈকালে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হয়। রাজেন্দ্র কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীশিশিরকুমার আচার্য, শ্রীপৃথ্বীশ গুহরায়, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ রামকৃষ্ণ-জীবনদর্শন আলোচনা করেন। সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীবিনোদলাল ভদ্র মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে পরমহংসদেবের বাণী বর্তমান সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা ব্যাখ্যা করেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই উৎসবে যোগদান করেন।

দিনাজপুর শাখাকেন্দ্রে তিথিপূজা পরিপালিত হয় বিবিধ অর্চনা-কৃত্যের মাধ্যমে। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আশ্রমের শান্ত ভাবগম্ভীর আনন্দপরিবেশে ভক্ত এবং অনুরাগী বন্ধুগণের সমাগম চলিতে থাকে। উৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে এবং কলেজে আংশিক ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। ভজন, জীবনী-আলোচনা এবং দেড়সহস্র নরনারীকে প্রসাদ দান উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

মালদহ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের শুভ ১১৯তম জন্মতিথি উৎসব সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ভজন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, সমবেত হোম ও প্রসাদ বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিচালিত এক সভায় শ্রীপ্রতুলকৃষ্ণ গুপ্ত স্বরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচালী' পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখান যে, যেমন দেশশাসন ব্যাপারে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালিত হয়, তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গণতান্ত্রিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগ ও সেবার জীবন্ত আদর্শকে ভারতীয় জীবনে পরিস্ফুট করিয়া জগতের সামনে সকলকে ধরিতে বলেন। পর দিবস অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। এতদুপলক্ষ্যে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ কর্তৃক একটি মনোরম আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই দিনকার অনুষ্ঠানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

পবিত্র গঙ্গাসাগর তীর্থের তিন মাইল দূরবর্তী মনসা-দ্বীপ পল্লীকেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম জন্মোৎসব, তথা শ্রীমা-শতবর্ষজয়ন্তী, সংযুক্ত ভাবে ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ; মধ্যাহ্নে শোভাযাত্রা; অপরাহ্ণে ধর্মসভা এবং

সন্ধ্যায় সঙ্গীতবাসর ও প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে যাত্রাভিনয় ছিল উৎসবের অঙ্গ। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ ছিলেন ধর্মসভার পরিচালক। আশ্রম-সেবক স্বামী নিরাময়ানন্দ, প্রধান শিক্ষক, তিনজন সহকারী শিক্ষক ও স্থানীয় জেলা বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উৎসবে প্রায় ১০।১৫ মাইল দূর হইতে আগত আনুমানিক দুই হাজার নরনারায়ণের সেবা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণের 'দাসীপুত্র' যাত্রাভিনয় বিশেষ আনন্দপ্রদ হয়। পরদিন সন্ধ্যায় আশ্রম হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে রুদ্রনগর দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠে প্রায় পাঁচ শত নরনারীর উপস্থিতিতে স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও উক্ত বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী—শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে ১৬ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) হইতে সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা, জনসভা, মহিলা সম্মেলন, ছাত্রদিবস, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কীর্তন, অভিনয়, সঙ্গীত-জলসা, ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া বিদ্যাপীঠ হইতে দেওঘর শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রী ব্যাণ্ডপার্টি সহ এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। বৈকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহোদয়ের নেতৃত্বে এক সভা হয়। সভায় স্বামী জপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, এবং দেওঘর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনন্দন সহায় বক্তৃতা করেন। ১লা মার্চ এক মহিলা সম্মেলনে মহিলাগণের মধ্য হইতে অনেকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও আবৃত্তি করেন। ৪ঠা মার্চ দেওঘরের এস-ডি-ওর পরিচালনায় এক ছাত্র-সভা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে—হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ভারতের মহীয়সী নারী ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৫ই মার্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ "অভিমন্যু বধ" অভিনয় দ্বারা দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। ৬ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালিত হয়। বৈকালে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের দ্বারা পরিচালিত এক জনসভায় শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি), এবং বিদ্যাপীঠের কর্মসচিব স্বামী বোধাত্মানন্দ বক্তৃতা করেন।

১৪ই মার্চ বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সভানেতৃত্বে বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সভার পূর্বে ডাঃ সিংহ নবনির্মিত বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বিদ্যাপীঠের প্রার্থনাগৃহ, উদ্যান, শিল্পকলা-প্রদর্শনী, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং ছাত্রদের আবৃত্তি, সঙ্গীত, ড্রিল প্রভৃতি দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন। ২১শে মার্চ ভারত-বিখ্যাত ব্যায়ামবীর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের পরিচালনায় বহু দর্শকের সম্মুখে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব গত ৩০শে ফাল্গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত এক সপ্তাহ ব্যাপিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, ধর্মসভা, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্তৃক কণ্ঠ ও

যন্ত্রসঙ্গীত, তরজা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর কথকতা, যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে পর পর দুইটি সভায় স্বামী জপানন্দ ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্বামী সুশান্তানন্দ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগের সবাক চলচ্চিত্র সাহায্যে কেদার-বদ্রিনারায়ণ ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থাদির চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় সাঁওতালগণ কর্তৃক তাহাদের মাতৃভাষায় "রামসীতা" নাটিকাখানি অভিনীত হয়। এতদুপলক্ষ্যে প্রায় চারি সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ পায় এবং প্রতি অনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর শতাব্দী জন্মজয়ন্তী উৎসব ৭ই চৈত্র হইতে নয় দিন ধরিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎ-সব পালনের জন্য দুইটি দিন পৃথক নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম দিনের সভার অধিবেশনে কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ, মনসাদ্বীপ কেন্দ্রের সেবক স্বামী নিরাময়া-নন্দ এবং কলিকাতা বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অন্য একদিন উক্ত অধ্যাপিকা মহোদয়ার সভানেতৃত্বে উদ্‌যাপিত মহিলা দিবস অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা গ্যাণ্টি ও শ্রীযুক্তা কৃষ্ণ-ভাবিনী দেবী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উদ্বোধনের সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পরিচালনায় দুই দিন দুইটি সভায় অধ্যাপক সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী নিরাময়ানন্দ যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। নবম দিবসের বিশেষ সভায় বক্তা স্বামী নিরাময়া-নন্দের বক্তব্য বিষয় ছিল, 'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা।' অন্যান্য দিনে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, দেহসৌষ্ঠব-প্রতিযোগিতা, সূচী-শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও আলপনা-প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সঙ্গীতবাসর, ৪০টি সম্প্রদায়ের হরিনাম সংকীর্তন এবং মহাসমারোহে নারায়ণ সেবা প্রভৃতি এই মহোৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

মহিলা সম্মেলন—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের অঙ্গস্বরূপ গত ১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) হইতে ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) পর্যন্ত কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও মাতা সারদা-দেবীর মহিলা ভক্তগণের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহূত হয়। দিল্লী, নাগপুর, কূর্গ, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। এই আরম্ভিক অধিবেশনে পুরুষভক্তগণেরও প্রবেশা-ধিকার ছিল। পরবর্তী অধিবেশনসমূহের কত-গুলি ছিল প্রতিনিধিবর্গের জন্য। চারটি মহিলা-সভা ছিল সর্বসাধারণের জন্য।

উদ্বোধনী-সভার দিন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলের মঞ্চটি পুষ্পলতাদি দ্বারা নয়নাভিরামরূপে সাজানো হইয়াছিল। মধ্যস্থলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা-সারদাদেবীর সুসজ্জিত, বৃহৎ চিত্র। সভাপতি শ্রীমৎ শঙ্করানন্দজী মহারাজকে শঙ্খধ্বনির দ্বারা বরণ করিয়া মঞ্চোপরি লইয়া যাওয়া হয়। তিনি তাঁহার মর্মস্পর্শী গভীরভাবদ্যোতক উদ্বোধনী ভাষণ (এই ভাষণটি উদ্বোধনের শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে) দিবার কিছু পরে শারীরিক অসুস্থতা হেতু চলিয়া গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ডাঃ রমা চৌধুরী মাতা সারদামণির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, শ্রীমায়ের আদর্শ অনুসারে আমরা নিজেদের জীবন গঠন করিতে পারিয়াছি কিনা সে বিষয়ে আজ চিন্তা করিতে হইবে এবং নূতন করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পত্নীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য— অর্ধাঙ্গিনীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মাতা সারদামণি দেবীকে পাইয়াছি। তাঁহার দাম্পত্যজীবন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও উচ্চতম ধর্মজীবন যাপন সম্ভব, ইহা মাতা সারদামণি নিজের জীবনে যেরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, জগতে আর কেহ তাহা করেন নাই। মাতা সারদামণি দেখাইয়া গিয়াছেন, মাতৃত্বই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও একাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক। ধনী-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্খ-উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সকলকে তিনি করুণা বিতরণ করিয়াছেন।

স্বামী মাধবানন্দজী বলেন, মাতা সারদামণি নিজের দৈবীশক্তিকে সংযত করিয়া আমাদেরই মায়ের মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের মাতৃরূপ মাতা সারদামণির জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মাতা সারদামণি সাক্ষাৎ ভগবতী। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ করিয়া তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন ও এতটা সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বক্তা বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের দায়িত্ব হইতেছে— জগৎকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেওয়া। নারীজাতিকেও সে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতা সারদামণিকে পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর মাতা সারদামণি তাঁহার কর্মভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসার ও শ্রীযুক্তা শুভলক্ষ্মী (মাদ্রাজ) বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাতা সারদামণির জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বিশ্বপ্রেম ছিল তাঁহার কর্মের উৎস এবং মাতৃত্বের প্রেরণায় নারীজাতিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার ও তাঁহার পার্টি সঙ্গীত করেন।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা—

জয়রামবাটী 'শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে' জননী সারদা-দেবীর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল, বুধবার) হইতে ২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল, শুক্রবার) পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী আনন্দোৎসব সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভা-যাত্রা, পূজা, যজ্ঞ, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ঠাকুর ও মায়ের জীবনী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে আলোচনা, কথকতা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি কর্ম-সূচির অঙ্গীভূত ছিল। ৪ঠা এপ্রিল হইতেই সাধু ও ভক্তযাত্রীর সমাগম হইতে থাকে। ৬ই এপ্রিল, মঙ্গলবার রাত্রে হাওড়া হইতে একখানি স্পেশাল ট্রেনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভক্ত নরনারী বিষ্ণুপুর পৌঁছান। বিষ্ণুপুর হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী জয়রামবাটী যাইবার জন্য বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল। শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দিরের সমীপবর্তী বিশাল ধান্যক্ষেত্রকে সমতল করিয়া উৎসবভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ ও মহিলার জন্য খড়ের ছাউনি ও বেড়া দেওয়া অস্থায়ী বহু সংখ্যক কুটীর নির্মিত হয়। বাসস্থান, আহারাদি, স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যত্ন, শৃঙ্খলা ও দক্ষতা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়াছিল। ১৪টি নলকূপ বসাইয়া এবং আমোদর নদে বাঁধ দিয়া একটি কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করিয়া জল সরবরাহ

এবং ডায়নামো চালাইয়া বিদ্যুৎ-আলোকের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্র হইতে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোটরলরি, ট্রাক, জিপ ও বাসে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে গোযানে, সাইকেলে ও পদব্রজে প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী উৎসবে যোগ দেন।

বুধবার (২৪শে চৈত্র) শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হয় মন্দিরের সম্মুখবর্তী এক সুসজ্জিত যজ্ঞ-শালায় 'রুদ্রযজ্ঞ' আরম্ভের সঙ্গে। কাশী হইতে চারজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে এই জন্য আনা হইয়াছিল। আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী-দের রচিত মৃত্তিকা-মূর্তি ও পরিবেশাদির মাধ্যমে শ্রীমা-সারদাদেবীর জীবন-লীলার একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। রাত্রিতে মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তির অধিবাস হয়।

বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে ১০১ তোপধ্বনি দ্বারা শ্রীশ্রীমাতার শতবর্ষ জয়ন্তী ঘোষণা করা হয়। প্রাতে ৭টায় শ্রীশ্রীমায়ের সুসজ্জিত পটমূর্তি লইয়া গীতবাদ্য সহযোগে সমাগত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং ভক্ত নরনারীদের এক শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অন্নযাগ হয়। মূল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীশঙ্করানন্দজী মহা-রাজের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাতা সারদামণির প্রস্তর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা, পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় কালী-কীর্তন, রাত্রিতে বাজি পোড়ান ও যাত্রাভিনয় এবং মন্দিরে দশমহাবিদ্যার পূজা ও হোম হয়। এই দিন প্রায় একলক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শুক্রবার প্রাতে সপ্তশতী হোম, রামায়ণগান অপরাহ্নে বক্তৃতা ও রাত্রিতে নদের নিমাই অভিনয় হয়। এইদিন কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানেও এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। জয়রামবাটী হইতে বহু ভক্ত উহাতে যোগদান করেন। হাওড়া হইতে একটি স্কাউট দল এবং বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ এবং আশেপাশের আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ ছাত্র কয়দিন স্বেচ্ছাসেবকরূপে দিবারাত্র অক্লান্তভাবে সমাগত যাত্রিগণের সেবা করিয়াছে। বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রীআয়েঙ্গার নিজে উৎসবস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত তদারক করেন। যাত্রিগণের প্রত্যাগমনের জন্য ৯ই এপ্রিল রাত্রে বিষ্ণুপুর হইতে হাওড়া পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। যাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক অদ্ভুত পবিত্র আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা ও আনন্দের স্মৃতি বহন করিয়া ফিরিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কটকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—
গত ২৭শে জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কটকে নারী সঙ্ঘ সদনে বৈকাল ৫টায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন কটকে এইবার বহু বৎসর পরে হইল।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ওড়িষ্যা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় পিঙ্গলরাজ পাণিগ্রাহী। বক্তৃতা করেন বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী জপানন্দ এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যার সর্ববরেণ্য নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব।

প্রথমে শ্রীবৈদ্যনাথ রায় চৌধুরীর প্রারম্ভিক

সঙ্গীতের পর ডাঃ মহতাব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। পরে স্বামী জপানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দেন। শ্রীবিমল-কৃষ্ণ পালও ওড়িয়া ভাষায় মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে সকলকে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য আহ্বান জানান।

সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর সভার কার্য শেষ হয়।

পরলোকে ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার— গত ২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল) মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে কলিকাতা-বালিগঞ্জে স্বকীয় বাসভবনে ৬৯ বৎসর বয়স্ক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের পরলোক-গমনে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিকের তথা ঋষিকল্প ভারতীয় মনীষীর অভাব ঘটিল। গভীর পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং অমায়িক উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি ছাত্র এবং অধ্যাপক মহলে সকলেরই আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার শিক্ষা ও শিক্ষণ-জীবন দুইই গৌরবোজ্জ্বল। ডক্টর সরকারের প্রণীত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বহু বৎসর হইতে উদ্বোধনে তিনি নিয়মিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে আমরা পরমাত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। পুণ্যাত্মার ঊর্ধ্বগতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা এবং তাঁহার সহধর্মিণীকে হৃদয়ের অকপট সমবেদনা জানাইতেছি।

স্মরণে—গত ১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শচীন্দ্রভূষণ পাল মহাশয় প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি মালয়দেশে মেণ্টাল হসপিট্যালের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন। সরল, অমায়িক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। বিদেশে অনেক বিপন্ন বাঙালী ও ভারতীয় পরিবারকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন এবং মালয়দেশে রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগদানপূর্বক সাধুদিগকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত সৎকার ও সেবা করিতেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন এবং অতঃপর ভগবৎ চিন্তা ও চর্চায় কাল কাটাইতেন। শচীনবাবু পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালিয়াটী (ঢাকা) গ্রামের ভক্তগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যামিনী লাল রায় চৌধুরী মহাশয় গত ২রা চৈত্র ৭১ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টের নাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের (খোকা মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার মুক্তি কামনা করি।

পল্লীবঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পূর্বসাতগেছিয়া গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব গত ২২শে ফাল্গুন বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি, বিকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হইয়াছিল। পরদিন রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জীবনী আলোচনা ও ভজনগানাদি হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রায় ৭।৮ শত লোকের সমাগম হয়।

গত ৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ রবিবার) হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেলাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯তম শুভ জন্মোৎসব

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে নগর-কীর্তন, বিশেষ-পূজা, ভজন, স্তবপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ পাঁচটায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমাবেশে একটি বিরাট জনসভা হয়। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের নানাদিক অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। সভাপতিরূপে স্বামী বেদানন্দ (সম্পাদক, বিশ্ববাণী) মর্মস্পর্শী ভাবে ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা কাল তাঁহার অভিভাষণ দেন। শ্রোতারা সকলেই ধৈর্য ও আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত ১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ বুধবার) মাজু (হাওড়া) রামনারায়ণ বসু উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জগতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদানসম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। ছাত্রদের আবৃত্তি, কুমারী বীণাপাণি সাউএর ভজনসঙ্গীত এবং চংঘুরালীর শ্যামা সম্মিলনীর কালী-কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হয়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে গত ২২শে ফাল্গুন ডাঃ শ্রীগিরিজাভূষণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে মহাসমারোহে অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মবার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে স্থানীয় সমবেত ভক্তবৃন্দ ও মহিলাদিগের সমক্ষে পরমহংসদেবের জীবনী ও তদীয় লীলাকাহিনী পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যাকালে যথারীতি আরাত্রিক ও স্তোত্রাদি আবৃত্তির পর উৎসবসূচির সমাধা হয়।

গত ২২শে ফাল্গুন থেপুত (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি পূজা নিম্নলিখিত কার্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ঃ— প্রভাতে—শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া নাম-কীর্তন সহ প্রভাতফেরী। পূর্বাহ্নে—আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে পূজা ও ভোগ, সারাদিন ব্যাপী সমাগত ভক্ত নরনারী ও বালক-বালিকাগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। অপরাহ্ণে—সভা। সন্ধ্যায়— আরাত্রিক— ভজন ও কথামৃত পাঠ।

বেলঘরিয়া দেশপ্রিয়নগরে গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন দুইদিনব্যাপী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব ও জননী সারদামণির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজার্চনা, শাস্ত্রাদিপাঠ, কালীকীর্তনাদি ছাড়াও দ্বিতীয় দিনে একটি মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পরিচালক ও মূল বক্তারূপে 'বিশ্ববাণী' সম্পাদক স্বামী বেদানন্দ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনসাধনা বিবৃত করেন এবং পূর্ববঙ্গ হইতে ছিন্নমূল নগরের বার সহস্র নরনারীকে নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনপূর্বক নবজীবনগঠনে আহ্বান জানান। এই উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয়নগরে একটি দেবালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীগোপীনাথ মল্লিক।

ভদ্রকালী (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য বালিকা-শ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশ্রমে বালিকারা ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্তে সমবেত প্রার্থনান্তর প্রাঙ্গণে মঙ্গল-ঘট স্থাপনা করে এবং ঠাকুরের বৃহৎ প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাভক্তি সহ মাল্য এবং চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করে। ইহার পর পরমহংসদেবের ষোড়শোপচারে অর্চনা সম্পন্ন হয়। সকাল ৯ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্তন ভক্তগণকর্তৃক ভক্তিভরে গীত হইয়াছিল। তিন-শতাধিক বালকবালিকা ও ভক্তমণ্ডলী কীর্তন-শেষে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় রাত্রি ৮ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সুমধুর নামকীর্তন সকলকে

তৃপ্তি দিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীহরিপদ ভাগবতভূষণ উৎসব উপলক্ষ্যে দশদিবস বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবদ্দশায় একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে কোন্নগর নৌকাযোগে গমনকালে এই ভদ্রকালী গ্রামে আশ্রম-সন্নিকটস্থ বিশালাক্ষীর ঘাটে অবতরণ করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্রমের এই উৎসবকে ঠাকুরের সেই শুভ পদার্পণের স্মারকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মতিলাল (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২২শে ফাল্গুন, যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠা ও শুভ জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ-পূজা হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং অপরাহ্নে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক, ভজন এবং সমবেত গ্রামবাসিগণ কর্তৃক সুললিত হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

এ বৎসর বেহালা হইতে ২½ মাইল দূরবর্তী ১নং বাসুদেবপুর কলোনীতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক ও লেখক শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতিরূপে ঠাকুরের শিক্ষার নানাদিক সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। পল্লীর নরনারীগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

২৪-পরগণার জয়নগর-মজিলপুরস্থ বোসপাড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একশত উনবিংশতিতম আবির্ভাব-উৎসব গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন নিষ্ঠার সহিত পালিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে বেলুড়মঠের স্বামী পূর্ণানন্দের পরিচালনায় একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীফণিভূষণ মিত্র, শ্রীকালীচরণ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি শ্রীকেশবলাল ঘোষ বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী পূর্ণানন্দ প্রায় দুইঘণ্টাকাল আবেগপূর্ণ ভাষণে সকলকে তৃপ্তিদান করেন।

মথুরাপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন, ৬ই ও ৭ই চৈত্র দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভজন গান, নগর সঙ্কীর্তন, পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ, এবং দরিদ্রনারায়ণসেবা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৫টা হইতে প্রায় ৩ঘণ্টা কাল জয়নগর মাজিলপুরের রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ সুমধুর 'গদাধর কথা-গীতি' পরিবেশন করিয়া সমবেত সহস্রাধিক নরনারীকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেন।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঝিখিরা গ্রামের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯-তম জন্মোৎসব এবং তদীয় লীলাসঙ্গিনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যথাসময়ে উষাকীর্তন, মঙ্গল-আরতি, পূজাপাঠ, হোম, হরিসংকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা'র চরিতকথা ও উপদেশাবলীর আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও রামনাম-কীর্তনান্তে উৎসব-কার্য সমাপ্ত হয়। পূজাহোমাদিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য বেলুড় মঠের স্বামী প্রেমরূপানন্দ সম্পাদন করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ উপনিষদ্ ও চণ্ডীপাঠ এবং আলোচনা সভার পরিচালন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানাদিক আলোচনা করিয়া কিরূপে তাঁহাদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ দ্বারা সাধারণ সংসারী মানুষ তাহদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, সন্ন্যাসি-দ্বয় তাহাই তাঁহাদের ভাষণে বলেন। গ্রামখানি সারাদিন উৎসবানন্দে মুখরিত ছিল।

ঘাটাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ) বিশেষ-পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজনকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণাদি সহ উৎসব সমারোহের সহিত

সম্পন্ন হইয়াছে। সাধারণ সভায় মহকুমাশাসক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ঠাকুরের অলৌকিক সাধনার বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ দেন।

কদমতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘে গত ২২শে ও ২৩শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সংশুদ্ধানন্দের পরিচালনায় নগর-কীর্তন, এবং বিশেষ পূজাহোমাদি, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী ও অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী—বিগত ৭ই চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্যন্ত তিন দিবস ব্যাপী গোপীনাথপুর (মেদিনীপুর) মাতৃ-আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই চৈত্র সকাল ৬৷৷৹টায় একটি সুদৃশ্য মঞ্চে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত করিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, ধুনা, আরতি, কীর্তন ও ব্যাণ্ড বাদ্য সহ একটি শোভাযাত্রা তিন চারিটি গ্রাম পরিক্রম করিয়াছিল। বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভোগারতি এবং ভজনাদিও হয়। পূজান্তে ৩০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদগ্রহণ করেন। বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

৮ই চৈত্র একটি মহিলাসভা এবং ৯ই চৈত্র বৈকালে ঘাটাল মহকুমাশাসক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। স্বামী মহেশ্বরানন্দ, স্বামী রামেশ্বরানন্দ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ স্ত্রীজাতির জাগরণে শ্রীশ্রীমার অবদান সম্বন্ধে বহুমুখী আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতির অভিভাষণান্তে সভার কার্য শেষ হয়। রাত্রি ৯টায় যাত্রাভিনয় হয়।

প্রতিদিন অগণিত নরনারী দলে দলে ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। এই তিন দিনে সর্বসমেত প্রায় ৬০০০ ছয় হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ১২ই পৌষ দেওঘর (কুণ্ডা) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, স্থানীয় বালিকাগণ কর্তৃক নগরকীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ, ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-আলোচনা, কীর্তন, ভক্তসেবা প্রভৃতি সারাদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত-ব্যাখ্যা করেন হুগলী কলেজেরপ্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম; শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ ও ডক্টর ব্রহ্ম। ঐ দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রামরাজ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ন্যায়াচার্য শ্রীশ্যামাপদ শাস্ত্রী, জমিদার শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফকিরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দিল্লীতে অনুষ্ঠান—নয়াদিল্লী (বিনয়নগর) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২৩শে মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যুক্ত-জন্মবার্ষিকী পালনার্থে লোকসভার সভ্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগোপীনাথ আমন এবং নয়া দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা দেন।

বৈরাগ্য

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসমাগমাগতসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ॥

রম্যং হর্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং
কিং বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে?
কিং তু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্, ৭৯-৮০

শুক্লা রাত্রির স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ কী আনন্দদায়ক, লোকালয়ের উপকণ্ঠে বনানীর সংলগ্ন প্রান্তরগুলি যখন সবুজ ঘাসে ঢাকিয়া যায় তখন উহাদের কী নয়নাভিরাম শোভা! বিদ্বৎ-সমাগমে চিত্তে যে নির্মল সুখ পাওয়া যায়, নানা কাব্যে রমণীয় বর্ণনাদি-পাঠে যে সাহিত্য-রস অনুভব করা যায় তাহাও কত অভিনন্দনীয়। আবার তরুণ যখন প্রিয়তমার কৃত্রিম কোপে অশ্রুবিন্দুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তখন সেই মুখচ্ছবি তাঁহার নিকট কতই না সুন্দর মনে হয়! জীবনের বিচিত্র গতিপথে, পৃথিবীর দিকে দিকে কত রূপ, কত রস, কত আনন্দ আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সত্য! কিন্তু এমনও সময় আসে যখন চিত্তে প্রবেশ করে এই সব কিছুরই প্রতি একটি দুরতিক্রম্য অনিত্যতা-বোধ। তখন মনে হয়, কোন কিছুরই যেন আর কোন আকর্ষণ নাই।

রমণীয় অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখ হয় বই কি, উপযুক্ত স্থানে নিশ্চিন্ত মনে প্রিয়জনদের সহিত অবসর-সময়ে বসিয়া মধুর গীতবাদ্যাদি শুনিলে প্রাণে বিমল আনন্দ পাওয়া যায় বই কি। প্রেমাস্পদা কান্তার সাহচর্যজনিত সুখও যে অত্যন্ত কাম্য তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? সত্য! কিন্তু এমনও সময় আসে যখন মনে হয়, সব কিছুই অতি অস্থির—যেন রূপমুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষালোড়ন-সঞ্জাত বায়ুস্পন্দনে চঞ্চল দীপশিখার একান্ত ক্ষণিক ছায়া! তাই তো দেখিতে পাই, এই অনুভূতির ফলে জীবনের সব আকর্ষণ পিছে রাখিয়া সন্তগণ অতি-জীবনের অপরিবর্তনীয় সত্য ও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে গৃহ ছাড়িয়া বনের কৃচ্ছ্রতাকেই বরণ করিয়া লইয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

অতীন্দ্রিয়তার সুযোগে

কিছুদিন আগে বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণকোণস্থিত গির্জায় জনৈক খ্রীষ্টান যোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার জনরবে শত শত লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল—ভিড়-নিয়ন্ত্রণের জন্য নাকি পুলিসকেও নামিতে হইয়াছিল। পরে শোনা গেল যোগী নাকি একজন যোগ-ব্যবসায়ী মাত্র! কয়েক বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার গ্রামে 'নেপালবাবা'র আবির্ভাব ও তিরোধানের করুণ ঘটনা মনে পড়ে; করুণ কেননা দূর-দুরান্তরের সহস্র সহস্র নরনারী বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায় মাত্র একটি অলৌকিক বিশ্বাসে চালিত হইয়া কতকগুলি দুষ্ট লোকের দ্বারা ধনে প্রাণে কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা পড়িলে নেপালবাবা-নাট্যের প্রযোজক-মণ্ডলীর উপর ক্রোধ অপেক্ষা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত 'বিশ্বাসী'গণের প্রতি মমতাই বেশী উদ্রিক্ত হয়। কুর্গের পল্লীবালা ধনলক্ষ্মীও তো সারা দেশ জুড়িয়া আলোড়ন সৃষ্টি করিল—অবশেষে তাহার অলৌকিকত্ব-পরীক্ষার জন্য ভারত-সরকারের বেশ কিছু অর্থদণ্ড ঘটাইয়া যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ঘটনা সব দেশে, সব কালেই মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে, অলৌকিক উপায়ে অনেক সময়ে মানুষের বহু সাংসারিক কামনার পরিপূর্তিও যে না হয় তাহাও নয়। কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করা এক কথা, আর এগুলিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অলৌকিক উপায়ে যদি কেহ রোগ সারাইতে পারেন বা নিঃসন্তানের পুত্র-জন্ম, বা বিপন্নের মোকদ্দমা-জয় প্রভৃতি অঘটন ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে এক ধরনের চিকিৎসক বা যাদুকরের সম্মান অবশ্যই দেওয়া উচিত এবং অনেক দেশে বোধ করি তাহাই দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা অন্য প্রকার। আমরা উক্তপ্রকার অলৌকিক শক্তিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি এবং ব্যতিরেকী ন্যায়ে যদি কোন সাধুসন্তের উক্ত ক্ষমতা না থাকে তাঁহাকে নিম্নস্তরের বলিয়া গণ্য করি। এই মনোভাব যে অশিক্ষিত জনসাধারণের তাহা নয়, শত শত 'উচ্চ'-শিক্ষিত ব্যক্তিও অতীন্দ্রিয়তাকে শুধু ম্যাজিকের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝিয়া থাকেন। ফলে মাঠে বাটে গাছতলায় অথবা গৃহ-প্রাঙ্গণে 'নেপালবাবা' এবং সাম্প্রতিক 'খ্রীষ্টান যোগী'র দলের আসর জমাইতে কষ্ট পাইতে হয় না। দু চার সপ্তাহ বা মাস 'বিশ্বাসী'দের চোখে ঠুলি দিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিলেও অনেক কিছু গুছাইয়া লওয়া যায়।

ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা অবশ্যই অতীন্দ্রিয় বস্তু, উহাদের উপলব্ধির পথেও অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের আলোর প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়—কিন্তু এই অতীন্দ্রিয়তার সহিত সুনীতি ও সুপরীক্ষিত যুক্তির কোন বিরোধ নাই। যে অতীন্দ্রিয়তার লক্ষ্য ঈশ্বরানুভূতি উহা নিশ্চিতই বৈষয়িক স্বার্থের সহিত জড়িত থাকিতে পারে না। অতএব যদি কোনস্থলে দেখা যায় সাংসারিক লেন-দেনেরই আড়ম্বর বেশী, আচরণ ও কথা চিরপ্রচলিত নৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইতেছে—যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে না, তাহা হইলে সেই 'অতীন্দ্রিয়তা' হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়।

আমাদের দেশে 'অলৌকিক ঘটনা'রও বিজ্ঞান (Science) একদিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে নানাবিধ বিভূতির আলোচনা আছে। চিত্তসংযমের ফলে এই সকল শক্তি যোগীর নিকট উপস্থিত হয় এবং কি'কি বস্তুতে চিত্ত একাগ্র

করিলে কোন্ কোন্ শক্তির অধিকারী হওয়া যায় তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এ কথা নাই যে, এই বিভূতিই আধ্যাত্মিকতা। সাধনার ক্রমে উহারা যোগীর নিকট উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু যোগী উহাদের কোন পারমার্থিক মূল্য দেন না। বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি জ্ঞান—এই সবগুলিই অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য—বিভূতি নয়। সত্য বটে, কোন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ মানুষের দুঃখে কাতর হইয়া কখনও কখনও তাহার ব্যাধি বা অন্য কোন বিপদের মুক্তির জন্য যোগবিভূতি প্রয়োগ করিয়াছেন—কিন্তু উহাই তাঁহাদের মহাপুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। দেখা গিয়াছে তাঁহারা নিজেরাই সঙ্কটত্রাণার্থীকে বলিয়া দিতেছেন যে, তাহাদের বিপন্মুক্তি বাস্তবিক পক্ষে শ্রীভগবানের দয়াতেই সম্ভবপর হইল, অতএব তাহারা যেন তাঁহাকে না ভুলে, তাঁহার নাম চিন্তা ধ্যান যেন অভ্যাস করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সিদ্ধাই' (যোগবিভূতি)-কে বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণ্যই মনে করিতেন। সকল মহাপুরুষেরই এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রের যখন ব্যাপক অধ্যয়ন-অধ্যাপন ছিল, ধর্মজীবনের প্রতি মানুষের যখন একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তখন মানুষ কোনটি সার কোনটি অসার তাহা বুঝিত, কাহার দাম এক টাকা আর কাহার মাত্র এক পয়সা তাহা জানিত। সে বিচার করিত, পরীক্ষা করিত, তাহার পর কোন কিছুকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিত। তাই অতীন্দ্রিয়তার অর্থ ছিল তখন সুস্পষ্ট। অতীন্দ্রিয়তার সুযোগে হীন স্বার্থ তখন মানুষকে ঠকাইতে পারিত না। তখন যোগী ছিল, ম্যাজিকওয়ালাও ছিল, কিন্তু ম্যাজিকওয়ালা যোগীর ছদ্মবেশে আসিলে ধরা পড়িয়া যাইত। আজ কিন্তু ধরা পড়ে না; পড়িলেও অনেক বিলম্বে অনেকের অনেক ক্ষতি করিয়া পড়ে। কারণ আমরা শাস্ত্র পড়ি না, শুনি না—ধর্ম জিনিসটা কি তাহা তলাইয়া দেখি না, দেখিবার সময়ও নাই; ফলে হয় আমরা অতীন্দ্রিয় বলিতে যাহাকিছু স· (ভগবান, আত্মা, ধর্ম, পরলোক ইত্যাদিও) হাসিয় উড়াইয়া দিয়া পুরাপুরি নাস্তিক বনিয়া যাই, নয়তো সাধারণ বুদ্ধি যুক্তি পরীক্ষা প্রভৃতি তালাবন্ধ করিয়া বিচারহীন বিশ্বাসে 'বিরিঞ্চিবাবা'র শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করি। 'অতীন্দ্রিয়তার' বৃহৎ ধামা আমাদের চোখ হইতে অসংখ্যপ্রকার ছল চাতুরী দুর্নীতি প্রবঞ্চনা চাপা দিয়া রাখে।

সাহিত্যে সন্ন্যাসী

জর্জ ইলিয়ট তাঁহার 'রমলা' (Romola) উপন্যাসে বিশেষভাবে যে দুটি সন্ন্যাসীর (সাভোনারোলা ও ফ্রা লুকা; প্রথমোক্ত জন অবশ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি) চরিত্র আঁকিয়াছেন তাঁহাদের বৈরাগ্য, বিশ্বাস এবং চরিত্রবল পাঠকের হৃদয়কে অভিভূত করে। আনাতোল ফ্রাঁসের বিখ্যাত 'থাই' (Thais) গ্রন্থের উপজীব্য সন্ন্যাসজীবনের উত্থানপতনের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসে সংসারত্যাগীদের কথা আছে—'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম গোস্বামী, 'সীতারাম'-এর 'পরমযোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী', 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দপ্রমুখ ত্যাগব্রতধারী 'সন্তানগণ'। 'অসামাজিক' হইলেও ইঁহারা সমাজের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন, 'সামাজিক' নরনারীর সেবা করিতেছেন, তাহাদিগকে সুপরামর্শ দিতেছেন। 'বিষবৃক্ষে' 'ব্রহ্মচারী'র বর্ণনা ও কথোপকথনে গৃহত্যাগী তাপসের এই লোককল্যাণব্রত কী সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে!

পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারী বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন-রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ—কতক কতক শ্বেতবর্ণ। একহাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। * * * পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময় হইল—পথিক কোথায় পথ,

কোথায় অপথ কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ, সব সমান।

* * *

শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ নেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাঁহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান, তাঁহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারেন না।

* * *

সূর্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের প্রয়োজন নাই।" ব্রহ্মচারী।—আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' এবং স্পর্শমণি' কবিতাদ্বয়ে বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত এবং বৈষ্ণবসন্ন্যাসী সনাতনের কামকাঞ্চননিস্পৃহ ঊর্ধ্বতর জীবনসাধনার যে মহিমময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই অনুপম। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'ও এক সেবাব্রতী যুবক সন্ন্যাসীর সুন্দর ছবি দেখিতে পাই।

'বাঙলার মোঁপাসা' প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় কিন্তু সন্ন্যাসী জীবটিকে সিধাভাবে দেখিতে পারেন নাই। 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নায়ককে প্রথমে সন্ন্যাসী সাজাইয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইয়াছেন। আর একখানি বইতেও সপরিবারে লঞ্চে ভ্রমণ-রত জনৈক ভদ্রলোক কর্তৃক ঝড়ে নৌকাডুবির ফলে জলমগ্ন এক সন্ন্যাসীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া অনূঢ়া কন্যার দ্বারা সেবাশুশ্রূষার পর সেই কন্যার সহিত পরিণয় ঘটাইয়া গল্পের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বেচারীও উচ্চশিক্ষিত, শুধু তাহাই নয়, ইনি আবার বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী! উচ্চশিক্ষার সহিত ত্যাগবৈরাগ্যের একত্রাবস্থান যেন 'বাঙলার মোঁপাসা'র দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব।

উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাহিত্যের উপাদান হিসাবে সন্ন্যাসীও বাদ পড়েন না। কোন কোন সাহিত্যে তাঁহার জীবনাদর্শটি উজ্জ্বল করিয়া দেখানো হইয়াছে, কোথাও কোথাও তিনি শুধু পাঠকের ঘৃণা ও ব্যঙ্গরসের বস্তু হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার গৌরব বা লাঞ্ছনা নির্ভর করিয়াছে সাহিত্যস্রষ্টার মানসিক এবং আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস্তবিকপক্ষে সংসারবাসী শত শত নরনারীর কাছে এক বিরাট কৌতূহল বা উপেক্ষার পাত্র। তাঁহার জীবন-মর্ম অনেকেরই নিকট বোধগম্য নয়। অনেকেরই নিকট তিনি শুধু পরান্নভোজী নিষ্কর্মা 'সমাজের ভার'। সংসারের এই 'মেজরিটি'র মনোভাব তাহাদেরই চিত্ত-বিনোদনের জন্য সৃষ্ট সাহিত্যে যে প্রতিফলিত হইবে ইহা ইহা স্বাভাবিকই। আজকাল তাই দেখিতে পাই, বহু গল্পে উপন্যাসে আদিরস বা হাস্যরস সঞ্চার করিবার প্রয়োজনে কোন আশ্রম এবং আশ্রমবাসী সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র বাছিয়া লওয়া হয়। সেই আশ্রমে আশ্রমবাসিনীরও অবতারণা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। বাঙলা কথাসাহিত্যের এই ক্রমবর্ধমান হাল্কা ধারাটির দিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পড়া উচিত। সু এবং কু জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আছে। একটি সুচিরপ্রতিষ্ঠিত বহু-গৌরবান্বিত আদর্শের বিকৃতির দিকটিকেই সাহিত্যের উপজীব্য করিয়া জনচিত্তবিনোদনের সহজ চেষ্টা নিশ্চিতই জাতির ঐতিহ্যরক্ষার অনুকূল নয়।

প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা

সমীর বাবু একদিনকার প্রেক্ষাগৃহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন। শাসকরূপে সাহেবরা এই দেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু সাহেবিয়ানার

রূপ-রস-গন্ধ জায়গায় জায়গায় দৃঢ়মূল করিয়া বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই চৌরঙ্গীর প্রেক্ষাগৃহগুলিতে বসিয়া বিদেশী ছবি দেখিবার ভিড় সমানেই লাগিয়া থাকে। সমীরবাবু সেদিন 'মেট্রো'তে গিয়াছিলেন আভিজাত্যের হাওয়া লাগাইবার মোহে নয়, খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথম দিককার সুখ-দুঃখ আশা-সংঘর্ষের করুণ কাহিনী-সম্বলিত বহু-প্রশংসিত 'কোন্ পথে যাও' (Quo Vadis) চিত্রটি দেখিতে—ঐতিহাসিক এবং ধর্মানুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই। পর্দার ছবি দেখিয়া অবশ্যই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু পর্দার সম্মুখে বৃহৎ হলঘরে সারি সারি সজ্জিত দর্শকবৃন্দের আসনে আর একটি যে চিত্র চোখে পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার চিত্তকে বিষম বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। যাঁহারা ছবি দেখিতে আসিয়াছেন —তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বাঙ্গালী-মাদ্রাজী-গুজরাটী-মাড়োয়ারী-পাঞ্জাবী-পার্শী-অ্যাংলোইণ্ডিয়ান —তাঁহারা সকলেই ভারতবাসী, কিন্তু সমীরবাবুর মনে হইল তিনি যেন ভারতবর্ষে বসিয়া নাই। তাঁহার আশে আশে সম্মুখে পিছনে যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদের অনেকেরই জন্ম যেন ভারতের মাটিতে নয়। কি পোষাকে, কি চালচলনে, কি চাহনিতে, কথাবার্তায় একটি উগ্র বৈদেশিক গন্ধ যেন সবস্থানে বাহির হইতেছে! ভারত যখন বিদেশীর অধীন ছিল তখন এই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকমণ্ডলী যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বসিতেন এখনও ঠিক একই পরিবেশ। লোকগুলির গায়ের চামড়াই শুধু সাহেবী-সাদা নয়।

চকিতে সমীরবাবুর দৃষ্টি দর্শকবৃন্দের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া যেন তাঁহাদের ভিতরকার মনকে দেখিতে সমর্থ হইল। সমীরবাবুর মনে হইতেছিল আজাদ্ হিন্দুস্থানের এতগুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন প্রাদেশিক আচারব্যবহার সম্পন্ন নরনারী যাঁহারা প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে ভারত-সংস্কৃতির কোন যোগসূত্র নাই, তাঁহাদিগকে এখানে এক করিয়াছে 'পাশ্চাত্ত্যরুচি।' প্রশ্ন জাগিতেছিল, আজ প্রেক্ষাগৃহে যাঁহারা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের রোমান রীতিনীতির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, খ্রীষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রভাব দেখিয়া মুগ্ধ, খ্রীষ্টীয় শহীদদের ত্যাগ ও বিশ্বাসের নিদর্শন ছবিতে প্রত্যক্ষ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ আবেগে 'আহা' 'আহা' করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ভাল করিয়া জানেন, কয়জন হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত? ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট 'খানাপিনা ও ডেরা' দিবার একটি ভৌগোলিক ভূমিবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানকার ধর্ম, এখানকার ইতিহাস, এখানকার সমাজ-শিল্প-সাহিত্য, মঠ-মন্দির-দেবতা—এ সকলের সহিত গভীর তাদাত্ম্যবোধ এই প্রেক্ষাগৃহবিলাসীদের মধ্যে কয়জনের আছে? আমরা যখন পরাধীন ছিলাম তখন 'স্বাদেশিকতা' কথাটি লইয়া ভাবিতাম—দেশীয় রুচি, দেশীয় আদর্শ, দেশীয় পোষাক, দেশীয় খাদ্য, দেশীয় ভাবধারার মর্যাদা দিতাম। আজ কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়া সেই দৃষ্টি আমাদের নাই। স্বাদেশিকতার সাধনা যেন আমাদের শেষ হইয়াছে। ইংরেজরা রাষ্ট্রাধিকার হইতে সরিয়া যাক্ এই টুকুই যেন ছিল আমাদের আজাদীর লক্ষ্য। আজ যেন আমরা যাহা খুশী তাহাই করিতে পারি। ভারতবর্ষে বাস করিয়া যেন তেন প্রকারেণ ছলেবলেকৌশলে একটা মোটা মাহিনার চাকুরী বা মোটা টাকার অন্য কোন রোজগারের পন্থা লইয়া পাশ্চাত্ত্যের ভোগ-বিলাস যতটা পারা যায় নিংড়াইয়া জীবনযাপন করিতে পারিলেই যেন স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা-গিরিতে কোন ফাঁক রহিল না। আর কোন দায়িত্ব নাই, আর কোন অন্বেষণ নাই, আর কোন কর্তব্য নাই। সমীরবাবু আরও ভাবিতেছিলেন, এই পোষাকে-সাহেব মনে-সাহেব ভারতীয়তাশূন্য ভারতীয় অভিজাতম্মন্যগণের মধ্যেই হয়তো এমন বহু

আছেন যাঁহাদের উপর সরকারীভাবে দেশবাসীর শিক্ষা ও সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের ভার আজ রহিয়াছে বা কাল থাকিবে। ইঁহারা এদেশের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে ভারতীয়ভাবে কতটা পরিচালিত করিতে পারিবেন ?

সমীরবাবুর অভিজ্ঞতায় যে নিরাশা এবং আশঙ্কার কালো ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কিছুটা হয়তো তাঁহার মনঃকল্পিত—কিন্তু ঐ চিত্রের মধ্যে যে অনেকখানি বাস্তবতা আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা আলাদা জিনিস। দেহের গোলামি অপেক্ষা মনের গোলামি অনেক বেশী মর্মান্তিক নয় কি ?

সংস্কৃতশিক্ষা-প্রসঙ্গে

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সংস্কৃত সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু সংস্কৃতকে আবশ্যক (Compulsary) শিক্ষণীয় বিষয় করিবার বিপক্ষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন :—

"প্রাচীন ভারতকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা কাজে লাগে বটে, কিন্তু ছাত্রগণের জন্য ঐ ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করিবার আগে উহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আটচল্লিশ-বৎসর পূর্বে আমি যখন ইংলণ্ডে পড়াশুনা করিতেছিলাম তখন লাটিন ও গ্রীককে আবশ্যক শিক্ষিতব্য বিষয় করা হইবে কিনা ইহা লইয়া ঐ দেশে একটি বিতর্ক উঠিয়াছিল। ইওরোপীয় সংস্কৃতির উপর ঐ দুটি ভাষার প্রভূত প্রভাব আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক মনীষী তখন মত দিয়াছিলেন যে, বিদ্যার্থিগণের উপর ঐ ভাষাদ্বয় জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নয়।"

আমাদের মনে হয়, ইওরোপীয় সংস্কৃতির উপর লাটিন ও গ্রীক্ ভাষার প্রভাব ও ভারত-সংস্কৃতির উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব সমপর্যায়ের নহে। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার (লোকসভার সহকারী স্পীকার) যথার্থই বলিয়াছেন :-

"সংস্কৃত গ্রীক ও লাটিনের ন্যায় মৃত ভাষা নয়। শেষোক্ত ভাষাদুটির জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না, সংস্কৃত কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎসস্বরূপ।"

'ছাত্রদের উপর জোর করিয়া চাপানো'—নেহেরুজীর এই উক্তিতে একটি ফাঁক আছে। যে বয়সে বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে পড়ে, সেই বয়সে পাঠ্যনির্বাচনের যুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের কতটুকু ধারণা থাকে ? কি পড়া উচিত, না উচিত এ বিচারের ভার কি বিদ্যার্থিগণের, না শিক্ষাধারার ব্যবস্থাপকগণের—যাঁহারা জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণকে জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব লইয়াছেন ? দরকার হইলে জোর করিয়া তিক্ত ঔষধও রোগীকে খাওয়াইতে হয়, সামরিক প্রয়োজনে ভাল লাগুক, না লাগুক প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে আইন করিয়া সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া লইতে হয়। তেমনিই শিক্ষার মাধ্যমিক অবস্থায় তিন বা চার বৎসর যদি ভারতীয় বিদ্যার্থীর পক্ষে সংস্কৃত অবশ্য-পাঠ্যই করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে 'জোর করিয়া চাপানো' বলে না। উহা আদৌ সময় নষ্ট নয়, অত্যাচারও নয়। যদি পরবর্তী জীবনে ইস্কুলে অধীত সংস্কৃতের অধিকাংশই কোন ছাত্র ভুলিয়াও যায়, তাহাতেও ঐ ভাষাশিক্ষার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। সে তো রসায়নশাস্ত্রও ভুলিতে পারে, জ্যামিতি ভূগোলও ভুলিতে পারে। যেটুকু তাহার মনে থাকিবে তাহা দ্বারা তাহার সাংস্কৃতিক জীবনের বহুল উপকার সাধিত হইবে। সুযোগ ও অবসর মতো ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য নীতি সম্বন্ধে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীগুলির সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনা তাহার থাকিবে। (অনুবাদ পড়িয়া গভীরে যাওয়া যায় না, সংস্কৃত শব্দের ও বাক্যের অন্তর্নিহিত রসের ও শক্তির উপলব্ধি হয় না।) এই পরিচিতি বিদ্যা-বিলাস নয়—ভারত-সন্তানের অবশ্য কর্তব্য।

কালবৈশাখী

শ্রীমতী রেণুকণা দেবী

বৈশাখ-শেষে উড়ায়ে আকাশে পিঙ্গল জটাজাল
রক্তনয়নে হানে সঙ্কেত, এল কি রে মহাকাল ?
ঈশানের কোণে বাজিছে বিষাণ দ্রিমিকি দ্রিমিকি রবে
মসীময় কালো আঁধার ঘনালো সহসা ঢাকিল সবে।
কালবৈশাখীবেশে ভৈরব আসে বুঝি ঐ আসে
স্তব্ধ ধরণী নির্বাক চায় অপলক-চোখে ত্রাসে।
তুলিছে হস্তে অতি প্রচণ্ড পিনাক ভয়ঙ্কর
সংহার-মাখা অট্টহাসিতে কম্পিত চরাচর।
বিদ্যুৎ ছোটে ত্রিনয়নকোণে স্ফুলিঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে
বিদীর্ণ ঐ গগন-প্রান্ত হতে নামে ধরাসনে।
প্রমত্ত ঝড় গরজিয়া ধায় শন্ শন্ মহাবেগে,
হাড়-মালা ছাল নরকঙ্কাল খসে পড়ে দশ দিকে।
তাথৈ তাথৈ দেন করতালি তাণ্ডবে ধূর্জটি
ডম্ ডম্ ডম্ ডম্বরু তালে নাচিছে চরণ দুটি।
অসংখ্য ধারা পড়ে আছাড়িয়া প্রলয়ের কলরোলে
নিঃশেষে বুঝি মিশে যাবে সব মহাকাল-পদতলে।
জীবন-মৃত্যু চরণে দলিয়া করিছ কি প্রভু খেলা ?
থামাও থামাও নৃত্য তোমার হে নটরাজ ভোলা।
প্রলয়-বিলাস হেরি শঙ্কায় চিত্ত মোদের কাঁপে
হর হর তব ভয়হর নাম রসনা সতত জপে।
রুদ্ররূপী হে কালবৈশাখী সম্বর ক্রোধ তব
আঁধার সরায়ে হও প্রকাশিত সুন্দর সৎ শিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শ

(এক)

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজন্মজয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।)

পুণ্যশ্লোকা শ্রীমা সারদাদেবীর শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীতে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে আমি আনন্দিত। সকল যুগের সকল নরনারীর হিতার্থে যাঁহারা সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাইতে আমি আজ এখানে আসিয়াছি। বাস্তবিক, আমাদের বর্তমান সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শ্রীমার পবিত্র জীবনের বড়ই প্রয়োজন। আমরা এই যুগে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া লক্ষ্যহারার মতো পথ চলিতেছি। এইরূপ দুর্দিনে রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। আমাদের সকলেরই এই বাণী শ্রবণ করা কর্তব্য। শ্রীমা সরলতা ও সত্যের প্রতিমূর্তি। আজিকার জগতে মানবজাতি যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, এগুলির যথার্থ মীমাংসার জন্য সরলতা ও সত্যেরই সর্বাধিক প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনও এখন বহুসমস্যাসংকুল। ইহা খুবই সত্য যে, সমস্যাসমূহের অনেকগুলি রাজনৈতিক। আমাদের জীবনকে অধিকতর সুন্দর ও শুভময় করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এমন কি, রাষ্ট্রনীতিও বহুলাংশে নৈতিক প্রশ্ন ও ধার্মিক বিচার-সাপেক্ষ। কতকগুলি নৈতিক মান পরিবর্জন করার ফলেই রাষ্ট্রিক সমস্যাসমূহ অনেকাংশে সমুদ্ভূত। বর্তমান সংকটকালে গভীর চিন্তা ও স্থৈর্যের সহিত আমাদিগকে সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যে-সকল যুগন্ধর মহামানব আমাদিগকে জীবনাদর্শ দেখাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাণী অনুসরণ করিয়াই আমরা আমাদের জীবনকে যথার্থ বুঝিতে পারিব। ভারত, সিংহল ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ পরম ভাগ্যবান যে, তাহাদের মধ্যে লোকোত্তর মহাপুরুষ ও বড় বড় নেতৃবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের বাণী আমরা উপেক্ষা করিয়াছি, কারণ তাঁহাদিগকে ধীর স্থির ভাবে বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। বর্তমান জগতের অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কি ব্যষ্টির জীবনে অথবা সমষ্টির জীবনে কূটবুদ্ধিপ্রসূত উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কিছু কিছু ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাও উপর উপর। বস্তুর যথার্থ মূল্য-অবধারণার মূলে যে গভীর সত্য রহিয়াছে—উহা এবং প্রাত্যহিক জীবনে উহার ব্যাখ্যা—এই দুটিই কেবল আমাদিগকে পথের নির্দেশ দিতে পারে। যে-মুহূর্তে আমরা ইহা ধরিতে পারিব, স্বতঃই তখন আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া এক মহত্তর পৃথিবী গড়িয়া তুলিব।

এসকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা কর্তব্য। আমরা নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। আমরা অল্পে তুষ্ট, নিজেদের পারিবারিক সুখেই পরিতৃপ্ত। মানুষ আমরা, অতএব মানুষের মতোই আমাদের চিন্তাধারা থাকা উচিত। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে

ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে কেবল সংঘবদ্ধ বুঝাপড়া ও পারস্পরিক প্রেমই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে এইসকল নিহিত আছে, আর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জগতের নিকট ইহা প্রচার করিতেছেন। যদি আমরা মুক্তি চাই, তবে আমাদের প্রয়োজন এই প্রেমের—যে প্রেমের বার্তা ভারতে ও সিংহলে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য মুনি-ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট বাণীগুলি যদি আমরা জীবনে অনুসরণ করি, তাহা হইলে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে পারিব। আজকাল এরূপ বুনিয়াদের একান্তই অভাব। শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাসের উপযোগী অবস্থার পরিবর্তে আমরা পাইতেছি নিত্য নূতন নূতন মারণাস্ত্র-আবিষ্কারের ভীতিপ্রদর্শন। আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এইসকল আবিষ্কার পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে। আরও অধিকতর ধ্বংসকারী আণবিক অস্ত্র-আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, কারণ আমাদের ভয় এই যে, আমাদের শক্তিশালী আণবিক বোমা অপেক্ষা অন্যে অধিকতর বিধ্বংসী বোমা প্রস্তুত করিতে পারে। মানবজাতিকে বাঁচিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ প্রেম ও শুভেচ্ছার দরকার। আমরা এমন সময়ে বাস করিতেছি যখন আমাদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, যাহার ফলে ভারতের স্বাধীনতালাভ হইল। সেই সময়ে লোকে বলিয়াছিল—এত বড় ক্ষমতাশালী ব্রিটিশ জাতির সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আমরা কি করিতে পারিব? কিন্তু ভারতের নরনারীগণ অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সাহায্যে জড়শক্তিতে বলীয়ান ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সেই সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণের ও ভারতীয় ঋষিগণের শিক্ষাই প্রচার করিয়াছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের প্রথম কাজ হইয়াছিল ব্রিটিশদের নিকট আমাদের বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করা।

বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই দৃঢ়তর অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে সচেষ্ট, কারণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো লড়াইয়ের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের দেশের ও পৃথিবীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনগুলি মিটাইতে পারিবেন—এরূপ লোকদেরই দরকার। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা সুসংগত অভিমত আছে যে, এই জড়জগতে বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে মস্তবড় কিছু পাইবার আশা বৃথা। প্রথমতঃ আমাদিগকে এই আধ্যাত্মিক শক্তি কি তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, সেই শিক্ষাই অধুনা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান প্রচার করিতেছে, কারণ এই সংস্থা ন্যায় ও সত্যের পতাকাই বহন করে, আর এই শিক্ষাই আমাদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের প্রেম থাকিবে। অন্যায় ও ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করিলেই প্রেম জন্মিবে। স্বার্থচিন্তা না করিয়া চলুন আমরা নৈতিক উন্নয়নের কথা বেশী ভাবিতে থাকি। উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুসারে মানুষের জীবন পরিচালিত হওয়া উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেই মানবজাতি সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে।

(দুই)

অধ্যাপক এস্ বেঙ্কটরমণ

(অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়)

(বিশাখাপত্তনম্ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ; অনুবাদক—শ্রীনৃত্যগোপাল রায়)

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দেবমানব সহস্র বৎসরে দেশে দু'একবারই মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

তুলনা পাই গৌতম বুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দু আধ্যাত্মিকতা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম বিধি ও স্থত্রের গোঁড়ামির কলরবে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই সে সময়ে ইওরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু উপদেশ দ্বারা নহে— স্বীয় সাধনাদ্বারা বিভিন্ন বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় এবং বিভিন্ন আদর্শবাদের ঐকতান আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও গোঁড়ামি ছিল না—তিনি প্রচার করিলেন যে, সকল ধর্মমতেরই সারাংশ সত্য। কঠোর নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত-অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনটি পন্থা অনুসরণ করিতে তিনি উপদেশ দেন— কথনও ঈশ্বরানুরক্তি মন্দীভূত হইতে না দেওয়া, ভগবদ্ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা করা, আর শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পথের আলো জ্বালিয়াছিলেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যেরা সেই আলোকশিখা অনির্বাণ রাখিয়াছেন— ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নৃশংস লক্ষ্য যখন সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বশান্তির জন্য সেই জ্যোতিঃশিখা জগতের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া দেওয়াই একমাত্র অপরিহার্য পথ।

(তিন)

শ্রীচন্দুলাল ত্রিবেদী

(বিশাখাপত্তনম্ শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতি অন্ধ্র-রাজ্যপালের ভাষণ হইতে সঙ্কলিত; অনুবাদক— শ্রীনিত্যগোপাল রায়)

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের পক্ষে হিন্দুসংস্কারের যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতির ধারা অধোগামী হইয়া নিম্নতম খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে—ফলে বহুবিধ অশুভ ও অনিষ্টকর সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ সুদীর্ঘকালের মুসলমান রাজত্বের চাপে এবং পরে ব্রিটিশ প্রভুত্বের আওতায় মিশনারিগণের জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার বদ্ধপরিকর প্রচেষ্টার ফলে হিন্দুগণ— তথা হিন্দুধর্ম নিতান্ত দীনহীনভাব পরিগ্রহ করে। এইরূপ অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে কতিপয় প্রথিতযশা মনস্বীর জন্মগ্রহণ আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় এবং দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্মকে অমঙ্গলকর বহুবিধ কুপ্রথার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন এবং যথাক্রমে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ই কালক্রমে নিথর হইয়া পড়িল। উভয় সম্প্রদায়ই প্রভূত সার্থক ও মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, কিন্তু কালের বিচারে তাহাদের উপযোগিতা সেই সেই যুগের পরিসরের সীমানায়ই পর্যবসিত। পক্ষান্তরে দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে আমরা যাহা পাই না, শ্রীরামকৃষ্ণে আসিয়া আমরা তাহাই পাই— তাঁহার কাছ হইতে আমরা যে শিক্ষা ও বাণী পাইলাম আজও তাহা যেমন জীবন্ত তেমনি অমোঘ। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে যে বাণী, যে জীবনবেদ প্রদান করিলেন, তাহা তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য দীপ্তি উজ্জ্বলতম। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শুধু আমাদের স্বদেশেই নহে— আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশবিদেশেও বহু আশ্রম ও মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্বে নাগপুরে আমার রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিবার প্রথম সুযোগ ঘটে। সেই সময় হইতে আমি পাঞ্জাব, ওড়িষ্যা, অন্ধ্র যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই এই যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার যে দিকটা আমাকে সর্বাধিক আকৃষ্ট

করে তাহা হইল সেবার ভাব— যে ভাবের তন্ময়তায় তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন এবং যে ভাবটি তিনি প্রচার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু হইলে এবং কর্মী নিষ্ঠাবান হইলে কোন সৎকার্যই অর্থাভাবে ব্যাহত হয় না। রামকৃষ্ণ মিশনে যে সন্ন্যাসিবৃন্দ রহিয়াছেন তাঁহারা অনিন্দনীয় আদর্শকর্মী এবং আমি আশা করি তাঁহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সহজেই পাইবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সৎকার্যে সাহায্য করা এবং অর্থাভাবে বা কর্মীর অভাবে সেইসব সৎকার্য যাহাতে কখনও প্রতিহত না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষ নিজে যতই কর্মব্যস্ত হউক না কেন, মাঝে মাঝে অপরের ভাবনা ভাবাও তাহার কর্তব্য। শান্তি এবং চিত্তের নিরুদ্বেগ ভাব লাভ করিতে আত্মসমাহিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করা এবং ধ্যানাভ্যাস সততই কল্যাণকর। যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি আজ আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতেছি সেই মহাপুরুষের কোন কোন শিক্ষাও যদি আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে এবং অভ্যাসে রূপায়িত করিতে পারি, তবে আজিকার সান্ধ্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যথার্থই অনেকাংশে সার্থক হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী মীরা সিংহ, এম্-এ

ভারতকে আপনার প্রকৃত সংস্কৃতি ও সত্তা, অর্থাৎ অধ্যাত্মবোধ ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং এই অপূর্ব শক্তিতে মহীয়ান হ'য়ে সুদূর ভবিষ্যতে একমাত্র ভারতই পারবে সমস্ত জগতের সমস্যার সমাধান করতে—এ কথা আজ আমাদের অনেক চিন্তাশীল মনীষীই বলে থাকেন। পৃথিবীর সকল দেশ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের শেষ সীমায় এসে এমন এক জায়গায় পৌছবে, যেখানে সকলে নির্বাক ও নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে। এই বিস্ময়ের সমাধান ক'রতে, এই বিরাট প্রশ্ন উপলব্ধির পথ দেখাতে, তখন এগিয়ে আসবে এই ভারত। সন্ধান দেবে এমন সত্যের যার পর নেই কোন জিজ্ঞাসা, নেই কোন বিক্ষোভ ও অতৃপ্তি। তার পর আছে কেবল পরম শান্তি ও বিশ্বাস। পরমহংসদেব ভারতের এই চিরন্তন সংস্কৃতির একটি রূপ ও পরিচয়। বিজ্ঞান যেখানে অচল, বিজ্ঞান যেখানে পঙ্গু, সেখান হ'তে শুরু হ'য়েছে ভারতের সাধনা। অজ্ঞতার তিমিরে ভারতের এই সাধনা লুপ্তপ্রায় হ'তে বসেছিল। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আসলেন অবিশ্বাস-সংক্ষুব্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগৃতি দিতে।

যে চরম ও পরম সত্যকে বিজ্ঞান প্রমাণ ক'রতে পারেনি, তা তিনি তাঁর জীবনমহাকাব্যে প্রত্যক্ষ ক'রে তুললেন। তিনি ধর্মকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তাঁর কর্মধারা কবিতায় পরিণত ক'রলেন। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে ছন্দ, তা ছন্দ নয়; পৃথিবীকে বাদ দিয়ে যে সঙ্গীত, তা সঙ্গীত নয়;—কবিতা, ছন্দ ও সঙ্গীত ওতপ্রোত ভাবে পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে থাকবে, তবেই হবে তাদের প্রকৃত বিকাশ। ঠিক এই কারণেই সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে অসাধারণের, লৌকিকের সাথে অলৌকিকের, সংসারের সাথে সন্ন্যাসের সংমিশ্রণে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিস্ফুটন হ'য়েছে। বিভিন্ন ভাবের ও বিপরীত রসের সমাবেশে তিনি এক মহাসম্পূর্ণতা এনেছেন। তাঁর এই মহাসঙ্গীতে তিনি জগতের সুন্দরতম সৃষ্টি নারীকে কোনমতেই বাদ দিতে

পারেন না। বুদ্ধদেব ও নিমাইয়ের সাধনা গোপা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে একপ্রকার বাদ দিয়েই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখি। তিনি স্বেচ্ছায় সারদাদেবীকে গ্রহণ ক'রলেন, দেহকে অবলম্বন ক'রে দেহাতীত হওয়ার সুকঠোর ব্রত অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর জীবন-মহাকাব্যে এমন এক আদর্শ-প্রতিষ্ঠা ক'রলেন যা নর-নারীর ইতিহাসে অভাবনীয় ও অশ্রুতপূর্ব। এতে নর-নারীর মিলনের মত্ততা নেই, কেবলমাত্র ভোগ ও লালসা নেই। এতে আছে পুরুষ ও নারীর Spiritual Union বা আত্মিক-মিলন। আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই আমরা মুগ্ধ হই শ্রীমায়ের নীরব সহায়তা দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকে সুষ্ঠু করতে আমরা মায়ের অপূর্ব ধৈর্য, প্রেম ও মহত্ত্বপূর্ণ নারীত্বের পরিচয় পাই।

ষোড়শীপূজার দিন পরমহংসদেবের কাছ হ'তে শ্রীমা নারীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পেলেন। ইহা যথার্থ যে, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারবঞ্চিতা নারীকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ঠাকুরের সারদাদেবীকে গ্রহণ ও ষোড়শীপূজা-কল্পনা। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে। সারদাদেবী ষোড়শীপূজার দিন, সকলের আধারভূতা এই মাতৃরূপে বিভূষিতা হ'লেন। সীতা সতীত্বের প্রতীক, রাধা প্রেমের আধার, কিন্তু সবকিছুর মিলিত সার্থকতা নিয়ে শ্রীমায়ের মাতৃরূপ ফুটে উঠল। এখানে তিনি অতুলনীয়া। "আমি পাতান মা নই, কথার কথা মা নই—আমি সত্যিকারের মা।" এই মাতৃত্বে ধনী, দরিদ্র, সজ্জন দুর্জন, দুর্বল ও শক্তিমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পরম-হংসদেবের কাছে বাছবিচার আছে, কিন্তু শ্রীমায়ের কাছে পাপী তাপী যে কেউ 'মা' বলে ডেকে কখন ফিরে যায় নি। শ্রীমায়ের মাতৃত্বকে, এই 'ক্ষমারূপ তপস্যা' মাধুর্যে পূর্ণ ক'রেছে। তিনি ব'লতেন, "কারু দোষ দেখতে পারতুম না, ওটি শিখি নাই।"

ষোড়শীপূজার দিন ঠাকুর শ্রীমাকে সর্বগুণে ভূষিত ক'রলেন। কিন্তু মায়ের বিশেষত্ব এই যে তিনি অসাধারণ হয়ে রইলেন না, সাধারণের সাথে সুন্দরভাবে মিশে চললেন। দৈনন্দিন সংসারের কাজের কোন ত্রুটি রাখলেন না, অথচ তারই মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অন্তঃস্থিত দেবীর পূজা করে যেতে লাগলেন। তাঁর জীবনে আমরা দেবী ও মানবীর অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাই। এখানে সহজ ও অসহজের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সারদা-দেবীর সাধনা পৃথিবীকে বাদ দিয়ে নয়। পৃথিবীর শোকতাপ দুঃখকষ্টের সাথে নিজেকে জড়িয়েই তাঁর দেবীত্ব। সাধারণ বাঙ্গালী কুলবধূর মত তিনি সংসারের সকল কাজ করতেন। কিন্তু এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ এমন এক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সাথে ক'রতেন যে, তা পূজার অর্ঘ্যের মতই প্রতিভাত হ'য়ে উঠত। এমনিভাবে সব সাধারণ কাজের মধ্যেও ক'রতেন পরমসুন্দরের ধ্যান। তাই প্রতিটি কাজ তাঁর হ'য়ে উঠত পূজার ফুলের মত শুচিসুন্দর। প্রেম, স্নেহ, ত্যাগ ও সেবা তাঁর প্রতিটি ছোটখাট কাজের সাথে সুন্দরভাবে জড়িয়ে ছিল। সেবাধর্ম দিয়ে তিনি তাঁর নারীত্বকে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'সেবারূপিণী আনন্দময়ী'। স্বামিসেবা, অতিথিসেবা ও সন্তানসেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেবী হয়ে উঠেছেন। শ্রীমায়ের মধ্যে আমরা এমন এক বিশেষত্ব দেখি যা উল্লেখ না ক'রে পারা যায় না। তাঁর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করবার কোনরকম চেষ্টা আমরা দেখি না। তাঁকে আমরা অল্পই ভাব-সমাধিস্থ হ'তে দেখেছি। চুপি চুপি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলত তাঁর সাধনা। তিনি সর্বংসহা মাতৃরূপে তাঁর সবকিছু ঢেকে রেখেছিলেন। মা ছিলেন যেন ছাইচাপা আগুনের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বাণী ও তাঁর আবির্ভাবকে সার্থক করবার জন্যেই সারদাদেবীর আগমন। শ্রীমা

ও পরমহংসদেব যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ব'লেছিলেন, "আমার শরীরটা চ'লে গেলে তুমিও যেন শরীর ছেড়ে চলে যেও না; শুধু কি আমার দায়? তোমারও দায়?" শ্রীমায়ের উপর সকল ভার দিয়ে পরমহংসদেব নিশ্চিন্তে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মা তাঁর অকৃত্রিম সেবা ও প্রেমে সন্তানদের অভয় দান করতে লাগলেন। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর তিনি সঙ্ঘের কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। স্বামীজী তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বিদেশে পরমহংসদেবের বাণী প্রচার করতে গেলেন। তাঁর মঙ্গলময় শুভেচ্ছা তাঁর সন্তানদের দিত সাহস, শক্তি, সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা ও পরমশান্তি।

নারীজাগরণের সন্ধিক্ষণে ঠিক এমনই এক নারীচরিত্রের একান্ত দরকার ছিল, যাকে আদর্শ করে নারী তার সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। পাশ্চাত্যের ভাবধারা অন্ধভাবে অনুকরণ ক'রে ভারতীয় নারীর রূপ হ'য়ে উঠবে অসুন্দর ও অসম্পূর্ণ। বৃক্ষের কাণ্ডকে বিনাশ ক'রে কোন প্রাণবন্ত ফল আশা করাই বৃথা। ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে নূতন ভাবধারার সংমিশ্রণ চাই। সারদাদেবীর মধ্যে আমরা এই সমাবেশ দেখতে পাই। পুরাতনের মাধুর্য ও নূতন যুগের ঐশ্বর্য নিয়ে শ্রীমায়ের রূপ। ভারতীয় নারী জাতির মূল আদর্শ মাতৃত্বকে অবলম্বন করেই ষোড়শীপূজা উদ্‌যাপিত হয়। আবার এই মূল আদর্শের সাথে মিলিত র'য়েছে শ্রীমায়ের বিশালতা, নব ভাবধারা গ্রহণের স্বীকৃতি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, "ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা…… শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও নূতনের সার্থক সূচনা।"

এই নারীপ্রগতির যুগ এমন এক 'মাতৃতীর্থ' পেয়ে ধন্য।

জয়রামবাটীতে অবিস্মরণীয় উৎসব

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ইং ১৯২৪ সালে জয়রামবাটীতে ঠিক মায়ের জন্মস্থানের উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। পূজার জন্য বেদীর উপর মায়ের একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকদিন হতেই সাধু ও ভক্তদের বাসনা হয়, ঐ মন্দিরে মায়ের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৫১ সালের ১১ই মে কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর ঐ ইচ্ছা আরও বলবতী হয় এবং মঠ কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়ায় কাশীর এক সুদক্ষ ভাস্করের ওপর ঐকাজের ভার দেওয়া হয়। বর্তমান বছরে পৃথিবীর সর্বত্র মায়ের শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে, কাজেই মন্দিরে মূর্তিপ্রতিষ্ঠার এই বৎসরই সব থেকে উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হয় এবং ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪ (বাংলা ২৫শে চৈত্র, ১৩৬০) বৃহস্পতিবার বাসন্তী সপ্তমীতিথিতে ঐ শুভকার্য সম্পন্ন হবে এইরূপ স্থির হয়। শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঐ সময় জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর তীর্থযাত্রারও ব্যবস্থা করা হয়। এই উভয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রায় দুমাস পূর্বে যাত্রীদের আহার বাসস্থান ও উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করার জন্য দুইজন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী জয়রামবাটী গমন করেন। জয়রামবাটী একটি ছোট

গ্রাম— মাত্র ৮০।৯০ ঘর সাধারণ গৃহস্থের বাস। কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন, প্রায় তিন সহস্র সাধু ও ভক্তের সমাবেশ হবে। ঐ ক্ষুদ্র গ্রামে তিন হাজার লোকের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, তবে ওঁদের বিশ্বাস ছিল যে শ্রীশ্রীমায়ের কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন। মন্দিরের সামনে পূর্বে কোনও নাটমন্দির ছিল না— এবার মন্দির-সংলগ্ন একটি সুন্দর প্রশস্ত নাটমন্দির ও তদুপরি ছোট নহবৎখানা উৎসবের পূর্বেই নির্মিত হয়। এপ্রিলের ৭ই, ৮ই ও ৯ই এই তিনদিন উৎসব হবে স্থির হয়। উৎসবে যোগদানেচ্ছু ভক্তদের নিকট পূর্বেই ট্রেনের সময়, কি কি জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হবে তার তালিকা ইত্যাদি সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল। আগমনেচ্ছু ভক্তদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করে পাঠাবার জন্য একটি ফর্মও প্রেরিত হয়। ৬ই এপ্রিল হতে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত যাত্রীদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হবে একথাও জানানো হয়। উৎসবের কয়দিন পূর্বেই অনুসন্ধান অফিস, স্বেচ্ছাসেবক অফিস ইত্যাদি খোলা হয় এবং ৪ঠা এপ্রিল হতে ভক্ত ও সাধুসমাগম এবং পূর্ণোদ্যমে কাজ চলতে থাকে।

গ্রামের লোকেরা সভা করে এই বৃহৎকাজে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করতে আশ্বাস দেয় এবং চালাঘর বাঁধবার জন্য জমি ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করে। আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হয়, তার দুপাশে দোকান, যাত্রামণ্ডপ, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তদের থাকার জন্য রাস্তার দুপাশে মোট ২৮টি খড়ের লম্বা দোচালা কুটীর নির্মিত হয়—একপাশে ১৪টি মহিলাদের জন্য এবং অপর পাশে ১৪টি পুরুষ-ভক্ত ও সাধুদের জন্য। উহার নিকটেই টিউবওয়েল, সেফটি পায়খানা এবং সামনের দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও খাওয়ার মণ্ডপ হয়েছিল। সাধুদের ঘর ছাড়া অন্য সবঘরে ইলেট্রিক লাইটের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন স্থান হতে চারিটি ডাইনেমো আনা হয় এবং আমোদর নদী হতে মন্দির পর্যন্ত প্রায় ২ ফার্লং রাস্তা, মন্দির, দোকান, বিভিন্নমণ্ডপ ইলেট্রিক আলোতে সজ্জিত করা হয়। স্থানীয় লোকরা এই প্রথম ইলেকট্রিক লাইট দেখে খুবই খুশী। উৎসবের কয়দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষুদ্র জয়রামবাটী গ্রাম একটি জনাকীর্ণ সুসজ্জিত শহরের রূপ ধারণ করত। স্নান ও পানীয়জলের বেশ ভাল বন্দোবস্ত ছিল। আমোদর নদীতে বাঁধ দিয়ে অনেক জল জমা করা হয়েছিল এবং মোট ১৪টি টিউবওয়েল বসেছিল। ধূলা বন্ধ করার জন্য রাস্তায় জল দেওয়ার বন্দোবস্তও করেছিলেন। উৎসবক্ষেত্রের সীমানা হয়েছিল প্রায় ২৫০০′ × ১২০০′ মেদিনীপুর, খড়্গপুর, বাঁকুড়া, ঘাঁটাল প্রভৃতি স্থান হতে স্পেশাল বাস ও লরী নিয়মিত চলেছিল এবং কোতুলপুর হ'তে জয়রামবাটী ছয় মাইল এবং জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর তিন মাইল রাস্তা এই উৎসব উপলক্ষে পাকা করা হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলাশাসক শ্রী ডি আয়েঙ্গার আই সি এস্ মহোদয়ের প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলেই সুদূর পল্লীগ্রামেও এইসব বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

উৎসবের কয়দিন তিনি সদলবলে ক্যাম্প করে ওখানেই ছিলেন এবং যাত্রীদের সবরকম সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করায় সকলেই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

কুটীরগুলিতে বহিরাগত প্রায় এক হাজার পুরুষ ভক্ত ও আটশত মহিলাভক্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক মহারাজ প্রমুখ প্রায় দুইশত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং সুদূর ব্রহ্মদেশ হতেও অনেক সাধু ও ভক্ত আসেন। জয়রামবাটী গ্রামে এবং আশে পাশের গ্রামেও অনেক ভক্ত আতিথ্য-গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, আরামবাগ প্রভৃতি

স্থানের এবং কলিকাতা ও হাওড়া হইতে আরও সর্বসমেত প্রায় পাঁচশত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক কয়দিন যাত্রীদের যথাসম্ভব সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এ ছাড়া বয়েজস্কাউট, অস্থায়ী ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল, দমকল প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত ছিল। সংবাদ-আহরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, নিয়মিত সময়ে সমাগতদের জন্য আহার, মায়ের জীবনী-বিষয়ক প্রদর্শনী, ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা, গভর্নমেণ্টের ফিল্ম প্রদর্শন এবং চিত্তবিনোদের জন্য রাতে যাত্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি সব বন্দোবস্ত অতি প্রশংসনীয় ছিল। ৬ই রাতে হাওড়া হতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত একটি স্পেশাল ট্রেনে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী ও সাধু আগমন করেন। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটী পযন্ত যাবার বাসের সুবন্দোবস্ত ছিল।

মায়ের মন্দিরের সামনে একটি সুন্দর যজ্ঞশালা নির্মিত হয় এবং সেখানে মায়ের প্রতিকৃতিকে একটি ছোট কুঁড়ের মধ্যে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়।

কাশী হতে আগত চারজন বেদজ্ঞ পূজারী ব্রাহ্মণ ৭ই সকাল ৭টায় উপরোক্ত যজ্ঞশালায় 'রুদ্রযাগ' করেন। মাধবানন্দজী সকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীসম্বন্ধে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। স্বামী ওঁকারানন্দজীর তত্ত্বাবধানে পূজার ব্যবস্থাদি করা হয় এবং ব্রহ্মচারী গায়ত্রীচৈতন্য পূজা করেন। অনেক যাত্রী সকালে কামারপুকুর দর্শনে যান। ৮ই ও ৯ই এপ্রিল জয়রামবাটী হতে কামারপুকুর পর্যন্ত বাস চলাচল করেছিল। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর মন্দিরেও বেশ ভিড় হয় এবং বিশেষ পূজা-পাঠাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শঙ্করানন্দজী মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ এবং আরও দুএকজন প্রাচীন সাধু জয়রামবাটী হতে চার মাইল দূরে কোয়ালপাড়ায় শ্রীজগন্নাথ কোলের বাসভবনে অবস্থান করেছিলেন। শ্রীযুক্ত কোলে মহারাজদের সুখ-সুবিধার প্রতি সব সময় যত্নবান ছিলেন।

৭ই সন্ধ্যার সময় মন্দিরে মায়ের অধিবেশনান্তে ঘোষণা করা হয় যে, পরদিন ভোর ৬॥ টার সময় অধ্যক্ষ মহারাজের নেতৃত্বে একটি ছোট শোভাযাত্রা বের হবে—তাহাতে কেবলমাত্র সাধুরাই যোগদান করবেন। ভক্তদের রাস্তার দুধারে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হয়। আগের দিনই মায়ের মন্দির অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করা হয়। ৮ই প্রতিষ্ঠাদিবস। সাধু ভক্তদের মন আনন্দে ভরপুর। ভোরে উঠেই সকলে তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে মন্দিরে সমবেত হন এবং ভোরের শান্তস্নিগ্ধ ও পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রা দর্শনের জন্য রাস্তার দুপাশে দাঁড়ান। পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ ঠিক ৬॥০ টায় আসেন। ছোট তিনটি সুসজ্জিত সিংহাসনে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে বসান হয় এবং তিনজন প্রাচীন সাধু তাঁদের মাথায় করে নেন। গঙ্গাজল ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে দুজন সাধু তাঁদের অনুগমন করেন। তারপর ছিলেন অধ্যক্ষ মহারাজ। অন্য সাধুরা ধূপ, ধুনা, চামর, পাখা, শাঁখ ইত্যাদি নিয়ে অনুগমন করেন। পণ্ডিতরা বেদপাঠ করেন, অনেকে ভজনগান ও স্তোত্রাদি পাঠে রত ছিলেন। এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মায়ের মন্দির হতে শোভাযাত্রা বেরিয়ে প্রথমে মায়ের বাসস্থান পর্যন্ত এবং পরে মায়ের পৈতৃক বাসগৃহে যায় এবং সেখান হতে পুনরায় মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। মুহুর্মুহু মায়ের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের মনে গভীর রেখাপাত করে। ভোরে ১০১টি তোপধ্বনি দ্বারা মায়ের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার বার্তা ঘোষিত হয়।

শোভাযাত্রা মন্দিরে ফিরে আসার পর পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠাকার্য আরম্ভ হয়। এদিকে আয়োজন চলতে থাকে, আর

একটি বড় শোভাযাত্রার। শ্রীশ্রীমায়ের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি একটি চতুর্দোলায় সুন্দরভাবে সাজানো হয় এবং শোভাযাত্রায় যোগদানেচ্ছু সকলকে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরের কাছে রাস্তায় সমবেত হতে বলা হয়। প্রথমে লাঠিধারিগণ অতঃপর ঢাকীর দল, পুরুষ ভক্তমণ্ডলী, কীর্তন পার্টি, মহিলা ভক্তবৃন্দ, বাউলদল, সাধুবৃন্দ, সাধুদের কীর্তন পার্টি, পূর্ণঘট-বহনকারিণী আটটি কুমারী, চতুর্দোলায় শ্রীশ্রীমা ও পেছনে ভক্তবৃন্দ চলেন। গ্রামের একপাশ পরিক্রমা করে উৎসব-প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই বিরাট শোভাযাত্রা মন্দিরের সামনে আসে। অন্যূন পাঁচ হাজার লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। এ সময় যজ্ঞশালায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অন্বাযাগ সম্পন্ন হয়। পূজান্তে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের ভোগ ও তৎপরে হোম সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্ণ ১১।৷০টা হতে অধিক রাত পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলতে থাকে এবং প্রায় বিশ হাজার নরনারী প্রসাদ পান। মা যেন অন্নপূর্ণা-মূর্তিতে ভাণ্ডারে উপস্থিত ছিলেন এবং দুহাতে সমবেত সকলের মধ্যে অন্ন বিতরণ করছিলেন। ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত—কাজেই কাউকেই অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হয় নি। সন্ধ্যায় মন্দিরে বিবিধ বাদ্যোদ্যম-সহকারে মায়ের আরতি হয় তৎপরে কালীকীর্তন চলতে থাকে। অন্যদিকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফায়ার ওয়ার্কস কোম্পনী' নানারকমের সুন্দর সুন্দর বাজি পোড়াইয়া যাত্রীদের আনন্দ বর্ধন করেন। এই সময় কামারপুকুর হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চতুর্দোলায় সাজিয়ে এক শোভাযাত্রা জয়রামবাটী আসে। জনতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং চারদিকে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সকলেই আশ্চর্য হয়ে যান যে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে কি করে এত বড় জনসমুদ্র উপস্থিত হল। প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম ঐ দিন সন্ধ্যার পর হয়েছিল—সব পথই যেন ঐ দিন জয়রামবাটীর দিকে চলছিল। রাত সাড়ে এগারটায় যাত্রা সুরু হয় এবং 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' পালা অভিনীত হয়। ভোর ৫টায় যাত্রা শেষ হয়। তখনও বহু সহস্র লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। মায়ের মন্দিরে রাতে দশমহাবিদ্যা পূজা হয় এবং প্রায় ভোর পর্যন্ত পূজা চলে।

পরদিন ৯ই কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী উক্ত উৎসবে যোগদান করেন। এ দিকে যজ্ঞশালায় সপ্তশতী হোম আরম্ভ হয়। দারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করেও বহুলোক সেই হোম দর্শন করেন। যজ্ঞশালার সামনেই একদল লোক রামায়ণ গান করেন।

১০ই এপ্রিল স্পেশাল ট্রেন বিষ্ণুপুর হতে কলকাতায় যাবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু সকলের সুবিধার জন্য উহা একদিন আগে ৯ই রাতে করা হয়। সন্ধ্যায় যাত্রিপূর্ণ অনেকগুলি বাস ও লরীর বিরাট 'কনভয়' জয়রামবাটী হতে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওনা হয়। আগের দুদিন সন্ধ্যায় দুইজন সাধু ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জীবনীর প্রধান প্রধান কাহিনী বর্ণনা করেন। দু'বছর আগে কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় যে চলচ্চিত্র তোলা হয়েছিল তাহাও প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচারবিভাগ হতেও রোজ সন্ধ্যায় নানারূপ চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল। ব্যায়াম-প্রদর্শন ও নদের নিমাই অভিনয় সকলকেই প্রচুর আনন্দ দান করে। প্রদর্শনী দেখবার জন্যও লম্বা 'কিউ' হয়। প্রদর্শনীর পাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের মাঝে মায়ের ছবিও বহুলোককে আকর্ষণ করে। পরদিন নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-পূজা হয় এবং ঐ দিনই উৎবের পরিসমাপ্তি হয়।

যাঁদের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা সকলেই অপার্থিব আনন্দ পেয়েছেন এবং এই মধুর ও পুণ্য স্মৃতি বহুকাল তাঁদের মনে জাগরূক থাকবে। জয় মা !!

ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের ঐতিহ্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

(বিশ্বভারতী)

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা মিহি ঢাকাই মসলিনের যে ঐতিহাসিক কাহিনী পাই, সেই মসলিনের সূক্ষ্ম সূতা একটি অতি প্রাচীন—খুব সম্ভব প্রাচীনতম একটি সামান্য যন্ত্রসাহায্যে কাটা হইত। ইহারই নাম তকলি। চরকার জন্মও এদেশেই অতিপূর্বে ঘটিয়াছিল। মিহি সূতা কাটিবার জন্য তকলি ব্যবহৃত হইত। বস্তুতঃ এই আদিম সহজ সরল যন্ত্রটি দ্বারা এদেশের বস্ত্রশিল্পী যে অনুপম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল, ইহার অনুরূপ কিছু বর্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগেও এযাবৎ সম্ভব হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর ঢাকাই মসলিনের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে একগজ চওড়া ও সতের গজ লম্বা কাপড়ের ওজন মাত্র ৯০০ গ্রেন্; অর্থাৎ প্রতি বর্গগজ মসলিনের ওজন মাত্র ৬০ গ্রেন্। ইওরোপের সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত তাঁতিরা যে মিহি কাপড় বুনিত, ইহার ওজন অন্ততঃ ৪।৫ গুণ বেশী। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি একসময় দেশে বিদেশে ছড়াইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এত সূক্ষ্ম সূতা অন্য কোন দেশের তাঁতে আজ পর্যন্ত বোনা সম্ভব হয় নাই। ঢাকার মসলিনশিল্প আট নয় দশক পূর্বেও সক্রিয় ছিল। যে তকলিতে মসলিনের সূতাকাটা হইত, ইহার চালনা-পদ্ধতির সংগে আমেরিকার ঐতিহাসিক ক্রোফোর্ড সাহেব সুদক্ষ বেহালাবাদকের সুরলহরী সৃষ্টির উপমা দিয়াছেন।*

তকলি ও চরকার জন্ম

তকলি-ব্যবহারের নৈপুণ্য অনুভূতিসাপেক্ষ—ইহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা অনুভব না করিলে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়ে বা কলের মত তকলি চালাইয়াও তাহা বুঝা সম্ভব নয়। তুলার ন্যায় কোমলতম বস্তুদ্বারা একটি সরল যন্ত্র সাহায্যে এত সূক্ষ্ম বস্তু অর্থাৎ সূতাকাটার চর্চা শিল্পজগতে একটি অভিনব ব্যাপার। তকলিসম্বন্ধে আমি যে সামান্য অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহা একটি যোগবিশেষ এবং ইহার যথাযথ প্রবর্তন শিক্ষাজগতে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

ঢাকার মসলিন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া কাজ করিবার সময় স্বর্গীয় রসিকলাল গুপ্ত-রচিত 'রাজবল্লভ' নামক একটি ঐতিহাসিক পুস্তকের বিশেষ অংশ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইখানা

* ক্রোফোর্ড স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—"One of the most romantic phases of the cotton story in India concerns the gossamer muslins for which Dacca was once famous. There are occasional references to these fabrics among the classical writers, but surer proof exists in Indo-Greco statuary of the first and second century of the Christian Era...... One significant feature of these statures is the way in which a fabric of incredible lightness has been perfectly draped in natural folds on the human form. No artist could model such a quality, unless familiar with it."

১৩১১ বংগাব্দে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর খাদি-আন্দোলনের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভের রাজত্বকালে রাজনগরের বর্ণনায় আছে—"কেহই উৎকট ধনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইত না, সকলেই সংযত জীবন যাপন করিত। অতিথি আসিয়া কোন গৃহস্থের আলয় হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। সমস্ত রাজনগরে একটি মাত্র সমাজ ছিল এবং রাজবল্লভ ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ সেই সমাজের নেতা ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলির ঝঞ্ঝাবাত কখনও এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

"মধ্যাহ্ন-আহারের পর সকলেই বিশ্রামসুখ ভোগ করিত। এই সময় রমণীগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মিলিত হইয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং সংগে সংগে খোস গল্প করিয়া একে অন্যের চিত্ত-বিনোদন করিত। প্রাচীন ও প্রাচীনাগণ বিশেষ বিশেষ স্থানে একত্র হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকের পূতকাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইত। যামিনীর প্রথম ভাগে বর্ষীয়সীরা নিজ নিজ গৃহকোণে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিত এবং পরিবারস্থ বালকবালিকাগণ উপকথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চরকার ধ্বনির সংগে সংগে উপকথা চলিতে থাকিত।

"বিধাতার নির্বন্ধে এই আনন্দধাম অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অতি অশুভক্ষণে অনন্ত কাল-সাগরে বাঙ্গালা ১২৭৬ সাল সমাগত হইল। 'রথখোলা' নামে যে নদী এতদিন ক্ষুদ্র কলেবরে প্রবহমাণ হইতেছিল, তাহা সহসা বর্ষাকালে স্ফীত হইয়া ক্ষুধার্তা রাক্ষসীর ন্যায় করাল বদন বিস্তার করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নগরের অধিকাংশ সৌধমালা অল্পকাল মধ্যেই রথখোলার কুক্ষিগত হইয়া গেল।"

'রাজবল্লভ' ঐতিহাসিক পুস্তক। ইহাতে ঢাকার রাজবল্লভের কাহিনী ও দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহার লেখক প্রসংগান্তরে বাংলা দেশের একটি লুপ্ত নগরের সামাজিক পরিবেশে চরকার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহাই আলোচনা করিয়াছেন; রাজনগর ১২৭৬ সালে নদীবক্ষে বিলীন হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আট দশক পূর্বেও বাংলার স্থানে স্থানে চরকার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ইহার পূর্ববর্তী কালে যে সূতা হাতে কাটিবার প্রথা আরও ব্যাপক ছিল সে প্রমাণ বহু বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রালফ্ ফিচ্ নামক ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময় পূর্ববংগ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়—"তৎকালে সুবর্ণগ্রামে যে সূক্ষ্ম মলমল প্রস্তুত হইত, তাহা ভারতীয় কার্পাস শিল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ পেসর্সেট সোনার গাঁও-এ উৎপন্ন বস্ত্রের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববংগ পর্যন্ত সমগ্র দেশ কার্পাসশিল্পের একটি বিরাট কারখানা-স্বরূপ ছিল। তথায় সকল গ্রামের ও নগরের অধিবাসিগণ কার্পাস ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত থাকিত।"

সেই সময়কার এক ফরাসী পর্যটকের বিবরণী হইতে জানা যায়, "প্রতি বৎসর অন্যূন পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত এবং তন্মধ্যে দশলক্ষ পরিমিত রেশমের বস্ত্র এদেশেই প্রস্তুত হইত।"

এখন প্রশ্ন এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসরের বস্ত্রশিল্পচর্চা আমাদের জীবন

হইতে তিরোহিত হইল কেন? শুধু কাপড়ের কলই কী এজন্য দায়ী? ইহার উত্তর এই যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও সংস্কৃতিগত অনুকরণপ্রিয়তাই এই দুর্দশার মূল কারণ। আমাদের অপূর্ববস্ত্রশিল্প-সাধনার পথ আবার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে প্রশস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনুসন্ধিৎসু হইয়া এ বিষয়ে বিচার করা প্রয়োজন। কাপড়ের কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূল লক্ষ্য কী? সহজে সস্তায় সকলের বস্ত্রাভাব পূর্ণ করাই কি কল ও কল-মালিকের লক্ষ্য? যে পথে কাপড়ের কল আবিষ্কৃতি ও স্থিতি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নৈতিক, আর্থিক পরাধীনতাকে জাতিগত ভাবে স্থায়ী করিয়া আমাদের অপূর্ব শিল্পকলা-সম্পর্কে স্মৃতিভ্রম ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের নিকষপাথরে যাচাই করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর আজ আবার পাইতে হইবে। কারণ, শিল্পবিকাশের উপর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প-পতনের পূর্বাভাস

উদার মোগল রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশীয় আগন্তুক ও ব্যবসায়িগণ রাজদরবারে সমাদর পাইতেন। পরবর্তী সময়ে ইহা ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে। ভারতের অপূর্ব শিল্পকলা ও ঐশ্বর্যসম্বন্ধে পশ্চিমাগতদের ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না। স্থলপথ বন্ধ হইবার পর তাঁহারা জলপথ আবিষ্কারের পন্থা খুঁজিতে লাগিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কলম্বাস জলপথে ভারতবর্ষ খুঁজিতে যাইয়া আমেরিকা পৌঁছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদিগকে কার্পাসবস্ত্র-পরিহিত দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি ভারতবর্ষেই পৌঁছিয়াছেন। পরবর্তী আবিষ্কারক পর্তুগীজ ভাস্‌কোদাগামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ভারত মহাসাগর সাফল্যের সংগে পাড়ি দিয়া ১৪৯৭ সালে ভারতবর্ষে পৌঁছেন। ভাস্‌কোদাগামার ভারতপথ আবিষ্কারের পর পর্তুগীজ বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় হল্যাণ্ডের বণিকেরা লিসবন শহরের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাইত। ফলে হল্যাণ্ডের বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে—আন্টয়ার্প, বার্জেস, হারলেম প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয় রংগীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকোর আমদানী হইতে থাকে। ইহার কারণ সেদেশবাসী এদেশীয় বস্ত্রাদি খুব পছন্দ করিত। বহু নাবিক ব্যবসায়ী তখন আইনকানুন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদির চোরাকারবার চালাইত এবং প্রচুর লাভ করিত। স্পেনীয় বণিকেরা প্রায় এক শতাব্দীকাল ভারত ও অন্যান্য পূর্বদেশের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। স্পেনের সমৃদ্ধিও এ পথে বৃদ্ধি পায়। স্পেনীয়রা মেক্সিকো ও পেরো বিজয় করিয়া গর্বে আরও স্ফীত হইয়া উঠে। কিন্তু বিজয়মদে মত্ত স্পেন ১৫৮৮ সালে ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে হারিয়া গেল। ফলে স্পেনীয় বণিকদের ভারতীয় বস্ত্রসম্ভার ইউরোপে আমদানী করার পথ রুদ্ধ হইল। পূর্বদেশসমূহের বাণিজ্য-বন্দরসমূহ অন্য ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ীদের হস্তগত হইল। হল্যাণ্ডের নাবিক-ব্যবসায়ীরা ১৬০২ সালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিল। ইহার পূর্বে ১৫৮৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক (Sir Francis Drake) নামক ইংরাজ পূর্বদেশজাত বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার বোঝাই পর্তুগীজ অর্ণবপোত আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। ১৫৯২ সালে এরূপ আর একটি জাহাজ ইংরেজদের হস্তগত হয়। ইহা ক্যালিকো, সৌখীন বালিশ, কার্পেট প্রভৃতি বহুবিধ মূল্যবান প্রাচ্যদেশীয় দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই ছিল। ইংরেজ বণিক অভিযানকারীরা এই প্রথম ভারতীয় ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়; ভারতের সংগে যোগস্থাপন করিলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

১৫৯৯ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। ফরাসী বণিকেরাও বৃটিশের পদাংক অনুসরণ করে; ১৮৬৪ সালে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়। এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষও ঘটে। এই কোম্পানীসমূহের ইতিহাস-পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় পণ্যদ্রব্য—বিশেষ করিয়া বস্ত্রশিল্পের ব্যবসা ইউরোপীয় বণিককুলকে কতখানি প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ইউরোপে ইহার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের বাজারে উৎকৃষ্টতর অথচ সুলভ ভারতীয় পণ্য (বস্ত্র) সেই মহাদেশের বস্ত্রশিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে বিশেষ বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ফরাসী, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডের বাজারে তখন ভারতীয় রংগীন ছাপের কাপড় ও ক্যালিকো সেই দেশের শিল্পীদিগকে প্রায় বেকার করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, সেই সকল দেশের গবর্নমেণ্টসমূহ ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের উপর আইন প্রণয়ন করিয়া নানারূপ বাধানিষেধ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আইনের নাগপাশ এড়াইয়াও ভারতীয় চোরাই বস্ত্রসম্ভার ইউরোপের বাজারে চলিতে থাকে।* প্রাশিয়াতে ভারতীয় 'বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন চালু করা হয়। ইংলণ্ডের পশম-ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। তখনকার দিনে ভারতীয় বস্ত্রাদির প্রভাবসম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় রংগীন কাপড়ের সমাদর বুঝিতে পারিয়া নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইতে থাকে। প্রাশিয়াতে ১৭৪১ সালে ছাপের কাপড় তৈরির কেন্দ্র বার্লিনে স্থাপিত হয়। ওবের কাম্পফ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থায়ী রং-এর ছাপের পন্থা আবিষ্কার করেন। ১৭৭৬ সালে ওবের কাম্পফ জন কয়েক অংশীদার লইয়া ফরাসী দেশের ভার্সাই শহরের নিকট Jony নামক স্থানে দৃঢ় রংয়ের ক্যালিকো শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেন। 'ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ' আইন প্রয়োগের ফলে তাঁহারা যে সুযোগ লাভ করেন, সেই সুযোগে ভারতের অনুরূপ রংগীন বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে থাকেন। ফরাসী দেশের এই নবজাত শিল্প ইংলণ্ডের পুঁজিপতিদের মধ্যেও প্রেরণা যোগায়।

ফরাসী, পর্তুগীজ এবং ডাচ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের বণিককুলের ব্যবসাই বৃহত্তম আকার ধারণ করে। সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, কি ভাবে বস্ত্রনির্মাণের কল ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়, ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হয়। ইংলণ্ডের কাপড়ের কলকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশসাম্রাজ্য কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা কথা, কাজেই ইহার আলোচনা এ স্থানে নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা এই ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলার ধ্বংসের উপরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের পরাধীনতার এই ঐতিহাসিক কারণটি মহাত্মা গান্ধী সঠিক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্য বটে, মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম স্বদেশী আমলে স্বদেশী শিল্পকে জাগ্রত করিবার উদ্যম দেখা দিয়াছিল, কিন্তু অভিজ্ঞ বৈদ্যের ন্যায় এদেশের পরাধীনতার মূল কারণটি মহাত্মা গান্ধীই বিশেষ ভাবে আবিষ্কার করেন। সেই জন্যই দেখিতে পাই, অহিংসা-ধর্মের পূজারী হইয়াও বিদেশী বস্ত্রবর্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্নিযজ্ঞের প্রচার তিনি করিয়াছিলেন।

* The introduction of painted calicoes and chintzes of the east met in France, in seventeenth century, a vigorous resistance from the manufactures of silk and wool. Stringent laws were passed and a measure enforced, and yet it is apparent that inspite of these prohibitions, there was a dangerous demand for the forbidden wares.

প্রাচীন ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও ইহার ধ্বংসের যে সকল কারণ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাই ?

ইতিহাসের শিক্ষা ও বস্ত্রস্বাধীনতা-লাভের প্রয়োজনীয়তা

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃটিশ কোম্পানীর আমল পর্যন্ত এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কাটা সূতায় ও তাঁতির তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রশিল্প এ দেশবাসীর বস্ত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করিত।

(২) এ দেশের বস্ত্রশিল্পকলা অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

(৩) ভারতীয় অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা ইউরোপীয়দিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

(৪) ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা এক সময়ে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ইউরোপীয় নাবিক ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবসা করিয়া প্রচুর লাভবান হইত।

(৫) এ দেশে তৈরী রংগীন কার্পাস বস্ত্র ইউরোপের বণিকদিগকে ক্রমে নিজেদের দেশে অনুরূপ শিল্পগঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

(৬) অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়া লাভবান হইবার লোভ কাপড়ের কল নির্মাণের অনুপ্রেরণা দান করিয়াছিল। বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হয় নাই ; পরন্তু কলের সাহায্যে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইয়া অল্পমূল্যের বস্ত্র দেশবিদেশের বাজারে চালু করিয়া বাজার বিস্তার ও অধিকার করিয়া বৈষয়িক জগতে আধিপত্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

(৭) কাপড়ের কলের আবিষ্কৃতি ও এ দেশে কলের বিস্তৃতির ফলে দেশবাসীর বস্ত্রস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে নাই ; বরং বহুলপ্রকারে তাহা খর্ব হইয়াছে। যে বস্ত্রশিল্পকলা একদা এদেশের জনসাধারণের করায়ত্ত ছিল, কাপড়ের কল সেই সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দেশবাসীকে বাজারের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে।

ইংলণ্ডেই প্রথম কাপড়ের কল আবিষ্কৃত হয়। অনুসন্ধিৎসুগণ সেই ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, লাভ ও লোভের মোহ কি ব্যক্তিগত বা কি জাতিগতভাবে কতদূর গড়াইতে পারে। ইহা হইতে আমরা বড় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। মত ও পথ একই মানবিক সূত্রে গ্রথিত না হইলে পরিণামে মানবের কল্যাণ হয় না ;—ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতীয় বস্ত্রের বাজার অধিকার, ভারতে বৃটিশ সরকার কায়েম ও সর্বশেষ ধাপে ভারতে বৃটিশ বস্ত্র বর্জন, ল্যাংকাশায়ারের চরম দুর্গতি ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রথম মহাসমরের কালে ব্রিটিশ বস্ত্রের আমদানি এদেশের বাজারে হ্রাস পাওয়ায় এবং ঘটনাস্রোতে এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম প্রবল হইতে থাকায় এদেশে ক্রমে কাপড়ের কল স্থিতি ও বিস্তার লাভ করে। আজ দ্বিতীয় মহাসমরের পর ভারতে প্রচুর কলের কাপড় প্রস্তুত হইয়া বিদেশের বাজারেও চালান যাইতেছে, কিন্তু দেশবাসীর বস্ত্রসমস্যার সমাধান হইয়াছে কিনা বস্ত্রব্যবহারকারী নাগরিকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। প্রশ্ন এই, এরূপ কেন হইল ? এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, কাপড়ের কল সর্বসাধারণের বস্ত্রস্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি ? কল মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু দানবের ন্যায় কল আজ মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং লোভ নামক বৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কলকে মানুষের সর্বসাধারণের মংগল-কাজে

নিয়োগ করার উপায় আজ বাহির করিতে হইবে। সকলেরই খাদ্যের ন্যায় বস্ত্রের প্রয়োজন আছে। বস্ত্রশিল্পে জনসাধারণের লোক-প্রতিভাকে আবার জাগ্রত করিতে পারিলেই ইহার সমাধানের উপায় আপনা হইতেই সর্বসাধারণই করিতে পারিবে। বস্ত্রশিল্পের ব্যাপকতা বিশাল। তুলার চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নমুনার সুতা ও সকল রকমের বস্ত্র-শিল্পকৌশল লোকায়ত্ত হইলে আজিকার বহু সমস্যার সমাধান সহজ হইবে। কলকে সর্বসাধারণের স্বার্থে মানুষের বশে আনিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

লোকপ্রতিভাকে জাগ্রত করিতে হইলে, একাধারে প্রাচীন ভারতের অপূর্ব বস্ত্রশিল্পকলা-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও যুগোপযোগী বস্ত্রশিল্পচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। ইহার নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, এক কথায় সাংস্কৃতিক শুভফল তখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে।

কিন্তু বস্ত্রশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত পথে লোকায়ত্তের পথে আনিবার, জনপ্রতিভাকে জাগ্রত করিবার একটি উপায় বস্ত্রশিল্পকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইহার শুভ পরিণতি সুদূরপ্রসারী হইবে।

মনোরম নক্সায় সুরুচিসম্পন্ন বয়নশিল্পের উৎকর্ষের প্রচেষ্টা বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে দুই দশক যাবৎ চলিতেছে। এ পথে ব্যাপকভাবে সুরুচির মানকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্রবর্জন, খাদি আন্দোলন ও সর্বশেষ ধাপে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি প্রবর্তনের মধ্যে আগাগোড়া এক বিশাল সংগতি রহিয়াছে। খাদি-আন্দোলন দেশের রাজনীতির সংগে একীভূত হওয়ায়, খাদিকে অনেকে শুধু স্বাদেশিকতার চিহ্নস্বরূপ মনে করিত। ইহার লাভক্ষতি উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার গুণাগুণ যাচাই করার দিন আসিয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় সুতাকাটা ও বয়ন প্রবর্তনের অন্তর্নিহিত বাণী অন্যরূপ, অর্থাৎ ইহা রাজনৈতিক নহে; জনসাধারণের কর্মপ্রতিভাকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে চালনা করাই ইহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গেলে সর্বাগ্রে বস্ত্রশিল্পকে আবশ্যিক জনশিক্ষার অংগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার সার্থকতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই শিল্পের শিক্ষানৈতিক বিবর্তনের উপর। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার সতর্ক গবেষণা প্রয়োজন, নতুবা প্রচুর অপচয়ের সম্ভবনা রহিয়াছে।

বুনিয়াদি শিক্ষাধারা দেশে বিস্তারলাভ করিলে দেশে তুলার চাষ ব্যাপকতর হইবে। বিভিন্ন তুলার গুণাগুণ-সম্বন্ধেও জনসাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মান আপনা হইতেই উন্নত হইবে। সুতা ও সুতা কাটিবার যন্ত্রাদির প্রগতিতে জনসাধারণের প্রতিভা সক্রিয় হইয়া উঠিবে। কাপড়ের কলের অতিকায় লোভ ও পরশোষণক্ষমতা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। ফলে কলও কালে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আপনার নৈতিক স্থান ও মান খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে।

যথাযথভাবে কোন কর্মের চর্চা করিতে হইলে ইহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞানচর্চা নিছক পুঁথিগত হইলে কর্ম-বিজ্ঞানটির সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না। অভিজ্ঞতা দ্বারা কাজের গুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পুঁথির জ্ঞানও আলোক প্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্মবিজ্ঞান ও পুঁথিজ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক করিয়া প্রত্যক্ষ সমাজজীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিয়া তুলিবার তাগিদ আসিয়াছে। কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষানীতিসম্মত উপায়ে কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিলে আমাদের প্রাচীন কার্পাসশিল্পের ঐতিহ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ হইবে, মহত্তর অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন নূতন আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

পুঁথিজ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান

তুমি

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বন্ধু তুমি, সুহৃৎ তুমি,
মিত্র তুমি ভক্ত্যাধার
প্রীতি তুমি, পুণ্য তুমি,
প্রণয় তুমি, শুদ্ধাচার।
শ্রদ্ধা তুমি, শান্তি তুমি
সুপ্তি তুমি, স্বপ্ন মোর
দীপ্তি তুমি, তৃপ্তি তুমি
ক্ষান্তি, ভালবাসার ডোর।

বৃদ্ধি তুমি, ঋদ্ধি তুমি
শক্তি তুমি, আমার ক্ষেম
সাধ্য তুমি, সাধনা তুমি
যজ্ঞ তুমি, আমার প্রেম।
বিত্ত তুমি, চিত্ত তুমি
হৃদয় তুমি, আমার প্রাণ
মোক্ষ তুমি, মুক্তি তুমি
ইষ্ট তুমি, আমার ত্রাণ।

তোমারে দেখেছি

শ্রীঅটলচন্দ্র দাস

তোমারে দেখেছি প্রভাতবেলায় চপল বালক সম,
ধরণী জুড়িয়া বেড়াইছ খেলি হে আমার নিরুপম!
তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার কোলে ঘুমায়ে পড়িতে সুখে,
স্তব্ধ আবেগে রয়েছে যামিনী চাহিয়া তোমার মুখে!
তোমারে দেখেছি রুদ্রের রূপে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে
কর্মের ফল প্রদান করিতে বিচার-আসন-'পরে।
তোমারে দেখেছি কাঁদিতে একাকী ঘন ঘোর বরিষায়
পাতকীর দুখে গলিয়া পড়িতে কতো সমবেদনায়।
তোমারে দেখেছি শারদ-আকাশে, কুসুমের রাশে রাশে,
বক্ষে আমার চেয়েছ আসিতে প্রীতির মধুর হাসে।
তোমারে দেখেছি হৃদয়ে আমার উপজিতে করুণায়,
শোকের গভীরে দুখের তিমিরে দৈন্যের বেদনায়!
তোমারে দেখেছি হে প্রাণকান্ত, করমে কথায় গানে
ভিতরে বাহিরে সাথে সাথে মোর ফিরিছ সকল খানে।

যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য

শ্রীআশুতোষ দাস

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অমৃতে ডুবে গেলেও মরণের ভয় নাই।' নিমজ্জিত ব্যক্তির মৃত্যু সর্বত্র সুনিশ্চিত হ'লেও এ যে অমৃত! এর ক্ষুদ্র কণিকাও অমর করে। তাই তার আহরণ আস্বাদন বিতরণ বা বিনিময় সবেতেই কল্যাণ। 'মিছরীর রুটি যেভাবে খাও মিষ্টি' এ অপূর্ব বাণীও তাঁরই মুখের। আর সেই সাহসেই বর্তমান বিষয়ের অবতারণা।

পাগলামি কথার শব্দার্থ যাই হ'ক, উহা যে সাধারণ জ্ঞানের অভাব এবং অনর্থকর কার্যের উপর্যুপরি অনুষ্ঠানের পরিচয় তা'তে সন্দেহ নেই। সচরাচর যা অসাধ্য ও অসম্ভববোধে অনেকে করতে নিরস্ত হয়, তা সংসিদ্ধ এবং সম্ভব করার উদ্যমকেও পাগলামি বলে।

সাধারণজ্ঞান অর্থে বিচারবুদ্ধিসহায়ে শুভাশুভ-নির্ধারণ এবং মঙ্গলের চেষ্টা ও অমঙ্গল-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। মানুষমাত্রেই আপন আহার ও আরামের জন্য যত্নশীল। শরীররক্ষার জন্য খাদ্য চাই, আচ্ছাদন চাই, আরও অনেককিছু চাই। শুধু নিজের জন্য নয়; যাদের নিয়ে সংসার সেই বাপ-মা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি সকলের জন্য। যেখানে একের উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা যত বেশী প্রয়োজনও সেখানে তত অধিক। সে প্রয়োজনের আবার মাত্রা নেই; এই পরিমাণ হ'লে সকলে সন্তুষ্ট হবে তা'নয়। একজনের যা আকাঙ্ক্ষা—আর একজন তার শতগুণ পেয়েও অসন্তুষ্ট। কামনা-কল্পনা ছোট বড় যাই হ'ক তার জন্য যে কোন বাধা সরিয়ে অগ্রসর হ'বার অবিরাম চেষ্টাই মানব-জীবন। ঐরূপ অন্ধ আবেগে সকলেই চ'লেছে। বিরাম নেই—বিরক্তি নেই—তৃপ্তি নেই। তারপর একদিন শীঘ্র বা বিলম্বে অপ্রত্যাশিতভাবে যাত্রার যন্ত্র বিকল হ'য়ে পড়ে।—তখন সব নিশ্চল, সকল আশা-ভরসার অপূর্ণ অবস্থায় অবসান—অর্থাৎ মৃত্যু বা দেহান্তর। এই যে শ্রেষ্ঠ জীব মানবের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা এও কি প্রকাণ্ড পাগলামি নয়? সমগ্র মনুষ্যসমাজকে পাগল বলার স্পর্ধা বা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আমার নেই। আমি নিজেও তারই একজন;—আজীবন ধন মান খাদ্য স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যর্থ অনুসরণকারী। তবে দীর্ঘকালের মরুভ্রান্তিতে মুহ্যমান হরিণের যে অভিজ্ঞতা—মৃত্যুর মুক্তিদ্বার-সন্নিহিত ব্যক্তির বহুদিনের বহু প্রচেষ্টার ব্যর্থতা—উপস্থিত ও অনাগত পথবর্তীর সাবধানতার সহায় হতে পারে। তা'ছাড়া ভুল করলেও তা' স্বীকার এবং সংশোধনের প্রয়াস নিন্দনীয় নয়।

যে ভুল করে এবং উপর্যুপরি করে—বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও করে তাকেই পাগল বলে। সে হিসাবে কমবেশী আমরা সকলেই পাগল। মিথ্যাকে সত্য ভাবা—অস্থায়ীকে স্থায়ী মনে করা—ছায়াকে শরীর বলে দেখা ভ্রম বা ভুল। তবু যদি পুনঃপুনঃ আমরা তাই করি তা' কি পাগলামি নয়? পাঁচটার একটা খসলো—অশেষ চেষ্টাতেও রাখতে পারলাম না;—বাকী চারটাকে যদি চিরস্থায়ী বা নিজস্ব ভাবি, তবে পাগলামি ছাড়া তা' আর কি? ব্যাধির তাড়নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে যে শরীর অঙ্গহীন অবস্থায় কোনোমতে অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তাকে অক্ষয় ভেবে আত্মপ্রসাদ বা অভিমান কি উন্মত্ততা নয়? চোখের উপর বহুক্ষেত্রে পাওয়ার বিড়ম্বনা দেখেও এই যে অহরহ ধনমান ইত্যাদি চাওয়ার ব্যগ্রতা, এও কি সুস্থতার লক্ষণ?

বস্তুতঃ আমরা সকলেই অল্পাধিক পাগল।

ভালবাসার একটা অফুরন্ত প্রেরণা অনুক্ষণ আমাদিগকে এটা-সেটা এদিক-ওদিক করাচ্ছে। গোল শুধু বস্তুবিচারে—সত্যনির্ণয়ে। যার বিকার আছে—বিনাশ আছে,—যা' পেয়ে পরিতৃপ্তি নেই, যা পান করে পিপাসার বৃদ্ধি সেই ভুল ক্রমাগত করার পাগলামি ছেড়ে এমন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত নয় কি—যার বিকার নেই বিনাশ নেই,—যে মিলনে বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, যার অন্তর্ধান নেই, আছে কেবল আবির্ভাব,—যাতে আছে যা কিছু লভ্য-লোভনীয় আর, আর আছে অতুলনীয় তৃপ্তি, অসীম শান্তি, অবাধ আনন্দ।

ভালবাসার প্রকৃত পাত্র এবং যথার্থ বস্তু কি তাই আমাদিগকে আগে বুঝতে হবে; এবং তার জন্য চেষ্টা নয় শুধু, জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে হবে। টাকায় ভাতকাপড় হয়, প্রকৃত কল্যাণের প্রায় কিছুই হয় না। আবার আশ্চর্য এই যে, পার্থিব প্রয়োজন থাকলেও যে জিনিস আশানুরূপ কেউ পায়ও না তার জন্য—আমৃত্যু অপরিসীম উৎকণ্ঠা—অথবা স্ত্রীপুত্র—যারা চিরসঙ্গী নয়—জীবনের যাত্রাপথে অভ্যাগত পথচারী মাত্র—তাদিগকে নিয়ে অল্পকাল অভিনয় করে' অনিচ্ছায় নিরুদ্দেশ যাত্রা—এই যদি মানুষের অবস্থা হয়, তবে তার পশুপক্ষী বা বৃক্ষাদির সঙ্গে পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য কোথায়? এই মানুষের দেহ নিয়েই পরম পিতা যুগে যুগে আসছেন; তৎকালোপযোগী পথ দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর মরুভূমিতে অমৃতের পরিবেশ রেখে যাচ্ছেন। আমরাও এখানে মরতেই আসি নি তা' বুঝতে হবে, আমাদিগকে আদর্শ সাক্ষাৎকার করতে হবে—অমর হ'তে হবে। 'হুঁশ' থাকবে বলেই আমরা মানহুঁশ। যাঁর একাংশ এই বিচিত্র বসুধাকারে সম্মুখে থেকে সর্বদা আমাদিগকে আচ্ছন্ন, অভিভূত এবং অন্ধ করে' রেখেছে সেই ঈশ্বরকে চাই—আংশিক নয়, অখণ্ড ভাবে।

"ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য" ইহা ভগবদ্বাক্য। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই। তথাপি ঐ চরমলক্ষ্য—সব অভাবের অবসান—সব পিপাসার পরিতৃপ্তি সহজ-সাধ্য নয়। তাই সর্বভাবের সমন্বয়মূর্তি, সর্বাধিক পরিস্ফুট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে গেলেন, "ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।" শুধু বলা নয়—পূর্ববর্তী ঈশ্বরাবতার বুদ্ধ-যীশু শ্রীচৈতন্যের মত আদর্শলাভের অত্যুগ্র উৎসাহে আহার বিশ্রাম, এমনকি সবচেয়ে প্রিয় আপন দেহবোধ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে' বহু মহাত্মার বর্ণিত বিভিন্ন পথে একই পরমধামে পৌঁছালেন এবং সংসারগহনে পথহারা সংশয়াচ্ছন্ন জগদ্বাসীর জন্য রেখে গেলেন তাঁর অভিনব অবদান—"নিষ্ঠা থাকলে সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।" সন্দিহান শঙ্কাকুল দ্বিধাগ্রস্ত মানবাত্মার জন্য মুক্ত করে দিলেন সকল পথের সকল বেষ্টনী।

এ জগতে কেউ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। তার কারণ সাধারণতঃ মানুষ যা' চায় তা' প্রেয় মাত্র—শ্রেয় নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রিয়—সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়—সর্বস্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য এবং একমাত্র প্রাপ্তব্য। ঐ আসল লভ্য বা পরমসত্য-লাভের জন্য ব্যাকুলতা যখন সাধারণ প্রচেষ্টার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছায়—তখনই তাকে উন্মত্ততা বা পাগলামী বলা হয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঐরূপ উন্মাদনা ভিন্ন এ পর্যন্ত কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই।—আর উহাই অতৃপ্তির জগতে—অমূল্য সান্ত্বনা—মানবজীবনে দৈবী সম্পদ। আরও আশ্বাসের বিষয় এই যে—ঐরূপ অসাধ্য সাধন এবং অদ্ভুত আবিষ্কার যাঁরা করেন তাঁরা নিজের শ্রেয়োলাভেই নিশ্চেষ্ট থাকেন না। অনুভূতির উচ্চচূড়ায় দাঁড়িয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা আশ-পাশের অপর সকলের কল্যাণের জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা—তাঁদের অর্জনের সাফল্য দিয়ে যান। এর ফলে জাগতিক জীবন-প্রবাহে নূতন শক্তি ও গতির সঞ্চার হয়,— তার রূপ পরিবর্তিত

হয় এবং কালক্রমে সঞ্চিত দুষ্ট ব্যাধিবীজাণু বা আবিলতা অপসৃত হয়। এই নশ্বর ও সদা-পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে তাঁদের অবদানই শুধু অমর হয় না— তাঁরাও স্মরণীয় ও নমস্য হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই সংস্কার বা পথ-নির্দেশের অধিকারী ;— তাঁদের সুস্পষ্ট অনুভূতিই দুস্তর সমুদ্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জোর দিয়ে বলেছেন— 'যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সেই ধন্য।' ভক্ত কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস সেই সুরে ভাষায় রূপায়িত হল— 'আমায় দে মা পাগল করে।'

সৃষ্টির প্রয়োজনে স্রষ্টার অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির প্রভাবে মানুষ আত্মবিস্মৃত এবং সুখকর বোধে বাঁধনের উপর বাঁধন জড়াচ্ছে। ইহা অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য এবং নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হ'লেও এরই অপর দিক অবাধ উন্মুক্ত উজ্জ্বল এবং চিরসুন্দর। অন্ধকারের এই দুর্গম পথ উত্তরণের জন্য পূজা করতে হবে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে— প্রার্থনা করতে হবে আতুর অন্তরের সমগ্র ঐকান্তিকতা নিয়ে। তিনিই অভয়া মূর্তিতে পৌঁছিয়ে দেবেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের সুবর্ণসৈকতে— আলোকনিকেতনের বাঞ্ছিত তোরণে। সর্পাকারে দংশন এবং ওঝারূপে আরাম তিনিই করেন। জীবন-পথে মানুষ সতত বাধা পাচ্ছে— প্রতিপদে আহত হচ্ছে ; অথচ মুক্তির পথ মুক্ত থাকা সত্ত্বেও ঘুনির মাছের মত মৃত্যুর অপেক্ষায় আবদ্ধভাবে পড়ে আছে। সাধারণতঃ এরূপ হ'লেও উপর্যুপরি আঘাতের ফলে অথবা সূচনাতেই সম্ভাবনা বুঝে কদাচিৎ কারুর দৃষ্টির আবরণ সরে যায় এবং মুক্তিদেবতার চিরমধুর আহ্বান সে শুনতে পায়। তাঁর অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-সংকেত যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা সকল বন্ধন ছিন্ন করে আকুল উন্মাদনায় বেরিয়ে পড়েন। সাংসারিক বিধি-নিষেধ, আবেষ্টনী কিছুই তাঁদের সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে না। মূঢ় মোহাচ্ছন্ন জগৎ তাঁদের পাগল বা যাই বলুক, তাঁরাই পৃথিবীর অলঙ্কার, সার্থক মানুষ— মর ও অমর লোকের স্বর্ণসেতু। তাঁরাই আনেন সীমার মধ্যে অসীমের বার্তা, মর্তলোকে অমৃতের পণ্য— জগতের বেসুরা বাদ্যযন্ত্রে তাঁরাই তোলেন অনাদি সঙ্গীতের আনন্দ-ঝঙ্কার। সেই জন্যই যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'যে ঈশ্বরের জন্য পাগল সে-ই ধন্য'।

কালিদাস-কাব্যে আদর্শবাদ

অধ্যাপক শ্রীঅনিল বসু, এম্‌-এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সুবর্ণযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাকবি কালিদাস 'আর্ট ফর আর্ট সেক্' অর্থাৎ 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই মতবাদকে কাব্যরচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সৌন্দর্যসম্ভোগের কবিহিসাবে কাব্যরচনা তাঁহার বিলাসমাত্র ছিল—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা বস্তুতই কবির উপর অবিচার করেন। প্রাচ্যের কবি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' মতবাদের যে পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা তাঁহার রচনার বিশদ আলোচনা করিয়া জানা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্য-মতে যাহা রচনার আদর্শ হওয়া উচিত তাহাকেই অর্থাৎ বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শকে কবি যথোপযুক্ত মাধ্যমে রূপায়িত করিয়াছেন। কবি প্রেয়কে কখনও শ্রেয়ের উপরে স্থান দেন নাই, তাঁহার রচনায় শ্রেয় ও প্রেয় একই বৃন্তে বিধৃত হইয়াছে। বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "তাঁহাকে একই কালে সৌন্দর্য-ভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য এবং সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।"

এই প্রবন্ধে আমরা কবির প্রধান প্রধান কয়েকটি কাব্য ও নাটকের আলোচনা করিয়া তাঁহার রচনার আদর্শের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। কবির মেঘদূত-গীতিকাব্যে স্বাধিকার-প্রমত্ত যক্ষ কৈলাসস্থিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অলকাপুরী হইতে নির্বাসিত হইলেন বহুদূরে রামগিরির আশ্রমে। প্রিয়ার বিরহে কাতর যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে' পুষ্কর-বংশোদ্ভব নূতন মেঘকে দূত পাঠাইলেন বিরহিণী দয়িতার কাছে। একজন বিরহবিধুর প্রণয়ীর দূত-হিসাবে এবং তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেঘের গতি যথাসম্ভব ত্বরিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু যক্ষ মেঘকে যাত্রাপথের নির্দেশ দিয়া রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী প্রভৃতি বিভিন্ন নদনদী এবং বিদিশা, অবন্তী, দেবগিরি প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের উপর শীতল বারি বর্ষণ করিয়া মন্থর গতিতে অতিক্রম করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে আপাত-অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও এই অসামঞ্জস্যের উপরই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যক্ষ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে নিদাঘতাপে শুষ্কপ্রায় নদনদীর জলের প্রয়োজন না মিটিলে এবং বিভিন্ন জনপদের বিরহক্লিষ্ট জনগণের বেদনা উপশমিত না হইলে তাঁহার নিজের বিরহ-যন্ত্রণারও লাঘব হইতে পারে না। এই আদর্শই উপনিষদে বিশদভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় কবি হিসাবে কালিদাস এই আদর্শকেই তাঁহার রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যষ্টির অস্তিত্ব তখনই হয় সার্থক যখন ব্যষ্টির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিসর্জিত হয়। ব্যষ্টির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর কল্যাণের জন্য পরিচালিত হওয়া উচিত। ইহাই ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং মহাকবি কালিদাসের আদর্শবাদেরও ভিত্তি।

এই আদর্শবাদই কবির বিখ্যাত শকুন্তলা-নাটকেও সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অবসান হইল রাজ্যের ভবিষ্যদ্ ভাগ্যনিয়ন্তা রাজচক্রবর্তি-লক্ষণ-যুক্ত পুত্রের জন্মগৌরবে। পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া অশ্রুসজল নয়নে শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন তিনি আবার আশ্রমের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তদুত্তরে মহর্ষি সহজভাবে তাঁহাকে বলিলেন দৌষ্মন্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এবং কুটুম্বপরি-বাররক্ষার গুরু দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া স্বামীর সহিত পুনরায় আশ্রমে আগমন করিবেন। আদর্শ ভারতীয় জননীহিসাবে এইখানে শকুন্তলার চরিত্র সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মহাকবির কুমারসম্ভব-মহাকাব্যেও একই আদর্শবাদের পরিচয় পাইতেছি। গিরিরাজদুহিতা পার্বতীকে অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী করিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অপূর্ব রূপসী পার্বতী এমন এক অদ্ভুত পুত্রের জন্মদান করিবেন যাঁহার প্রয়োজন তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত নিখিল বিশ্ব অনুভব করিতেছে। কবি যদি 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' মতবাদের পক্ষপাতী হইতেন, তাহা হইলে কেবল রূপরাশির বর্ণনাতেই তিনি তাঁহার কল্পনার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া কবি এই অপরূপ সুন্দরীকে দিয়া কঠিনতম তপশ্চর্যা করাইয়া লইয়াছেন। কাব্যের প্রথমাংশে অকাল বসন্তের অজস্র সমারোহের মধ্যে গিরিরাজনন্দিনী অপূর্ব রূপলাবণ্য লইয়া কামদেব সমভিব্যাহারে

তপস্যারত গিরিশের হৃদয় জয় করিবার মানসে উপস্থিত হইলেন। ফল হইল বিপরীত—ত্রিলোচনের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন মদন আর পার্বতী মহেশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলেন। ইহা দ্বারা কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কেবল কামের বশে বা মোহের আতিশয্যে কোন মঙ্গলকর্ম সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং কোন মহৎ জীবনও চরিতার্থ হয় না। পার্বতী সেইজন্য অনন্যোপায় হইয়া মহেশ্বরের হৃদয় জয় করিতে দুশ্চর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইখানে মহাদেবের পরাজয় হইল, ধর্ম মহাদেবের মনকে পার্বতীর অভিমুখে আকর্ষণ করিলেন এবং ধর্মের দ্বারাই তাপস-তপস্বিনীর মিলন সাধিত হইল। হরপার্বতীর পুণ্য মিলনে জন্ম গ্রহণ করিলেন উৎপীড়িত বিশ্বের শান্তি-সংস্থাপক এবং তারকহন্তা বিখ্যাত সেনানী 'কুমার'।

কবির রঘুবংশ-মহাকাব্য পাঠ করিয়াও আমরা এই বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শের সন্ধান পাই। কবি এই মহাকাব্যে আদর্শরাজ্য ও আদর্শ রাজত্বের পরিকল্পনাকে রঘুবংশীয় নৃপতিগণের জীবন ও কার্যাবলীর মাধ্যমে রূপ দান করিয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় যে, রাজ্যের প্রসার এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য রঘুবংশের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজসুখোপভোগ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সমষ্টির স্বার্থের জন্য ব্যষ্টির সার্থকতাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ ছিল। কবির মতে মহাসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর অস্তিত্ব তাহাদের নিজেদের জন্য নহে, কিন্তু বিশালকায় মহাসমুদ্রের বিস্তৃতির জন্য। মহাসমুদ্র ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুর সমষ্টিমাত্র।

উপসংহারে কবিমানসে আদর্শের উৎপত্তি ও তাহার প্রকাশকৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

যখন কোন আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত হয় তখন কবির সৃষ্টি, সৃজনের সমস্ত প্রয়াস ও পাঠক-হৃদয়ে সেই আদর্শ জাগ্রত করিয়া তুলিবার উদ্দাম সাফল্যের চরম সীমায় উপনীত হয়। সাফল্যের সহিত চরম ফলপ্রাপ্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অবিমিশ্র বিমল আনন্দলাভ করা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর মাধ্যমকে বাদ দিয়া এই উচ্চতর আনন্দ লাভ করা সম্ভব নহে। বস্তুনিরপেক্ষ আনন্দ কথাটা আমাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং এই বিভ্রান্তিই 'আর্ট ফর আর্ট'স সেক্' মতবাদের মূলেই বিদ্যমান। কোন উচ্চতর রচনা পাঠ করিয়া যখন বিমল আনন্দ লাভ করা যায় তখন ইহা বস্তুনিরপেক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। কবির মনের নিভৃত অংশে অনুভূত হয় এক তাগিদ (urge)—যাহা কবির সত্তার প্রশান্তিকে আন্দোলিত করিয়া দেয়। এই তাগিদ হইতে জন্মলাভ করে বিমর্শ (deliberation) এবং বিমর্শ হইতে ভাবরাশির উৎপত্তি হয়। ভাবের তরঙ্গ যখন পর্যায়ক্রমে কবির মনকে উদ্বেল করিয়া অবশেষে মনের উপরস্তরে স্থান দখল করিয়া লয় তখন পূর্বানুভূত তাগিদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সেইজন্য কবির সৃষ্টিকে অকারণ এবং উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সৃষ্টির সূত্র ধরিয়া বিচার করিয়া দেখিলে সেই তাগিদেরও সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। কবির মনের উৎপন্ন ভাবরাশি উপযুক্ত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যখন ভাব তথা তাগিদ ও মাধ্যমের অপূর্ব সমন্বয় হয় তখন উচ্চতর বিমল আনন্দলাভ করা যায়। এই আনন্দকেই পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যোপাসকেরা বলিয়াছেন "Symmetry" অর্থাৎ সৌষম্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ।" মহাকবি কালিদাসের রচনাও উদ্দেশ্যবিহীন নহে, মহৎ আদর্শের প্রেরণা তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে। কবির আদর্শ ও সৃষ্টির মধ্যে এমন এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে যে, আদর্শ কোথাও কাব্যরস-পরিস্ফুরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই। শিব ও সুন্দর সমভাবে তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। ইহাই হইল মহাকবিদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

আইডা আনসেল

(দ্বিতীয় পর্ব)

একবার তুরীয়ানন্দজী জনৈক ছাত্রের উপর তাঁর বাহ্যিক রাগ সম্পর্কে আমাকে এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বললেন,—"আসলে আমি কিন্তু রাগি না; একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি রাগের ভান করি।" আরও বললেন,—"যে রেগে উঠতে না পারে সে একটি বোকা। যে জ্ঞানী সে রাগের বশ নয়। সবার সাথে এক হতে চেষ্টা কর। কারুর বিরোধিতা কোরো না। যতখানি বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই পরিমাণেই তোমার একত্ববোধ ব্যাহত হবে। তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে রেগে যেও না বা বাদ-প্রতিবাদ কোরো না। খুব সাবধানে বিচার করে দেখো তার কথা সত্যি কি না। যদি সত্যি হয়, সংশোধন করে নাও; মিথ্যে হলে তাতেই বা তোমার কি আসে যায়?" অতঃপর বুদ্ধের একটি বাণী যোগ করলেন,—"তার আবার দান কি যদি গ্রহীতা গ্রহণই না করল?"

অনন্তর তুরীয়ানন্দজী বুঝিয়ে দিলেন, এক জন সন্ন্যাসী কি ভাবে অপরের মতই সব কিছু উপভোগ করবে, তবে অপরের ইচ্ছার উপরই তার সব নির্ভর। নিজের কোন চাহিদা তার নেই। সে যেন মৃত। সজ্ঞানে সে যেন মরে রয়েছে। আচার্যদেব তাঁর প্রিয় তুলসীদাসের কথা আবৃত্তি করলেন—

"হে তুলসী—
চোখ মেলেছ যখন তুমি ধূলার ঘরে এই ভবে
অঝোর ঝরে কাঁদলে কেবল উঠল হেসে হায় সবে।
আসলো এখন তোমার পালা শান্তি দেবার জগৎটায়,
বাঁচার মত বাঁচতে হবে তৈরী কর জীবন-কায়;
শেষ-বিদায়ের পালা এবার আসলে পরে বিশ্বপার
হাসবে তুমি তোমার শোকে কাঁদবে সবে এই ধরার॥"

আবার বললেন, "হে তুলসী,—চাও, সকলেরই সাথে বাস করে চলো, কারণ, কে জানে কোনখানে এবং কোন্ বেশে ভগবান স্বয়ং এসে হাজির হবেন তোমারই কাছে।"

একান্ত আন্তরিকতার উপর তিনি অত্যন্ত জোর দিতেন। "মন মুখ এক কর; কিন্তু সত্য ও দয়া একসাথে পালন করবে।" ঐ সঙ্গে একটি সংস্কৃত কিংবদন্তী আবৃত্তি করে তার ইংরেজী অনুবাদ শোনালেন,—"মিষ্ট কথা বলবে, কিন্তু তা যেন মিথ্যা না হয়। সত্য বলবে, কিন্তু তা যেন রূঢ় না হয়।" আবার সুন্দর একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য বললেন,— "সত্যেরই একমাত্র জয়, মিথ্যার নহে। যে পথ-অবলম্বনে ঋষিগণ পূর্ণে উপনীত হ'ন— তা-ই সত্যের সনাতন পথ। মুক্তিলাভ করার আর কোন রাস্তা নেই।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে যাঁরা শান্তি আশ্রমে প্রথম গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এলামেডার Home of Truth-এর শিক্ষক ছিলেন। ধীরা আর আমি ছিলাম মিস্ লিডিয়া বেল্-এর ছাত্রী; তিনি ছিলেন সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর Home of Truth-এর অধিনেত্রী। ওখানে প্রাচ্যবিদ্যা ও খ্রীষ্টীয় দর্শনের আলোচনা হ'ত। তিনি প্রথমে খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান ও নিউইয়র্কের থিওসোফি-বিষয়ে যে আন্দোলন চলছিল তার অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বক্তৃতাশিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে সার্

* হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকায় (November-December, 1952) প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীগণেশচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক অনূদিত। এই প্রবন্ধের প্রথম পর্ব (শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত) গত বর্ষের উদ্বোধনে (চৈত্র, ৫৯, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ৬০) প্রকাশ করা হইয়াছিল,—উঃ সঃ

এডউইন আরনল্ড-এর The light of Asia থেকে পড়ে শোনাতেন। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য আমাকে মিস্ বেল-এর নিকট পাঠান হ'ল; এই দুর্বলতার জন্য আমাকে স্কুলও ছাড়তে হয়েছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীরা যখন এলেন তখন আমাদের দৈনিক গীতার ক্লাস হচ্ছিল ' আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগও পড়ে ফেলেছিলাম; ঘটনাচক্রে ঐ বইখানাই শান্তি আশ্রমে পড়া হয়। কিছুদিন ধীরা ও আমি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর তাঁবুর পরের তাঁবুতেই ছিলাম— যেদিকটায় তাঁবুর আগুন জ্বালান থাকত। সান্ধ্য ধ্যানের পর তাঁর তাঁবু থেকে তুরীয়ানন্দজী আমাকে প্রথম শিক্ষা দেন; আমিও আমার তাঁবু থেকে তা গ্রহণ করি। আমার মিস্ বেলের প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল; এটা ভাঙ্গিবার জন্য স্বামীজী যে উপায় অবলম্বন করেন তা'কে বলা যেতে পারে মৃদু পরিহাস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মিশ্রণ। আমার ভাবভঙ্গীর অনুকরণের একটু বাড়াবাড়ি করে স্বামীজী বল্লেন, "তোমার মনের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখ: 'প্রবেশ নিষেধ' যতক্ষণ না বলতে পার, 'এসো, সকলেই এসো'। সকলের মধ্যে মাকে দেখবার চেষ্টা কর, আর সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর।" কিন্তু আমার আসক্তি দূর করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমার শিক্ষাদাত্রীর প্রতি আমার সম্মান ও ভালবাসা পুরোপুরি বজায় থাকে। একদিন স্বামীজী মিস্ বেলের কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরাতে চাইলেন; সেদিন তিনি আমাকে ক্লাসে আসতে বারণ করেন; বল্লেন, 'গাছের তলায় বসে তাঁর জন্য প্রার্থনা কর।'

তুরীয়ানন্দজীর শিক্ষাদানে কোন প্রাণহীন, গতানুগতিক নিয়মানুবর্তী বহিরঙ্গভাব ছিল না; তিনি আমাদের মধ্যেই যেন বাস করতেন, আর প্রত্যেকের প্রয়োজন-অনুসারে শিক্ষা দিতেন। এক দিন আমি দেখলাম, তিনি ঠায় একা বসে প্রাণভরে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাসবার কি ব্যাপার স্বামীজী?" তিনি শুধু মাথা নেড়ে হাসতেই লাগলেন। তখন আমি বল্লাম, "আপনার মনে কি আছে জানতে পারলে আমি পৃথিবীতে সব কিছুই ছেড়ে দিতে পারতাম।"

মুহূর্তমধ্যে তুরীয়ানন্দজী শান্ত হয়ে বল্লেন, "উপরে তুমি দেখতে পাবে এটা ওটা— তুরীয়ানন্দ— কিন্তু ভেতরে দেখবে সব রামকৃষ্ণ।" আমি মাঝে মাঝে অনুভব করেছি, একথা মিশনের সব স্বামীজীদের সম্বন্ধেই সত্য। বাইরের দিকে তাঁদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, ভেতরে তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণে লীন। একজন স্বামীজী বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাইরের পার্থক্য সব দেখা যাচ্ছে স্বামীজীদের প্রারব্ধ কর্মের জন্য; ছাত্রেরা সেদিকে দৃষ্টি দেবে না।

একদিন বিকালে একদল শিক্ষার্থী একসঙ্গে বসে কথাবার্তা করছিল। তুরীয়ানন্দজী সেখানে এসে বেশ উত্তেজিত ভাবে বল্লেন, "আমি দোলনা থেকে পড়ে গিছলাম। কেন আমি প'ড়ে গেলাম? যেটাকে ধরেছিলাম সেটা শক্ত ছিল না। মাকে ধরে থাক। তা'হলেই আমরা নিশ্চিন্ত। সেইটিই আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায়।"

অন্য আর একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলেছিলেন। তিনি তখন প্রথম সান্‌ফ্রান্সিস্কোয় আসেন, বাস করছিলেন ডাঃ লোগানের বাড়ীতে। এক দিন কোন পয়সা না নিয়েই তিনি শহরের পথে বেরিয়ে পড়েন; ঠিক যখন একটা মোটর কারে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মনে হ'ল "তাইত, আমি আমেরিকায় রয়েছি, কারের ভাড়া লাগবে।" তারপর তিনি আবার দৌড়ে গিয়ে ডাঃ লোগানের কাছে দরকারী খরচার জন্য কিছু টাকা চাইলেন। মোটর কারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল; ভদ্রলোক তাঁকে চিনতেন। তিনি তুরীয়ানন্দজীর ভাড়া দিয়ে দিলেন। স্বামীজী নিজের

নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কারের ভঙ্গীতে কপালঠুকে বলতে লাগলেন, "মা অনুযোগ করলেন 'আমি কি তোমার গাড়ীভাড়া দিতে পারতাম না ?' "

আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। ঘটনাটি আমাদের সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। তুরীয়ানন্দজীর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোয় আসার প্রথম সপ্তাহেই একদিন বিকালে মিঃ য়্যাল্‌বার্ট উলবার্গ কয়েক জন বন্ধুব সঙ্গে তাঁকে একটি ফরাসী ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। রেস্তোরাঁটি Call Building-এর সবচেয়ে উপরের তলায় ছিল। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল শহরটির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। তুরীয়ানন্দজীর তখন সব বিষয়ে একটি সানন্দ কৌতূহলী ভাব। আর আঁধার ভেদ ক'রে আলোব ঝলক ঘন ঘন দেখা দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি ?" সাধারণ প্রশ্নেও গভীর জিজ্ঞাসু ভাব ! মিঃ উলবার্গ বল্লেন, "স্বামীজী, ওটা একটা সন্ধানী আলো। ওটা চ্যুট্‌স্‌ থেকে আসছে। চ্যুট্‌স্‌ এই শহরের দক্ষিণ দিকের একটি আমোদ-প্রমোদের পার্ক। আপনি কি সেখানে যেতে চান ?"

"চ্যুট্‌স্‌ ? শিব ! শিব ! হ্যাঁ, যাব" বল্লেন তুরীয়ানন্দজী।

ভোজের পর নানাধরনের পাশ্চাত্ত্য আমোদ-প্রমোদের সহিত স্বামীজীর প্রথম পরিচয় ঘটল। একটি নৌকার সামনের দিকে তিনি বসেছিলেন, হঠাৎ নৌকা কাত্‌ হওয়ায় তিনি হড়কে গিয়ে সাতারের ছোট্ট পুকুরে পড়ে যান ; পড়ে গিয়েই হাবুডুবু খেতে লাগলেন, আর চারদিকে ছড়াতে লাগলেন জল। একবার তাঁর খুব উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোন এক পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে চলেছেন খোলা একটি মোটর গাড়ীতে। গাড়ীটি ভীষণ বেগে একবার উঠছিল, একবার নামছিল। তা' দেখে আমাদের কি আনন্দের ধ্বনি !

তারপর তাঁকে 'মেরি-গো-রাউণ্ড' এর একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘোরানো হল। বয়স্ক লোকদের এই ভাবে তরুণদের মতো রঙ্গ-তামাসায় মাতা সম্বন্ধে আচার্যদেব মনে মনে কি ভাবছিলেন তা অবশ্য তিনি বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখে একটি আমোদের কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। এরপর আমরা গেলাম একটি থিয়েটারে। একটি নর্তকী তার পোষাকের সন্নিবেশ অদলবদল করে অনেকগুলি আয়নার সামনে এমনভাবে বহু বিচিত্র প্রতিবিম্ব ফেলছিল যে দর্শকবৃন্দের মনে হচ্ছিল যেন গোটা একটি নর্তকীর দল রঙ্গমঞ্চে হাজির ! তুরীয়ানন্দজী দেখে খুব খুশী ! বলে উঠলেন,— "দেখ দেখ ! এরই নাম মায়া। বাস্তবিক রয়েছে এক অথচ অনেক বলে মনে হচ্ছে।"

আচার্যদেব যখন কথা বলতেন তখন তাঁর হাবভাবগুলি তাঁর কথার মতোই খুব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত এবং তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন তা যেন প্রত্যক্ষভাবে সমীপবর্তীর অন্তর স্পর্শ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি যখন তাঁর নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথাটা একটু উপরের দিকে তুলে আমাকে বুল ডগের মত নাছোড়বান্দা হতে বলছেন, তখন অনুভব হত যে, তাঁর ভেতর দিয়ে যেন স্থির প্রতিজ্ঞার একটি বাস্তব তরঙ্গ বয়ে চলেছে।

তিনি এক মুহূর্তেই অপরের মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। একদিন সকালে আমার মনে একটা হতাশভাব চলছে। তিনি সেই সময়ে এসে হাজির। বজ্রদৃঢ়স্বরে বললেন,—"তুমি বুঝতে পার বা না পার এটা ঠিক যে, তুমি মায়ের সন্তান।" তারপর স্বর নরম করে বলছেন,—"তবে যদি এটা ধারণা করতে পার তাহলে তোমার সব ভয় দূর হয়ে যাবে, সব সন্দেহ কেটে যাবে, হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর উপর আমার টান একান্ত-

ভাবে বেড়ে চলছিল। এটা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনিও আমার সংশোধনের জন্য নির্মম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। দিনের পর দিন তিনি আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে চললেন, আমায় যেন গ্রাহ্যই করছেন না, এবং আমি যতক্ষণ তাঁর তাঁবুতে কাজ করছি, তিনি ওদিকে আসছেনই না। তারপর আমি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছি যে, তাঁর কাছ থেকে কোন স্নেহ পাওয়ার আশা আর নেই—তখন অকস্মাৎ একদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—"তোমার বান্ধবী মিস বেলের উপর তোমার যে টান ছিল সেইটাই এখন আমার উপর পড়ছিল। তাই 'অস্ত্রোপচারের' দরকার হয়েছিল। এবার ঘা শুকোবার মলম পাবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালবাসার ফল দুঃখ। 'মা'কে যদি ধর তাহলে সব পাবে।"

এই বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করবার পর আচার্য-দেবের সঙ্গে আমার পূর্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ফিরে এল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কয়েকমাসের জন্য আমাকে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে হয়। শীত আসছে। বর্ষায় তাঁবু ছিঁড়ে জল পড়ত। ঠাণ্ডা লেগে আমি সর্দিতে আক্রান্ত হলাম। আবার সামনে আসছে শীতকাল। স্বামীজী আমাকে কাঠের ঘরে শুতে আদেশ দিলেন। আমি প্রথমে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন—"অত বেশী আমেরিকান হয়ো না, একটু হিন্দু হও, বাধ্যতা শেখো।" স্থির হলো আমি সানফ্রানসিস্কোতে থাকব—এবং বসন্তে ফিরে আসব। যদিও আমি শহরে গেলাম; আমার মন সব সময় আশ্রমেই পড়ে থাকত।

এই সময়ে আমি স্বামিজীর কাছ থেকে কতকগুলি চিঠি পাই। তার একটিও পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এখানে দিলাম :—

শান্তি আশ্রম ; পোঃ ডি ফরেষ্ট
স্যান্টাক্লারা কোং
ক্যালিফোর্নিয়া—
১৫ই জানুয়ারী, ১৯০১

স্নেহের বেবী,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। ভাল আছ জেনে আনন্দিত হ'লাম। তুমি আমার কাছে যে গানটি চেয়েছ তার সমস্তটা অনুবাদ করে পাঠাচ্ছি। আমি এটা গুরুদাসের জন্য করেছিলাম। এখানে এরা সকলেই ভাল আছে। আমি শীঘ্রই শহরে যাব বলে আশা করছি। শ্রদ্ধা পুনরায় ভালই বোধ করছে। এই একান্তবাস শেষ করে আমি কখন ওখানে আসব তা যথাসময়ে মিসেস উইলমটকে লিখে জানাব। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আসছে কাল থেকে আমি এক সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করবো। গত কয়েকদিন ধরে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা সব সময় জানবে। এখানে অনুবাদটি দিলাম।

"হে আমার মন, তোমাকে বলি যে পথই তুমি পছন্দ করো না কেন, কালীর ভজনা কর। তোমার গুরু তোমাকে যে মহৎ মন্ত্র দান করেছেন তাই দিবারাত্র জপ কর।

যখন শোবে তখন জানবে যে তুমি মাকে নমস্কার করছ।

যখন নিদ্রা যাবে, জানবে যে তুমি মায়ের ধ্যান করছ, যখন খাবে তখন জানবে—যে তুমি শ্যামা মাকে নৈবেদ্য অর্পণ করছ।

তোমার কানে তুমি যা শোনো, সবই মায়ের কথা, কারণ মা সকল অক্ষরেই বিরাজ করছেন।

মহানন্দে রামপ্রসাদ ঘোষণা করছেন যে, মা সকলের শরীরেই বাস করছেন। সুতরাং তুমি যখন নগরের চারিদিকে বেড়াচ্ছ, তখন ভাববে যে তুমি শ্যামা মাকেই প্রদক্ষিণ করছ।"

এই গানের মর্ম অনুভব করবার চেষ্টা করবে তাহলে তোমার ধ্যান ধারণা প্রভৃতি খুব চমৎকার-ভাবে সম্পন্ন হবে।

জগজ্জননীতে তোমাদের চির—তুরীয়ানন্দ।

আধ্যাত্মিক ভারতে তীর্থের স্থান

শ্রীরবি সিংহ

আধ্যাত্মিক ভারত-আকাশে পুণ্যতীর্থগুলি জ্যোতিষ্কস্বরূপ অপরিম্লান দ্যুতি নিয়ে ছেয়ে আছে। তারা নিয়তই পথ দেখাচ্ছে আপন ভাস্বর প্রভায় পরিপূর্ণ চৈতন্যসঙ্গম-পথযাত্রীকে। তাদের প্রাণস্পর্শী আহ্বান তীর্থপথিককে স্থির থাকতে দেয় না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত সে ছুটে যায় অভাবিত গন্তব্যের দিকে—আশার পিয়াসী মনে, অদৃশ্য শক্তির টানে। সংখ্যাতীত কাল হতে পুণ্যলোভাতুর ছুটে গিয়েছে দুরারোহ পর্বতমালায়, দুর্গম গহন অরণ্যে, দুস্তর পারাবার পেরিয়ে কোন্ সে পারমার্থিক স্বর্গবেঁষা কিছু একটা অলক্ষিত অভাবিতের দর্শনমানসে—শত বাধাবিপত্তি, শত দুঃখকষ্ট, শত বন্ধন ছিন্ন করে।

ভারতের তীর্থযাত্রীরা তীর্থযাত্রায় যেমন করে মেতে ওঠে, তেমন করে নেচে উঠতে দেখি না অপর কোন বিদেশীয় রাষ্ট্রবাসীদের। তাই ভারতমানসে তীর্থযাত্রা এক সাধনা—তার আসলরূপ চেনার সাধনা। আত্মসাধন স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে আনন্দ-লহরীর মাঝে গা ভাসিয়ে দেয় এ পথের যাত্রী। কারো বা যাত্রা শুরু হয় যৌবনের উদ্দামতার তালে, কারও বা শুরু হয় বার্ধক্যের শেষ সীমায়।

প্রকৃতিদেবীর অশেষ দানে সম্পদশালিনী এই পুণ্যভারতের স্তবকে স্তবকে অসংখ্য তীর্থ তার ভূষণ হয়ে আছে। তীর্থভূষিত ভারতের জয়গান আমরা পাই তার প্রতিটি শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকাব্যে। দেবদেবীর কাহিনী-বিজড়িত তার ইতিকথা। মাধুর্যভরা তার স্তুতি। রহস্যে ভরা তার স্থিতি। অনির্বচনীয় তার দিব্যদর্শন। কতশত যুগ গেছে এর পুণ্যকাহিনী বুকে নিয়ে মহাগৌরবে। দুর্দৈবকালের স্রোত এর উপর দিয়ে শতশত ঘটনায় ভারাক্রান্ত রথ ছুটিয়ে নিয়ে গেছে, অশান্তচঞ্চল গতিতে। তবু সে পিষ্ট হ'লো না—চূর্ণ হ'লো না শত বৈরীর নিষ্ঠুর আঘাতে—নিঃশেষ হ'লো না সহস্র লুণ্ঠকের লুণ্ঠনে। অক্ষয়প্রভায় তারা এখনো ভারত জুড়ে রয়েছে।

ভারতজোড়া তীর্থশ্রেণীগুলি তীর্থকারীর দল পর্যটন করে বেড়াচ্ছে। অগণিত তীর্থ—দেবতীর্থ, কায়তীর্থ, পৈত্রতীর্থ, ব্রাহ্মতীর্থ, মানসিক তীর্থ আরও যে কতপ্রকার তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় বা চিরতুষারমৌলি হিমগিরি, কোথায় বা নীলাম্বু-শোভিত সরোবর। কোথায় বা পর্বতকন্দর-নিঃসৃত নির্ঝরিণী, তপ্তকুণ্ড, দু'তীর-ছোঁয়া সেতুবন্ধ, বহুশাখাপ্রসারিত মহীরুহতল, গিরিগুহা, বৃক্ষরাজি-শোভিত উদ্যান, কোথায় বা আবার গগনস্পর্শী মন্দিরচূড়া, বৈদূর্যখচিত, বিদ্রুমশোভিত গর্ভমন্দিরে পদ্মাসনে আসীন বিগ্রহ। বহুযুগের বৈচিত্র্যে ভরা বহুশিল্পীর কারুকার্যশোভিত দেবমন্দিরের প্রস্তরগাত্র। নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট দেবালয় বহুবিধ তার গঠনভঙ্গী। অভ্যন্তরে নানা ভঙ্গীতে বহুপ্রকার বিগ্রহ ও প্রতিমূর্তি।

বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সম্প্রদায় ও আচার-সমন্বিত এই ভারতে বহুবিধ মতামত। কত যে পথাবলম্বীর মিলন ঘটেছে এই ভারতের মিলন-তীর্থে তার কি ঠিক আছে? সকল আচার ও ব্যবহারকে নিঃসঙ্কোচে ভারত তার নিজের মর্মমাঝে স্থান করে দিয়েছে সুবিন্যস্তভাবে। সকল বৈচিত্র্য, সকল বিভিন্নতা কেমন যেন এক অদৃশ্য গ্রন্থিতে বাঁধা আছে সবার মধ্যে এককের উপলব্ধি ক'রে—তাদের সেই এককের সূত্রটি—যা তারা আবিষ্কার করেছে জ্ঞানের দীপ্ত দীপের আলোয়, প্রতিষ্ঠা করেছে অফুরন্ত কর্মশক্তি দিয়ে, জয় করেছে প্রেমের

শুচিশুভ্রতার স্পর্শে, প্রচারিত করেছে জীবনের উদাত্ত ঘোষণায়। তাই কোন কিছু আঘাত পেলো না তার অজ্ঞানের সংকীর্ণতার কাছে। কোন কিছু বিনষ্ট হ'লো না গোঁড়ামির নিষ্ঠুর হাতে। কোন কিছু প্রত্যাখ্যাত হ'লো না দম্ভ-অহমিকার জোরে। সব কিছু সে বরণ করে নিয়েছে আনন্দভরা মনে; আহরণ করেছে কল্যাণের অনিন্দ্য ছন্দে— সবার সত্তা স্বীকার করে। সত্যদ্রষ্টা ভারত তার মঙ্গলময় নিপুণহাতে বিশ্বজনীন আসরে মরণজয়ী, কালজয়ী, দ্বেষজয়ী একতারা নিয়ে বসেছে বিশ্বদেবতার বিশ্ব-সুর বাজাতে। সে একতারা সকল আত্মার পরম-তত্ত্বতন্ত্রীতে বাঁধা; তার আকাশে বাতাসে অহরহ মহেশ্বরের জয়গানের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। চিত্তপুরুষের অম্লান প্রভা সে বিচ্ছুরিত করেছে আপন অঙ্গন-সীমার গণ্ডি ছাড়িয়ে। দিগ্বিজয়ীর অভিযানে সে বেরিয়েছে— বিশ্বজয়ী দিগ্‌বিজয়— ছুটেছে সে দেশ হতে দেশান্তরে। জয় করেছে কালপুরুষকে; অজাতশত্রু ভারত চলেছিল আধ্যাত্মিকতার রথে চড়ে, ধর্মের মুক্তকৃপাণ হাতে নিয়ে, সংস্কৃতির অশ্ব ছুটিয়ে। তখন তার সম্ভোগের বল্গায় টান পড়েছে, তামসিকতার মাঝে দোলা লেগেছে, আত্মদানী মন বলিদানের স্ফূর্তিতে নাচ শুরু করেছে, অহংভাবের সেদিন হয়েছিল মৃত্যু। তার রথচক্রের ঘায়ে চূর্ণ হয়েছে নানা দেশের পুঞ্জীভূত অন্ধতা, অজ্ঞতা, বদ্ধতা— সর্বজয়ী তিমিরান্তকের পরশ পেয়ে অভ্যুদয় ঘটেছে মঙ্গল দিনকরের।

ভুবনেশ্বরের আরাধনা হ'লো ভারতে, ধর্মের বেদীমূলে—সমন্বয়ের মন্ত্রে। অধ্যাত্মবাদ হ'লো তার পূজারী। বহুখণ্ডিত ভারত— বিক্ষুব্ধ ভারত এসে মিলিত হ'লো ধর্মবেদী ঘিরে। হৃদয়বীণা বেজে উঠল মানবসেবী শিল্পীর ঝংকারে। চিত্তাকাশে ধ্রুবতারার আবির্ভাব— প্রাণপুরুষ জেগে উঠলো, ঘুচে গেল মানবের আদিম মনের প্রবৃত্তির ছাপ। শুচিশুভ্র চিৎসরোবরে ফুটে উঠলো শ্বেতশতদলরাশি — সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। যার কাছে থেমে গেছে হিংসায় উন্মত্ত পিশাচের নৃত্য।

এই আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম ছিল তার পোষক —তার ধাত্রী। সকল সম্প্রদায়ের শিশুদেহ তার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে, সঞ্জীবিত হয়েছে তার অমৃতরসে। আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম হচ্ছে প্রাণ-পুরুষের চাবিকাঠি। তাই এ ধর্মপাশে তার মিলন ঘটবেই। সকল দাবি, বহু সিদ্ধান্তের মাঝে সমন্বয়ী ধর্ম, সর্বধর্মমাঝে সাধারণ সূত্রগুলির গ্রন্থিতে বেঁধেছে এককের মহান অনুভূতিতে। তাইতো আধ্যাত্মিক ভারতে অধ্যাত্মের পরমপ্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বতেজা প্রকাশ যা' বস্তুমুখী বিশ্বকে ভস্ম করে দেবে তার আপন কল্যাণে, তার আপন মুক্তিতে।

আধ্যাত্মিক ভারতোদ্যানে তীর্থগুলি ফলে ফুলে ছাওয়া তরুরাজির মত শোভা পাচ্ছে। আধ্যাত্মিক ভারতের বুক হতে তারা সকল প্রকার রস সংগ্রহ করছে, বেঁচে আছে এর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। সর্বত্র ফুটে উঠেছে মাটির বদ্ধতা ভেদ করে প্রাণ-পুরুষের অন্তর্গূঢ় খবর নিয়ে। চারিদিক জুড়ে তার প্রকাশ। অনির্বচনীয় তার শোভা, অনিন্দ্য-সুন্দর তার রূপ, আত্মবিস্মৃত তার পরিমল। নানা আকার, নানা ভঙ্গী, নানা বর্ণ, নানা ছন্দে সে রয়েছে আধ্যাত্মিক ভারতের ধর্মোদ্যান ছেয়ে। তার সেই রূপ যুগে যুগে তীর্থপথিককে আকর্ষণ করেছে, আকুল করেছে তার গন্ধ। অনুসন্ধিৎসুগণকে জ্ঞানফলে পরিতৃপ্ত করেছে। ছুটে গিয়েছে পুণ্য-তীর্থের পথিক। কত দুঃখ, কত ব্যথা যে নিষ্ঠুর কষাঘাত করেছে তার দেহে তার আর পরিমাপ নেই। দুর্গম পথ-যাত্রায় মনের সঙ্গে দেহের বার বার দ্বন্দ্ব লেগেছে। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের, বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, আপনের সঙ্গে সবার।

তীর্থগুলির প্রাণস্পর্শী আহ্বান যে শুনেছে, সে ছুটে গিয়েছে আপন সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে —যে মায়াবন্ধনে সে বদ্ধ হয়েছে সারাজীবন ধরে—

আপন তৃপ্তি, আপন ভাবনা, আপন অভিপ্রায়, আপন স্পৃহা, আপন রুচি মিলিয়ে তা'কে সে অকস্মাৎ বিদীর্ণ করে ছুটে যায় দুর্গম পথে, দুর্দম বেগে। সব ফেলে যায়। বহু স্মৃতি তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কত স্নেহ, কত প্রীতি, সকল কীর্তি যে কেবলই বাধা দেয় মুক্তপথের যাত্রায়। তবু সে যায়, গেছে, যাবে সব কিছু পায়ে ঠেলে।

রহস্যভরা এই পৃথিবীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে বেরিয়েছেন যুগে যুগে আচার্যগণ ভারত পর্যটন-পথে তীর্থদর্শনে। অন্তরাত্মার অকথিত ভাষা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের শ্রীমুখের বাণীতে। অজ্ঞাতপুরীর খবর পেয়েছেন তাঁরা তাঁদের তীর্থ-পথযাত্রায়। তারই সঙ্গে তাঁরা শুনেছেন বিচিত্র দেশের বৈচিত্র্যের মাঝে এককের আহ্বান।

ভারত-চেনার আশা যাদের তারাই তো ফিরছে পুণ্যপুরীর পথে পথে। যে আধ্যাত্মিক ভারত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সত্যধর্মের আসন বিছিয়ে বসে আছে ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাকে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দর্শন পেতে গেলে তীর্থযাত্রা চাই-ই।

ভারতের প্রতিটি প্রান্তর জুড়ে, প্রতিটি ভাষাভাষী অঞ্চল হতে তীর্থযাত্রী আসে তীর্থভূমিতে নানাপ্রকার ব্যবহার, নানাপ্রকার আচার, নানা বেশভূষা নিয়ে, নানা সামাজিক রীতি পোষণ ক'রে। এ'কে অপরের ভাষা বোঝে না, এ'কে অপরের রীতিনীতির সঙ্গে অনভ্যস্ত, তবু যেন তার মধ্যে ছন্দ, মধুর মিল—তারা যে একই পথের যাত্রী, একই পুণ্যের অভিলাষী, একই দর্শনের আকাঙ্ক্ষী। বাহিরের সকল বাধা, সকল বিভিন্নতা, সকল ব্যবধান তাদের অন্তরমিলনের কাছে পরাভূত হয়। সমন্বয়ী ভারত মূর্ত হয়ে ওঠে। কারণ তারা যে একই আকর্ষণডোরে বাঁধা—যে আকর্ষণ পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিয়েছে, জন্মান্ধকে দেবদর্শনে চক্ষুষ্মান করেছে। বৃদ্ধা চলেছে একাকিনী—সহায় প্রার্থনা না করে, বৃদ্ধ চলেছে যৌবনদৃপ্ত পদক্ষেপে। তাঁর আকর্ষণের দীপ্ত দীপের আভায় যে সবার মাঝে সুপ্ত মহাশক্তির জাগরণ হয় সব কিছু সাঙ্গ করে!

যে সভ্যতা, যে ভারতীয় সংস্কৃতি বহির্বিশ্বে একদিন পথ দেখিয়েছে, শঙ্কাকুল মানবচিত্তের আগামী দিনের লক্ষ্য হয়ে আছে—সেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিত্তি ধর্মের উপর—অধ্যাত্মবাদ তার ভূমি; আর তীর্থ তার ভবন, তার আশ্রয়, তার প্রকাশ, তার ঘোষণা। আশ্রিত জনের পরে দেবতার আশিস নিয়তই ঝরছে—তাই বলি তীর্থপথযাত্রীর জয় হোক!

নির্ভর

শ্রীঅশোক সেন

তুমি যে অসীম, রয়েছ ছড়ায়ে ধরণীর সবখানে,
তবুও তোমার মধুর প্রকাশ মোর সীমায়িত প্রাণে;
হৃদয়ের যত কামনা আমার
নিয়েছ যে তুমি করি আপনার,
তনু-মালঞ্চে প্রতি অণু মোর তব সৌরভ আনে।

বক্ষে তোমার মুখ ঢেকে মোর, নয়নে নয়ন রাখি
তোমার অরূপ রূপ পানে আমি নিশিদিন চেয়ে থাকি,
জানি তুমি মোর হৃদিকন্দরে
রয়েছ লুকায়ে মনরূপ ধ'রে ;
তোমার-ই দেওয়া সে মায়া-অঞ্জন রেখেছে তোমারে ঢাকি'।

দুঃসহ দুখে যখনি হৃদয় কেঁদেছে ব্যাকুল স্বরে
সে তো জানি, প্রভু, তোমার আশিস্—পাঠায়েছ স্নেহভরে,
বরাভয়-মাখা তব দুই পাণি
ব্যথার আড়ালে রয়েছে তা' জানি
দুখহরা তব করুণা পরশ বুলাবে সে অন্তরে।

ক্লান্ত শরীর অসীম ব্যথায় ভেঙে পড়ে বারে বার,
নিরাশায় ছাওয়া জীবনের পথে নেমে এলো আঁধিয়ার,
শ্রান্ত এ হিয়া কেঁদে কেঁদে কয়
'আলো দাও মোরে, ওগো দ্যুতিময়,
আরো কতদূর—কবে হবে শেষ দুর্গম যাত্রার ?'

ধর্মের আহ্বান *

(William James—Will to Believe—1897)

এই প্রপঞ্চ জগতের পরপারে অদৃশ্যজগৎ আছে কি না আছে সে প্রশ্নের উত্তর আমার মনে হয় অনেকটা নির্ভর করে আমরা ধর্মের আহ্বানে কে কতটা সাড়া দিই তার উপর। মোটা কথায় বলতে চাই যে, হয়তো ভক্তের ভক্তির জোরের সঙ্গে ভগবানের প্রাণের শক্তি বাড়ে কমে। এ জীবনের দুঃখকষ্ট ঘর্মপাত রক্তপাত প্রাণপাত—এ সকলের অর্থ যদি কিছু থাকে তাহলে এই তো তার অর্থ। এ জীবনের যুদ্ধ যদি সত্য যুদ্ধ না হয়, এ যুদ্ধের জয়ে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনও সত্য এবং সনাতন বস্তু লাভ না করে তাহ'লে তো ইহা একটা সখের থিয়েটারের অভিনয়মাত্র, যার যখন খুশী এর থেকে সরে পড়তে পারে। কিন্তু তেমন তো ঠেকে না। অনুভব তো হয় এ জীবনযুদ্ধ সত্য যুদ্ধ; যেন সংসারের এমন কিছুটা জঙ্গলে ঢাকা কাঁটাবনে পূর্ণ —স্থান আছে যাকে চাষের যোগ্য করবার জন্য আমাদের কর্তব্যপরায়ণতার, আমাদের বিশ্বস্ততার দরকার আছে। এবং প্রথমেই দরকার আছে আমাদের হৃদয়ের ক্ষেত্র থেকে নাস্তিকতার জঙ্গল এবং ভয়ের কাঁটাগাছ সাফ করা। এই রকমের

* শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস্. (অবসরপ্রাপ্ত) কর্তৃক অনূদিত।

কতকটা জংলা, কতকটা সাফ ব্রহ্মাণ্ডই যেন আমাদের স্বভাবের পক্ষে উপযোগী। আমাদের স্বভাবের গভীরতম স্থানই হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সেই গহ্বর যেখানে আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা ভয় বিশ্বাস নিয়ে একাকী বাস করি—যেখানকার কথা আমরা মুখে প্রকাশ করি না। পাহাড়ের অন্ধকার গহ্বরের ফাটল দিয়ে যেমন পৃথিবীর অন্তঃস্থলে থেকে জল এসে ঝরণার উৎপত্তি হয়, তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের সেই আলো আঁধারে ঢাকা গভীরতা থেকেই আমাদের যত কাজকর্মের, যত সিদ্ধান্তের উৎপত্তি। এইখানেই পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের আসল যন্ত্রগুলি রক্ষিত আছে। এবং আমাদের আত্মার এই স্বচ্ছন্দগতির কাছে—দার্শনিকের মতবাদ কি বৈজ্ঞানিকের তর্ক নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অগ্রা বিশেষ করে যখন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলেন যে আমাদের এ বিশ্বাস বিচারসহ নয় তখন তাঁদের কথা আমরা অর্থহীন প্রলাপ বলেই মনে করি।

আমার শিষ্যদিগের প্রতি এই আমার শেষ কথা। জীবনকে ভয় করো না। বিশ্বাস রেখো যে বেঁচে থাকবার অর্থ আছে, মূল্য আছে। তোমাদের এই বিশ্বাসই নিজেকে বাস্তবে পরিণত হতে সাহায্য করবে। যদিও মহাপ্রলয়ের দিনের পূর্বে হয়তো তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলবে না, কিন্তু এখন যারা বিশ্বাস নিয়ে জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত আছে, সেই দিনে তারা কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা আজকের জীবনযুদ্ধে যারা ভয়ত্রস্ত বা দ্বিধাগ্রস্ত তাদের Arquesএর যুদ্ধ জয়ের পর Henry IV তাঁর বিলম্বপরায়ণ সেনাপতি Crillonকে যাহা বলেছিলেন তাই বলতে পারবে:—"বীরবর, গলায় দড়ি দাও—Arquesএতে আমরা যুদ্ধ করলাম —তুমিতো সেখানে ছিলে না।"

হরিনাম টহলগান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্-এ, বি-কম্

বাঙলা দেশে গ্রামে গ্রামে কত অজ্ঞাত কবি কত যে সুরে হরিনামের গুণগান করিয়া নামপ্রচার করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। এ সমস্ত গানের অধিকাংশের রচয়িতা কে জানা নাই, এমন অপূর্ব সুরই বা কাহারা দিয়াছেন, এত আকুল আর্তি কাহারাই বা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম পর্যন্ত হারাইয়া গিয়াছে।

কেবল বাঙলার গ্রামে গ্রামে গৃহস্থঘরের ভক্তি-নম্র নরনারীরা আর বৈরাগী ভিখারীরা বছরের পর বছর সেই একই গানগুলি একই সুরে, একই ঢঙে গাহিয়া আসিতেছে। শরৎ-হেমন্তের শেষ রাতে বৈরাগী টহলদার ঐ সুরকে কণ্ঠে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, হাটে বাটে নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ফিরে। এ সব গান জনসাধারণের নিজস্ব সম্পত্তি, তাহারা নিজেরাই মনোমত করিয়া সুরের রদবদল করে, প্রয়োজনমত কলির রূপান্তর করিয়া লয়।

বাঙলা দেশের কত পরিবর্তন ঘটিল। কতবার কত রাজার বদল হইল; গ্রামগুলি রেলপথ-জলপথের প্রসাদে শহরের কাছে আগাইয়া আসিল। শিক্ষার প্রসার ঘটিল, সাহিত্য এবং সঙ্গীতে নূতন ভাব, নূতন সুর আসিল, কিন্তু বাঙলার গ্রামবাসীদের সেই হরিনাম-গান সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সদ্যঃপ্রয়াত রামদাস বাবাজীর কণ্ঠে যাঁহারা নামগান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন—নাম-

গানের অপূর্ব সুর-লহরী বাঙলা দেশে আজিও হারায় নাই। সারাদিনের কর্ম-অবসানে সন্ধ্যাবেলায় গ্রামবাসীরা যে নাম গাহে, পালাপার্বণে, দোল-ঝুলনে, রাসে বারোয়ারীতলায় যে হরি-সংকীর্তনের আসর বসে—তাহার মধ্যেই এ দেশের লৌকিক জীবনের নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।

হরি বল, হরি বল, হরি বল ভাই,
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই॥
হরিনামে উদ্ধারিল জগাই আর মাধাই, হরি নামের নৌকা ক'রে ভবপারে যাই।
হরিনাম মহামন্ত্র এই কর সার। হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাই॥

এমন অল্প কথায় এত সহজভাবে ভগবানের নামগান আর কোথাও নাই। বাঙালীর ধর্মজীবন এবং সংসারজীবনের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে এই শ্রেণীর হরিনামগান। শ্রীচৈতন্যদেব সকলকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেন নাই, সংসারী লোকদের মুক্তির উপায় বলিয়া তিনি নির্দেশ দেন হরিনাম গান করিবার। সবাই যদি সন্ন্যাস লয়, তবে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? এ ভাবে হরিনাম-কীর্তন করিলেও সন্ন্যাসের সমতুল্য ফল পাওয়া যাইবে—সে জন্য এই গানগুলি সংসারী লোকদের সাধন-ভজনের গান :—

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও।
গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও॥
একবার গাওরে আনন্দময় নাম
এনাম বদন ভরে গাও (হরিনাম বদন ভরে গাও)॥
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে,
সদা সর্বক্ষণে গাও (হরিনাম সর্বক্ষণে গাও)॥
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে
হরিনাম যথা তথা গাও (হরিনাম যথা তথা গাও)॥
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে
গেয়ে জগৎ মাতাও (নামে জগৎ মাতাও)।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে (সংসারের দুর্গম পথে রে)
আনন্দে চলে যাও॥

এ সব গানের মধ্যে কোন গভীর তত্ত্বচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা, কোন গূঢ় গহন ইঙ্গিত, সুরের স্পর্ধিত কারুকার্য বা কসরৎ প্রভৃতি কিছুই নাই। এইগুলিতে বৈরাগ্যের নির্লিপ্ততা ও অনাসক্তির সঙ্গে সংসার-যাত্রা-নির্বাহের মধ্যে মুক্তির নিশ্চিন্ততার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হরি বলে ডাকরে রসনা, ও তোর যাবে ভব-যন্ত্রণা।
হরি বলে ডাকরে আমার মন, অন্তিম কালে জানবি হরিনামের কত গুণ ;
আবার হরিবলে যাবে চলে, যমে ছুঁতে পারবে না।
হরি ভবকাণ্ডারী, নিজগুণে পার করিতে রেখেছেন তরি,
আবার দুঃখী তাপী পারে যাবে
তাদের মাসুল লাগবে না॥

নীলকণ্ঠ অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, মধুসূদন কিন্নর, কাঙাল ফিকিরচাঁদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গীতিকারের রচিত অনেক সুপরিচিত গানের ঈষৎ রূপান্তরিত নানা গানও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাঁহাদের স্বরচিত সুরকে অবলম্বন করিয়া আবার গ্রাম্য কবিরা নব নব গান রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। নিম্নের বিখ্যাত হরিনাম গানটি গোবিন্দ অধিকারীর রচনা—

হরি হরি বলরে ও আমার মন
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন
ভাবিলি না সে কাল-বরণ, কিসে হবে কাল নিবারণ,
সদা যেমন মত্ত বারণ, করেছ ভ্রমণ ॥
মত্ত হয়ে রাজ্যসম্পদে, না মজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তোর পদে পদে, দিবে যে শমন ॥
যে পদে লক্ষ্মীর সম্পদ, ভাবিলি না সে হরিপদ,
ঘটালি আপন আপদ, এ আর কেমন।
কারে বল আপন আপন কররে মন !
কি আলাপন, সে নহে কখন আপন, যেমন স্বপন।
আপন যে চিনলি না তাঁরে, যে ভব দুস্তরে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাবলে তারে, পালাবে শমন ॥

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণের অথবা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলার সাহিত্যরসঘন অলঙ্কৃত বাগ্‌বিন্যাস ইহাতে নাই, ভাগবত অথবা চরিতামৃতের সঙ্গেও ইহার যোগ নাই। তত্ত্ব অথবা তথ্যের ভারে অযথা গানগুলিকে বুদ্ধিগম্য করা হয় নাই। এইগুলিতে আন্তরিকতার অভাব নাই।

বাংলাদেশের প্রেমধর্ম-প্রচারের ভার ছিল নিত্যানন্দ প্রভুর উপর। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পরেও নিত্যানন্দের লীলা প্রকট ছিল। গৃহস্থ ভক্তরা গৃহে বাস করিয়াও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই কারণে গৌরাঙ্গদেব অপেক্ষাও নিতাই বাংলার বাউল গায়কদের অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছেন—

তোরা কে নিবি লুট লুটে নে নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে।
প্রেমের কর্তা শ্রীচৈতন্য পাত্র হইল নিত্যানন্দ,
মুন্সীগিরি দিল অদ্বৈতরে।
ওরে হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে প্রেম বিলাচ্ছে নগরে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
ধ্যান করিয়ে না পাইল যাহারে,
ওরে নারদ মুনি মগ্ন হয়ে বীণা-যন্ত্রে গান করে ॥
ওরে নিতাইচাঁদের প্রেমের বাজারে
রূপ-সনাতন দু'ভাই আসি প্রেমের বাজারে বসি ;
আনন্দেতে বেচাকিনি করে,
ওরে রাঙ, দস্তা ফেলে সোনা নিতেছে ওজন করে ॥

জগাই-মাধাইয়ের মতন পাষণ্ড নাস্তিক তাঁহার নাম করিয়া উদ্ধার পাইয়াছে, রূপসনাতনের মতন বিষয়াসক্ত গৃহী হরিনাম করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন— তখন যে কেহই তাঁহার নাম করিয়া ভবপারাবার পার হইতে পারিবে। বিষয়ীদের সময় থাকিতে সতর্ক হইবার জন্ম গ্রাম্য কবিরা তাই গান ধরিলেন—

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল।
দিন গেল, দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল॥
ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, তারা হরির নামে তরে গেল।
ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে ফকির হ'ল॥
(ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে (সে যে ও নামে) তরে গেল।
(ওরে) অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে মানব হ'ল॥
(ওরে) মনরে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে
এবার আমায় নিয়ে ব্রজে চল॥

এ সমস্ত গানের সুরেও মৌলিকতা আছে। বাঙলায় দুইটি প্রধান গ্রাম্য সঙ্গীতের সুর কীর্তন এবং বাউলকে— কথকতা এবং পাঁচালীর ভঙ্গীতে সরল করিয়া টহলদাররা এক বিচিত্র সুরে নামটহল গান গাহিয়া থাকে।

নামগানেরই বিশিষ্ট সুর আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াছে— 'হরিবোল, হরি-বোল, হরিবোল, মন আমার'— এর সুরেই আমরা গাই—

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

গৃহস্থ সাধক

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহু, এম্-এ,বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ

বিখ্যাত তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়ের বংশে পূর্ণানন্দের জন্ম। তিনি হুগলী জেলায় সিঙ্গুরে কিছু সম্পত্তিলাভ করায় সেখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম শাক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডীর আসন এখনও আছে।

তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র অল্প বয়সেই গৃহ হইতে চলিয়া যান। তিনি কাশীতে গিয়া বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা হয়। তদবধি তিনি নানাস্থানে ঘুরিতে থাকেন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। লোকসমাজে তিনি সতীশ বিদ্যানিধি নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার সিদ্ধাবস্থায় গুরুদত্ত নাম ছিল সনকানন্দ সিদ্ধান্তাচার্য। তিনি যখন পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন, তখন হঠাৎ বর্ধমানে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরে তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। গুরুদেব তখন বলেন—গৃহে তোমার মা তোমার জন্ম মনস্তাপ করিতেছেন— তুমি ফিরিয়া গিয়া সংসারী হও। তোমার দ্বারা জগতের কিছু কাজ হইবে।

তারপর সতীশচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহ করেন ও সংসারধর্মে মনোযোগ দেন। গৃহে আসিয়া তিনি বিল্ববৃক্ষমূলে একটি ত্রিমুণ্ডী আসন স্থাপিত করিয়া পূজারাধনা করিতে থাকেন। তিনি চিরদিন গৈরিক ইত্যাদি গ্রহণ না করিয়া সাধারণ

মানুষের মতই বেশভূষা করিতেন। তিনি টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইয়া ও পৌরোহিত্য করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিল। যাহা হউক, সেই অবস্থাতেও প্রসন্নভাবে তিনি তাঁহার সাধনার সূত্র অটুট রাখিতে চেষ্টা করেন। বাহিরে তিনি ঘোর সংসারী—তাঁহাকে সাধক বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া লোকে আশ্চর্য হইয়া যাইত।

তাঁহার কয়েক জন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ শিষ্যের সংখ্যা অল্পই ছিল। একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের স্ত্রীর উৎকট ব্যারাম হয়। ডাক্তারেরা বলেন, আজ রাত্রে রোগিণীর রোগ অতিরিক্ত বাড়িবার সম্ভাবনা, রাত্রিটা কাটিবে কিনা সন্দেহ। সেই ক্ষীণকলেবর সংজ্ঞাহীন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ম্লানমুখে স্বামী বসিয়া আছেন। রেড়ির তেলের প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের দরজা বন্ধ, সদরদরজা ও খিড়কি সব বন্ধ। বাহিরে ঝম্ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন দুর্যোগমুহূর্তে হঠাৎ 'ওঁ তৎ সৎ' বলিয়া কমণ্ডলুহস্তে সতীশচন্দ্র রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে দেখা দিলেন। দরজা বন্ধ—কেমন করিয়া আসিলেন, কিছু জানা গেল না। শিষ্য ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রণাম করিতে গেলেন। ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়া তিনি রোগিণীকে উঠিয়া বসিতে বলিলেন। রোগিণী সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। তিনি তাঁহার হাতে কমণ্ডলুর জল দিলেন। তারপর আর তাঁহাকে দেখা গেল না। পরদিন ডাক্তারেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, রোগিণীর রোগ প্রায় সারিয়া গিয়াছে।

সিঙ্গুরের মন্মথনাথ মল্লিক একজন বিখ্যাত ধনী। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—এত আড়ম্বরে লাভ কি?—মরা গরুতে ঘাস খায় না। তাহাদের বাগবিতণ্ডায় বিরক্ত হইয়া সতীশচন্দ্র বলেন—'দেখতে চাও?'—তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করে, সমবেত সকলেই উৎসুক হয়। উক্ত বৃষোৎসর্গকালে মন্মথ বাবু নিজে এবং আরও অনেকে দেখিলেন—মন্মথবাবুর জননী তাঁহার প্রদত্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসিলেন। নিমেষ পরেই অবশ্য আর কিছু দেখা গেল না। কিন্তু এই নিমেষের দেখাই তাঁহাদের প্রাণে স্থায়ী আনন্দের ঢেউ তুলিল।

একদিন হঠাৎ তাঁহার গুরু তাঁহার নিকট দেখা দিয়া বলিলেন—তুমি ভুল পথে গিয়াছ, এত পরিশ্রমের পর শুধু হাঁটিয়া নদী পার হইলে বা শূন্যমার্গে অন্যস্থানে গেলে লাভ কী হইল? সামান্য নৌকাভাড়া বা রেলভাড়া যোগাড় করিলে অতি সাধারণ লোকেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। তুমি কেন্দুবিল্বে ক্ষেপাচাঁদের নিকট যাও, তাঁহার উপদেশমত কার্য কর। ইহার পর এই গুরুদেবের সহিত আর সতীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় নাই।

কেন্দুবিল্বের ক্ষেপাচাঁদ একজন তেজস্বী সাধক ছিলেন। তিনি ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড হইয়া অনেকদিন সাধনা করিয়াছিলেন। গুরুদেবের নির্দেশ-অনুসারে সতীশচন্দ্র বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্বে গিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন ও তদবধি বৈষ্ণবমতে প্রেমের সাধন করিতে থাকেন।

তিনি কথাবার্তায় বিশেষ সংযত ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন—ভগবানকে পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু বর্তমানযুগে মানুষ নিজেকে খুব স্বাবলম্বী মনে করে—ভগবানকে পাওয়ার প্রয়োজন হওয়াই শক্ত। অনেক সময় তাঁহার কথা হেঁয়ালির মত শুনাইত, কিন্তু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বুঝিতে কষ্ট হইত না। একবার এক শিষ্যাকে বলিয়াছিলেন—তোমার ছেলে হয় নাই, দুই একজনের মা হইতে চাও, না হাজার হাজার ছেলের মা হইতে চাও? শিষ্যার সাহস হয় না—তিনি প্রথম বরই চাহেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে আনুমানিক সত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগ করিবার কয়েকদিন পূর্বে তিনি একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে

বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিলেন—এই দেহে বোধ হয় আর দেখা হইবে না। এই স্থূলটাকে পাল্টানো দরকার হইয়াছে, তবে সূক্ষ্মে থাকিব—আবশ্যক হইলে দেখা যাইবে। তখন তিনি নানারকম শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যেও ভুগিতেছিলেন। এই সময়েই তিনি সহধর্মিণীকে মাঝে মাঝে বলিতেন—হেরে গেলে! এ কথার কী ইঙ্গিত জানা যায় না।

দেহত্যাগের প্রায় পনের দিন পূর্বে তাঁহার মাথায় ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর প্রায় একইঞ্চি বাহুযুক্ত একটি সমত্রিভুজ পরিমিত স্থান হঠাৎ বসিয়া যায়। রাত্রে তিনি দেহত্যাগ করেন। যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি যোগাসনে আসীন; হঠাৎ কট্ করিয়া একটা শব্দ হয়। এই শব্দের পর অলৌকিক জ্যোতিতে সারা ঘর ভরিয়া যায়। বহুক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে এই জ্যোতি মিলাইয়া যায়। অনেকে ভাবিয়াছিলেন তিনি ধ্যানমগ্ন আছেন, কিন্তু জ্যোতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাঁহার মস্তকে একটা ছিদ্র হইয়াছে ও দেহে প্রাণ নাই। সাধক রামপ্রসাদের তনুত্যাগের বিবরণ অনেকের জানা ছিল। সতীশচন্দ্রের দেহত্যাগ দেখিয়া কাহারও আর সন্দেহ রহিল না—তিনি একজন বড় যোগী ছিলেন।

রামকৃষ্ণ

'ভাস্কর'

হে দেবতা রামকৃষ্ণ! সর্বগুণাকর
জগতের সর্বগ্লানি করিবারে দূর
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে কামারপুকুর
গ্রামে আসি জন্ম নিলে, তাপসপ্রবর।

ভুলিলে নিজেরে, নিঃশেষে করিলে দান
মোহময় মানবের কল্যাণের ব্রতে,
কাঞ্চনেরে দেখিলে যে মাটির সমান
প্রতি নারী মাতা তব, হের জন্ম হ'তে।

ধর্মেরে ধরিলে তুমি মতের উপরে,
যত মত তত পথ, হের নিঃসংশয়,
আপন জীবনবাণী বাহিরে অন্তরে,
নিষ্কলুষ বন্ধহীন মহিমানিলয়।

অতি দীন মূঢ় জন, নাহিক ভকতি,
কৃপাকণা তরে পদে করিছে মিনতি।

বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় আদর্শ

অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ঘোষাল, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ

ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে বহিরাগতরা এই দেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। উত্তরদক্ষিণে দুই হাজার মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আঠারোশত মাইল পরিসর এই বিরাট দেশে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত নানা প্রকৃতির বহু জাতির দানে সমৃদ্ধ হিন্দু সভ্যতা কিভাবে গড়ে উঠেছিল, তা সত্যই একটি বিস্ময়ের বিষয়। নানাত্বের ভিতর, বহুত্বের বহিরাবরণের নিচে একত্বের ধারণা হিন্দু সভ্যতার

মর্মকথা। প্রবল ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রের উপরের জলরাশি বিক্ষুব্ধ হয়, উত্তাল তরঙ্গের প্রলয়নাচন ভীতিসঞ্চার করে, কত বৃহৎ তরীর সমাধি রচনা করে, কিন্তু অতলের তলদেশ শান্ত নিস্তব্ধ থাকে। সেখানে কোন আলোড়ন-বিলোড়ন থাকে না। নানা রঙ, বহু ভাষা, পোষাক, আচারব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতাসত্ত্বেও হিন্দু-সভ্যতা একত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, এই বিরাট দেশের অসংখ্য জাতি ও ধর্মমত সুপ্রাচীন কাল থেকে শান্তিতে বসবাস করে এসেছে। শাখা-প্রশাখা ফুলফল পাতা প্রভৃতি নানা অংশের সমন্বয়ে বৃক্ষ, কিন্তু তার মূল এক। একটি মূল শিকড়ের সাহায্যে যে রস বৃক্ষদেহে পরিবেশিত হয়, তারই শক্তিতে বৃক্ষটি জীবিত থাকে, নূতন পত্রপুষ্পের শ্যামলিমায় সুন্দর হয়ে উঠে। হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

বৈদিক অধ্যাত্মসাধনার অদ্বৈতভাব—হিন্দু-সভ্যতার মৌলিক অক্ষয় উপাদান—এর ভিত্তি-প্রস্তর। এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নানা জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির উপাদানে হিন্দুসভ্যতা-সৌধ গঠিত হয়েছে। হিন্দুরা একত্বসাধনার সোনার কাঠির সাহায্যে তাদের জাতীয় সমস্যা সমাধান করেছিল। বর্তমান যুগের রাজনীতিক ধুরন্ধররা যদি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, জাতির সঙ্গে জাতির যে মনোমালিন্য, হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও লোভ বিশ্বের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে—তা দূর হয়ে যেতে পারে, ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন ও জাতিজীবন সুসংস্কৃত ও পরিশুদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে।

হিন্দুসভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য হিন্দুধর্মের মূল নীতি-প্রয়োগের সুফল সন্দেহ নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু বিচার-বুদ্ধির স্থান অনুভবের নিচে দিয়েছে। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া—বিচারবুদ্ধির সাহায্যে,—তর্ক-বিচারের মাধ্যমে বিভেদ নিরসন হয় না। কারণ, তর্ক অনেক সময় প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিপন্থী। হিন্দু বোধিকে বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, ধর্মমতের চেয়ে ধর্মভাবকে, বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে হৃদয়-বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়েছে—বাইরের পরিচয়ের চেয়ে অন্তরের পরিচয়কে উচ্চতর বলে গ্রহণ করেছে। সে বস্তুকে, পরমসত্যকে শুধু জেনে আনন্দ পায় না, তাকে পেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

আমাদের মনের তিনটি বৃত্তি— অনুভূতি, মনন ও কর্মপ্রণোদন। অনুভূতি আনে প্রত্যক্ষ-বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক, মনন আনে বাইরের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— তাঁর (ডাক্তারের) সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল একটি বস্তু (পুত্র) সম্বন্ধে তথ্য মাত্র। সত্যের উপলব্ধি তা নয়। পুত্রের জন্য তাঁর নিবিড় অনুভূতির মধ্যে তিনি পরম সত্যের সন্ধান পান। এ হল সম্বন্ধগত সত্য, এ হল সৃষ্টির মৌলিক সত্য।

মানুষ শুধু মননশীল জীব নয়, সে অনুভূতিশীল জীবও বটে। সে মননের দ্বারা পায় জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, কিন্তু অনুভূতি জ্ঞেয় বস্তুর অন্তরের নাগাল পায়। মননের দ্বারা আমরা জ্ঞেয় বস্তুকে জানি মাত্র, কিন্তু তাকে পাই অনুভূতি দ্বারা। আচার্য শঙ্কর তাঁর শারীরকভাষ্যে সত্যসম্বন্ধে বলেছেন— স হি ন একান্তেন অবিষয়ঃ।

বেদান্ত জ্ঞান ভক্তি ও কর্মকে বাদ না দিয়ে তাদের উপর আর একটি বস্তুর, অনুভূতির নির্দেশ করেছেন। অনুভূতি ছাড়া বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মের সার্থকতা নেই। নিছক জ্ঞান, নিছক ভক্তি ও নিছক কর্ম বস্তুর সমগ্র সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে না। মানুষের বহুমুখী বৃত্তি প্রতিটি মানুষকে প্রতিটি জাতিকে নিয়ত পরিচালিত করছে। এক একটি ধর্ম এক একটি বৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি করছে। যে ধর্মে

অনুভূতির স্থান নেই, সে ধর্মে মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর পরিচয় সম্ভব হয় নি এবং এই পরিচয়ের অভাবে পৃথিবীতে মানবসভ্যতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

হিন্দুধর্ম ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জরথুষ্ট্রের মত কোন যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন নি। দল বেঁধে, সম্প্রদায় গঠন করে, অথবা তলোয়ারের সাহায্যে এই ধর্ম কখনও প্রচারিত হয় নি। রাজ্য-জয় বা সাম্রাজ্য-স্থাপন কোন দিন এর উদ্দেশ্য ছিল না। এর লক্ষ্য মানুষের হৃদয়জয়, চিত্তপরিশুদ্ধি।

ধর্মের মূলনীতির উপর হিন্দুসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত বলে প্রাচীন জগতে এর বিস্তৃতি আশ্চর্যজনক হয়েছিল এবং বহু বাধা বিপত্তি বিপ্লব সত্ত্বেও এই সভ্যতা এখনও জীবিত আছে। বাইরের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হিন্দু যখন কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছিল, তাতে হিন্দুধর্ম সাময়িকভাবে রক্ষা পেলেও হিন্দুধর্মের মূলনীতি ব্যাহত হয়েছিল। ফলে যে নীতির প্রয়োগে সে পরকে আপন করতে সমর্থ হয়েছিল, তাহাই আবার আপনকে পর করে দিয়েছিল। সেই অধঃপতনের অমানিশার মধ্যে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতসাধনার আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ করে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মনীষা কুসংস্কার ও বিকৃত ধর্মের শৈবালে আচ্ছন্ন জাতীয় জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি। তারপর প্রায় হাজার বৎসর অন্ধকার যুগ। এর প্রথমে ইসলাম ও ইসলাম সংস্কৃতি এবং শেষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভাব হিন্দুমানসের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার প্রতিরোধের জন্য ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তার শক্তি ও বিশ্ব-পরিস্থিতি ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত পশ্চিমী রাজনৈতিক জোটে পরোক্ষভাবে যোগদান করে নি। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশ অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনভাবে জড়িত যে, পৃথিবীতে কোন বড় রকমের যুদ্ধ বাধলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা যেমন বিপজ্জনক তেমনই অসম্ভব। ভারত শান্তি কামনা করে, যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ, পরদেশ আক্রমণ বা পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপনের নীতিকে গ্রহণ করে নি। অন্যের উপর প্রভুত্ব করার দুর্দমনীয় বাসনা পৃথিবীর ঈর্ষাশীল জাতিদের, বিশেষতঃ ভুঁই-ফোড় আপকোওয়াস্তে রাষ্ট্রচালকদের মধ্য থেকে যতদিন না দূর হয়, ততদিন পর্যন্ত—পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তিস্থাপনের আশা কোথায়?

মিথ্যাপ্রচার ও অর্থবলে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেশের শাসকের স্থান দখল করে। তারা নানা অজুহাতে এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের শত্রুতা সৃষ্টি করে। ক্রমে এই শত্রুতা পরস্পরের ভিতর আত্মঘাতী যুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে। যে দিন যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা পৃথিবীর জনমন মানবতার উদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে, এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষকে আত্মীয় বলে ভাবতে পারবে, এক মহামানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত এক একটি অংশ বলে চিন্তা করতে শিখবে, এবং যেদিন জনগণের হাতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সামগ্রিক অধিকার আসবে— সেই দিনই সামগ্রিক যুদ্ধের সর্বধ্বংসকর প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সামগ্রিক শান্তির সর্বাত্মক প্রস্তুতি রচিত হবে— সে দিন তারা তাদের সমরবিলাসী প্রচ্ছন্ন শত্রুদের বিতাড়িত করে তাদের প্রকৃত বন্ধুদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চস্থান দিয়ে শান্তিতে বাস করতে সমর্থ হবে।

বর্তমান জগতে ধনতন্ত্র গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ নিয়ে একটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন মতবাদের নিদারুণ সংঘাতে জনমন আলোড়িত হয়েছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবিত ধ্বংসলীলার আতঙ্কে সারা বিশ্বের সাধারণ মানুষ চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছে। এজন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শান্তি-আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। এমন কি বিবদমান মতবাদি-

গণ একদিকে মুখে শান্তির বুলি আওড়াচ্ছেন, আর অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য নূতন নূতন মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছেন। একদিকে বাইরে শান্তিবৈঠক, অন্যদিকে ভিতরে অস্ত্রসজ্জার ব্যবস্থা চলেছে। সাধারণ মানুষ শান্তির ভিখারী। রাষ্ট্রচালকদের মানসিক অবস্থা ব্যক্তিত্বের বা বস্তুজগতের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে ওঠার পক্ষে অনুপযোগী। মহামানবতার লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারলে শান্তি মাত্র মুখের কথায় এবং শান্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

দুই হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদের ঋষি বিশ্ববাসীকে ডেকে যে শান্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, সেই বাণী ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী। বস্তুজগতের মানুষ যেদিন বেদান্তের সেই মহামন্ত্রের সাধনাবলে বস্তুবোধের উপরে উঠিতে সমর্থ হবে, সেই দিনই বিশ্বে প্রকৃত শান্তিপ্রতিষ্ঠা হবে। শুধু শান্তিবৈঠকে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। যেদিন বেদান্ত-প্রতিপাদিত অনুভূতিলব্ধ একত্ববোধ বাহ্যিক নানাত্বের লোপসাধন করে এক অখণ্ড মহামানবতার বোধ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে—যেদিন সেই মহাযজ্ঞে মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ-ব্যবস্থা, ও হৃদয় পরিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত হয়ে উঠবে, সেই দিনই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তার পূর্বে নয়। সে দিন হয়ত বহুদূরে, কিন্তু সে দিন আসতে বাধ্য।

শ্রীম-প্রসঙ্গে

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর জীবনী-আলোচনা-প্রসঙ্গে একটা কথা বারবার মনে পড়ে ঈশ্বরের করুণাধারায় সিক্ত না হ'লে মানুষের জীবন সার্থকতা লাভ করে না। শস্যক্ষেত্র যতই উর্বর হোক না কেন, বীজ যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন তাতে ফসল হয় না, ফসলের জন্য চাই—বর্ষার ধারাবর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ। বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে, জ্ঞানে এবং গুণে তাঁরা ছিলেন সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। তবু তাঁরা বুঝেছিলেন যে হৃদয়-কুসুমকে ফোটাবার জন্যে চাই আলো, চাই উত্তাপ। যেমন রাশি রাশি শুকনো কাঠ—প্রচুর দাহিকা শক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে; কিন্তু তারা নিজেরা শক্তিহীন অসার বস্তুমাত্র। তাদের কাজে লাগাতে গেলে চাই অগ্নির সংযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সেই অগ্নিগর্ভ তেজোময় বিরাট পুরুষ—যাঁর কৃপাস্পর্শে তাঁর শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর জীবন সার্থক হ'য়ে উঠেছিল। যাঁর ধ্যান, যাঁর শক্তি এবং সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আজ বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে তিনি হচ্ছেন প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সংক্ষেপে শ্রীম।

মহেন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর অবিস্মরণীয় উপহার শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। এই বইকে বাইবেল, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত করলেও বোধ হয় বাহুল্যদোষ হয় না। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কথামৃত আরও বেশী মূল্যবান বলে মনে হবে, কেননা পৃথিবীতে এর আগে কোন মহামানবের বাণীকে তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এ ভাবে যথাযথ রূপ দেবার চেষ্টা হয় নি। এখানে লেখককে অনুমান, জনশ্রুতি বা পরের কথার ওপর নির্ভর করতে হয়নি। গুরুর সঙ্গে প্রতিবার মিলনে তিনি তাঁর সমস্ত চেতনাকে নিয়োজিত করেছেন ঠাকুরের কথামৃত-সুধা পান করবার জন্য—

সুধাকরের মত বিকিরণ করেছেন ঠাকুরের নিকট হতে লব্ধ জ্ঞানের বৈচিত্র্যময় দ্যুতি।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখি ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা। তাঁর জীবনপাত্র পূর্ণ ছিল ঠাকুরের প্রতি অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে। মহেন্দ্রনাথের সমস্ত সত্তা ছিল দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্য-স্বরূপ। এই নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল ভক্তি। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞানাভিমানী শিক্ষক, কিন্তু ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা যেমনই অলৌকিক তেমনি বিস্ময়কর। পুরীর রথযাত্রার পর মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করেন হাওড়া ষ্টেশনে জগন্নাথের প্রসাদের আশায়। কেউ খাম বা চুপড়ির মধ্যে প্রসাদ পাঠালে মহেন্দ্রনাথ চুপড়ি ও খামটি পর্যন্ত ফেলতে দেন না—সযত্নে রেখে দেন—"আহা, থাক দর্শন পাব।" বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে যেখানে ঠাকুরের দাদা রামকুমারের টোল ছিল এবং ঝামাপুকুরের যে মিত্রবাড়ীতে ঠাকুর কিছুদিন পূজা করেছিলেন, সেখানে যেতে আসতে মাষ্টার মশাই মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। সঙ্গীরা লজ্জা পান, মহেন্দ্রনাথের ভ্রূক্ষেপ নেই—বলেন—"জান—এই রাস্তায় যদি কেউ বেড়ায় সেও যোগী হয়ে যাবে।" কখনও বা দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরেছেন, সঙ্গে এনেছেন অমূল্য সম্পদ একখানি ভিজা গামছা! তাই নিঙড়ে ভক্তদের গায়ে ছিটিয়ে বললেন—"ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করতেন সেই ঘাটের জল আছে এই গামছায়।" কি অপূর্ব ভক্তি! এর কণামাত্র পেলেও বুঝি মানুষের জীবন ধন্য হয়ে যায়। আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রেতাযুগের কথা। সীতাদেবী হনুমানকে উপহার দিয়েছেন বহুমূল্য মুক্তার মালা। হনুমান দূরে সরিয়ে দিলেন সেই মুক্তার হার—বললেন—"কি হবে এতে—এতে তো রামনাম নেই।" অভিমানভরে হনুমান তার বুক চিরে ফেললেন! দেখা গেল—রামসীতার মূর্তি। সারা সত্তায় মিশে ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল রামনাম। মহেন্দ্রনাথের সমস্ত চেতনাকে এই ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঠাকুরের কথা। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁর শুধু ঠাকুরেরই কথা, ঠাকুরেরই নাম। তাঁর কাছে কেউ ঠাকুরের কথা শুনতে চাইলে তিনি বুঝিয়ে বলতেন—"দেখুন, আগেকার দিনে ছাত্ররা সমিধ হাতে করে ঋষিদের কাছে এসে বলতেন—ঋষিবর, আমাদের উপনিষদের কথা বলুন, ঋষিরা বলতেন— আমাদের কথাই তো উপনিষদের কথা। তা আমারও ঠিক তাই। ঠাকুরের কথাই আমাদের কথা।" বাস্তবিকই তাই। মহেন্দ্রনাথ যে কেন বিষয়েই কথা বলুন না কেন, সে যুদ্ধের কথাই হোক আর যাই হোক, তার মধ্যে ঠাকুরের কথা এসে পড়বেই। ঠাকুরের প্রতি তাঁর কি অপার শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল—তার সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। মাষ্টার মশাইকে তখন "জাত সাপে" ধরেছে, অর্থাৎ ঠাকুরের করুণাজালে জড়িয়ে পড়েছেন। গুরুই তখন তাঁর ধ্যান, গুরুই তাঁর জ্ঞান। যখনই সময় পান, তখনই যান গুরুর চরণদর্শনে। তখন তিনি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক। ঠাকুর কলকাতায় এসেছেন শুনলে, টিফিনের ফাঁকে ফাঁকেও গিয়ে দেখে আসেন। এই সময় একবার স্কুলের ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ধারণা হয় যে, গুরুর প্রতি অতিরিক্ত ভক্তির জন্যই মহেন্দ্রনাথ স্কুলের কাজে যথোচিত মন দিতে পারছেন না। একথা প্রকাশ হ'য়ে পড়াতে মহেন্দ্রনাথ তখনই স্কুলের কাজে ইস্তফা দিলেন। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হবে জেনেও গুরুনিন্দার গ্লানি থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

মহেন্দ্রনাথকে দেখি—এই নীতির মূর্তিমান বিগ্রহরূপে। তিনি সকলকেই আপনি বলে সম্বোধন করতেন, নিজের খুঁটিনাটি কাজ নিজেই করতেন। জামা কাপড় কাচা থেকে নিজের খাবারের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত নিজেই পরিষ্কার করতেন। কোন ভক্ত বিছানার মশারি ফেলে দিতে চাইলে তিনি বলতেন—"না না, তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিও না।" কিছুমাত্র ভোগবিলাস বিষয়-বাসনা ছিল না তাঁর মধ্যে। একবার এক ভক্ত কিনেছেন একখানা ভাল ইটালিয়ান কম্বল—তখনকার দিনেই তার দাম ছিল ১৮৲। মহেন্দ্র-নাথ দেখে বললেন—"আরে করেছ কি? এ যে অরক্ষণীয়া কন্যা। একে সামলাতে সামলাতে এর দিকে যে মন পড়ে থাকবে।" শুধু যে দেহের সুখভোগ তিনি বর্জন করেছিলেন তা নয়, ভাল খাদ্যগ্রহণেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন—জিহ্বার কোন রকম লালসা ছিল না তাঁর মধ্যে, ভাল তরকারি তিনি জলে ধুয়ে খেতেন, কোন ভক্ত ভাল ভাল খাবার জিনিস আনলে তিনি বলতেন—"আহা ধন্য আপনি, কি জিনিস এ সব! অদ্বৈত আশ্রমে নিয়ে যান সাধুসেবায় লাগবে।" ১৯২৪ অথবা ১৯২৫ সালে পূজার পর তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে পুরী গিয়েছেন, ৩।৪ দিন থাকার পর এক ভক্ত বললেন,—একদিন মাছের ঝোল খেলে কেমন হয়। মহেন্দ্রনাথ বললেন—"হ্যাঁ, পরের মাস খেতে খুব ভাল লাগবে। এখানে রেঁধে খাচ্ছি সেটাই অন্যায়। প্রসাদ খেয়ে থাকা উচিত।" এইখানেই একদিন সন্ধ্যার পর তিনি ভক্তদের সঙ্গে গিয়েছেন জগন্নাথ-দর্শনে, গরুড়-স্তম্ভের কাছে তিনি প্রদীপ নিয়ে আরতি সুরু করলেন, তখন তিনি অন্য জগতের মানুষ—তাঁর মন চলে গেছে দূরে কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকে। প্রদীপ কখন নিভে গেছে, মহেন্দ্র-নাথের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর এই নীরব আত্মনিবেদন শেষ হ'ল বহুক্ষণ পরে। এই তন্ময়তা, এই ধ্যান-মগ্নতার জন্যই মহেন্দ্রনাথের পক্ষে কথামৃত লেখা সম্ভব হ'য়েছিল।

মহেন্দ্রনাথের জীবনের ব্রত ছিল সকলের মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করা। তিনি ঠাকুরের কথার ভিতর দিয়েই সকলের প্রশ্নের জবাব দিতেন।

মহেন্দ্রনাথ ছিলেন সংযম ও সাধনার মূর্তিমান বিগ্রহ। খরচপত্রের বেলাতেও এই সংযমের ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর স্বোপার্জিত প্রতিটি পয়সা যাহাতে সৎকার্যে ব্যয় হয়, তার প্রতিও মহেন্দ্রনাথের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নির্জনে বনে, পাহাড়ে কন্দরে, যাঁরা তপস্যায় রত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য মাসে ২।১ টাকা করে পাঠাতেন, এতে মাসে প্রায় ২৫। ৩০ টাকা খরচ হত। এছাড়া বেলুড় মঠে (তাঁর ডায়েরীতে Lord's Math বলে লেখা আছে)—মাঝে মধ্যে ৩০।৪০ টাকা করে দিতেন। সংসারের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে অন্ততঃ তিন মাসের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যাতে সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ১০০৲ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের লীলাবসানের পর শ্রীমা সারদামণি জয়রামবাটীতে থাকেন। এই সময় মহেন্দ্রনাথ জয়রামবাটীতে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীমার অবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় শ্রীমাকে প্রতিমাসে ১০৲ করে পাঠাতে শুরু করেন। শ্রীমা মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং কোন কিছু প্রয়োজন হলে তা মহেন্দ্রনাথকে জানাতে কুণ্ঠিত হতেন না।

মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই একটি গান গাইতেন। তার কথা হল—

হরি জগত জীবন দীনবন্ধু
শুনেছি পুরাণে কয়,
পুনর্জন্ম নাহি হয়
হেরিলে ও মুখ ইন্দু
　　হরি জগত-জীবন দীনবন্ধু।

পতিতপাবন দীনবন্ধুর মুখচন্দ্রমা দর্শন করে মহেন্দ্রনাথ পরপারে চলে গেছেন। আবার কীর্তির্যস্য স জীবতি—তিনি তাঁর কীর্তির মধ্য দিয়েই চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

সমালোচনা

Philosophy and Life and other Papers—By J. C. P. d' Andrade, Late Professor of Logic and Philosophy, Elphinstone College, Bombay. With a foreword by the Rev. Dr. John Mekenzie, M.A., D.D., C.I.E. . Collected and edited by Miss S. Panandikar, M.A., M. Litt. (Cantab), H. M. Seervai, M.A., LL B. and prof. G. N. Lawande, M.A , Ph. D. Orient Longmans Ltd. Pages XXXVIII + 240. Price : Rs 10/-

আধুনিক ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে সি ই এম্ জোড্ দুর্বোধ্য, গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বগুলি সহজ সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করে দর্শনশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌কে বাদ দিলে ভারতীয় লেখকের মধ্যে ঠিক ঐ ধরনের জনপ্রিয় অথচ খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থকার চোখে পড়েনি। অনেক লেখক দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বগুলি সহজ করতে গিয়ে কোথাও বিকৃতি এনেছেন। আবার কখনও বা পাঠককে ভুল বুঝিয়েছেন। আবার যাঁরা দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি জটিলতর করে পরিবেশন করেছেন, তাঁরা সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করতে পারেন নি। আলোচ্য গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি, অধ্যাপক ডি-এ্যান্‌ড্রেড্ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর অপূর্ব সমন্বয়-সাধন করেছেন। লেখকের ভাষা এত স্বচ্ছ, সরল প্রাণবন্ত যে, বইখানি একবার পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। লেখক ভাববাদী, তাঁর ভাববাদের বৈশিষ্ট্য হল, ভাববাদের সঙ্গে তিনি বিবর্তনবাদ ও চরমমূল্যের সংমিশ্রণ করেছেন। তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মতটি প্রত্যেক প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু নিজের মত জোর করে পাঠকের উপর চাপানোর নিষ্ফল প্রয়াস নেই। সহৃদয় পাঠকের মন লেখকের মতের সঙ্গে সায় না দিয়ে পারে না। রাসেলকে সমালোচনা করতে গিয়ে লেখকের নিজস্ব মত তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭১-১৮৯)।

আলোচ্য বইখানি লেখকের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন। বিষয়বস্তু মূলতঃ দর্শনশাস্ত্রের হলেও লেখনগুলির বৈচিত্র্য পাঠকের চোখ এড়ায় না। প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় হচ্ছে দর্শন ও জীবন, তত্ত্ববিদ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভাববাদের মূলসূত্র, শুদ্ধ ভাববাদী 'সত্য' বলিতে কী বোঝেন, ভ্রম, চরম মূল্য, কাল ও পরিবর্তন, স্বাধীনতা, অলৌকিক ঘটনা, আত্মা ও জড়, স্পিনোজা, জেমস্ ওয়ার্ড, ব্র্যাডলির মনোবিজ্ঞান, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, হাসির তাৎপর্য, সংস্কৃতি ও চরিত্র, কল্পনা, ন্যায়শাস্ত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহার, বিবর্তন ইত্যাদি। বইখানির দুটি সুলিখিত ভূমিকা রয়েছে ; একটি লিখেছেন ডক্টর জন্ ম্যাকেঞ্জি, অপরটি শ্রীমতী এস্ পানানডিকর। গ্রন্থকারের স্মৃতিপ্রসঙ্গ লিখেছেন শ্রীমিরভাই।

গ্রন্থকার তৃতীয় প্রবন্ধে নিজের মত ও পথের কথা বলেছেন। তিনি বার্কলীর সঙ্কীর্ণ ভাববাদকে খণ্ডন করে বলেছেন যে, সত্যিকারের ভাববাদ জড়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না, করার প্রয়োজনও নেই। ভাববাদী জড়ের উপর চৈতন্যের আবির্ভাবকে বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের ভিতর তিনি অন্তর্লীন উদ্দেশ্যের আভাস প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

লেখকের অন্যতম প্রশংসনীয় ক্ষমতা হচ্ছে এই যে, তিনি কোন জায়গাতেই অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই। 'সত্য ও ভ্রম' সম্পর্কে কূট দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সহজ, সরল উদাহরণ

ব্যবহার করেছেন। ফলে আলোচনাটি মনোজ্ঞ হয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাববাদের কোন বিরোধ নেই, বরং শুদ্ধ ভাববাদ অন্যান্য মতগুলিকে আত্মসাৎ করেছে—এই কথা লেখক নানাভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ষষ্ঠ প্রবন্ধে 'মূল্যের স্বরূপ' আলোচনা করতে গিয়ে মূর, রস্ প্রভৃতি বিশিষ্ট দার্শনিকের মত লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। স্পিনোজার দর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন (পৃঃ ১৩৫-৩৬)। লেখক নিজে উদ্দেশ্যাত্মক ঐক্যে বিশ্বাসী; স্পিনোজার পত্রাবলী থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, স্পিনোজা উদ্দেশ্যাত্মক ঐক্যে বিশ্বাসী (যদিও এই মত স্পিনোজার টীকাকারগণ সাধারণতঃ গ্রহণ করেন না)। স্পিনোজার 'দ্রব্য' বা ঈশ্বর যে অমূর্ত নন একথাও লেখক প্রতিপন্ন করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বানুগতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্র্যাড্লির উপর লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে (পৃঃ ১৭০)।

বইখানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করবার যথেষ্ট কারণ আছে সত্যি, কিন্তু কয়েকটি ছোটোখাটো ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্মৃতি-প্রসঙ্গে ও ভূমিকায় বিভিন্ন লেখক-লেখিকা মানুষ হিসেবে কত বড় ছিলেন গ্রন্থকার তার পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় (পৃঃ ১৮৶০) লেখকের একটি বাক্যের উদ্ধৃতি আছে: "কোন লেখককে ভাল করে না বুঝে, না আত্মসাৎ করে কখনও সমালোচনা করবে না; কোন দার্শনিককে তুমি বুঝতে পারবে না, যদি তার প্রতি তুমি সহানুভূতিশীল না হও।" কিন্তু আলোচ্য বইখানির ১৭২ পৃষ্ঠায় লেখক যে ভাবে রাসেলের সমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয়, এই আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। বর্তমান জগতের নৈতিক শৈথিল্য ও চিন্তার অরাজকতার জন্য লেখক রাসেলকে দায়ী করেছেন, যদিও তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি প্রয়োগ করেননি। আমার মনে হয়, রাসেলের প্রতি তিনি একটু বেশী রূঢ় হয়েছেন। রাসেল তাঁর 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস'—বইখানিতে প্লেটো, কাণ্ট ও হেগেলের দর্শন অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু লেখক রাসেলের প্রতি যে আক্রোশ প্রকাশ করেছেন, তা ভূমিকায় বর্ণিত তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়েছে। 'কাল ও অনন্ত' প্রবন্ধে রয়েস্ ঐ সমস্যা নিয়ে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন সে কথার কোন উল্লেখ নেই। 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি'—ডেকার্টের এই মৌলিক সত্যের উল্লেখ লেখক নানা স্থানে করেছেন। *কিন্তু ডেকার্ট-দর্শনের অন্যতম* টীকাকার নরম্যান্ কেমপ্-স্মিথ নজীর তুলে দেখিয়েছেন যে ডেকার্ট-দর্শনের মূলসূত্র অন্যত্র রয়েছে। আলোচ্য বইখানির ১৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক বার্কলীকে স্বয়ংসদ্বাদী (Subjective idealist) বলে অভিহিত করেছেন। আমার মনে হয় বার্কলীকে নিঃসন্দেহে "Objective idealist" বলা চলে। "মূল্যের স্বরূপ" প্রবন্ধে হার্টম্যানের উল্লেখ নেই, অথচ হার্টম্যান্ এই বিষয়ে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছেন এবং লেখকের মতবাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল আছে। "বিবর্তনের ধারা"—প্রবন্ধে অধ্যাপক এ ই টেলর-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। "Sparks from a Philosopher's Workshop"—অংশে লেখক অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠক এই অংশ থেকে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাবেন।

ভূমিকায় ও স্মৃতি-প্রসঙ্গে লেখক-লেখিকারা গ্রন্থকারের চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তা, ছাত্রবাৎসল্য, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও জ্ঞানপিপাসার যে পরিচয় দিয়েছেন—তা সত্যিই দুর্লভ। লেখক শুধু দর্শনের অধ্যাপক নন, তাঁর জীবনই তাঁর দর্শন। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার (অধ্যাপক)

ধূমকেতু—(বিজ্ঞান),—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, O. A. R. E ; নক্ষত্র-রত্ন প্রণীত ; প্রকাশক—মেসার্স জি সি দত্ত এণ্ড কোং, প্রিণ্টার্স ও ষ্টেশনার্স—৯-এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১। পৃঃ ২৭০ ; মূল্য ২॥০ টাকা।

এই পুস্তকের প্রবীণ গ্রন্থকার স্বয়ং একজন নক্ষত্রবিৎ ও গগন-পরিদর্শক এবং ইনি পূর্বে ভারত, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিশিষ্ট অনেক জ্যোতির্বিদ্যা-পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। বর্তমানেও কয়েকটি নক্ষত্র-পরিদর্শন-প্রতিষ্ঠানের সভ্য রহিয়াছেন।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-পরিদর্শনে নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট অভিজ্ঞতার সহিত পাশ্চাত্ত্য নক্ষত্রতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিজ্ঞতার ফল মিলাইয়া জীবনব্যাপী সাধনার ফল বঙ্গ ভাষায় প্রকাশে উদ্যোগী এই মনীষীর নিকট বাঙালী কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'পূর্বাভাস' নামক ভূমিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার সাধনা কেবল এই "ধূমকেতু" নামক গ্রন্থটিই সৃষ্টি করে নাই, 'সৌরজগৎ', 'সবিতা ও ধরণী' এবং 'নক্ষত্রজগৎ' নামক আরও তিনটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও রচনা করিয়াছে। ঐ ভূমিকার প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন, "দীর্ঘ চারি বৎসরাধিক মুদ্রাযন্ত্রের কুক্ষিগত থাকিয়া আমার প্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'ধূমকেতু' লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইল।" ইহাও আবার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দত্ত নামক জনৈক প্রিণ্টার্স ও ষ্টেশনার্স এর বদান্যতায় সম্ভব হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকে ধূমকেতুর উৎপত্তিস্থান, গঠন, উপাদান, স্বভাব, প্রকৃতি, সূর্য-প্রদক্ষিণকাল, ঐ কালের পরিমাণ প্রভৃতি, প্রাচীন ও আধুনিক ধূমকেতুর জীবনেতিহাস, উহাদের স্থিতি, গতি, পরিণতি প্রভৃতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু পাশ্চাত্ত্য নক্ষত্রবিদের গবেষণার সহিত তাঁহাদের জীবনীও এই পুস্তক অলঙ্কৃত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়, (১৪ পৃষ্ঠা) সূর্যসিদ্ধান্ত, সারদা-তিলক, সিদ্ধান্তশিরোমণি, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থ এবং শব্দকল্পদ্রুম, মহাভারত, গরুড়-পুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাদি সহ কেতুসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ একটি প্রবন্ধ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। ধূমকেতু বিষয়ে এই জাতীয় গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় বোধ করি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা সাহিত্যে কি ধরনের পাঠ্য-পুস্তকের অভাব আছে তাহার আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী মহাশয় 'কি লেখা পড়ব' প্রবন্ধে (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৬০, ৭১২ পৃঃ) বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"আকাশ-রহস্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোনও বই নাই।" গ্রন্থকারের বর্তমান পুস্তকখানি ও অপ্রকাশিত তিনখানি পুস্তক এই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করিবে বলিতে পারা যায়।

পুস্তকখানিতে ধূমকেতুর ফটো ও রেখাচিত্রের ১৪ খানি ব্লক ছাপা আছে।

বিদ্বৎসমাজের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা, এই আজীবন নীরব বিজ্ঞান-সাধক বিত্তহীন বৃদ্ধ মনীষীর বহু আয়াসে প্রথম প্রকাশিত 'ধূমকেতু' নামক পুস্তক প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীর জন্য রাখিয়া তাঁহারা বিদ্যার সমাদর করুন।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

শ্রীমা সারদা দেবী—শ্রীগৌরাঙ্গী রসিকলাল মেহতা প্রণীত। গুজরাত শ্রীশ্রীমা শ্রীসারদাদেবী শতাব্দী-মহোৎসব-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। মডেল হাইস্কুল, ঘি কান্ত রোড, আমেদাবাদ। পৃষ্ঠা—৩২ ; মূল্য—।৶০ আনা।

গুজরাতী ভাষায় এই পুস্তিকাখানিতে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবকাল হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশে মায়ের অমৃতময়ী কথা হইতে নির্বাচিত ২৫টি উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে। মুখবন্ধে কবিতায়

মাতৃ-প্রশস্তি, অন্তে 'মা সারদা' ও 'দক্ষিণেশ্বর তীর্থে মায়ের প্রথম গমন' শীর্ষক কবিতা দুইটি এবং শ্রীশ্রীমায়ের একখানি চিত্র ইহার সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছে।

সরল সহজ ভাষায় বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে অতি-রঞ্জনের বাহুল্য নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক জীবনী-গ্রন্থের কাহিনীর সহিত কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়; সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতই এইরূপ হইয়া থাকিবে। পুস্তিকার দ্বাদশ পৃষ্ঠায় আছেঃ "শ্রীশ্রীমা প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে শ্রীশ্রীঠাকুরের চুল ফেলিয়া দিলেন —শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি হইতে মনে হয়—তিনি ইহার পরে নিজের কেশরাশিও সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।" —ইহা সত্য নহে, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশের কথারই কেবল উল্লেখ দেখা যায়। ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—"পুরীতে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমা কিছুকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'দাসী'ভাবে সেবা করেন।" শ্রীশ্রীমায়ের মূল জীবনী পাঠে জানা যায়, তিনি একবার পুরীতে কয়েক মাস ছিলেন। মন্দিরের পাণ্ডা তাঁহাকে শিবিকায় মন্দিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে তিনি বলেন—না, তুমি আগে আগে পথ চলবে। আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ-দর্শনে যাব।" অতএব দেখা যাইতেছে 'দাসী'-ভাবে সেবা করার ঘটনাটি অতিরঞ্জিত। জনৈক সন্ন্যাসীর আদেশে শ্রীশ্রীমায়ের পঞ্চতপা করার কাহিনীর মধ্যেও অতিরঞ্জন লক্ষিত হইল।

গুজরাতী পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তিকাটি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-পরিচিতির সহায়ক হইবে।

শ্রীকল্পলতা দেবী

শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা— স্বামী বেদান্তানন্দ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ শীল, মোহনালয় লিমিটেড, মেন রোড, রাঁচি; পৃষ্ঠা—১৫৪; মূল্য—১৲ টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের এই 'জীবনকথা' পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। মায়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সরস বর্ণনার সহিত তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সহজ ভাষায় সুন্দর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তরুণ-দিগের বইটি ভাল লাগিবে এবং ইহার মাধ্যমে দেবী-মানবীর জীবনাদর্শের প্রতি তাহারা আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বইটি পড়িয়া ইহা কিশোরদের ভিতর প্রচার করুন ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। বইএর মূল্য আকারের তুলনায় কমই বলিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১—রয়াল অক্টেভো ১৫২ পৃষ্ঠার বহু-চিত্র-শোভিত চমৎকার কাগজে সুমুদ্রিত পশ্চিম বাঙলার নানা তথ্যসম্বলিত এই বার্ষিকী প্রকাশের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রারম্ভে কবিগুরুর আশীর্বাণী (১৩৪৬ সালের একটি ভাষণ হইতে লওয়া) এবং তৎপরবর্তী প্রবন্ধ 'বাঙলার সংস্কৃতি' (ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত) বাঙালীর আত্ম-সম্বিৎকে উদ্বুদ্ধ করিবে। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
সংবাদ

সান্‌ফ্রান্সিস্কো (উত্তর কালিফোর্নিয়া) বেদান্ত সোসাইটি— ২৯৬৩, ওয়েবষ্টার ষ্ট্রীট্, সান্‌ফ্রান্সিস্কো— ২৩ স্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে গত ডিসেম্বর (১৯৫৩) মাসে সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ 'ভগবান এখানেই আছেন, এ মুহূর্তেই আছেন', 'বুদ্ধি হইতে বোধি', 'আমার জানা এক মহাপুরুষ', 'আমরা কেন বাঁচি, কেনই বা মরি ?', 'ভগবানে মানুষ, মানুষে ভগবান্' ও 'খ্রীষ্ট যথার্থই আমাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন ?' বিষয়ে আলোচনা করেন। সহাধ্যক্ষ স্বামী শান্তস্বরূপানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আমেরিকার যে ধর্মের দরকার' এবং 'মনের শক্তিসমূহ'। গত জানুয়ারী মাসে স্বামী অশোকানন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আমাকে অনুসরণ কর; মৃতগণ নিজেদের মৃত সমাহিত করুক', 'অন্তরাত্মা ভগবানের জন্য ব্যাকুল', 'বুদ্ধিবৃত্তি কতদূর যাইতে পারে ?' 'কুণ্ডলিনী-শক্তি', 'ভগবান কে ও কি ?', 'ঈশ্বরাবতার কিভাবে তাঁহার পার্ষদ নির্বাচন করেন' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার নবধর্ম'। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ 'কর্তব্য ও অনাসক্তি এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

স্বামী অশোকানন্দ প্রতি শুক্রবার সায়াহ্নে সোসাইটির সদস্যগণকে ধ্যানশিক্ষা দেন ও বেদান্ত-দর্শনসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার বালকবালিকাগণকে বেদান্তের সর্বজনীনভাব শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ-গণের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইবার শিক্ষাও তাহারা লাভ করিয়া থাকে। গত ৩১শে জানুয়ারী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্বামী অশোকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তীর কতকগুলির বিবরণ আমরা বৈশাখসংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসে আরও কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে উৎসব দিবসত্রয় ধরিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল) সন্ধ্যায় জেলার জজ শ্রীযুত ডি এন হাজারিকা মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরসময় কাব্যতীর্থ, মহকুমাশাসক শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সরকারী উকিল শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম এবং স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবব্রত দত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরাম কৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় অতি মনোজ্ঞভাবে বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণপ্রদান করেন। পরের দিন রবিবার সপ্তদিনব্যাপী পূজার্চনা, ভজন, পদাবলীকীর্তন এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। অন্যূন ৮ হাজার নরনারীর মধ্যে ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী পুরুষাত্মানন্দ আলোক-চিত্র-সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি করেন।

রাঁচি ওয়েলফেয়ার সেণ্ট্রাল হলে রামকৃষ্ণ মিশন ও রাঁচির জনসাধারণ কর্তৃক ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হইয়াছে। স্বামী সুন্দরানন্দের সভা-পতিত্বে এই স্থানে এক জনসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর ব্যাপকতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাঁচি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীএন কে গোরী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ইহার পর ইন্দুভূষণ

সেনগুপ্ত মহাশয় ধর্মের মহিমা নামক গল্পের অবতারণা করেন। গল্পদ্বারা তিনি সকলকে বলেন যে, ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে অবশেষে জয় হইবে। সভাপতি মহারাজ বলেন, ভারতবর্ষ বর্তমানে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীর মনের পরিবর্তন হয় নাই। প্রথমে তাহাদের মনের পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন, মানুষকে যদি আমরা সম্মান না দিই বা শ্রদ্ধা না করি, তাহা হইলে আমরা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইব। সেই জন্য আমাদিগকে ভগবৎপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এই সভায় বিহার-সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের শিল্পিবৃন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন যথারীতি পূজার্চনাদির অনুষ্ঠান হয়। প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণ-কথামৃত (ইংরেজীতে) পাঠ এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দ ইংরেজীতে ও শ্রী কে বালসুব্রহ্মণ্য আয়ার তামিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলোচনা করেন। ১৪ই মার্চ সাধারণ উৎসবের দিন সকালে প্রায় ষাট্ জন ভক্ত (অধিকাংশই তরুণ) 'গস্‌পেল অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ দি গ্রেট্ মাষ্টার' গ্রন্থদ্বয় হইতে 'পারায়ণ' করেন। অতঃপর মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসিকর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা এবং মধ্যাহ্নে শ্রীরামস্বামী ভাগবতার কর্তৃক উক্ত বিষয়েই 'হরিকথা কালক্ষেপম্' (কথকতা) নির্বাহ হয়। অপরাহ্নে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচার-পতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জনসভায় অধ্যাপক শ্রী এন্ ভক্তবৎসলম্ তেলেগুতে, শ্রী পি রামকৃষ্ণন্ (মাদ্রাজের প্রধান জেলা-শাসক) ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক আর্ বিশ্বনাথন্ তামিলে মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে যুগাবতারের জীবন এবং বাণীর মর্ম ও প্রভাব বিশ্লেষণ করেন।

উতকামণ্ড (নীলগিরি) শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে উৎসব আয়োজিত হইয়াছিল ২৮শে ফেব্রুয়ারী। উহার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকীও সংযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব-সূচীর অঙ্গ ছিল সকালে পূজা ও ভজন, মধ্যাহ্নে 'অন্নদানম্' ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং সায়াহ্নে জনসভা। সভাপতি ছিলেন বোম্বাই-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রী এম্ বি বেণুগোপাল পিল্লাই এবং স্বামী চিদ্‌ভবানন্দ।

শিলং-কেন্দ্রে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৯-তম জন্মজয়ন্তী আসাম রাজ্যের সরবরাহমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক কে এন দত্ত, শ্রী আর এন চ্যাটার্জী এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ আলোচনা-সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আধুনিক জগৎ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তিথিপূজার দিন (২২শে ফাল্গুন) ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানীয় দুইশত ভক্ত আশ্রমে বসিয়া প্রসাদগ্রহণ করেন। পরদিবস (২৩শে ফাল্গুন, রবিবার) ১২০০ নরনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। বৈকালে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ ও চিত্তরঞ্জন কারখানার শ্রী এম্ এন্ ঘোষ।

বাগেরহাট (পূর্ব পাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১০ই বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রায় দেড় সহস্র নরনারীকে পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ দেওয়া হয়। বেলুড় মঠের স্বামী পূর্ণানন্দ তাঁহার মধুর ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঐ দিন আশ্রমপ্রাঙ্গণে ও পর দিবস শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা

সারদাদেবীর জীবন, লীলা ও নবযুগের প্রবর্তনকারি-রূপে তাঁহাদের আগমন-বার্তা ও উপদেশ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গো-পালন—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিজস্ব গোশালা—'সুরভি-কানন'-এর ১৯৫২ সালের কার্য-বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকের 'মাড়োয়ারী বাগানে' (যাহা কয়েক বৎসর পূর্বে বেলুড় মঠ ক্রয় করিয়াছেন) এই গোশালা স্থানান্তরিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গাভী, ষাঁড় এবং বৎস মিলিয়া ৩০টি পশু ছিল। এক সময়ে ৪ হইতে ১০টি গাভী দুধ দিয়াছে। মাসিক উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ ছিল ১১৫০ সের হইতে ১৫৫০ সের পর্যন্ত। আলোচ্যবর্ষে গোশালার মোট আয় ১৬,১২৯৵০ আনা, মোট ব্যয় ১২,৪৪৩।৶১৫ পয়সা। উন্নত বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবাদির পালন এবং চিকিৎসার বহুবিধ ব্যবস্থা এই গোশালায় করা হইয়াছে। গো-পালনে উৎসাহী মঠ-দর্শনার্থিগণ এই গোশালা দেখিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমা-শতাব্দীজয়ন্তী—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শততম জন্ম-জয়ন্তী এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আসানসোল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৬ই চৈত্র হইতে একপক্ষ-ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আন্দুলের কালী-কীর্তন, শ্রীশ্রীমায়ের ও ঠাকুর-স্বামিজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা, শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, ময়নাডাল সম্প্রদায় কর্তৃক মাথুর ও মানভঞ্জন কীর্তন এবং সশিষ্য শ্রীনবনী দাসের বাউল নাচ ও গান প্রথম পাঁচদিনের কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল। ১২ই চৈত্র প্রাতে বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি ও সায়াহ্নে কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী পি কে গুহের পরিচালনায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধাত্মানন্দ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর জাতিগঠনমূলক ভাবধারার আলোচনা করেন। ১৩ই প্রাতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতনায়ক শ্রীঅতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হয় এবং অপরাহ্ণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীশিউবালক রায় ও স্বামী বোধাত্মানন্দ ভাষণ দেন। ১৪ই ও ১৫ই চৈত্রের সভায় বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীশিউবালক রায় ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ; শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ। শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় পদকীর্তন পরিবেশন করেন। ৩০শে মার্চ (১৬ই চৈত্র) শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা এবং আশ্রমস্থ হাই স্কুলের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হয়। শিশুসাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ভাষণ দেন। বাকী কয়দিনের কর্মসূচী ছিল প্রখ্যাত সুরশিল্পীদের সঙ্গীত, নরনারায়ণসেবা, আশ্রমে নাট্যাভিনয়, শারীরিক ক্রীড়াকৌশল, আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রদের হস্তশিল্প-প্রদর্শনী।

৪ঠা বৈশাখ কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূরে বেলঘরিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হোমের নূতন আবাসে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে যথোচিত নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে এই দিন বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে সুপ্রশস্ত মণ্ডপতলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়; অন্য বক্তা ছিলেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) এবং স্বামী সাধনানন্দ।

কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে ২০শে মার্চ, অপরাহ্ণে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশত-

বার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হয়। একটি সুসজ্জিত বেদিতে শ্রীমার এক রঙীন চিত্র রক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে মিশনের কার্যকরী সভার কতিপয় সদস্য ও কর্মকর্তাদিগের সহিত কেন্দ্র-পরিচালক স্বামী অসংগানন্দ, কলম্বোর অর্থমন্ত্রী মাননীয় স্যার অলিভার গুণেটিলেক এবং কলম্বোর পৌর-সভার সভাপতি শ্রীটি রুদ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বক্তৃতা-কক্ষে শ্রীমার শতবার্ষিকী-সভার সভ্যদিগের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর মন্দিরে যাইয়া তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পপ্রদান করেন। ইহার পর তাঁহাকে মঞ্চে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত শ্রীমা সারদাদেবীর আলোক-চিত্রে মাল্যপ্রদান করিলে পর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রার্থনা এবং প্রারম্ভিক ভাষণাদির পর শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। (এই সংখ্যায় ২৩৯ পৃষ্ঠায় উহা পৃথক ভাবে মুদ্রিত হইল)।

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীমা-শতবার্ষিকীর কর্মসূচী ছিল বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং একটি মহিলাসভা। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় আটশত মহিলা সভায় যোগ দেন। সভানেত্রী ছিলেন জেলাশাসকের পত্নী মিসেস বি কে রায়।

শিলং রামকৃষ্ণমিশন প্রাংগণে ২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) হইতে শ্রীশ্রীমার পঞ্চদিবসব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ও তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-ও বাণী-মূলক একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোতিরাম বোরা। শেষের দিনে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় ছয় হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত ও নরনারায়ণ সেবা হয়। শিলং ও তৎ-পার্শ্ববর্তী সকল দিক এবং খাসিয়া পাহাড়ের আভ্যন্তর অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র নরনারী এই প্রদর্শনী দেখিতে আসেন।

এই উৎসবের কার্যসূচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, ভজন, বেদপাঠ, বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডী গীতা ও উপনিষৎপাঠ, ধর্মসভা, রামনাম-সংকীর্তন, কালী-কীর্তন, পদকীর্তন, সঙ্কীর্তনসহ শোভাযাত্রা, ভক্তি-মূলক ও উচ্চাংগ সংগীত, কুমারীপূজা, ব্যায়াম-প্রদর্শন, আলোকচিত্র, প্রদর্শন, সাধারণ সভা এবং পাঁচদিনের মধ্যে একদিন মহিলাদিবস। বিভিন্ন দিনের সভার পরিচালনা করেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী ও শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকরী সভার সভাপতি শ্রীঅমিয়কুমার দাস, লেডি কেইন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য, শ্রীমহাদেব শর্মা, আসামের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল শ্রী এ কে মুখার্জি এবং বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী অবিনাশানন্দজী। বিভিন্ন বক্তা ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণ ইংরেজী, আসামী, খাসী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। আসামের বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় যে লিখিত প্রবন্ধ পাঠান তাহা মহিলাদিবসের সাধারণ সভায় পঠিত হয়। কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত গায়কের সংগীত জনসাধারণ কর্তৃক খুবই আদৃত হইয়াছিল। শিলংএর সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই অনুষ্ঠান এক প্রবল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

প্রাচ্যবাণী-মন্দির— সম্প্রতি প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পান্না-লাল বসু মহাশয়ের অনিবার্য কারণে অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতৃ-যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিগত এক বৎসরের

মধ্যে প্রায় দশ সহস্র টাকা পরিষদের উন্নতিকল্পে প্রদানের নিমিত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রাচ্যবাণী-মন্দিরে প্রায় চারি হাজার হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং বিগত ১১ বৎসরে তাঁহারা ১১০টি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের শাখাসমূহ বিশেষভাবে ভারতীয়-সভ্যতার প্রচারমূলক কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই সভার উদ্বোধনকারী ডক্টর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও প্রাচ্যবাণীর কৃষ্টিপ্রচারমূলক কার্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের সদস্য ও সদস্যাগণ কর্তৃক শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। অভিনেতৃগণের, বিশেষতঃ অভিনেত্রীগণের উচ্চারণ-বৈশুদ্ধ্য ও নাট্যকৌশল সকলের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

বসিরহাটে অনুষ্ঠান—স্থানীয় টাউন হলে গত ১২ই বৈশাখ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের স্বামী গোবিন্দানন্দের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী অভয় চৈতন্য, শ্রীগণেশ বিশ্বাস চৌধুরী, অধ্যাপক নৃপেন গোস্বামী ও শ্রীমতী কমলরাণী ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, জীবনী, বাণী ও ভাবধারা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বহির্বঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব—আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজাহোমাদি ও প্রার্থনা এবং ভজনগান হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি মর্মরমূর্তি আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পূজোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শেষাদ্রিজী, শ্রীকিষণলাল দুবে, আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় ও শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩শে ফাল্গুন স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি মঞ্চোপরি পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। আজমীরের রাজ্যপাল শ্রী এ ডি পণ্ডিত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীব্রহ্মদত্ত ভার্গব, শ্রীকিষনলাল দুবে ও ব্রহ্মচারী মনোহরলাল এবং আশ্রম-সেবক স্বামী আদিভবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার ও জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জনসেবায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান-সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুপম ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত করার মহান্ কর্মে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানান।

রামগড়ে (হাজারিবাগ) গত ৭ই চৈত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী প্রচুর উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজাকৃত্যাদিব্যতীত অপরাহ্ণে রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং 'উদ্বোধনে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের পরিচালনায় এক জনসভা হয়। এই সভায় জাতিধর্মনির্বিশেষে রামগড়ের বিশিষ্ট নাগরিকেরা যোগদান করেন। রাঁচি ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার বসু যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলাতে ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী এবং তাঁহার উপদেশাবলী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতি মহারাজ দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর তাৎপর্য তাঁহার বিশ্লেষণাত্মক হৃদয়গ্রাহী ভাষণে ব্যাখ্যা করেন।

দর্শন-প্রতীক্ষায়

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্রীজগন্নাথস্তোত্র

মহাসাগরের তীরে, কনকবর্ণ নীলাচলশিখরে, পাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গগনচুম্বী দেব-প্রাসাদ। মন্দিরবেদির এক পার্শ্বে সহোদর মহাবীর বলভদ্র এবং মাঝখানে ভগিনী সুভদ্রাদেবীকে লইয়া প্রভু জগন্নাথ তাঁহার লোকোত্তর মহিমায় সমাসীন। সমস্ত সুরগণ পরাৎপর শ্রীভগবানের সেবায় উন্মুখ। মর্ত্যের সামান্য মানুষ আমিও যুগ যুগ সঞ্চিত কত প্রতীক্ষা লইয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। জগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই, নাথ। অহেতুক কৃপাময়, আমার নয়নপথে আসিয়া এই অকিঞ্চনকে আজ কৃতার্থ কর।

দয়ার যিনি পারাবার, সজল জলদশ্রেণীর ন্যায় শ্যামল সুন্দর যাঁহার অঙ্গকান্তি, সর্ব-সৌভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী ও সর্ববিদ্যারূপিণী সরস্বতীর যিনি প্রীতিবর্ধন, বিকসিত নির্মল নয়নপদ্মশোভিত যাঁহার মুখ দেখিয়া চিত্তের সকল মোহ, সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়, সেই সকলদেবগণারাধ্য সকলবেদবন্দিত জগন্নাথ স্বামী দৃষ্টিপথে আসিয়া আজ আমার মানব জন্ম ধন্য করুন।

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম ও অলৌকিকতা

"যোগী ইন্দ্রিয়গ্রাম ও চিত্ত সংযত করিয়া অন্তরলোকে যে সত্যের ও শান্তির সুস্পষ্ট সন্ধান পান তাহা সংসারের হাজার হাজার লোকের নিকট রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। এই হাজার হাজার লোক প্রাত্যহিক জীবনের আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, টাকা রোজগার—ইহাদের বেশী বড় কিছু ভাবিতে পারে না, চায়ও না। এইগুলিই তাহাদের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার। পক্ষান্তরে—অতিবাস্তব, অতিমূল্যবান এই যে বিষয়ভোগের পশ্চাতে ছুটাছুটি—সত্যদ্রষ্টা মুনি ওখানে জাগিয়া নাই; তাঁহার কাছে উহাদের সার্থকতা, আকর্ষণ, মূল্য—এই সব কিছুর উপরেই যেন এক নৈশ গাঢ় অন্ধকারের প্রলেপ মাখানো রহিয়াছে।"

এই কথাগুলি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক শ্লোকের ভাববিস্তার। সাধারণ বিষয়ী লোক আর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এই দুইজনের পার্থক্য যে শুধু তাঁহাদের চোখের চশমায়—জগৎ-সংসারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে—এই জিনিসটিই যেন শ্রীকৃষ্ণ এখানে বুঝাইতে চাহিতেছেন। একজনের কাছে যাহা দিন, সেখানে অপরে দেখে রাত্রি। একজন যাহা মনে করে কুহেলিকাময়ী নিশি, তাহাই হইয়া দাঁড়ায় অপরের চোখে সূর্যোদয়। দুইজনই রক্ত-মাংসের মানুষ, পৃথিবীর দেহধারী মানুষ, কিন্তু দুইজনের ভিতরটা সম্পূর্ণ আলাদা। একজনকে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ অনবরত নাকানিচোবানি খাওয়াইতেছে, একটুও বিশ্রাম দিতেছে না—অপরে বিষয় আকর্ষণের মূলদেশে শ্রীভগবানকে আবিষ্কার করিয়া ক্ষণিক ভোগবাসনা বর্জন করিয়াছেন, শাশ্বত সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পরমা শান্তিলাভ করিয়াছেন। একজন মোহাচ্ছন্ন, অপর-জন মোহমুক্ত। একজনের জগৎ ও জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন হুঁশ নাই—অপরের নিকট সেই তথ্য সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত।

ধর্মজীবনে যদি কোন অলৌকিকতা থাকে তো উহা উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই। লক্ষ লক্ষ লোকের দেখা দিবালোককে যিনি রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় মনে করেন তাঁহার দৃষ্টি অলৌকিক তো বটেই—কিন্তু উহা তাঁহার নিজের হৃদয়-মনের একটি রূপান্তর ছাড়া আর কিছু কি? ধর্মসাধনায় এবং উহার সিদ্ধিতে যদি কোন রহস্য থাকে তবে তাহা এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনই, অপর কিছু নহে। আমাদের ভিতরে যে একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ বিষয়ভোগমত্ত পশু-মানুষ বসিয়া আছে, জীবনের রঙ্গমঞ্চে একনায়কত্ব করিতেছে, তাহাকে নূতন কাপড় পরাইতে হইবে, তাহার প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া তাহার অহমিকার ঊষর মরুভূমিতে ভগবানের প্রেমধারা বহাইতে হইবে। কঠিন কাজ—জীবনভোর অক্লান্ত অকুণ্ঠ পরিশ্রমের কাজ—কিন্তু যদি কোনক্রমে সিদ্ধ হয়, তখন দেখা যাইবে কী অদ্ভুত ত্রিলোক-বিস্ময়কর কাজ। দেবতারা পর্যন্ত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিবেন মর্ত্যদেহধারী মানুষের সেই সিদ্ধি দেখিয়া। আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার, ভূমিগর্ভে কুম্ভক করিয়া থাকিবার বা কয়েকমাস অনাহারে কাটাইবার সিদ্ধি নয়, অণিমা-লঘিমা-ব্যাপ্তি, ব্যাধি সারানো, ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া ইত্যাদ্যাকার সিদ্ধিও নয়—দুর্বার ইন্দ্রিয়গ্রাম-বশীকরণের সিদ্ধি, চিত্তে সমতার, হৃদয়ে পবিত্রতার, প্রাণে বিশ্বাস-ভক্তির সিদ্ধি, নিঃস্বার্থ জীবনে উদার মৈত্রীর, সেবার সিদ্ধি।

অনেক সময়েই কিন্তু আমরা ধর্মানুভূতির এই লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে চাই না। মনে করি উহা যেন অতি একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন, নির্জলা ব্যাপার। কিছু আড়ম্বর না দেখিলে আমরা যেন খুশী হইতে পারি না, কিছু 'যৌগশক্তি'র পরিচয় না

পাইলে ধর্মাদর্শকে পুরা গ্রহণ করি না। আমাদের মনে রাখা উচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার বালক ভক্তগণকে কিভাবে সাবধান করিয়া দিতেন। স্বামী সারদানন্দজী বর্ণনা করিতেছেন—

"ঠাকুর আমাদের অনেককে অনেক সময়ে বলিতেন, 'যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি-তিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট (sign-board) মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি নি।'"

(শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়)

নাট্যকার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের সহোদর ভ্রাতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ (ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন) বলিতেন, "ঠাকুরের miracle (যোগবিভূতি) যদি দেখতে চাও তো লাটুমহারাজকে দেখ।" সমাজের নিম্নস্তরের একজন শিক্ষাদীক্ষাহীন সামান্য মেষপালক বালকের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিকতার বিকাশসাধন—ইহাই বক্তার মতে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

"সকল অনিত্যবস্তুর মধ্যে সর্বকারণ নিত্য পরমাত্মা রহিয়াছেন, সকল সজীব প্রাণীর তিনিই চেতনা, সকল বহুত্বের পিছনে তিনিই 'এক' থাকিয়া সব কিছু বিধান করিতেছেন। যাহারা নিজের সত্তায় তাঁহাকে দেখিতে পারিয়াছে তাহারাই ধীর—যথার্থ কৌশলী, তাহারাই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপরে নহে।" (কঠোপনিষৎ, ২।২।১৩)

অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, মানবপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কারই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই কাম্যকে লাভ করিতে গেলে অবশ্যই কিছু অসাধ্যসাধন করিতে হয় (সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন,—শিবেরও অসাধ্যসাধন মন মজানো রাঙাপায়, নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।), অবশ্যই উজানপথে নৌকা বাহিতে হয় ; কিন্তু সেই অসাধ্যসাধন নিশ্চিতই এমন কিছু নয় যাহা রাস্তার লোকের ভিড় টানিয়া আনিবে। আবার কমলাকান্তেরই ভাষায়—"মন, তুই দেখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।"

ধর্মজীবন যে নীরব চেষ্টার জীবন, ধর্মানুভূতি যে নিভৃত অন্তরলোকের দীপ্তিবিশেষ—এইটিই ভাল করিয়া মনে রাখিবার। ইহাই ধর্মের অলৌকিকতা। আর যাহা কিছু তাহা শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের ভাষায়—'উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেষঃ'—উদরপূর্তির জন্য নানা বিচিত্র সাজসজ্জার আড়ম্বর মাত্র ; অথবা ফ্রান্সিস্ বেকনের সংজ্ঞানুসারে—মানুষের চিত্ত-বিভ্রমকারী 'নাট্যমঞ্চের পুতুল' (Idols of the theatre)—সাজানো কতকগুলি বুলি, মনগড়া রঙীন কতকগুলি কল্পনা—সত্যের সহিত যাহাদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যদি কেরাণীকে জেলে দেয়, সে জেল খাটে বটে, কিন্তু যখন জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়, তখন সে কি রাস্তায় এসে ধেই ধেই করে নেচে নেচে বেড়াবে? সে আবার কেরাণীগিরি জুটিয়ে লয়, সেই আগেকার কাজই করে। গুরুর কৃপায় জ্ঞানলাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।৬।৩)

ধেই ধেই করিয়া নাচার অর্থ আড়ম্বর, অনাবশ্যক আত্ম-প্রচার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, ধর্মানুভূতির সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। সংসারের আর দশজনেরই মত বেশভূষা লইয়া, দশজনের একজন হইয়া দশজনের মতো হাটবাজার করিয়া, খড়ের চাল মেরামত করিয়া চলিতে থাকিলে তত্ত্বজ্ঞান পচিয়া যায় না। হয়তো দশজনের মধ্যে বসিয়া থাকিলে তত্ত্বজ্ঞকে ধরিতেই পারা যাইবে না (শ্রীরামকৃষ্ণকে কত সোনার চশমা আঁটা কলিকাতার বাবু কালীবাড়ীতে আসিয়া মনে করিয়া গিয়াছেন বাগানের মালী!) কেন না, শ্রীমা সারদা দেবীর ভাষায় ভগবানকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাথায় দুটি শিং গজায় নাই। কিন্তু সেই ঠিকানায়-পৌঁছিয়া যাওয়া লোকটির হৃদয়-মন? উহা যে স্বর্ণ-নির্মিতা বারাণসী!

উহার যে তুলনা নাই। উহার অলৌকিকতা যে মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না।

আজিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বপ্রকৃতির কোন ক্ষেত্রেই জটিলতা, কুয়াসা সহ্য করিতে পারে না। যাহা ভারী তাহাকে হাল্কা করিয়া দেওয়া, যাহা মন্থর তাহাতে গতি সংক্রামিত করা, যাহা অদৃশ্য তাহা দৃষ্টির কক্ষে লইয়া আসা—ইহাই আজ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার লক্ষ্য। বিজ্ঞান আজ শুধু ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নাড়াচাড়া করে না, উহার গবেষণা-পরিধি বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে মানুষের চিন্তা আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও—তাহার মনস্তত্ত্বে, সমাজ-নীতিতে, ইতিহাসে, দর্শনে। ধর্মও বাদ পড়িবে না। ধর্মের মধ্যে যাহা সত্য, চিরন্তন তাহা থাকিবে, পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদা পাইবে—যাহা মিথ্যা, দুর্বল, মাত্র সাময়িকউত্তেজনা-দায়ী তাহাই লোপ পাইবে, তাহাদের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে।

ধর্মের সহিত যে সকল অলৌকিকতা জড়িত করিয়া সহস্র সহস্র 'বিশ্বাসী' ভ্রান্ত মুগ্ধতায় ধর্মের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেই বঞ্চিত থাকিয়া যাইত উহাদের অনেক কিছুই যদি এই বিশ্লেষণ ও আঘাতে ধসিয়া পড়ে তাহাতে মানুষের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। ধর্মের মধ্যে যাহা যথার্থ অলৌকিক তাহা মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত ধার্মিকতা সাধিতে পারিবে।

কি ভাবে এবং কতটা ভাঙ্গিব?

(ক) "হিন্দু সমাজের মূল গঠন সম্বন্ধে যাঁর একটুও ধারণা আছে তিনি বেশ ভাল করেই জানেন যে, যতদিন পর্যন্ত বর্ণ (জাতি)-ভেদ প্রথা থাকবে ততদিন অস্পৃশ্যতা দূর হবার নয়। অতএব বর্ণপ্রথার উপর সামনাসামনি আক্রমণ চালানো দরকার। * * * একটি অস্পৃশ্যের যত গুণই থাকুক হিন্দু ধর্মে এমন কোন ব্যবস্থা নেই, যার দ্বারা সে বা তার পরবর্তী সহস্রতম বংশধর অস্পৃশ্য ছাড়া অপর কিছু হতে পারে। এ অব্যর্থ বিধান ঘুচবে না যতক্ষণ বর্ণপ্রথা রয়েছে। অতএব যাঁরা অস্পৃশ্যতা বন্ধ করতে শুধু মুখের নয়—হৃদয়ের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁদের উচিত বর্ণপ্রথা ভেঙ্গে ফেলার জন্য কার্যকরী উপায় অবলম্বন করা।

জাতিভেদ প্রথার মারাত্মক বিষ হিন্দুসমাজে এমন ভাবে মিশে গেছে যে, যিনি খুব প্রগতিশীল তিনিও পর্যন্ত অজানতে নিজের জাতির দিক চেয়েই চিন্তা ও কাজ করেন। বাহির থেকে মনে হয় যে ইচ্ছাপূর্বক জাতিবিচার তিনি করছেন না, কিন্তু অভ্যাসের শক্তি এমনই দৃঢ় যে, অনেক ক্ষেত্রেই কোন্ এক অনির্জ্ঞাত প্রভাব তাঁকে চালিত করে জাতিভেদ মানতে।"

—শ্রীজগজীবন রাম

(খ) "চারটি সহজ শব্দ—শিক্ষা দাও, রক্ষা করো, পুষ্টি দাও, সেবা করো। যিনিই কোন পরিবারের কর্তা, পোষ্য-বর্গের প্রতি তাঁহার যেমন এইগুলি আবশ্যক কর্তব্য সেইরূপ বৃহৎ-পরিবার অর্থাৎ সমাজের প্রতিও শাসকবর্গের ইহাই করণীয় কাজ। শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতে গেলে চাই বিদ্বৎসম্প্রদায়—মনস্বিবৃন্দ অর্থাৎ প্রাচীন সংজ্ঞানুসারে 'ব্রাহ্মণ'গণ (বর্তমান কালে এই শব্দটি তুলিয়া শিক্ষক বা অধ্যাপক শব্দ বসানো উচিত, কেননা ব্রাহ্মণের প্রকৃত অর্থ যাহা তাহা আজকাল আর ঐ শব্দ দ্বারা বুঝায় না)। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন নির্বাহিক-বর্গ—ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস, সৈন্য অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়' ('রক্ষক' বলিলে ভাল); 'পুষ্টি' সম্পন্ন করিতে হয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহায়তায় অর্থাৎ 'বৈশ্য' (বা পোষক)দের দ্বারা; সমাজের নানাবিধ সেবার কাজের জন্য চাই শিল্পজীবী—যাহারা হাতের কাজ করিবে অর্থাৎ 'শূদ্র' (সহায়ক, ধারক বা শ্রমিক বরং ভাল কথা)। এই চারটি সুনির্দিষ্ট 'আকার' দ্বারা প্রকৃতি মানুষকে চার বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। আজিকার সোভিয়েট রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনে এই বিভাগ বর্তমান। জীবনের বহু দুর্বিপাক, ভ্রান্তি, ব্যর্থতা—যাহাদের পরিণাম অনেক সময়ে আত্মহত্যা ও উন্মাদ অবস্থা—ঘটে, মানুষকে তাহার মানসিক গঠন ও স্বাভাবিক যোগ্যতার বিরোধী কাজে অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া যোগ দিতে হয় বলিয়া। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের হুঁশ হইয়াছে—তাই তাঁহারা আজকাল স্কুল কলেজে মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞ 'বৃত্তি-নির্দেশক' (Career Masters) নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্রের মানসিক ঝোঁক ও ক্ষমতা নির্ণয় করিয়া লন এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তির সুবিধার জন্য কে কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিলে ভাল হইবে তাহা বলিয়া দেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই কাজটির ভার লইতেন গুরুকুলের আচার্যেরা। * * *

আচার্যই বলিয়া দিতেন কোন্ বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ-কাজের যোগ্য, কে ক্ষত্রিয়-বৃত্তির উপযোগী, বৈশ্য-কার্যই বা কাহার করা উচিত ইত্যাদি। উহাই হইত বিদ্যার্থীর প্রকৃত জাতি বা বর্ণ—জন্মগত জাতি নয়। * * * সমাজের সুসংহতি বলিতে কি বুঝায় তাহা চারিপ্রকার 'বর্ণের' নামগুলি হইতে সুস্পষ্ট। যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে—কিন্তু আমরা চাইনা ব্রাহ্মণরাজ্য, পৌরোহিত্যের অত্যাচার, পুঁথি-শাহী। ক্ষত্রিয় চাই বই কি—কিন্তু চাইনা সার্বভৌম নরপতিত্ব, একনায়কত্ব, যুদ্ধবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, লাঠি-শাহী। * * বৈশ্যেরও দরকার আছে, কিন্তু দরকার নাই বৈশ্যরাজ্যের, বাঁধনহীন পুঁজিবাদের, 'থলিশাহী'র। সর্বশেষে শূদ্রও আমাদের চাই—শারীরিক শ্রম যাঁহারা করিবেন। ভরণ-পোষণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা ইহাদের দিতে হইবে—কিন্তু আমরা চাইনা, শূদ্ররাজ্য, মজদুর-বাদ, 'হুল্লড়-শাহী'। * * শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, ধনধান্যবল, শ্রমবল এই চারিপ্রকার শক্তির প্রতীক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণের পরস্পরের সহিত সুসম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। উহারা মাথা, হাত, মধ্য-দেহ এবং পা—শরীরের এই চারি অংশের ন্যায় পরস্পরের সহায়ক, প্রত্যেকেই সমাজের অপরিহার্য। প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করুক সমাজের পুষ্টি ও সুপরিচালনার জন্য, কিন্তু কেহ অপরের অধিকার ও কর্মে যেন ব্যাঘাত না আনে।"

—ডক্টর ভগবান দাস

একই বিষয়ের একটি পূর্ণতর চিত্র দেখিবার জন্য পর পর আমরা দুটি উদ্ধৃতি সাজাইয়াছি। হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথা বর্তমান আকারে যেরূপে আছে এবং ক্রিয়াশীল রহিয়াছে তাহার বহুতর অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামের বিকানীরে প্রদত্ত একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতা হইতে যে কথাগুলি আমরা তুলিয়াছি ('ক' উদ্ধৃতি) তাহার জায়গায় জায়গায় এই আবেদনই পরিস্ফুট। এমন সহস্র সহস্র উচ্চশিক্ষিত হিন্দু বাস্তবিকই আছেন যাঁহারা হিন্দু-ধর্মের হয়তো কিছুই মানেন না কিন্তু হিন্দুসমাজের জাতিভেদের নাগপাশ হইতে নিজেদের তাঁহারা মুক্ত করিতে পারেন নাই এবং বোধ করি মুক্ত হইতেও চান না। জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা সমাজ-দেহের অনেক বিষ সহ্য করিয়া চলেন। যে বিচার, তীক্ষ্ণবিশ্লেষণ, চিন্তা ও আবেগের বিদ্রোহ লইয়া তাঁহারা 'পুতুলপূজা' মঠ-মন্দির-তীর্থস্নান-ব্রত-জপ-শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 'মুর্দাবাদ' ঘোষণা করেন, সেই বীরত্ব ও সাহস থমকিয়া যায় যখন জাতি-সংক্রান্ত কোন কুরীতি বর্জন করিবার কথা উঠে। আজ আর্থিক বিপর্যয়ে ব্রাহ্মণসন্তান যখন জুতার দোকান দিতেছেন, তাঁতিবংশোদ্ভব শিক্ষিত ব্যক্তি যখন অধ্যাপনার কাজ করিতেছেন তখন জাতিগৌরবের অর্থ নিশ্চিতই আর পূর্বের মতো নাই। জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করিবার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং তাঁহার ন্যায় বর্ণপ্রথাকে সম্মুখাক্রমণ (frontal attack) করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের দু'একটি জিনিস মনে রাখিলে ভাল হয়।

(১) হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ এক জিনিস নয়। বর্ণপ্রথা হিন্দুসমাজেরই প্রথা। বর্ণপ্রথার অপ-প্রয়োগের জন্য দায়ী হিন্দুদের 'ধর্ম' নয়—সমাজ। ঐ প্রথা সামাজিক প্রয়োজনে বিস্তারলাভ করিয়াছে—ধর্মের প্রয়োজনে নয়।

(২) বর্ণপ্রথা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যখন প্রথম প্রবর্তিত হয়, তখন উহা একটি উদার বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। ঐ বৈজ্ঞানিক রীতি আজও পরিবর্জনীয় নয়। ডক্টর ভগবান দাস ইহাই তাঁহার প্রবন্ধে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ৮।২।৫৪) দেখাইয়াছেন। (উপরোক্ত 'খ' উদ্ধৃতি)।

(৩) জাতিভেদপ্রথাই যে অস্পৃশ্যতার জন্য দায়ী তাহা বলা চলেনা। অস্পৃশ্যতা রীতির সহিত কোন আপোষ থাকা উচিত নয়—সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, সবদিক দিয়াই অস্পৃশ্যতাকে ভাঙিতে হইবে—কিন্তু চতুর্বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে আরও ধীরভাবে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। নিম্নবর্ণীয়গণ উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি যাহাতে ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। হিন্দুসমাজের প্রধান চারিবর্ণের মধ্যে যে অসংখ্য শাখা প্রশাখা আছে সেইগুলির সংখ্যা যত

কমিয়া আসে ততই মঙ্গল—কেননা, এই সকল শাখা-প্রশাখার উদ্ভব যে কারণে হইয়াছিল—জীবিকাবৃত্তির পারম্পর্যরক্ষা—সেই কারণ এখন আর নাই। সূত্রধরের ছেলে এখন সূত্রধরই হয়না—তন্তুবায়ও হয়। অধ্যাপকের পুত্র দাস্যবৃত্তি করিলে এখন আর কেহ টিটকারি দেয় না। কিন্তু মানবসমাজে চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগের বৈজ্ঞানিক কারণটি এখনও রহিয়াছে এবং ডক্টর ভগবানদাসের উদ্ধৃত প্রবন্ধানুযায়ী চিরকালই থাকিবে। অতএব চাতুর্বর্ণ্যবিভাগকে 'ফ্রন্টাল অ্যাটাক্' বুঝিয়া শুনিয়া করা উচিত। চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগের প্রাচীনকালের মৌলিক রীতিটি যদি ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় তাহা হইলে সমাজের পক্ষে সবদিক দিয়াই মঙ্গল। ডক্টর ভগবানদাস তাঁহার প্রবন্ধে বোধ করি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি স্মরণীয়—

"সমস্যার সমাধান উঁচুকে নীচুতে নামাইয়া আনিয়া নয়—বরং নীচুকে উচ্চস্তরে উঠাইয়া। এই কর্মধারাই আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে নির্ণীত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন লোক হয়তো অন্যরূপ বলিবেন—যাঁহাদের নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রাচীনদের বিশাল পরিকল্পনাগুলি বুঝিবার ক্ষমতা দুইই শূন্য বলিলে চলে। কি সেই পরিকল্পনা? একপ্রান্তে ব্রাহ্মণ,—অপর প্রান্তে চণ্ডাল—সমস্ত কাজটি যেন হইতেছে চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের জায়গায় উঠাইয়া লইয়া যওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উহাদিগকে বেশী বেশী অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

খেদ হয় যে, আজকাল নানাবর্ণের ভিতর এত বেশী বাগ্-বিতণ্ডা চলিতেছে। ইহা বন্ধ হওয়া অতি প্রয়োজন। উভয় পক্ষেই ইহা নিষ্ফল—বিশেষতঃ উচ্চতর বর্ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে—কেননা, এই সকল সুবিধা এবং বিশেষ দাবীর দিন চলিয়া গিয়াছে। সকল অভিজাত সম্প্রদায়েরই উচিত এখন আভিজাত্য বিসর্জন দেওয়া—যত শীঘ্র ইহা হয় ততই মঙ্গল। যতই তাঁহারা ইহাতে দেরী করিবেন, ততই তিক্ততা বাড়িবে এবং কঠিনতর আঘাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণের এখন কর্ত্তব্য ভারতের অন্যান্য জাতির উন্নতির জন্য কাজ করা। যদি ইহা তিনি করিতে পারেন ও করেন তবেই তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণ।"

ভক্তি*

স্বামী বিরজানন্দ

মানুষ এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এক অপরিমিত শক্তি নিয়ে, যা' সতত তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে প্রকাশের পথ খুঁজে ফিরছে। আমরা যা কিছু কর্ম করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছু অনুভব করি, সব হচ্ছে এই শক্তিরই খেলা। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও সঞ্চিত কর্ম আমাদের মধ্যে এত সুগভীরে মূল বিস্তার করে যে, এজন্যে ওগুলি যেন দাঁড়িয়ে যায় আমাদের 'স্বভাবে'। এই 'স্বভাবে'র বিপুল ক্ষমতার কাছে মানুষ এতই দুর্বল যে, একে সে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না এবং এরই প্রবাহে গা ভাসিয়ে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও ভোগের মধ্যে একান্ত অসহায় ভাবে হাবুডুবু খায়। এইভাবে, সে তার শক্তির অপচয় করে চলে ভোগ-সুখ আয়ত্তের জন্য বহির্জগতে একে প্রয়োগ করে। দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই একটা আদর্শ সুখের কল্পনা আছে। সেই কল্পনালোকেরই অনু-সন্ধানে ফেরে সে বহির্জগতে। তারই অনুধ্যানে হয় সে বিভোর। এ তার প্রকৃতিগত; বিষয় হতে

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরলোকগত ষষ্ঠ অধ্যক্ষের অপ্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ কর্তৃক অনূদিত।

বিষয়ান্তরে এই কল্পিত সুখের আদর্শকে সে প্রক্ষেপ করে চলে। এই বিষয়গুলিকেই সে ভালবেসে ফেলে এবং প্রাণমন এরই উপর উজাড় করে ঢেলে দেয়। এগুলিরই উপর সে তার কল্পনার আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়ে তোলে, তার মনের সকল উচ্ছ্বাস ও আবেগ এদেরই উপর ভেঙ্গে আছড়ে পড়ে। আর তখন নিজেকে সে মনে করতে থাকে এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র অধীশ্বর। দুর্ভাগ্যবশতঃ একবারও তার মনে হয় না যে বালির বাঁধের উপর গড়ে তুলেছে সে তার এত সাধের, এত সুখের প্রাসাদ, যে কোনও মুহূর্তেই উহা ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। তার প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণপ্রতিম পুত্র, যারা তার নয়নমণি, তার সকল আশা ও আনন্দের উৎস, মৃত্যুর করাল-গ্রাসে অকস্মাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই নিদারুণ আঘাতে অন্তর তার দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে পড়ে। সম্মুখে প্রসারিত ভবিষ্যৎ তার কাছে আশাহীন, আনন্দহীন অতলস্পর্শী মহাশূন্যবৎ, কেবল গভীর তিমিরাবৃত। এমনই একসময় অকস্মাৎ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়, অপসারিত হয় দৃষ্টির বাধা। উদ্ভাসিত হয় সুতীব্র আলোকলেখা—"আমি কিসের জন্য আমার জীবন দিতে বসেছি? এই কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী মিথ্যার পিছনে আমার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেছি। আমি কার? এ বিশ্ব-সংসারে এমন কি কেউ নেই যাকে আমার আপনার বলতে পারি? কেন আমি এই ছায়াময়, প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে উদ্দেশ্য-হীন ইতস্তত ভ্রমণকরে মরছি। হায়! কেউ কি আছ আমার আপনার? তবে দেখা দাও। আমি যে তোমায় ছেড়ে আর মুহূর্তমাত্রও বাঁচতে পারছি না।" প্রেমময় ঈশ্বর এই কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। ভক্তের সেই সুতীব্র তৃষ্ণা, সেই অসহ্য অন্তর্জ্বালার দহন তাঁর পক্ষে চেয়ে দেখা অসহনীয় হয়ে পড়ে। টলে ওঠে তাঁর আসন, ভক্তবৎসল ভগবান অবশেষে এসে দাঁড়ান তাঁর ভক্তের সম্মুখে। কিন্তু, এইরকম সৌভাগ্যবান পুণ্যাত্মা ভক্তের সংখ্যা খুবই কম, কদাচিৎ মানব-ইতিহাসে এঁদের দর্শন মিলে থাকে।

সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, সে ত দূরের কথা, আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি। বলা বাহুল্য, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ উন্মাদের বাতুলতামাত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলতেন—"গলায় কাঁটা বিঁধলে বেড়ালের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়িস্। আর তোর যত সংশয় ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে?" তিনিই বলেছেন, যেমন আকারহীন জল হিমে জমে যায় তেমনি ভক্তিহিমে জমে গিয়ে নিরাকার ঈশ্বর সাকার মূর্তি গ্রহণ করে থাকেন। দেহসীমাবদ্ধ বস্তুজগতে বিচরণশীল জীব আমরা সাকার ব্যতীত সকল গুণময় পরমবস্তুর ধারণা কি করে করব? অবশ্য, দুই শ্রেণীর মানুষ সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে না। এক, মানবদেহধারী পশু, যার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। আর মানবপ্রকৃতির সীমা যাঁরা অতিক্রম করেছেন সেই সকল পরমহংস দেবমানবেরা। এই উভয় প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানব ভিন্ন অপর সকলেরই ঈশ্বরকে মানবীয় আকারে চিন্তা করা ভিন্ন উপায় নেই।

বেদোক্ত সনাতনধর্ম, যা একদিন অতি প্রাচীন কালে, ইতিহাসেরও জন্মের পূর্বে, ঋষিগণ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে লাভ করেছিলেন, তা' সাধককে ঈশ্বর-দর্শনের অসংখ্য পথের সন্ধান দিয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে আমাদের ধর্ম বড় বড় কথায় এবং বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ নয়; এ ধর্ম নিছক মতবাদ, কেবল কল্পনাপ্রসূত অসার তত্ত্বও নয় যাতে বিশ্বাস করলেই ফুরিয়ে গেল। এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু। এই অনুভূতিই ত' মানুষকে করে দেবতা, মাটির জীবকে করে দেবত্বগুণে বিভূষিত। মানুষের সাধনায়ই এই সিদ্ধি সম্ভব। আমরা এখন যা', তা' আমাদের অতীত সাধনার ফল, আর ভবিষ্যতেও আমরা যা হব, তা' আমাদের বর্তমান সাধনার উপর

নির্ভর করছে। একপ্রকারে অভ্যাসের কলকাঠি চালনা করে আমরা আমাদের বর্তমান প্রকৃতি পেয়েছি, আবার বিপরীত দিকে যদি অভ্যাসের কলকাঠি ঘোরাই ভিন্ন প্রকৃতি পাব। কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কথা ভেবে ভেবে আমরা বর্তমান জড়-প্রকৃতি পেয়েছি। জড়বস্তুর এই নিবিড়বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে আবার আমরা স্বস্বরূপে যা,—সেই চিন্ময়-আত্মারূপে উদ্ভাসিত হব। পূজা ও উপাসনা ধর্মের গবেষণাপদ্ধতি মাত্র। উপাসনা ও পূজাদ্বারা আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে বাস্তবে এগিয়ে চলি। ভক্তির অভ্যাস ব্যতীত আমরা শুদ্ধাভক্তির সেই মহাঐশ্বর্যময় অবস্থা সংপ্রাপ্ত হতে পারি না,—যে অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় হৃদয়ের সকল গ্রন্থিমোচন হয়, সকল সংশয় নাশ হয়, সকল কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।

কি উপায়ে এই ভক্তির সাধনা আমরা করব? শাস্ত্র বলছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র চিন্তা করে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অভ্যাস করে, কোনও সম্মানই নিজে না গ্রহণ করে, এবং যোগ্যব্যক্তিতে তা অর্পণ করে, ভক্ত ভগবানের উপাসনায় সর্বদা নিমগ্ন থাকবেন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তির নয়টি অবস্থা বর্ণনা করেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, নিজেকে তাঁর দাস, তাঁর সখা কল্পনা করা এবং আত্মনিগ্রহ করা—এই নয়টি ভক্তি সাধনার বিভিন্ন পর্যায়। এই নয়টি অবস্থা অতিক্রম করলে তবে পরাভক্তি লাভ হয়। অনুক্ষণ স্মরণই প্রকৃত পূজা। মনে সতত ঈশ্বরচিন্তা করবে। খুবই শক্ত কাজ। কিন্তু, অভ্যাসযোগে এও সম্ভব হয়। গীতায় অর্জুন বলছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥

"হে কৃষ্ণ! মন সর্বদা চঞ্চল, প্রমত্ত ও অনমনীয়। বায়ুবেগ সংযত করা যেমন দুঃসাধ্য, প্রমত্ত মনকেও সংযত করা তেমনই দুঃসাধ্য।"

ভগবান উত্তর দিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥

"হে মহাবাহো! সন্দেহ নেই মন সর্বদা চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ। কিন্তু, হে কুন্তীপুত্র, অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা সম্ভব হয়, মনকে সংযত করা যায়", সদাসর্বদা ঈশ্বর চিন্তা কর, যখনই মন অন্যবস্তুতে ধাবিত হবে, সজোরে তাকে শাসিত কর, তাকে বারম্বার টেনে এনে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত কর। একেই বলা হয় অভ্যাস।

বাসনাত্যাগ বা বৈরাগ্য মনঃসংযমের প্রকৃষ্টতম উপায়। এ জন্য সকল বাসনার মূলোচ্ছেদ করা প্রয়োজন। বাসনা হৃদয় দুয়ার রুদ্ধ করে রাখে। জমিয়ে তোলে সেখানে প্রচুর ধুলোকাদা, সকল কুপ্রবৃত্তির লীলাস্থল করে তোলে তাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বারম্বার বলছেন "হে অর্জুন! কর্ম কর, কর্ম কর, কিন্তু বাসনারহিত হয়ে কর।" জানবে এই বাসনাই সকল দুঃখের আকর, বাসনাই মনের সাম্যরক্ষা দুঃসাধ্য করে তোলে। মনঃসংযোগ না করতে পারলে আর কি করেই বা আমরা ঈশ্বর চিন্তা করব? মনের আবর্জনা ঝেঁটিয়ে আগে তাকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করে তোলা প্রয়োজন। তবেই না মনঃসংযোগ করতে পারব? মনে রাখতে হবে, কাম ও কাঞ্চন—এই দুইটি ধর্মপথে প্রবল বাধা। এ পথে যারা নূতন ব্রতী তাদের সযত্নে এই দুইটি পরিহার করতে হবে। এই দুইটি সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের অভিশপ্ত ফল যা

নিখিল বিশ্বের অনন্ত দুর্ভোগ বহন করে আনে। অগ্নিশিখা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে পতঙ্গ যেমন ধ্বংসোন্মুখে পতিত হয়, কামকাঞ্চনের মোহিনী-মায়ায় প্রলুব্ধ, প্রমত্ত মূঢ়জনের আত্মাও ঠিক তেমনি করেই ধ্বংস কবলিত হয়। সাংসারিক সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রীতি যেন শিশুর খেলার মতই। এ গুলিকে অন্তর হতে বিদায় করে দিয়ে সেখানে বসাতে হবে শ্রীভগবানের জন্য নির্মল ভক্তির, সুমহান প্রেমের সিংহাসন, যেখানে চিরপ্রেমময় তিনি এসে আসন গ্রহণ করবেন। ভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের অনুভূতি, ভাব, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। এ হচ্ছে অন্তরবিগলিত ধারা, হৃদয়-যমুনা প্রবাহ বিচারপ্রসূত কোনও সংপ্রাপ্তি নয়। কিন্তু, পরম সুন্দরকে জানবার এইই সোজাপথ। অনুক্ষণ মনে মনে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তোমার সকল অভাব, সকল অভিযোগ তাঁকে জানাও, তোমার ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য তাঁর কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদ। তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। চাও, চাইলেই পাবে। তাঁর বিরহে পাগল হও। কোনও সময় এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরা বহু পুণ্য কর্ম করেছেন, তবে কেন তাঁরা ঈশ্বরের দর্শনলাভে ধন্য হন নি বা হচ্ছেন না। তাঁর উত্তরে ঠাকুর বল্লেন, "তুমি তোমার রামকৃষ্ণকে যতখানি ভালবাস, বল, ঈশ্বরকে কি ততখানি ভালবাস ?" বলা বাহুল্য রামকৃষ্ণ ভক্তটির পুত্রের নাম। ভক্তটি উত্তর দিলেন "না, তা' নয়।" তখন ঠাকুর বল্লেন "লোকে নাম যশ ও টাকার জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের অদর্শনে কে একবিন্দু চোখের জল ফেলছে বল দেখি ?" বুঝে দেখ। অতএব, তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন জলাশয়ের সন্ধানে কাতর হয়, তেমনিই ঈশ্বর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কাতর হও। অশেষ অধ্যবসায় ও অদম্য দৃঢ়তা সহায়ে আপন অন্তরের নীচবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কর, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালাও। যদি আপনার অন্তরে কুবেরের সম্পদ পেতে চাও, তবে সজাগ থাক। যতক্ষণ না যুদ্ধে জয়ী হচ্ছ ততক্ষণ যেন কোনও মতেই আলস্যভরে ঘুমিয়ে প'ড়' না, নিরন্তর অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়ে জাগ্রত রাখ। অন্যথায় অনিষ্টকারী দস্যুদল কোন ফাঁকে হানা দিয়ে লুঠে নেবে তোমার সব সম্পদ। রন্ধনশালায় বসাও প্রহরী, নতুবা কখন মার্জার ও কুকুরশ্রেণী প্রবেশ করে নষ্ট করে দেবে তোমার মুখের অন্ন। জেনো, ধর্মের পথ কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথ নয়, ক্ষুরের ধারের ন্যায়ই শাণিত দুর্গম সেই পথ। এ পথে আছে সহস্র বাধা, সহস্র বিপর্যয় ; শত শত প্রলোভন, মোহিনীমায়া তোমায় হাতছানি দিয়ে কতবার ডাকবে ; কত মিথ্যা আশা, অলীক মরীচিকা তোমায় বিভ্রান্ত করবে ; বনবনানী, গহন অরণ্যসঙ্কুল এই পথে একক যাত্রী, তোমার পথ হারাবার কত না সম্ভাবনা ! একলা পথিক এ পথে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায় ধর্মের গূঢ় রহস্য যে গহনে নিহিত তারই উদ্দেশ্যে। যুক্তি বিচার সহায়ে দীপ্ত বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বহুতর বৃদ্ধি করেও সে অন্ধকার দীর্ণ করা যায় না। বহু মহাত্মা, মহাপ্রাণ সাধক এরূপ প্রয়াস করে বিফল হয়েছেন। আত্মা শুধু অপর আত্মার স্পর্শে জেগে ওঠে, অন্য কিছুতেই সে সাড়া দেয় না। আধ্যাত্মিক পথে এরূপ সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥"

"এ সংসারে তিনটি বস্তু দুর্লভ—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয় ; ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত এ তিনটি সম্পদ লাভ হয় না।" সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে যে এসেছে, সে ধন্য হয়ে গিয়েছে, জীবনে তার স্বর্ণদ্যুতি ঝলকে উঠছে। সদ্‌গুরুর দিব্যস্পর্শে চৈতন্যলাভ হয়, অন্তরের সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে সেই অশেষ ভাগ্যবান। যে ব্যক্তি এই দিব্যস্পর্শ সঞ্চার করতে

পারেন, তিনিই সদ্‌গুরু। তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত। তাঁর আদেশ বেদবাক্য বলে শিরোধায করতে হবে। তাঁর করুণাই সাধকের মোক্ষলাভের তরণী। জন্মমৃত্যুর ভয়াল অপার মহাসাগর পারাপারের পথে তিনিই একমাত্র আলোক-সঙ্কেত, তিনিই একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি ভক্তি বিনা, অশেষ দীনতা এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ বিনা ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি লাভ করা অসম্ভব। একমাত্র নিষ্ঠাসহকারে গুরুপাদপদ্ম সেবা করে সাধক আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। অবশ্য তাঁকে সিদ্ধগুরু হতে হবে, যিনি নিজে ঈশ্বর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। নতুবা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় গুরুশিষ্য উভয়েরই পতন ঘটবে। মন্ত্রসহায়ে গুরু শিষ্যের মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করে দেন। শিষ্য সেই মন্ত্র নিরন্তর ধ্যান করবে। মন্ত্রকে স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁরই বিগ্রহ বলে মনে করতে হবে। মন্ত্রের অনুধ্যান ও উচ্চারণই জপযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই জপযজ্ঞ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"— "যজ্ঞের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জপযজ্ঞস্বরূপ।" এই জপযজ্ঞদ্বারাই মনঃসংযোগ লাভ করা যায় এবং এইরূপে চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হলে প্রশান্ত হ্রদের বক্ষে চন্দ্র যেমন প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই অচঞ্চল মনে স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিফলিত হন।

সাধনার প্রথম অবস্থায় আমাদের পথ চলতে চাই ধরা ছোঁয়া যায় এমন কিছুর সহায়তা। পুরাণ-কথা এবং প্রতীক উপাসনা প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ তখন পরিহার করা যায় না। ভক্তির এইগুলি বহিরঙ্গ, এর সহায়তা ভিন্ন প্রথম প্রথম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। পাছে ছাগল ভেড়া খেয়ে ফেলে এই ভয়ে কেমন চারাগাছের চারপাশে বেড়া দিতে হয়, তেমনই প্রবর্তক সাধককে বহিরঙ্গ ভক্তিসাধনার মাধ্যমে আপনার ভাব রক্ষা করতে হয়। কালে এই চারাগাছই চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা পরিব্যাপ্ত করে মহামহীরুহে পরিণত হয়। যে সকল শক্তিধর মহাসাধকেরা জগতের ভাগ্যনির্ণয় করেছেন, মানবসভ্যতা ও চিন্তাজগতে ঘটিয়েছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাঁরা সকলেই এমন ধর্মের ছায়াতলে বর্ধিত হয়েছেন যা ক্রিয়াকাণ্ড এবং কাহিনী কথায় সমৃদ্ধ। বহিরাবরণশূন্য বীজ রোপণ করলে তার থেকে কোন মতেই গাছ জন্মাতে পারে না। ঝিনুকের খোলা থেকেই ত' মুক্তার জন্ম। অতএব এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিশেষ গুরুত্ব আছে দেখা যায়। এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই পাব। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব তাঁর মধ্যে মূর্ত, এবং সকল অবতারপুরুষদের মধ্যে একমাত্র তিনিই প্রত্যেক ধর্মের খুঁটিনাটি সকল ক্রিয়াকাণ্ড নিজে অনুষ্ঠান করে অনুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁর পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও কেন তিনি এরূপ করেছেন? তিনি কি ঈশ্বরসম্বন্ধে নিগুর্ণ অব্যয়-তত্ত্ব অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন যে, এই সকল সগুণ সাকার উপাসনা ব্যতীত তাঁর কোনও গত্যন্তর ছিল না. না তাঁর সেই প্রজ্বলন্ত প্রেম, প্রচণ্ড ভক্তি—যার কাছে ভগবান না ধরা দিয়ে পারেন না—তার অভাব ছিল? এ বিষয়ে তাঁর অক্ষমতা চিন্তা করাও মহাপাপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা আচরণ করে থাকেন, সাধারণেও তাই অনুকরণ করে। তাঁরা যা প্রামাণিক বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্যলোক তাই অনুসরণ করে থাকে।"

ভগবান আরও বলেছেন :—

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

আমি যদি অনলস হয়ে কর্ম না করি তবে, হে পার্থ, মানবগণও সর্বপ্রকারে ঠিক আমারই পথের অনুসরণ করবে।" ভগবান নিজে আচরণ করে জীবকে শেখান কি করতে হবে, কি করণীয়। মানবকল্যাণার্থেই ভগবান পরমহংসদেব এত কঠোর সাধনা, এত ক্রিয়াকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু এইসকল বাহ্যিক কর্মাদি, মূর্তিপূজা—এ সকলই প্রবর্তক সাধকের জন্য। ভগবান রামকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলতেন—"বহিরঙ্গ ভক্তিসাধনা ততক্ষণই প্রয়োজন যতক্ষণ না হরিনাম শুনে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ছে।"

ভক্ত হতে যে ইচ্ছা করে সে দৃঢ় ধারণা করে নেবে যে, যত মত তত পথ। যে পথ তোমার নয় তাকে ঘৃণা ক'র না, ব্যঙ্গ ক'র না, সে পথও পথ। তবে তোমার পথে তুমি দৃঢ় থাকবে, তোমার ইষ্টপদে দৃঢ় নিষ্ঠা রাখবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে একই পরমেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় জানবে। এইভাব আয়ত্ত হলে তবে ত তাঁকে ঠিক ঠিক ভালবাসা যায়।

চিত্তশুদ্ধির জন্যই এইরূপ বহিরঙ্গ ভক্তির সাধনা। ত্যাগই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। জীবনে ত্যাগ বিনা এ সকলই ভস্মে ঘি ঢালা। ত্যাগই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। ত্যাগ ছাড়া সাধকের আধ্যাত্মিকতার পথে একপাও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ভক্তের পক্ষে এই ত্যাগ অনায়াসলব্ধ। যখনই তোমার উচ্চ আদর্শের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে তখনই তুচ্ছ ক্ষুদ্র যা কিছু এতদিন পরম মমতাভরে আঁকড়ে ছিলে, সে'সব কিছুর উপরেই তোমার আকর্ষণ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে। এর জন্য তোমার কোনও জোর করতে হবে না, কোনও প্রয়াস করতে হবে না। সূর্য যখন আকাশে উদিত, চন্দ্রতারার দ্যুতি তখন ম্লান হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরকামনা সাধকের অন্য সকল কামনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভগবৎপ্রেম যখন প্রবল আকার ধারণ করে পরা ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন কোথায় লাগে ইন্দ্রিয়সুখ, কোথায় লাগে বিলাস-ভোগ! ভক্তি বলে ভক্তকে—"আমি তোমার কিছুই ধ্বংস করতে চাই না, আমি তোমায় পূর্ণ করতে চাই।" তোমার স্বভাবজ বাসনাকামনার শ্বাস রুদ্ধ করবার দরকার নেই, শুধু তাদের মোড় ফিরিয়ে দাও ঈশ্বরের অভিমুখে। যদি ক্রোধেরই বশবর্তী হও, তবে এইবলে ঈশ্বরেরই প্রতি ক্রোধ কর যে, কেন তোমার এত চাওয়া সত্ত্বেও তিনি দর্শন দিচ্ছেন না, কেন তিনি দূরে সরে রয়েছেন? যদি প্রাণে শূন্যতা অনুভব কর, তবে তাঁকে আলিঙ্গন-চুম্বন করে প্রাণের আবেগদ্বারা তা'কে দূর কর। যদি অহঙ্কার থেকে থাকে, তবে এই অহঙ্কারই থাক যে তুমি তাঁর সন্তান, আবার কার কাছে তুমি মাথা নোয়াবে? যখন সকল কামনার মোড় এমনই করে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, তখনই তাঁকে হৃদয়মন উজাড় করে ভালবাসতে সক্ষম হবে। তখনই তুমি অনুভব করবে তিনি প্রেমময়, প্রেমস্বরূপ তিনি। অবশেষে এইভাবে এই সর্বগ্রাসী প্রেম, এই তীব্র ভালবাসা, এ হতেই জন্ম নেবে পরিপূর্ণ নির্ভরতা। ভক্ত তখন দেখবে তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। একমাত্র এই অবস্থায়ই মানুষ সকল দুঃখকষ্ট, এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হাসিমুখে ও প্রশান্তচিত্তে বরণ করে নিতে পারে। একমাত্র এইরূপ ভক্তই বলতে সক্ষম হয়—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, হে প্রভু আমার।"

ভক্ত চায় ভগবানকে আস্বাদন করতে। এইজন্য তাঁর প্রতি পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রেমিক প্রভৃতি নানাভাব সে আরোপ করে থাকে। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে পবিত্রতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, আজ্ঞানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মনিগ্রহ ও প্রেমের যে আদর্শ অঙ্কিত আছে জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তার তুলনা মেলে

কি? সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ-সংগঠন-কৌশলে গর্বিত কোনও জাতি রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, যুধিষ্ঠির, সীতা বা গোপী—এঁদের কোনও একটিকেও দেখাতে পেরেছে? কত নাম করব? সংখ্যাহীন এই সকল পুণ্য নাম ভারত-ইতিহাসে। এ জন্মে হোক বা শতজন্ম পরে হোক একদিন না একদিন সব মানুষ-কেই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ করতে হবে। এ চরম সত্যটি কি? সে হচ্ছে প্রেম; এবং ভগবান এই প্রেমস্বরূপ। সেইজন্যই ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করতে চায়। রামপ্রসাদ যেমন আর কি বলেছেন—"মা চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই।" ভক্ত ভগবানকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের মাধ্যমে উপাসনা করে থাকে। ভক্ত যখন উচ্ছ্বাসহীন শান্ত ও স্থির শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহায়ে তাঁকে প্রার্থনা করে, তাকে বলা হয় শান্ত ভক্ত। পরবর্তী উচ্চাবস্থা দাস্যভাব। যখন নিজেকে ঈশ্বরের দাস মনে করা যায়, তখনই এই ভাব উপস্থিত হয়। তন্নিকটবর্তী শ্রেয়তর প্রেম সখ্যভাবের মধ্যে নিহিত। ভক্ত তখন মনে করে ভগবান তার সখা, তখন বন্ধুর মত তাঁর জন্য সমবেদনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে সে। তাঁকে সে খেলার সাথী এবং সর্বতোভাবে নিজের সমকক্ষ একজন বলেই চিন্তা করে থাকে। তারপরই আসছে বাৎসল্যভাব। এ ভাবে ঈশ্বরকে আর পিতা বলে মনে করি না আমরা, পুত্র বলে তাঁকে গ্রহণ করে থাকি তখন। বাৎসল্যভাব ঈশ্বরকে তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্যবিযুক্ত করে একান্ত আপনার করে ভাববার প্রকৃষ্টতম উপায়। ঐশ্বর্যের ভাব থাকলেই ভয় উৎপন্ন হয়। ভয় থাকলে ভালবাসা যায় না। এই বাৎসল্যভাবেই আবার ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করা চলে। ভক্ত তখন নিজেতে পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ভাব আরোপ করে থাকেন। অবোধ শিশু যেমন মার কাছে ন্যায় হোক, অন্যায় হোক সব আবদারই করতে পারে, ভক্তও তেমনি ঈশ্বরের কাছে সব কিছুই চাইতে পারে এবং প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া পর্যন্ত শিশুর মতই সে কেঁদে চলে। সন্তান কাঁদলে কোন মা আর স্থির থাকতে পারেন, কোন মা না তাকে সব আবদার পূর্ণ করে শান্ত করবার চেষ্টা করেন? আর কোন শিশুই বা মাতৃক্রোড়ে উঠে নির্ভয় না হয়? ভক্তও জগজ্জননীর অঙ্কে স্থান নিয়ে তাঁরই মুখচুম্বন করে, জগজ্জননীও সন্তানকে সাদরে চুম্বন করেন। এ আশ্বাস তখন সে পায় যে, সে যাই করুক না কেন, মা তার অপরাধ নেবেন না, মা তাকে কোনও শাস্তি দেবেন না। জগজ্জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে সে একেবারে নির্ভয়।

সর্বশেষে আসছে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব—মাধুর্যে এ ভাবের তুলনা নেই। এর নাম মধুরভাব। এ ভাবে ভক্ত ভগবানকে আপনার প্রিয়তম পতি বলে ভজনা করে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ভালবাসা জন্মে, তার মত আর কোন্ ভালবাসা মানুষকে এত উন্মত্ত করে তোলে? দুর্বার উদ্দাম আবেগে তার ব্যক্তিত্ব, তার পদমর্যাদা সব কিছুকে নিয়ে যায় ভাসিয়ে? তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে তার আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাকে কাজ করায়? এই প্রীতির তিনটি রূপ, যথা—সমর্থা,—অর্থাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম, সমঞ্জসা—অর্থাৎ আদান-প্রদানে সমান ভালবাসা, এবং সাধারণী—অর্থাৎ স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি। প্রথমোক্তরূপ ভালবাসায় প্রেমিক প্রেমাস্পদের কল্যাণ ও সুখের চিন্তায় বিভোর থাকেন, নিজের দুঃখকষ্ট জ্ঞান তাঁর থাকে না। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের এইরূপ উন্মত্ত ভালবাসা ছিল। তাকে প্রকাশ করবে কোন ভাষা? বৃন্দাবনের কুঞ্জে যখন পরমসুন্দর প্রেমমূর্তি কৃষ্ণ বংশীবাদন করতেন তখন নিশীথ রাতে ঘন অন্ধকারময় পথে সে আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটে চলতেন অসামান্য রূপবতী ব্রজগোপীরা।—ভুলে

যেতেন জাতি, কুল, মান, সমাজসংসার, কাজকর্ম, দুঃখ সব কিছু। অনভ্যস্ত পথ চলতে কাঁটায় ছড়ে যেত তাঁদের কোমল পা। রক্তাক্তপদে প্রেমভরে তবুও ছুটে যেতেন তাঁরা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে।

এ অবস্থায় মাঝে মাঝে বিরহ আসে, ঈশ্বরের অদর্শনে অসহ্য হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয়। বিরহ হচ্ছে সেই পরমমধুর বেদনা যা ভালবাসাকে গভীরতর করে তোলে। বিরহের দশদশা বৈষ্ণব-শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন। এদশায় ভক্ত বিরহজনিত অসহনীয় যাতনা ভোগ করে। অবশ্য এ বেদনা মাধুর্যরসে পরিপূর্ণ। অতএব, এ দশদশায় ভক্ত বিরহমাধুর্য উপভোগ করে এও বলা চলে। এ দশায় সে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, পুলক-কম্পনে শরীর স্পন্দিত হয়, অসহ্য আবেগে বাক রুদ্ধ হয়ে যায়, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় কখনও বা এলো-মেলো পদক্ষেপ হয়। সে কখনও অস্থির, কখনও চিত্রার্পিতের ন্যায় স্পন্দনহীন, শান্ত; কখনও তার ধমনীস্পন্দন যায় থেমে, চৈতন্যহারা হয়ে মৃতবৎ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তার দেহ। কখনও সে অদৃশ্য কাকে দর্শন করে আনন্দে ওঠে হেসে। তখন কার সঙ্গে কথা বলে, কি মাধুর্য যে উপভোগ করে তা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। লোকে তাকে পাগল বলে এবং মনে করে হয়ত বা ভূতেই পেয়েছে তাকে। সে কিন্তু বিষয়বাসনায় উন্মত্ত মূঢ়জনদের একমাত্র সুস্থমস্তিষ্ক নিজেকে উন্মাদ বলতে দেখে হাসে। মৃতেরা যেন জীবন্তকে প্রাণ দিতে চাইছে! এতে সে কি ক'রে না হেসে থাকতে পারে? যে এই আনন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে সে রসসাগরে ডুবে যায়, প্রেমাস্পদের সঙ্গে উচ্ছল মিলনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে সম্পূর্ণরূপে। সে তখন আর কিছু চায় না, মুক্তি চায় না, স্বাতন্ত্র্য চায় না, দেবগণের সাহচর্যে অক্ষয় স্বর্গসুখ চায় না। তখন ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদরূপে পেলে সহস্রবার কীটযোনিতে জন্মাতে সে দ্বিধাবোধ করবে না। এই জন্য ভক্ত প্রার্থনা করে—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাঽস্তু সদা ত্বয়ি॥"

সারা বিশ্ব তখন সে দেখে প্রেমের রঙে অনুরঞ্জিত। প্রেম—প্রেম—প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই সারা বিশ্বে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই প্রেমে মাতোয়ারা হয়েই কালীমন্দিরে বিগ্রহকে ভোগ না নিবেদন করে বেড়ালকে খাইয়েছেন সে ভোগ। দৈবী ভক্তির এই মত্তাবস্থাই একমাত্র আমাদের ভবরোগ দূর করতে পারে। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তখনই লাভ হয় যখন উপাস্য-উপাসক এক হয়ে যায়, যখন এ পরমতত্ত্ব আর অজ্ঞাত থাকে না যে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক; ভক্ত, ভগবান, ভাগবত এক।

"ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্যন্ত যায়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

[অংশতঃ ইংরেজী হইতে অনুদিত]

নিউ ইয়র্ক
62 West 71st Street
২৮শে জানুয়ারী ১৯০৭

ভাই শশী,

বহু দিন তোমার পত্রাদি না পাইয়া ভাবিত আছি, তুমি কেমন আছ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। বসন্তের মুখে শুনিলাম যে, তুমি ৺রামেশ্বর-দর্শনে গিয়াছিলে বাবুরাম ও তাহার মাকে লইয়া। আশা করি নির্বিঘ্নে ৺রামেশ্বর দর্শন করিয়া মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিয়াছ। তোমার কার্য কিরূপ চলিতেছে এবং খগেন কেমন আছে তাহাও লিখিবে।

বসন্ত[১] আমার সঙ্গে ইংলণ্ড হইযা এখানে আসিয়াছে ও ভাল আছে। গতকল্য সে তাহার প্রথম বক্তৃতা দিয়াছিল। উহা চমৎকার উৎরাইযাছে। বিষয় ছিল আত্মসংযম। সকলেরই বসন্তের কথা ভাল লাগিয়াছে। গত সপ্তাহে আমি পিট্সবার্গে একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে বসন্ত এখানকার ক্লাসের ভার লইয়াছিল। হরিপদকে[২] পিট্সবার্গে রাখিয়া আসিয়াছি।

*   *   *   *

বসন্ত অতি খাসা ছেলে। এই আটমাস তাহাকে দেখিলাম, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। তাহার ভিতরকার যে সব সদ্‌গুণ আছে সেগুলি বিকাশের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বাস্তবিকই উহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। হাজার হউক তোমাদের হাতের বানান চরিত্র। তোমার শক্তি কি বিফল হবার? *   *   * তুমি ভাই আমার প্রতি দয়া রেখো। ওখানে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য স্থানের বন্ধুদের আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইও। মহীশূরের দেওয়ান ও ডাক্তার পালপুকে কি চিঠি দিয়াছ? উভয়কে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিও। আমি নানাকাজে ব্যস্ত রহিয়াছি। আমাদের সোসাইটির স্থায়ী বাড়ী শীঘ্রই হইবে। আমি একটি নূতন বিষয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছি। সঙ্গের কাগজটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ—ইতি

দাস
অভেদানন্দ

পুনশ্চ ঃ—

খগেনকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা দিও। বাবুরাম ও মঠের অন্যান্য ভাইদেরও।

১ স্বামী পরমানন্দ
২ স্বামী বোধানন্দ

(২)

[ইংরেজী হইতে অনুদিত]

নিউ ইয়র্ক
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭

ভাই শশী,

তোমার সহৃদয় ও স্নেহমাখা চিঠিটি এইমাত্র পেলাম। এ জন্যে বহুৎ ধন্যবাদ। পত্রটি ২৪শে জানুয়ারী তারিখের। তুমি লিখেছ যে আমার ভারতবর্ষ থেকে রওনা হওয়ার পরে আমায় চিঠি দিয়েছিলে। সে চিঠি তো আমার হস্তগত হয় নি।

বসন্ত আমার ক্লাশগুলোর ভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে। সে ছোট খাট সভায় বক্তৃতা দিচ্ছে

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

এবং এখানে আমাদের কাজের বেশ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। * * মায়লাপুরে শীঘ্রই মঠ তৈরী হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ওখানে তোমার বন্ধুবর্গের যার যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

বসন্ত আমাদের ভ্রমণের একটি বিবরণী লিখছে। শেষ হয়ে গেলে সংশোধনের জন্য তোমার কাছে পাঠাবার ইচ্ছা আছে। তোমার নিজের চোখে দেখা বিষয়গুলির বর্ণনা যদি তুমি লেখ তা হলে আরও অনেক ভাল হবে। তারিখগুলোর জন্য ভেবো না। সাধারণ ভাবে স্থান, অভ্যর্থনা এবং লোকের উৎসাহাদির বিষয় বর্ণনা করে যাবে। তারিখ সহ সমস্ত স্বাগত অভিনন্দনগুলি আমাদের এখানে রয়েছে। ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, কুম্ভকোণম্ কাড্ডালোর, বন্যাবাড়ী এবং ধর্মপুরীতে প্রদত্ত আমার ভাষণগুলি যা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিলো ওদের কেটে আমাকে পাঠাতে পার কি? কলোম্বোয় আমাদের বন্ধুদের একটু জিজ্ঞাসা করে দেখো যে জাফ্না, কাণ্ডী এবং সিংহলের অন্যান্য জায়গায় আমি যে সকল বক্তৃতা দিয়েছিলাম তা আমাকে পাঠাতে পারবে কি না? ওরা ছোট কোন বই ছাপিয়েছে কি? * *

আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। ভালবাসা ও নমস্কার গ্রহণ করো।

ইতি দাস
অভেদানন্দ

(৩)

London
May 30th, 1908

ভাই শশী,

তোমার ভালবাসাপূর্ণ পত্রগুলি যথাসময়ে পাইয়াছি এবং অদ্য তোমার "The Universe of Man" নামক পুস্তকখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। The Message of Ramakrishna Chapter (রামকৃষ্ণের বাণী—এই অধ্যায়)টি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার বক্তৃতাগুলি যেমন সরল তেমনি সুপাঠ্য। অধিক আর কি বলিব, পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

এখানে প্রায় ৪ মাস ধরিয়া কার্য করিতেছি। Vedanta Society of London (লণ্ডন বেদান্ত সমিতি) খোলা হইয়াছে। শীঘ্রই উহার Head quarters স্থাপিত হইবে এবং জুন মাসে একটি বড় হল-এ Public Sunday Lectures (সর্বসাধারণের জন্যে প্রতি রবিবারের বক্তৃতা) দিব স্থির হইয়াছে। নিউইয়র্কের কার্য বেশ চলিতেছে। বসন্ত আর সেরূপ ছেলেমানুষ নাই; বেশ কাজের লোক হইয়াছে। তুমি তাহার জন্য কিছুই ভাবিও না। সে এত কার্যক্ষম হইয়াছে যে নিউইয়র্ক সোসাইটির কার্য করিয়া ক্লান্ত হওয়া দূরে থাকুক Mont Clair-এ একটি Centre (কেন্দ্র) খুলিয়াছে। সে একলা সমস্ত ভার লইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিল। তজ্জন্য তাহাকে রাখিয়া আমি এস্থানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। এখানে একজন উপযুক্ত লোক পাইলে তাহাকে এখানে বসাইয়া দিয়া Parisএ একটি Centre খুলি। এখানকার কার্য চালাইতে উপযুক্ত কেহ কি আমাদের মঠে আছে? যদি থাকে তাহা হইলে সত্বর আমাকে লিখিবে।

বসন্তকে এক্ষণে নিউইয়র্কে থাকিবার জন্য তুমি লিখিবে। সে তোমার কথা খুব মানে। * * * ভাল আছি। আশা করি তুমি স্বাস্থ্য ভোগ করিতেছ। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিও। ইতি

দাস
অভেদানন্দ

নিঃসঙ্গ যাত্রী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জীবনের পথে যতই আগাই যত হয় বোঝা ভারী,
সঙ্গীরা তত একে একে যায় ছাড়ি',
তফাৎ ঘটেছে কাহারো সঙ্গে জীবনাদর্শে ব্রতে,
যত দিন যায় কাহারো সহিত মিলে নাক আর মতে।
কেহ দ্রুত গতি আগাইয়া চলে কিছুতে ফিরে না চায়,
কেহ মন্থর, বহু অন্তর তার সাথে ঘটে' যায়।
বহু আশা ক'রে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তাবা ছাড়ে,
পথপাশে কেহ বটচ্ছায়ার মায়া না ছাড়িতে পারে।
সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল সুখের অংশী হ'য়ে
দুদিনে দিল ভঙ্গ তাহারা নানা ছলকথা ক'য়ে।
জীবনের পথে যতই আগাই তত ঘুচে অবসর,
বিচার করিতে ভুলে যাই পথে কেবা আত্মীয় পর।
ক্লান্ত চরণে যতই আগাই তত হই উদাসীন,
উদাসীনে ছেড়ে সবে চলে দূরে ক্রমে তাই সাথীহীন।
জীবনের পথে একলা এখন চলি,
আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নাই সাথে বলি।
দিনত ফুরায় আঁধার ঘনায় পশ্চিমে ডুবে চাকী,
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী।
দেখি সাথে সাথে কেহ চলে নাক আজ নিয়ে হাতে আলো,
সাঁজের আঁধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো।
জীবনমরণ-সন্ধির পরপারে
অন্ধকারের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইব কারে?
জানি না সে পথে কোথা সীমা তাহা আঁধারে যায় কি চিনা?
জানি না সে পথে তারা জ্বলে কিনা খদ্যোতও জ্বলে কিনা।
জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্যময়,
রাজা বাদশারো দিগ্‌বিজয়ীরো একলা যাইতে হয়।
সাথীহারা হয়ে চলিতেছি পথ বলি'
ক্ষোভ নাই তাই গোধূলি ধূলায় একলাই পথ চলি।

আমি কে?

(শ্রীরমণ মহর্ষির উপদেশালোকে)

'দাদু'

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্‌মনসগোচরম্।

আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে॥

"যিনি অবিভাজ্য সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ যাঁহাতে অবস্থিত, সেই বাক্য ও মনের অগোচর পরমাত্মাকে আমি আশ্রয় করিতেছি।"

মহর্ষি শ্রীরমণের পদপ্রান্তে বসিয়া 'আমি কে'—এই জিজ্ঞাসা বা আত্মতত্ত্বের কথা যাহা শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি।

অনাদিকাল হইতে ভারতবক্ষে—মাভৈঃ মাভৈঃ অভয়বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। বেদ ও উপনিষৎসকল একবাক্যে বলিতেছেন, হে অমৃতের সন্তানগণ! ভয় নাই, দুঃস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াও।

"মরণের রোলে পড়ি, কেন তুমি বীর!
মাখি হুতাশের ছায়া
ব্যাপিয়া সমগ্র কায়া—
কেন এত যাতনা অধীর?
কেন পাষাণের ভার—
বুকে চাপা অনিবার—
কেন এত বিষাদ প্রবীর!
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্
আমার আনন্দভেরী ওম্ ওম্ ওম্॥"

ভয়ই পাপ, ভয়ই দুঃখ, ভয়ই অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয়ই মৃত্যু। তোমার অভাবের রোদন, ভয়ের কম্পন, দৈন্যের হাহাকার—শুধু তোমার স্বরূপজ্ঞানের অভাব হইতেই। তুমি তোমার 'আমি কে' জান না বলিয়াই। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সূচনায় অর্জুন যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ামোহে ভীত ও দুঃস্বপ্নে পীড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার সত্যস্বরূপ দেখাইয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আত্মবিস্মৃতিই সকল দুঃখ ও ভয়ের কারণ। উহাই মৃত্যু। এই পুণ্যভূমির মহামানবেরা, ঋষিরা, শাস্ত্র ও দর্শনসকল, পুনঃ পুনঃ একবাক্যে বলিয়াছেন —তুমি তোমার 'আমিকে' জান। নিজেকে, সবচেয়ে আপন যে—তাহাকে চেন। তোমার অন্তরে যিনি নিত্য জাগ্রত সেই চেতনাময় পুরুষই তোমার আত্মা। তিনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম—তোমার 'আমি'। সেই আমিকে জানিলে সব জানার অবসান হয়, তখন আর 'তুমি-আমি' এই ভেদ থাকে না—দুইটি ভাঙ্গিয়া হয় জগৎজোড়া একটি আমি। তাই সাধক গাহিয়াছেন—

"আপন চিন্‌বে যেদিন
বিশ্ব সেদিন
আপন হয়ে যাবে।"

তোমার আজিকার এই জীববোধের খোসাটি তখন আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। তুমি ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া অভয়ের বুকে এসে দাঁড়াইবার অধিকার পাইবে। মুক্ত হইয়া পরমানন্দে ভাসিবে। সকল অভাব, ভয় ও দুঃখের অবসান হইবে। ভয়ের অবসানেই হয় প্রকৃত জীবন আরম্ভ।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো
ভোক্তা কর্তা ন বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদা সাক্ষী
নিরপেক্ষঃ সুখং চর॥

"তুমি ত শরীর নহ, না তব শরীর
নহ কর্তা, নহ ভোক্তা, জেনো ইহা স্থির।

অসঙ্গ চৈতন্য সাক্ষী স্বরূপ তোমার
নিরপেক্ষ সদানন্দে করহ বিহার।"

মহামহিমময় ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব কঠোর তপস্যায় মানবজ্ঞানের পরিসীমায় উত্তীর্ণ লইয়া যে উপলব্ধ সত্যের সন্ধান ব্রহ্মসূত্রে দিয়াছেন তাহার মর্ম এই —"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।" ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ অলীক; জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এই মহাবাক্যে সদা মরণ-ভীত, দুঃস্বপ্ন-পীড়িত, মোহাচ্ছন্ন মানব পাইয়াছে তাহার অমরত্বের সন্ধান। তাই নামিয়াছে সত্যানুসন্ধিৎসু মানব সাধনসমরে, মুছিয়া ফেলিতে তাহার অজ্ঞানের শেষ রেখাটি। দেহে আত্মবুদ্ধি মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা হইলেও দেহাতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির পূর্বে তাহা সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। জগৎ মিথ্যা হইলেও আত্ম-দর্শন না হওয়া পর্যন্ত জগৎ ও জীব সত্য বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মদর্শন হইলে জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বলিয়া আর ধারণা হয় না। সেখানেই দ্বৈত-ভাবের অবসান হয়। ইহাই গুরুবাক্য ও বেদবাক্য।

যতদিন না সত্যের দিব্যালোক অন্তরে পাওয়া যায়,—ততদিন মানুষের মন বাহিরে, বিষয়ে, বিত্তে, ভোগে আনন্দ অন্বেষণ করে। নামরূপের মোহা-কর্ষণেই ছুটাছুটি করে। অভাব তার মেটে না, শুধু ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে ফিরিয়া আসে। এই ভাবে মন আত্মাকে ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ ভোগের তাড়নায় ছুটিয়া যায় মরীচিকাপানে।

পিপাসার নিবৃত্তি তাহার হয় না, অভাবের জ্বালায় শুধু সে দগ্ধ হয়। ইহাই জীববোধের অভিশাপ। এই জীববোধই মন। ভোগবাসনা, সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু আত্মধর্ম নয়, একথা মন কিছুতেই মানুষকে বুঝিতে দেয় না। বুঝিতে দিলে যে তার জগৎ-রচনার খেলা ভাঙিয়া যায়। অভ্যাসে সে গড়িয়া তুলিয়াছে—সংস্কারের প্রস্তরের উপর প্রস্তর সাজাইয়া—এক মনোরম দুর্গ। জীব তাহাতেই বন্দী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন—

"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"

সপ্তধাতু-নির্মিত এই স্থূল দেহ আমি নহি। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চ বিষয় এবং উহাদের পৃথক পৃথক গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও 'আমি' নহি। তেমনি বচন, গমন, গ্রহণ, বিসর্জন এবং প্রজনন এই পঞ্চবিধ কর্মের করণ—বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু ও উপস্থনামীয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ও 'আমি' নহি। আবার সর্ববিষয় ও সর্ববৃত্তিশূন্য বাসনামাত্রাবশেষ অজ্ঞানও 'আমি' নহি। আমি ইহা নহি, আমি উহা নহি, এই ভাবে সকল উপাধি বর্জন করিলে সববিলক্ষণ যাহা থাকে সেই জ্ঞানসত্তাই 'আমি'—যাহা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে নিরালম্ব সত্তা। আত্মবিস্মৃতি হইতেই আসে জগৎ-প্রতীতি, আবার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যায় মুছিয়া। যেমন ভ্রমবশে দড়িকে না দেখিতে পাইলে সর্প বোধ হয়, আর রজ্জুকে রজ্জু জ্ঞান করিলেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায়।

জীববোধই মন বা অজ্ঞানতা, মোহ ও বন্ধন। মনই আত্মদর্শনের পথের কণ্টক, অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া মানবজীবনকে মিথ্যাজ্ঞানে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ বিপর্যয়-জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। মনের এই চাতুরী বা খেলাই মায়ার ছলনা। পঞ্চভূতকে 'আমি' বলিয়া সেবা করাইয়া প্রতিনিয়ত মানুষকে প্রতারিত করিতেছে। প্রকৃত 'আমি'হারা জীব ভাসিয়া চলিয়াছে এক গহন আঁধারের অকূল পাথারে।

সীমাহীন সেই দুর্ভেদ্য মহা আঁধারে, ক্ষণে ক্ষণে তাহার আর্তনাদে, তাহার করুণ ক্রন্দনে, আকাশ বাতাস আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে! হায়! তুমি যে জান না, জীবনের 'পর জীবন লইয়া কেবলি

ছুটিয়া চলিয়াছ আলেয়ার পিছু পিছু। সেখানে সত্য নাই, আনন্দ নাই, শান্তি নাই। স্থূলত্বের মোহপাশ কাটিয়া ফিরিয়া এস নিজ বাসভূমে, নিজ অন্তরে। তুমি যে আনন্দ অন্বেষণ করিতেছ সে আনন্দ তোমার অন্তরেই, বাহিরের কোন বস্তুতে নয়, নামে, রূপে, রসে, গন্ধে বা স্পর্শেও নয়। অবাধ আনন্দ তোমার পূর্ণ স্বরূপ। ঋষিরা বলিয়াছেন, আনন্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মত্বই আমার স্বরূপ— আমার 'আমি'। এই 'আমি'কে জানিলে আর কিছুই জানিবার বা পাইবার অবশিষ্ট থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অজ্ঞানরাশি মুহূর্তে বিদূরিত হয়। আত্মপরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ গোলোক ধাঁধায় ঘুরিয়া মরে। তাহার কল্পনারচিত জগদ্‌দৃষ্টি দূর হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গে না, মোহ টুটে না। মন আত্মাকে পাইলেই সকল কামনা বাসনা শূন্য হইয়া মুক্তি পায়। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির পূর্ণনাশ হইলে মন আত্মারামকে পাইয়া তাহাতেই মিশিয়া অভিন্নত্ব-লাভ করে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাহার আর তখন থাকে না।

চাই সদ্‌গুরুর কৃপা। কৃপা ব্যতীত মুক্তির পথে চলা যায় না।...

"তত্ত্ববিদ্ গুরু যদি
করেন জ্ঞান দান
তবেই তো এই তত্ত্ব
হবে মূর্তিমান।"

যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে আশ্রিত, তাহাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তিনিই ভগ্ন হৃদয়ের ঘন তমসার পর্দা সরাইয়া আত্মজ্যোতি দেখাইয়া দেন।

শ্রীগুরু মহর্ষি রমণ বলেন ঈশ্বর, আত্মা ও গুরু— যথার্থ ভিন্ন নহেন। ব্যাঘ্রের কবলে পতিত শিকার যেমন কোন প্রকারেই ফিরিতে পারে না, তদ্রূপ- সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষে যাঁহারা পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন কালেই পরিত্যক্ত হইবেন না। তাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় সত্যের সন্ধান পাইয়া দিনের পর দিন ঊর্ধ্বতম স্বরূপের পথে অগ্রসর হইবেন। চাই শুধু লক্ষ্যে ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সাধনা।

আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় নির্দেশ করিয়া শ্রীরমণ মহর্ষি বলিয়াছেন "মনোনাশ কর" —তবেই তুমি তোমার আমি কে জানিতে পারিবে। তোমার সকল অভাব পূর্ণত্বে অবসিত হইবে। মৃত্যু অমৃতময় হইবে। ভয় চিরতরে মুছিয়া যাইবে। তখনি বুঝিবে তুমি—তোমার 'আমি'—নিত্যশুদ্ধ, চিরমুক্ত, বুদ্ধ, নির্বিকার, নির্বিকল্পস্বরূপ।

মহর্ষি শ্রীরমণ-বিরচিত উপদেশসার পুস্তিকার ২০নং শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—

অহমি-নাশ ভাজ্যহমহং তয়া।
স্ফুরতি হৃৎস্বয়ং পরমপূর্ণসৎ॥

মনোবৃত্তি-মূল অহংকারের বিনাশে।
পূর্ণসত্য আমি, আমি হৃদয়েতে ভাসে॥

মনোবৃত্তির মূলে যে অহংকার, বা জীবত্বের বোধ, উহা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইলে পূর্ণসত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ 'আমি' হৃদয়েতে প্রকাশিত হয়। এই অস্মিতা-বোধ, বা আমিময় জ্ঞান বা প্রকাশ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুখময়। এই বোধ সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বরূপে স্থিতি বলা হয়। মহর্ষি পুনরায় রমণগীতায় ঐ কথাই বলিতেছেন।

হৃদয়কুহরমধ্যে কেবলং ব্রহ্মমাত্রম্
অহম্ অহম্ ইতি সাক্ষাৎ আত্মরূপেণ ভাতি।
হৃদি-বিশ-মনসা স্বং চিন্বতা, মজ্জতা বা
পবন চলন রোধাত্মানিষ্ঠো ভব ত্বম্॥

অর্থাৎ হৃদয়াকাশের গুহামধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিত। যিনি কেবল 'আমি, আমি' আত্মরূপে প্রকাশিত। হৃদয়ের অতলতলে শ্বাস, প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ডুব দিলে মহাবিজ্ঞানময় সত্তায় পৌঁছিয়া স্থিতিলাভ সম্ভব হয়।

মনোগত অহং—যাহা উপাধি দ্বারা আবৃত—

আমি রূপে উদিত হয় তাহার পূর্ণনাশেই আত্মস্বরূপ চিৎ বা জ্ঞানময় 'আমি'র প্রকাশ। মহর্ষি শ্রীরমণ বলেন, মন আত্মস্বরূপে অবস্থিত এক আশ্চর্য শক্তি—যাহার প্রভাবে এক সত্তা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ-রূপী ত্রয়ীর ঘটে আবির্ভাব। সুষুপ্তির মাঝে এই তিনটি বিভিন্ন বস্তু একাকার হইয়া যায়। মনই দৃশ্য জগতের মূলবীজ বা আত্মাশক্তি। উহাই সকল বৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। চিন্তার সমষ্টিই মন; উহাই আমিরূপে দেহে উদিত হয়। এই মনোগত আমিই বিত্তা, বুদ্ধি, বিত্ত, অহংকার, কর্ম, কল্পনা, বাসনা, প্রকৃতি, মায়া ও ক্রিয়া। সকলই একমাত্র মন। শব্দবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তবে বুঝিলাম, মনই অদ্বয় চৈতন্যসত্তাকে অবলম্বন করিয়া নানা উপাধির পরিচ্ছেদে আবৃত হইয়া বহুরূপে বহুভাবে সাজিয়াছে। (ইংরেজীতে যাহাকে Self-consciousness, Individuality, Ego, Personality ইত্যাদি বলা হয়) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মহামুনি বশিষ্ঠদেব ঐ কথাই বলিতেছেন। মনই সকল বস্তু, কল্পনার আধার। মনই আত্মার ভোগায়তন—বা প্রথম শরীর। মহর্ষিও বলেন চিন্তাসমষ্টিই মনরূপে প্রতীত হয়। অহংবৃত্তিই মূল ও প্রথম বৃত্তি। উহার উদয় হইলে পশ্চাতে আর সব চিন্তার উদয় হয়।

উত্তম পুরুষ 'আমির' উদয় হইলে পরেই মধ্যম পুরুষ— 'তুমি' ও প্রথম পুরুষ 'সে'র স্ফুরণ হয়। উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকে না। মনই জগতের প্রথম অঙ্কুর। এই অঙ্কুরেই সব সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই বিচিত্র রঙ্গভূমির সৃজন কর্তা একমাত্র মনই। মন ভাবময়—যাহা ভাবা যায় তাহাই সংসাররূপে প্রতীত হয়। অতএব বৃত্তি বা চিন্তাই মনের স্বরূপ। চিন্তা ব্যতীত জগৎ বলিয়া অন্য কোন বস্তু নাই। সুষুপ্তিতে চিন্তা নাই, জগৎও নাই। জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিন্তা আছে, তাই জগৎও আছে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে সৃষ্টিসূত্র বাহির করিয়া পুনরায় উহা নিজেরই ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়; মনও তেমনি স্বস্থান হইতে জগৎ প্রতীতি বিস্তার করিয়া পুনরায় উহা আপনার মধ্যে গুটাইয়া লয়। মন আত্মস্বরূপ হইতে যখন বহির্গত হয়—তখন জগৎ 'প্রতিভাত' হয়। সুতরাং যখন জগৎ প্রকাশিত হয় তখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় না—যখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় তখন জগৎ প্রকাশিত হয় না। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার নাই। তেমনি যেখানে জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান নাই। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক। উভয়ের জন্য একাসন নহে।

"The self of matter and the self of spirit can never meet. One of the twins must disappear. There is no place for both."

যাহারা মনোনাশপ্রার্থী বা আত্মজ্ঞান-পিয়াসী, তাহারা বিচারের উদয়-কামনা করিবে। অবিদ্যারূপ মেঘ যতদিন না সম্পূর্ণরূপে জানা যায়, ততদিন আত্মদর্শন সম্ভব নয়। একমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই মনোনাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অন্য কোন তপস্যার আবশ্যক হয় না। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—হে রাম, তুমি বিবেকদ্বারা সঙ্কল্প উত্থাপন করিয়া বিশ্ববিকল্প মনকে জয় কর এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞান উদিত কর। মনের নাশই মহান অভ্যুদয় এবং মনের উদয়ই মহা অনর্থের মূল। অতএব তুমি মনের নাশ বিধানের জন্য যত্নবান হও। এই মনই মহারোগগ্রস্ত সংসার। মনই জগৎ বিস্তৃত করিয়াছে—সুতরাং মনের অভাবেই অদ্বয় পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন। "সঃ অয়ম্ অহম্"—শুদ্ধ চৈতন্যরূপ বস্তুটিই হইতেছি আমি—"অয়ম্ অহম্ ন" মায়া-কার্য বিশ্বরূপ বস্তুটি আমি নহি। তবেই বুঝিলাম মনোগত আমিরূপে যাহা উদিত হয় উহা সত্যিকার

আমি নহে—অজ্ঞানের আমি। সে আমি আত্মবিস্মৃত, ভোক্তা আমি—কল্পনার আমি,—মায়ার আমি,—পঞ্চভূতের আমি হইয়া দিশাহারা পথিকের ন্যায় অকারণ জন্মমৃত্যুর পথে কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত হইয়া ঘুরিতেছে—ইহাই অবিদ্যারূপী মনের খেলা। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে, মন জগতের সব কিছুই জানিতে বা পাইতে চাহে, কিন্তু চাহে না শুধু নিজেকে। কারণ নিজেকে জানিতে যাওয়া মানেই তাহার নাশ। শ্রীরমণমহর্ষি বলেন 'আমি কে ?' অর্থাৎ অহংবৃত্তিরূপ এই অহংকার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই আত্মবিচারই অন্য সকল চিন্তার লোপ করিয়া শবদাহক বংশদণ্ডের ন্যায় পরিণামে নিজেই লুপ্ত হয়।

প্রত্যেকটি চিন্তার উদয়কালেই 'ইহা উঠিয়াছে কাহার ?'—এইরূপে সাবধানে বিচার করিলে 'আমার'—এইরূপ বোধ হইবে। অতঃপর 'আমি কে'? এইরূপ বিচার করিলে মন নিজ উৎপত্তি-স্থান হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং উদিত চিন্তাও বিলয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অভ্যাসের ফলে দেহগত মনের বা জীবের—নিজ আশ্রয়স্থলে, অর্থাৎ জ্ঞানময় আত্মসত্তায় থাকার শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। হৃদয়ে বা আত্মসত্তায় অবস্থান করিলে নামরূপ জগৎ তিরোহিত হয়। মন বহির্মুখী হইলেই নাম-রূপের জগৎ ভাসিয়া উঠে। মনকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখার নাম অন্তর্মুখীনতা। এবম্বিধ রীতিতে মন হৃদয়ে স্থিতিলাভ করিলে, সকল বৃত্তির যাহা মূল সেই অহংভাব বা দেহগত আমি নিঃশেষে লোপ পাইলে নিত্য বর্তমান সদ্‌বস্তু আত্মগত আমিমাত্র প্রকাশিত থাকে। যে অবস্থায় অহংভাবের দেহের বা মনের আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও থাকে না—তাহাই স্বরূপে স্থিতি। বস্তুতঃ উহাকেই মৌন বলা হয়। এই মৌন স্থিতির অপর নাম জ্ঞানদৃষ্টি। আত্মস্বরূপ ত্যাগ না করাই জ্ঞান। উহাই আত্ম-সংস্থিতি।

তাহা হইলে মনোনাশের পর যাহা নিত্য বর্তমান থাকে সেই সদ্‌বস্তুই আমার 'আমি', আত্মা বা ব্রহ্মশব্দবাচ্য। আমার নিত্যজাগ্রত আমি-বোধই জ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার এই জ্ঞানের ভিতর দিয়াই 'আমি'র স্বতঃসিদ্ধস্ফূর্তি। এই আমিই জ্ঞানের কেন্দ্র বা আত্মস্বরূপ। 'আমি'ই সত্যস্য সত্যম্। ইহা অনুভবসিদ্ধ সত্য। এবিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মহর্ষি শ্রীরমণ তাই বার বার বলিয়াছেন, তুমি শুধু তোমার আমিকে জান, তবেই তোমার সব জানা ও পাওয়ার অবসান হইবে। আমরা সকলেই জানি যে আমার 'আমি' বা আত্মাই আমার পরমাত্মীয়। মানুষ বা জীবমাত্রেই ভালবাসে বা প্রিয়তম জ্ঞান করে আপনাকে। নিজেকে সে যত ভালবাসে, তত আর কোন কিছুকেই ভালবাসে না। এই চিরন্তন সত্য আমাদের না মানিয়া উপায় নাই। এই 'আমি'র বা আত্মতৃপ্তির জন্যই তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রাম। তাহারই ভোগের নৈবেদ্য সাজাইতে অহর্নিশ জীবের ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা। আমরা সহজেই দেখিতে পাই, মানুষের সকল কাজের পশ্চাতে রহিয়াছে একটা আত্মতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা, আনন্দলাভের এষণা। তাহার সকল কামনা-বাসনার লক্ষ্য রহিয়াছে ঐ একদিকেই। মানুষের প্রকৃত সত্তার স্বরূপটিই হইল আনন্দ। আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, বিষয়, নাম-যশ চাই ঐ আত্মতৃপ্তির জন্যই। সংসারে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই চাহে আনন্দ, শুধু আনন্দ। প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে কোন না কোন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। কেহ বা লইতেছে ধর্মের আশ্রয়, কেহ বা ছুটিতেছে বিষয়ভোগের পশ্চাতে। কিন্তু পন্থা যাহাই হউক উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ আনন্দলাভ।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীবনে, মানুষে মানুষে রহিয়াছে অনেক পার্থক্য, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় ঐ ব্যবধানের পশ্চাতে

সকলেরই অন্তরে রহিয়াছে আনন্দের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে চাহে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, নিত্যানন্দ, অখণ্ড আনন্দ, পূর্ণানন্দ—যে আনন্দে দুঃখের লেশমাত্রও নাই। বেদ ও উপনিষদের ঋষিরাও বলিয়াছেন—সেই কেবলানন্দই আমার 'আমি'র স্বরূপ। আমি সেই আনন্দ হইতেই জাত, সেই আনন্দেই আমার স্থিতি। আনন্দ অনুসন্ধানের সংগে ওতপ্রোত হইয়া আছে আত্মানুসন্ধান—কারণ আনন্দ চাওয়ার মানেই হইল আত্মবস্তুকে চাওয়া। আত্মবস্তু অমর। ইহাকে লাভ করিলে তবেই মানুষ সেই আনন্দকে লাভ করে—যাহার শেষ নাই।

"স্বরূপে আনন্দ মোর সিদ্ধ চিরদিন।
আনন্দ সাধিতে শ্রম করে বুদ্ধিহীন॥"

জীবের বুকে অর্থাৎ মনোগত 'আমি'র বুকে ফুটিয়া আছে স্বতই একটা অভাব, কারণ আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। সেই অভাবের মোহই তাহাকে লইয়া যায় বাহিরে, বিষয়ে আনন্দ অন্বেষণে। যাহার উপাদানই আনন্দ, যাহার স্বরূপই আনন্দ তাহাকে কি বাহিরের বস্তুতে অন্বেষণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে হয়? আনন্দ বিষয়ে জড়িত নাই। উহা যে জীবের অন্তরেই। যিনি অন্তরের অতল তলে ডুবিয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দে পৌছিয়া আনন্দময় হইয়াছেন।

ঋষিরা ও শাস্ত্র বলেন 'আমি'ই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। সচ্চিদানন্দ মানে—সৎ + চিৎ + আনন্দ। সৎ অর্থে সত্তা, থাকা—existence। আমি আছি ইহাতে ভুল নাই, সংশয় নাই। আমি রহিয়াছি, নিয়তই থাকিব। এই 'আছি'-বোধই সত্তা। চিৎ—মানে চেতন, জ্ঞান বা জানা—knowledge। আমি যে আছি ইহা জানিতেছি। এই জানা বা আত্ম-অস্তিত্বের জ্ঞানই চিৎ বা চৈতন্য। জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় চৈতন্য-প্রভাবেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হইয়াছেন। আত্মা নিজেই জ্ঞান স্বরূপ হওয়ায়—নিজের জ্ঞানের বা প্রকাশের জন্য-জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি নিজের স্বরূপেই নিজে প্রকাশিত। যাহাদ্বারা সমস্ত জানা যায় সেই বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইতে পারে? সে স্বতঃস্ফূর্ত। ইহাই অনির্বচনীয় স্বয়ংপ্রকাশত্ব। সাধারণতঃ আমরা যে জ্ঞানকে অনুভব করি, উহা শুধু বিষয়প্রকাশরূপী জ্ঞান। কিন্তু তাহার স্বরূপকে জানি না।

মহর্ষি এখানে বলিতেছেন :—

"জ্ঞানবর্জিতাঽজ্ঞানহীনচিৎ।
জ্ঞানমস্তি কিং জ্ঞাতুমন্তরম্॥

অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানশূন্য এবং অজ্ঞানশূন্য চিৎই জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ। প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানে—জ্ঞানবিবর্জিতত্ব কিরূপে সম্ভব? তাই কারণ দেওয়া হইতেছে। জানিবার অন্য পৃথক বস্তু না থাকায় দ্বৈতবিবর্জিত জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে জ্ঞানশূন্য বলা হইয়াছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত। পারমার্থিক সত্তায় জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী-বিভাগ বস্তুতঃ নাই। উহা পাই শুধু অজ্ঞানেতেই। আলো অপরকে প্রকাশ করে,—কিন্তু প্রকাশ করা তাহার স্বরূপ নহে—তাহার স্বরূপ দীপ্তি। যিনি আপনি আপনাকে—আপনার দ্বারাই সদা জ্ঞাত, যে জানায় ক্রিয়াত্ব নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ তত্ত্বই পরমাত্মতত্ত্ব। আমি আছি, ইহা আমি জানি, ইহা আমাকে কাহারো জানাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হয় না। জানি আছি। তাহা হইলে সৎ (সত্তা বা থাকা), চিৎ (জ্ঞান, চৈতন্য বা জানা) উভয়ে অভিন্ন। আমি আছি, আমি জানি, এই যে জ্ঞানময় অস্তিত্ব-বোধে থাকা—অতি সুখময়—এই জ্ঞানই আনন্দ (Bliss) শুদ্ধ চৈতন্যময় বস্তুটিই 'আমি'। অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি ও থাকিব। কি আশ্চর্য এই—'আমি'! এই 'আমির' নাশ নাই, জরা নাই—মৃত্যু নাই—ভয় নাই, অভাব নাই—দুঃখ নাই। *দেহবিশিষ্ট হইয়াও নির্বিশেষ* ও গমনাগমনের অতীত হইয়াও বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া

বিরাজিত এই 'আমি'। তথাপি যে দুঃখবোধ হয়, উহা দ্বৈতমূলক। যাহা কিছু জানা হয় বা পাওয়া যায় সবই অসৎ। কারণ মনোগত আমিই জানে। যে জ্ঞানস্বরূপ তাহার আবার জানার কি থাকিতে পারে? অজ্ঞানাৎ ময়া উপাধিঃ কল্পিতঃ। মোহবশে আপনাতে দেহ, মন, প্রাণ, অহংকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া দুঃখ পাইতেছি। এই আমি চিন্মাত্রস্বরূপ, মায়া ও মায়ারচিত প্রপঞ্চ-জালের অতীত একমেবাদ্বিতীয়ম্। প্রতীয়মান জড়-সমূহ মিথ্যা, পারমার্থিক নহে।

"ইদম্ বিশ্বম্ ভ্রান্তিমাত্রম্"—এই বিশ্ব কেবল ভ্রান্তি দ্বারাই সিদ্ধ। দ্রষ্টা হইতে ইহার পৃথক সত্তা নাই। স্বপ্নরাজ্যে প্রাসাদ ও বিষয়াদি যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্ন থাকা কালীন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, আবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে উহাদের অসারতা প্রকাশ পায়—ইহাও তেমনি। স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখা ভিন্ন অন্য আর কিছুই নয়। আত্মস্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। সকল দুঃখই দ্বৈত-ভ্রান্তিজনিত, অহংকারজনিত, নানাত্বদর্শনের ফল। মহামুনি অষ্টাবক্র স্বক্তসংহিতার ১৬ শ্লোকে বলিতেছেন :—

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বং একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ॥

"তথাপি যে করি অহো দুঃখ অনুভব
আত্ম ভিন্ন বস্তু জ্ঞান আনে দুঃখ সব।
আমি বস্তু দুঃখ মূল মায়ার অতীত,
অদ্বৈত চিন্মাত্ররূপে চির প্রতিষ্ঠিত।
যাহা দৃশ্য তাহা মিথ্যা, শুধু এই জ্ঞান
অমোঘ করিতে মোর দুঃখ অবসান॥"

* * *

'আমি' পূর্ণ; 'আমি' কেবলানন্দস্বরূপ। সর্বাবস্থায়—এই 'আমি' অপরিবর্তনশীল। বাল্যের আমি, এই যুবক আমি হইয়াছে। এই যুবক আমিই *কৈশোর পরিত্যাগ করিয়া আবার বৃদ্ধ আমি* হইয়াছে। রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, দেহের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে বটে, কিন্তু আমার আমির পরিবর্তন হয় নাই, হইবেও না। 'আমি' নিত্য নির্বিকার। আমার আত্মগত 'আমি' বিকারগ্রস্ত হয় না। তাই আমি মন নহি, প্রাণ নহি, দেহ নহি, ভোগ্য বা ভোক্তাও নহি। ইহার একটিও আমি হইলে বলিতাম না আমার মন, আমার প্রাণ, আমার দেহ ইত্যাদি। আমির বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই। যেমন ছিল, তেমনই আছে ও থাকিবে। এই 'আমিই' এক স্বকীয় সৎস্বরূপে নিত্য জাগ্রত। কিন্তু জগতের যে কোন দৃশ্য পদার্থই অপরের সাহায্য লইয়া নিত্য অবস্থান করিতেছে। দৃশ্য-মাত্রই ত অন্যাশ্রিত। নিরালম্ব অবস্থানের সামর্থ্য নাই। একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'ই নিরালম্ব, স্বতঃস্বাধীন। এই জ্ঞানস্বরূপ 'আমি' কিছু হইতে জন্মায় না। যাহা জন্মায় তাহার নাশও আছে। 'আমি' অমর, অক্ষয়, অব্যয়। জ্ঞানস্বরূপ আমির নাশ নাই। এই আমিকেই ঋষিরা 'কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্' বলিয়াছেন। কেবল জ্ঞানস্বরূপ 'আমি'। কারণ আমিই আমার অস্তিত্বের জ্ঞাতা। অতএব জ্ঞানই আমার একমাত্র স্বরূপ। আমি আছি ইহাই সৎ (Existence), আর আমি যে আছি এই জ্ঞানই প্রকাশ বা চিৎ (Knowledge of Existence), যে জানার কোন হেতু নাই, অবলম্বন নাই, উহাই চিৎ। নিজ বোধস্বরূপ স্বপ্রকাশই চিৎ। তবে বুঝিলাম, সৎ + চিৎ (সত্তা + চৈতন্য) আমার নিত্যস্বরূপ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। এই নিত্য স্বরূপই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তাই আনন্দময়। 'আমি' যে আছি এই জ্ঞান বা চৈতন্যই আনন্দ। আমার এই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে দুঃখের লেশমাত্রও নাই বলিয়া—'আমি' সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ - তাহা হইলে 'আমি'-ই কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্। মহর্ষি শ্রীরমণ উপদেশসার পুস্তিকার নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে বলিতেছেন :

কিং স্বরূপ মিথ্যাত্ম দর্শনে।
অব্যয়াহ ভবাহ-হ পূর্ণচিৎ সুখম্॥
স্বরূপ-সন্ধানে যদি আত্মদৃষ্টি হয়
পূর্ণ চিদানন্দ তাহা অজ ও অব্যয়॥

নিজের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অখণ্ড, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবিনাশী,—অকৃত্রিম, অনুপাদেয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়।

বন্ধমুক্ত্যতীতং পরমসুখম্।
বিন্দতীহ জীবস্তু দৈবিকঃ॥
মুক্তি বন্ধনাতীত এই চিদানন্দরূপ।
জীব যথা লভিছেন ঈশ্বর স্বরূপ॥

স্বরূপতঃ আমি বদ্ধ নহি; আমার মোক্ষও নাই, কেননা আমি নিত্য চিদ্রূপ। মনোগত 'আমি' বা অজ্ঞানের 'আমি' বিচিত্র বিশ্ব রচিয়া প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে। শুধু চিন্মাত্র 'আমি' তে বিশ্ব নাই, নাম নাই, রূপ নাই—ছিল না বা থাকিবে না। অদ্বৈত চৈতন্যে স্থিতিলাভ করিলেই জগদ্ভ্রম—নিরস্ত হইয়া যায়। জীববোধই বন্ধন—মুক্তিসাপেক্ষ। কোন দিন কোন কালেই এই আমির বন্ধন ছিল না; আজও নাই। কোন দিন হওয়াও সম্ভব নয়। অসীমকে সীমায় আনা যায় না। তাহাকে বাঁধা যায় না। একমাত্র মনেরই বন্ধন ও মুক্তি সম্ভব। "Thought of liberation is bound with the sense of bondage."

মুক্তিচিন্তায় বন্ধনচিন্তা জড়িত। ইহাও সংস্কারের বা মনেরই খেলা ছাড়া যে আর কিছুই নয়। মহামুনি অষ্টাবক্র সূক্ত-সংহিতায় বলিতেছেন :

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বন্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥
"মানিলে আপনে মুক্ত মুক্ত হয় নর,
জানিলে আপনে বদ্ধ বদ্ধ নিরন্তর।
লৌকিক প্রবাদ জেনো, সত্যি অতি'
যার যথা হয় মতি তার তথা গতি॥"

যিনি আপনাকে মুক্ত মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্ত; আর যিনি আপনাকে বদ্ধ মনে করেন তিনি বদ্ধই। প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যার যেমন মতি তার তেমন গতি। ইহা মিথ্যা নহে। বন্ধ, মোক্ষ—বস্তুতঃ মনেরই বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়। কারণ বন্ধপ্রত্যয়ের বিলোপ ও মোক্ষ-প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা বিচারবুদ্ধি দ্বারাই সাধিত হয়।

স্বরূপে বন্ধনমুক্তি কিছুই নাই; উহা সর্বা-বস্থাতীত চিৎ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ। পূর্ণ জ্ঞানী সদাই সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন।

অহমপেতকং নিজ বিভানকম্।
মহদিদং তপো রমণবাগিয়ম্॥

অনাত্মারূপ মনোমূল অহংকার বিনষ্ট হইলে যে আত্ম-স্বরূপের প্রকাশ তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। নিত্য আত্মস্ফুরণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন তপস্যা নাই, ইহাই শ্রীরমণ বলেন।

শাস্ত্রে আর তীর্থে তার না মেলে সন্ধান
তারে শুধু পাওয়া যায় হ'লে আত্মজ্ঞান
সে যে 'আমি' ছাড়া নাহি কিছু আর
একমাত্র সত্য 'আমি' সর্বসারাৎসার॥

"জগৎ এই মহান্ আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারসকল দূর হউক। দুর্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে থাক—ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি শুদ্ধস্বরূপ—উঠ, জাগরিত হও। হে মহান্, এই নিদ্রা তোমায় সাজে না। উঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে দুর্বল ও দুঃখী মনে করিতেছ? হে সর্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাণী

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়, এম্-এ

মানুষের তরে রেখে গেল যারা কিছু নয় শুধু আঁখিজল,
হৃদয়ের কথা ভাষায় ফোটেনি মরিল ব্যথায় অবিরল ;
জীবনের বুকে ছিন্ন পাত্র ধরিয়া
মরণের কোল দিল অমৃতে ভরিয়া
লক্ষ আঘাত বেদনায় তবু করেনিক কোন কোলাহল,
তাহাদের সেই বাণী হোক আমাদের চির সম্বল।

সংসার মাঝে সবাই যখন অভিশাপ দিল বিধাতায়,
সমূহ সৃষ্টি ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার অরাজকতায়,
তখনো যাহারা বিশ্বাস লয়ে হৃদয়ে
নীরব হাসিতে জেগে ছিল সারা নিশি এ
তখনো যাদের অটুট শ্রদ্ধা রহে মঙ্গল ক্ষমতায়,
মোরা চাই আজ তাহাদেব সেই নীরব বাণীর বারতাই ॥

জীবনের যত দুঃখ ও গ্লানি বিপুল দ্বন্দ্ব হাহাকার,
যারা দেখে গেল নয়ন ভরিয়া তবুও রহিল অবিকার ;
ভালো ও মন্দ নিল দুই হাতে সমানে
পাপ ও পুণ্যে টেনে নিল বিনা প্রমাণে
সবার লক্ষ দাবিরে ছাড়ায়ে উঠেছে প্রেমের দাবি যার,
আজিকে আমরা লইব সকলে বিশ্বপ্লাবী সে বাণী তার ॥

পুরী নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

স্বামী জগন্নাথানন্দ

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর যত উৎসব আছে, তন্মধ্যে রথযাত্রাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নরনারীরা আসিয়া রথে বিরাজিত প্রভুকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না,—হিন্দুদের এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অশেষ দুঃখকষ্ট

বরণ করিয়া দর্শনলালসায় আকুল প্রাণে তাঁহারা ছুটিয়া আসেন। রথযাত্রার সময় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

প্রভু ও ভৃত্য

কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই দেহ রথ, আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব, মন লাগাম, বুদ্ধি সারথি।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥"

যেমন দেহরথে বিরাজিত পরমাত্মাকে ভৃত্য-স্থানীয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে চালাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ জগতের নিয়ন্তা, জগতের পালক প্রভুকে রথে অবস্থিত আছেন জানিয়া রথের রজ্জু ধরিয়া সেবকেরা টানিয়া আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। পুরীতে অবস্থানকালে চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাবের উড়িয়া ভাষায় রচিত একটি গান করিতেন 'জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ"; পরিমুণ্ডা অর্থাৎ দীনতা প্রকাশ করা, নমস্কার ও প্রশংসা করা। জগবিমোহনকারী জগন্নাথ মহাপ্রভু যাইতেছেন। তাঁহাকে নমস্কাব ও নিজেদের আর্তি জানাইবার জন্য চল। এই গান সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের পার্ষদেরা সাত দলে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিতেন। এক এক দলে একজন করিয়া প্রধান গায়ক থাকিতেন; যথা অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস, সত্যরাজ খান ও হরিদাস। চৈতন্যমহাপ্রভু সকলের দলে যোগ দিয়া নৃত্য করিতেন, তাঁহার দেবদুর্লভ অপূর্ব উদ্দাম নৃত্য, গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ আজানুলম্বিত বাহুযুগল, গৌরকান্তি সকলের মন হরণ করিয়া নিত। পূর্বোক্ত গানটি করিয়া চৈতন্যদেব কখনও অন্তর্দশা, কখনও অন্তর্বাহ্যদশা, কখনও বা সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। পুনরায় একটু বাহ্যজ্ঞান আসিলে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। তাঁহার দেহের রোমাবলি কখনও কণ্টকিত হইত; কখনও তিনি প্রফুল্ল, কখনও বা কাষ্ঠের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন। জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলা তাঁহার মধ্যে সঞ্চার হইত। ভাবপূর্ণ অবস্থায় জজ···গগ · পরি···পরি ·· (জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ) ইহাই বলিতেন। সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। ঈশ্বরীয় প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে প্রেমঘন মূর্তিটি যেন তরঙ্গায়িত ও হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে হাড়মাংসের শরীর দর্শকেরা মনে করিতে পারিত না। নয়নপ্রাণহরণকারী অপূর্ব নৃত্য দর্শন করিয়া দর্শকেরা বুঝিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা পৃথিবীতে আছেন—না অন্য কোথাও আছেন। প্রভুর প্রেমের তরঙ্গে সেই সময় প্লাবিত হইয়া তাঁহারা দেশকাল ভুলিয়া যাইতেন। প্রভুর অবস্থানকালে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহিমা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার স্মৃতি পুরীর সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে।

এই রথযাত্রার সময় গোপীগীতা পাঠ করিবার কালে প্রতাপরুদ্রকে ভাবাবস্থায় মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। ওড়িশার রাজারা নিজেদেব জগন্নাথ-দেবের সেবক বলিয়া ভাবিতেন; প্রভুই এই রাজ্যের মালিক, আমরা তাঁহার ভৃত্যমাত্র এবং তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী। ভোগনিবেদনের পর জগন্নাথদেবকে রাজারা পানের ডিবা লইয়া দিতেন। যথাযথভাবে পূজা হইল কিনা, কোন ত্রুটি হইল কিনা, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব লইতেন।

ভোগ-নিবেদনের সময় দর্পণে প্রভুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইলে বুঝা যাইত কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইয়াছে। তজ্জন্য নাটমন্দিরাস্থিত গরুড়-স্তম্ভের নিকট রাজাকে হত্যা দিয়া থাকিতে হইত। স্বপ্নাদেশে প্রভু তাঁহাকে যেরূপ বলিতেন, তদনুযায়ী রাজা ব্যবস্থা করিতেন। কোন ভক্ত হয়ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছে, কেহ বা জগন্নাথদেবের ভক্তকে অপমান করিয়াছে, কোন ভক্ত হয়ত গ্রাসাচ্ছাদন

পাইতেছেন না—তজ্জন্য রাজাকে স্বপ্নাদেশের পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইত। কখনও কখনও প্রভু নিজে আপদবিপদ হইতে ভক্তকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাগ্রতদেবতার লীলা উৎকল-সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই প্রাচীন গল্পকথা লোকের মুখে গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। ওড়িয়া ভাষায় পদ্যে রচিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি' গ্রন্থ হইতে রঘু অরক্ষিতের একটি সংবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

ভক্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ ছিলেন মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণ মহাপাত্র, মাতার নাম কমলা। তাঁহাদের অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা প্রভুর ভক্ত ও অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মাতাপিতার মৃত্যুর পূর্বে এক ধনী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি অতি সুলক্ষণা ও সতীসাধ্বী/ নাম অন্নপূর্ণা।

ঐশ্বর্য নষ্ট ও মাতাপিতার মৃত্যু হওয়ায় রঘুনাথ অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে অন্নসংস্থান না থাকায় তাঁহাকে দরিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। এককালে যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, তিনি কোনমুখে সেই গ্রামেই ভিক্ষা করিবেন? রঘুনাথ দেশে না থাকিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, সেখানে তিনি নিত্য জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্তবস্তুতি করিতেন এবং সাধনভজনে অধিকাংশ সময় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। মঠে মঠে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেকালে সর্বসাধারণের জন্য মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল।

এদিকে কন্যার পিতামাতা ভাবিলেন, রঘু এখন পথের ভিখারী—তাঁহার কুলশীলের কোন মর্যাদা নাই। এরূপ অবস্থায় কোন বড়লোকের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করাই ভাল। মেয়েটি সুখে থাকিবে। বাসুদেব মহাপাত্র নামে সেইদেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সঙ্গেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইল। সতীসাধ্বী অন্নপূর্ণা ঐরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু, আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর, আমার পতি থাকিতে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। আমি আত্ম-হত্যা করিয়া জীবনের অবসান ঘটাইব"। তিনি আকুলকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—"হে প্রভু, আমার কাছে আমার পতিকে আনিয়া দাও, নচেৎ তাঁর কাছেই আমাকে লইয়া যাও।" সেই গ্রাম হইতে কয়েকজন নীলাচলে যাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন এবং স্বামীকে দিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন।

গ্রামের লোকেরা নীলাচলে আসিয়া অনেক খুঁজিয়া রঘুনাথের সন্ধান পাইলেন এবং তাঁহার হস্তে তাঁহারা পত্নীপ্রদত্ত পত্রখানিও অর্পণ করিলেন। দশদিন পরেই অন্নপূর্ণার পুনর্বিবাহ। পদব্রজে দেশে ফিরিতে হইলে একমাস লাগিবে। অথচ না গেলেও পত্নীর আত্মহত্যা-দোষ লাগিবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং কাতরকণ্ঠে স্বীয় মর্মবেদনা জানাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু, আমার কোন সহায় নাই, তুমিই আমার সর্বস্ব, একমাত্র সহায়, তোমার নাম বিপদমোচন" ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহদ্বারের নিকট ধরনা দিয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথদেব বেতাল নামক অনুচরকে রাত্রি থাকিতেই রঘু অরক্ষিতকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। বেতাল তদনুযায়ী প্রভাত হইবার পূর্বে তথায় তাঁহাকে পৌছাইয়া দিল। রঘু

অরক্ষিতের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা প্রভুর লীলা।

কন্যার পিতামাতা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কাঙাল জামাতা রঘুকে তাঁহাদের দ্বারের সম্মুখে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া মহা আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন। রঘুকে মারিয়া ফেলিলে কন্যা অন্যকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ভাবিয়া পিতামাতা বিষমিশ্রিত খাদ্য তাঁহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুকে সমস্ত অন্ন নিবেদন করিলেন। পত্নী তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। নিবেদিত অন্ন ফেলিয়া দিলে অপরাধ হইবে ভাবিয়া বিষমিশ্রিত সমস্ত প্রসাদ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। প্রাণবায়ু নির্গত হইলে রঘুনাথকে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। প্রচারিত হইল সর্পাঘাতে রঘু অরক্ষিতের মৃত্যু হইয়াছে। পতির নিধনের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় পতির সহগামিনী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

সতীর আর্তনাদে প্রভুর আসন টলিল—তিনি আসিয়া করস্পর্শে রঘু অরক্ষিতকে বাঁচাইলেন। পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে যাইবার পথে অন্য এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত যে রাজপুত্রের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তিনি সসৈন্যে আসিতেছেন জানিয়া পতি-পত্নী বিচলিত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহারা ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশে জগন্নাথ বলভদ্র সৈন্যসহ উপস্থিত হইয়া বিপদ হইতে ভক্তকে উদ্ধার করিলেন। এইরূপে সমস্ত দুঃখবিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উভয়ে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দেহান্তে এই দিব্যদম্পতী বাঞ্ছিতলোকে গমন করেন।

জগন্নাথদেবকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা ভক্তদের চরিত্র ও জাগ্রত দেবতার লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রথত্রয়

আমরা এখন রথযাত্রার প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা আরম্ভ হয়। জগন্নাথদেবের রথের চাকার সংখ্যা ষোল, বলভদ্রের রথের চাকা চৌদ্দ এবং সুভদ্রা দেবীর বার। যথাক্রমে রথত্রয়ের নাম নন্দিঘোষ, তালধ্বজ ও দর্পদলন। তিনটি রথ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। নন্দিঘোষের বর্ণ রক্ত ও পীত, তালধ্বজের নীল ও রক্ত, দর্পদলনের রক্ত ও কৃষ্ণ। শাস্ত্রানুসারে বিবিধ পতাকা ও বিবিধ কারুকার্যে রথত্রয় মণ্ডিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ-দেবের রথে গরুড়ধ্বজ, বলভদ্রের রথে লাঙ্গুলধ্বজ, সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকে। রথের বেদী হইতে জগন্নাথের রথের উচ্চতা তেইশ হাত, বলদেবের বাইশ হাত, সুভদ্রার রথের একুশ হাত। আষাঢ় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে রথগুলির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠার পর হইতে কোন জীবজন্তু, পক্ষী, মার্জার, এমন কি মনুষ্য পর্যন্ত রথের উপর যেন না বসে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

আষাঢ় শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়ার দিনে সেবকেরা প্রভাতে প্রভুকে অর্চনা করিয়া খিচুড়ি ভোগ দিয়া থাকে। তাহার পরে প্রার্থনার সুমধুর স্বর ভক্তকণ্ঠে জাগিয়া উঠে। প্রার্থনান্তে মহাপ্রভু রথে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন। ইহাকে 'পহন্তি বিজে' বলা হয়। 'পহন্তি বিজে' অর্থ—ধীরে ধীরে বসিয়া বসিয়া চলা। পহন্তির সময়ে বিবিধ বাদ্য, নানাবিধ মাঙ্গলিক সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। এই সময় প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। প্রথমে সুদর্শন চক্র, তাহার পরে বলরাম, তাহার পরে সুভদ্রা, শেষে জগন্নাথদেব রথে আসেন।

পহন্তি বিজে করিবার পূর্বে স্বয়ং রাজা ঝাড়ু হস্তে রথত্রয় ও পথ মার্জনা করেন।

এক কিংবদন্তী আছে ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তম-দেব (প্রতাপরুদ্রের পিতা) রথের সময় ঝাড়ু হস্তে মার্জনা করিয়া থাকেন শুনিয়া কাঞ্চি কাবেরীর রাজা ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং পূর্ব প্রস্তাবমত তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। সেজন্য পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে তিনি সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হন। রাজার প্রার্থনায় জগন্নাথদেব ও বলভদ্র সৈন্যসহ দুইটি অশ্বপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা পুরুষোত্তম জয়লাভ করিলেন।

জগন্নাথ, বলভদ্র সৈন্যবেশে নিজেদের রত্ন অঙ্গুরীয় বাঁধা দিয়া মানিক নাম্নী গোয়ালিনীর নিকট হইতে দই দুধ খাইয়াছিলেন। পরে সেই গোয়ালিনীর সঙ্গে রাজার দেখা হইলে রত্ন অঙ্গুরীয় দেখাইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে যে একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন, উহা মানিক পাটনা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ রথযাত্রার সময় প্রভুর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য পথের স্থানে স্থানে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং দর্পণে তাঁহাকে কর্পূরমিশ্রিত শীতল জলে অভিষিক্ত করা হয়।

অপরাহ্নে রথ টানা হয়। রথগুলি গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌছিবার পর মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত বেদিতে দেবতাদিগকে স্থাপন করা হয়। এখানে তাঁহারা থাকেন সাতদিন, বড় মন্দিরে থাকাকালীন যেরূপ ভোগরাগ দেওয়া হয়, সেইরূপ এখানেও হইয়া থাকে। এখানে মহাপ্রসাদও হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের নিকট ঠাকুররা সাতদিন থাকেন। গুণ্ডিচা মণ্ডপে দেবতারা গেলেও প্রতিদিন রথস্থ ধ্বজগুলির পূজা হয়। আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা দ্বারা রথের কোন ক্ষতি না হয়, সেইজন্য ভূতপ্রেতাদি ও দিক্‌পালদিগকে যথাবিধি বলি (পূজা) দেওয়া হয়।

অষ্টমীর দিন তিনটি রথকে দক্ষিণাভিমুখী করিয়া মাল্য, পতাকা ও চামর দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। নবমীতে সকালবেলা মন্দির হইতে ঠাকুরদের আনিয়া রথে স্থাপন করা হয়। সেইদিন রথ টানিয়া বড় মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট রথগুলি রাখা হয়। ঠাকুর আসিলেও সহজে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। লক্ষ্মীঠাকুরানী রাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বচনিকা আরম্ভ হয়, তারপর লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিলে ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ী

বড় মন্দিরের দেড় মাইল উত্তর দিকে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত। এই গুণ্ডিচা মন্দিরকে মহাবেদী, যজ্ঞমণ্ডপ, জন্মস্থান, জনকপুরী ও গুণ্ডিচা মণ্ডপ বলা হয়। প্রাচীন কালে ইন্দ্রদ্যুম্ন এইখানে নৃসিংহ-মূর্তি স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী, বেদী রচনা করিয়া উহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞমণ্ডপ এবং ঠাকুরদের এখানে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া জন্মস্থান বা জনকপুরী বলা হয়। স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল-খণ্ডে বর্ণিত আছে—

গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা।
অশ্বমেধসহস্রস্য মহাবেদী তবাভবৎ॥

আমি যেখানে পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেখানে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই গুণ্ডিচা-মণ্ডপে আমাকে লইয়া যাইবে, উহা আমার জন্মস্থান ও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। আমি সেখানে অনেকদিন অধিষ্ঠিত ছিলাম বলিয়া আমার ঐ স্থানের প্রতি অসীম প্রীতি রহিয়াছে।

মমোৎপত্তেশ্চ নিলয়ং প্রীতিকৃন্মম শাশ্বতম্।
বহুকালং স্থিতশ্চাহং মমাস্মিন্ প্রীতিরুত্তমা॥

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন গুড়িচা শব্দ দ্রাবিড় ভাষা হইতে আসিয়াছে। তেলেগুতে

গুড়িচার অর্থ কুটীর। আদিম অধিবাসীরা জগন্নাথ-দেবকে ঐদিন মন্দির হইতে বাহির করিয়া কুটীরে রাখিতেন বলিয়া কালক্রমে উহার গুণ্ডিচা নাম হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম গুণ্ডিচাদেবী ছিল, তদনুসারে গুণ্ডিচা হইতে পারে।

রথ-নির্মাণ-বিধি

প্রত্যেক বৎসর ঠাকুরদের রথ নূতন ভাবে নির্মাণ করা হইয়া থাকে। পূর্ব বৎসরের রথ ব্যবহার হয় না। উহা নিলাম হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে রাজা সংকল্প করিয়া আচার্য ও তিনজন সূত্রধরকে বরণ করিয়া থাকেন, অরণ্যে যেখানে ভাল কাঠ পাওয়া যায়, সেখানে পুরোহিত যাইয়া অরণ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া সুপ্র-শস্থ পাঠ ও ১০৮ আহুতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে ঘৃতের দাগ দেওয়া হয় এবং দিক্‌পাল ও ক্ষেত্রপালদের জন্য পৃথক পৃথক বলি দেওয়া হয়। বনস্পতির প্রীতির জন্য পায়সান্ন দ্বারা ১০০টি আহুতি দেওয়া হয়; তারপর আচার্য ভগবানকে স্মরণ করিয়া দাগদেওয়া বৃক্ষগুলিতে কুঠার দ্বারা আঘাত করেন। এইরূপে আচার্য সূত্রধরদের ছেদনকার্যে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক বৎসরের রথনির্মাণের পূর্বে যথোক্ত বিধি পালিত হয়।

নব-কলেবর

অবতার বা মহাপুরুষদের যেমন ভৌতিক দেহ জরাজীর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ অবতারমধ্যে পরি-গণিত জগন্নাথ প্রভু কলেবর-পরিবর্তন করেন। যে বৎসরে আষাঢ়ে মলমাস পড়ে, অর্থাৎ দুইটা আষাঢ় মাস হয় সেই বৎসরে ঠাকুর কলেবর-পরি-বর্তন করিয়া নূতন কলেবর ধারণ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই কলেবরপরিবর্তনপ্রথা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিশ্বাবসু-বংশীয় শবর জাতিরা জগন্নাথদেবকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিংবদন্তী আছে বহুপূর্বে প্রাচীন-কালে জৈনেরা এই মূর্তি পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শবরজাতিরা ছাড়াইয়া নিয়া আসে। তাঁহারা আনিয়া মূর্তির পরিবর্তন করিয়া নীলমাধব নাম দিয়া পূজা করেন। যে বৎসর মূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছিল, সেই বৎসর দুইটি আষাঢ় মাস পড়িয়াছিল, সেই মাসে তাহারা মূর্তি পরিবর্তন করিয়াছিল। উহা হইতেই নবকলেবর-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

দুইটি আসাঢ় মাসে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা ঘট পরিবর্তন করেন। ঠাকুরদের জীর্ণ কলেবর-গুলিকে মন্দিরের মধ্যে 'কুইলি বৈকুণ্ঠ' স্থানে প্রোথিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তীয় শবরেরা এই আষাঢ় মাসকে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। যখন ঠাকুরদের কলেবর প্রোথিত করা হয়, তখন হইতে 'দইতারা' (শবররাজ বিশ্বাবসুর কন্যা ফুলের বংশধর) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করেন। উহারাই প্রভুর জ্ঞাতি-কুটুম্ব। নয়দিন যথাবিধি তাঁহারা অশৌচ পালন করিয়া থাকেন।

বিগ্রহনির্মাণ যে কোন কাষ্ঠে হয় না। উহা নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত হয়। যেকোন নিম্ব-বৃক্ষে হয় না। বহু প্রকার বিধি আছে, কোন নির্জন স্থানে সাধুর আশ্রমে নিম্ববৃক্ষ থাকিবে। উহা কীটদষ্ট হইলে হইবে না। সেই বৃক্ষমূলে ধূপ ধুনা প্রত্যহ দেওয়া চাই। উহাতে একটি বিষধর সর্পের বাস থাকিবে। গাছের উপর কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। সে বৃক্ষের রং ধবল হইবে, শঙ্খের চিহ্ন থাকিবে এবং তাহাতে সাতটি শাখা থাকিবে।

এইরূপে বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনের প্রত্যেকের একটি লক্ষণযুক্ত নিম্ববৃক্ষের প্রয়োজন হয়। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত নিম্ববৃক্ষ সহজে পাওয়া যায় না। সেবকরা পুরী জেলার মধ্যে কাকটপুরস্থ সর্বমঙ্গলার নিকট হত্যা দিয়া থাকেন। কোন্

দিকে গেলে সেইরূপ বৃক্ষ পাওয়া যাইবে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন। তদনুসারে সেবকেরা উহার অন্বেষণে চলিয়া যান। সেই সেই নিম্ববৃক্ষের মূলে পূজা-অর্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তারপরে বৃক্ষ ছেদন করিয়া নূতন শকটে আনিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কুইলি বৈকুণ্ঠে দারু নিমিত হয়। জগন্নাথদেবের নাভিস্থলে যে কৌট আছে (আত্মারাম কৌট) উহা বাহির করিয়া নূতন দারুমূর্তির নাভিস্থলে রাখা হয়। যে লোকটি বাহির করে তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ভূতাবিষ্টের মত উহা আনিয়া নূতন কলেবরে স্থাপন করে। সে কৌটের মধ্যে কি আছে আজ পর্যন্ত কেহ দেখে নাই ; কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের দন্ত আছে।

রথযাত্রার ইতিবৃত্ত

রথ-শব্দের ব্যবহার বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। আর্য অনার্য উভয়ে এই রথ যে ব্যবহার করিতেন উহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের লোকেরা শোভাযাত্রার সহিত রথে চড়িয়া ভ্রমণ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতেন। দেবতারাও রথযান অতিশয় ভালবাসিতেন। কোন্ দেবতার কোন্ রথ দ্রুতগামী ও মনোহর উহাও স্থানে স্থানে বর্ণিত আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সূর্যদেব, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, কুবের, ইঁহারা সকলেই রথ ব্যবহার করিতেন। ইঁহাদের রথ অতি মনোহর ও অতি দ্রুতগামী ছিল। উপনিষদে ও সংহিতাভাগে ভূরি ভূরি রথের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জনসমাজে যা বিশেষ প্রচলিত ছিল, উহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণে রঘুবংশীয় রাজাদের, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভাস সম্ভবত পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের কবি, তিনিও তাঁহার স্বপ্নবাসবদত্ত-নামক নাটকে রথের বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার পরবর্তী কবি, এতদ্ব্যতীত সেকালে রোম ও গ্রীস-বাসীরা রথ ব্যবহার করিতেন। দশাশ্ববাহিত রথে চড়িয়া শোভাযাত্রা-সহকারে রাজা যাত্রা করিতেছেন। বর্ণনা আছে রথগুলি কাষ্ঠনির্মিত, কারুকার্যমণ্ডিত চাকাগুলি লোহার ও অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়া মুড়া থাকিত। যেগুলি যুদ্ধে ব্যবহার করা হইত সেগুলির চক্র সুতীক্ষ্ণ ছিল।

সর্বজন-আদৃত পবিত্র রথে লোকে তাহাদের অভীষ্ট দেবতাকে যে বহন করিয়া লইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? তাহা হইতে অনুমান করা যায় রথযাত্রা প্রাচীন কালেও ছিল।

নেপালে বৈশাখ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ভৈরব ও ভৈরবীর রথযাত্রা এবং বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে কুমারী রথযাত্রা প্রসিদ্ধ, জৈনদের মধ্যেও এই রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। পূর্বে উজ্জয়িনীতে জৈনেরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন তীর্থঙ্করকে রথে বসাইয়া নগর পরিভ্রমণ করাইতেন। অনেক বৌদ্ধক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের রথযাত্রা হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়ান ইহা দেখিয়াছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ান পাটলিপুত্রের রথযাত্রা-সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের মতে অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের পর সকলে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবররা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ত্রিরত্নের প্রতীক জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। জগন্নাথ—বুদ্ধ, বলভদ্র—সংঘ, সুভদ্রা—ধর্ম। জগন্নাথ-নামের মূলে বুদ্ধ আছেন। বৌদ্ধেরা ধর্মকে নারীমূর্তি বলিয়া অভিহিত করেন। ভাই-ভগিনীর মত সংঘের সম্পর্ক থাকায় বলভদ্র সংঘ। বৌদ্ধধর্মে যেমন জাতিভেদ নাই তেমনি জগন্নাথ-মহাপ্রসাদেও জাতিভেদ নাই। উহা যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হণ্টর সাহেব বলেন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বৌদ্ধদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দন্ত-উৎসবের নকল।

জাপানে ত্রিরত্নের রথযাত্রা প্রচলিত। ইহা উহার সাদৃশ্য বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ফর্গুসন সাহেব বলেন, বুদ্ধদেবের জন্ম ও নির্বাণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ; বৌদ্ধেরা ঐ দিনে বুদ্ধের দেহাবশেষ রথে রাখিয়া রথযাত্রা করিয়া থাকেন। ইহা উহারই অনুকরণ। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ঐরূপ মতপোষণ করেন। যাহা হউক, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের লীলা চলিতেছে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধন্য করিয়াছে, কত ধর্মশাস্ত্র ও কাব্য রচিত হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত ধর্মের উত্থান-পতন হইয়াছে। কত রাজার রাজ্যশাসন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পুনরায় লুপ্ত হইয়াছে, কত বড় বড় দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে উহার সমস্তই জগন্নাথদেব সাক্ষ্য দিতেছেন।

হে প্রভু, হে সাক্ষিন্, তুমি সকলের মঙ্গল কর, তুমি সকলকে ধর্মে মতি দাও।

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে—ইহাই প্রার্থনা।

ও তৎ সৎ।

বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরের গভীরে রয়েছে অমৃতের জন্যে পিপাসা, অনন্তের জন্যে কান্না। হাসির ছটা—সে তো বাহিরের। 'অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না ধন।' হাসি-ঠাট্টা, আমোদ প্রমোদ, নৃত্য-গীত, পান-ভোজন—সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়ে মানুষ নিঃশব্দে চলেছে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি হতাশাকে বহন ক'রে। এই প্রচ্ছন্ন বেদনার কথা কোন স্বামী বলে না তার স্ত্রীকে, কোন স্ত্রী বলে না তার স্বামীকে। বন্ধু বন্ধুর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে না তার নিঃসঙ্গ হৃদয়ের এই ব্যথাকে। সত্য সত্যই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাহিরের জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, মেনে চলেছে তার আইনকানুন। কায়দা-দুরস্ত তার মুখে লেগে আছে দেঁতো হাসি, তার পোষাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত, চায়ের টেবিলে সে হাস্যময়, জর্জেট সাড়ীতে আর রিবনে সুসজ্জিতা সে মনোহারিণী। দ্বিতীয় মানুষটি কিন্তু নিঃসঙ্গ এবং মৌনী। কামনার মৃত্যুজালে আবদ্ধ সে কাঁদছে মুক্তির জন্যে। সে বল্‌ছেঃ দরকার নেই আমার কিছুতে। আমার দরকার শুধু তাঁকে যিনি আমাকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, যা অধ্রুব তার মোহ থেকে যা ধ্রুব তারই শাশ্বত আনন্দের মধ্যে। মানুষের এই spiritual nature সকল সংশয়ের উর্ধ্বে।

ব্যথাতুর মানুষের কাছে এই চিরন্তন আনন্দ-লোকের বার্তা বহন ক'রে আনলেন রামকৃষ্ণ। পুরাকালের ঋষি অন্তরের মধ্যে জ্যোতির্ময় সেই পরমপুরুষকে দর্শন করে উল্লাসে ঘোষণা করেছেনঃ

'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো—অন্য পথ নাহি।

তপোবনের সেই ঋষির মতোই রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথকে বললেনঃ 'আমি ঈশ্বরদর্শন

করিয়াছি।' শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন: 'আমি তোমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিব।' উত্তরকালে স্বীয় জীবনের এই অমূল্য অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন:

> বালকবয়সে এ কলিকাতাশহরে আমি ধর্মান্বেষণে এখানে ওখানে ঘুরিতাম আর খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিবার পর বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? ঈশ্বরদর্শনের কথায় সে ব্যক্তি চমকিয়া উঠিত, আর একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছি।

ধর্ম বাহ্য অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম কোন মতবিশেষে বিশ্বাসও নয়। ধর্মের অর্থ প্রত্যক্ষানুভূতি। বিবেকানন্দের ভাষায় 'তাহাই ধর্ম যাহা আমাদিগকে সেই অক্ষর পুরুষের সাক্ষাৎকার করায়; আর এই ধর্ম সকলেরই জন্য।' ঈশ্বরলাভের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ধর্মশাস্ত্রের ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। যাঁরা সেই বর্ণনার সঙ্গে পরিচিত তেমন পণ্ডিতেরও অভাব নেই। কিন্তু সুদুর্লভ সেই পুরুষ যিনি অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার করেছেন, সর্বভূতে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন—রামকৃষ্ণ সেই সুদুর্লভ পুরুষদেরই অন্যতম। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ঠাকুর দুধ খেয়েছিলেন। কথামৃতের প্রত্যেক খণ্ডে এই দুধ খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আছে।

কি ক'রে তাঁকে দর্শন করা যায়? পাণ্ডিত্যের দ্বারা? বিচারের দ্বারা? ঠাকুর অকুণ্ঠভাষায় বললেন, তাঁকে পাণ্ডিত্যদ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না। বললেন, 'শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়।' আমাদের দেশের ঋষিরা অনেক আগেই বলেছিলেন: নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। অধিক বাক্যব্যয়ের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধিবলে বা অনেক শাস্ত্রপাঠের দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না।

কিন্তু ব্যাকুল হয়ে যাঁকে ডাকবো—তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর বললেন: বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তিনি আছেনই আছেন—এই জীবন্ত বিশ্বাস। এই যুগে—বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্যের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আর একজন বিরাট মানুষ বিশ্বাসকে দিলেন তার প্রাপ্য মর্যাদা। আমি প্রথিতযশা মার্কিন্ দার্শনিক উইলিয়াম জেম্‌সের (William James) কথা বলছি। জেম্‌সের The Will to Believe নামক যুগান্তকারী প্রবন্ধ বিংশশতাব্দীর দুনিয়াকে চলার পথে নূতন আলো দিয়েছে সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধে জেম্‌স্ বললেন: সত্যান্বেষণে বেরিয়েছে যারা তাদের দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে: সত্যে বিশ্বাস করো, আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। এ দুটোর মধ্যে আমরা সত্যান্বেষণকে প্রাধান্য দিতে পারি অথবা বলতে পারি: সত্য পাই আর না পাই ভুল করা কিছুতেই চলবে না। জেম্‌স্ বললেন: Better risk loss of truth than chance of error—অবিশ্বাসীর এই দৃষ্টিভঙ্গিমার মধ্যে আছে ভীরুমনের পরিচয়। বললেন, পাছে মিথ্যায় বিশ্বাস ক'রে ঠকি—এ ঠকার ভয় আমারও আছে। কিন্তু ঠকার চেয়েও বড়ো বিপদ পৃথিবীতে আছে। আমাদের ভুলগুলোকে এত ভয়াবহ ক'রে দেখবার দরকার কি? এ পৃথিবীতে যত সাবধানই আমরা হইনে কেন, ভুল করবোই। কোন সেনাপতি যদি তার বাহিনীকে বলে: আঘাতকে এড়িয়ে চলতেই হবে, তার জন্য যুদ্ধ থেকে যদি দূরে থাকতে হয় দূরে থাকতে হবে—তবে সেই সেনাপতিকে আমরা কি বলবো? বলবো: আঘাতের ভয়ে যুদ্ধকে যারা এড়িয়ে চলে তারা কখনও শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে না। বিপদকে যারা ভয় করে তারা প্রকৃতিকেও কি জয় করতে

পারে ? যারা বলছে বস্তুর অস্তিত্বের সঠিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পাদমেকং ন গচ্ছামি তারা কোন দিনই কোন বড় জিনিস আবিষ্কার করেনি ; তারা তীরে বসে শুধু লাভক্ষতির হিসাব কষেছে, আর ঠকেছে। যারা বলেছে 'ফাল্গুনীর' বাউলের ভাষায় 'আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি' তারাই যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে সত্যকে, ললাটে পরেছে জয়লক্ষ্মীর মালা। তাই জেমস্ বললেন ঃ ভুল করার ভয়কে এতখানি প্রাধান্য দেওয়ার চাইতে মনের খানিকটা বে-পরোয়াভাব ভালো।

কোন্ শাপে কোন গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙ্গায় থাকবো বসে'—

এইবলে যারা অজানা সমুদ্রে তরী ভাসালো একটা জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রেরণায় সেই বে-পরোয়া বে-হিসিবী কলম্বাসের দল আবিষ্কার করেছে নবনব সত্য। কলম্বাসের সামনে সেদিন ছিল কূলহীন পথহীন মহাসিন্ধুর ফেনিল ঊর্মিরাশি। জলপথে ঈপ্সিত দেশে পৌছানো যাবে—এমন কোন objective evidence ছিল না কলম্বাসের সামনে। কলম্বাস কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষায় তীরে বসে থাকলেন না। তিনি যদি ভাবতে বসতেন ভাবনার কূল-কিনারা পেতেন না। ভাবতে ভাবতেই তাঁর জীবন কেটে যেতো। ভিতর থেকে কে যেন বললে, বেরিয়ে পড় অজানা পথে আর সেই অন্তরের ডাক শুনে কলম্বাস বেরিয়ে পড়লেন। সর্বনাশের আশঙ্কা ষোলো আনা ছিল—কিন্তু সে আশঙ্কায় তিনি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন না। বিশ্বাস ক'রে অজানার বুকে ঝাঁপ দিয়ে ঠকার ভয় নিশ্চয়ই আছে ; জাহাজ খোয়ানোর, প্রাণ খোয়ানোর, সর্বস্ব খোয়ানোর ভয়। কিন্তু অজানাকে অবিশ্বাস ক'রে, ভয় ক'রে ঠকার আশঙ্কাও কি নেই ? জেমস্ বললেন, Dupery for dupery, what proof is there that dupery through hope is so much worse than dupery through fear ? অবিশ্বাস ক'রে ঠকা আর আশা ক'রে ঠকা, এ দুয়ের মধ্যে আশা ক'রে ঠকার বিড়ম্বনা যে বেশী—এর প্রমাণ কোথায় ? যাকে বিয়ে করে ঘরে আনবো সে গৃহলক্ষ্মী হবেই—এ নিশ্চয়তা ভিন্ন যে বিয়ে করতে রাজী নয় তার আইবুড়ো নাম ঘুচবার নয়।

ঈশ্বর আছেন—বাইরে এর কোন প্রমাণ নেই। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। তিনি আছেনই—এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁর দিকে চলতে হবে। প্রমাণ না পেলে তাঁর দিকে যাবো না—একথা বললে তাঁর আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। ঈশ্বরকে খুঁজতে যারা বেরিয়েছে তারা ডুবে থাকেনি পুঁথির মধ্যে, মেতে থাকেনি কামিনীকাঞ্চন নিয়ে। তারা সব পাওয়ার জন্যে সব ছেড়ে বেরিয়েছে মুক্ত পথের বুকে। তারা বলেছে—Sail forth—steer for the deep waters only. কূল আঁকড়ে থেকো না, অকূলে ভাসিয়ে দাও তোমার তরী।

ইংরেজী লেখাপড়া শিখে আমাদের মন যখন শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল, হারিয়ে ফেলছিল দেবদেবীতে বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধিকে দিচ্ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাধান্য, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এই সংশয়-দোলায় ক্রমাগত দুলছিল ঘড়ির দোলকের মত, তখন ঠাকুর বললেন ঃ বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। বললেন, 'তিনি সাকার কি কি নিরাকার সে কথা ভাববারই বা কি দরকার ? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল্লেই হয়,—'হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন তাই আমায় দেখিয়ে দাও ! তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।' বললেন মাষ্টার এবং তাঁর সগোত্রদের ব্যঙ্গ ক'রে ঃ 'শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যান্‌রা মানে না।' ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ক'রে যারা

বলছিল প্রতিমা-পূজা ক'রেই দেশটা জাহান্নামে গেল, ঠাকুর তাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী তৎকালীন ইংরেজী লেখাপড়া-জানা যুবকেরা দেখ্‌লে এক ন্যাংটা ব্রাহ্মণ। ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় নেই বল্‌লে হয়। রসিকের চূড়ামণি। আনন্দময় পুরুষ—শুট্‌কে সাধু নয়। মুখে হাসি লেগেই আছে। নম্র, নির্মল, সরলতার প্রতিমূর্তি। বৃন্দাবনে থেকে যাচ্ছিলেন; মা কাঁদবে, তাই সেজোবাবুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। করুণায় মন কত নরম! ন্যাংটা ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্বের অনির্বচনীয় আকর্ষণ কলেজে পড়া যুবকদের মনকে জয় ক'রে ফেললো। শ্রদ্ধাহীন মনে শ্রদ্ধা ফিরে এলো। 'সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্‌বে—তা হ'লে ভগবানের পূজা হয়।' ঠাকুরের একথায় নরেন্দ্র আগে বিশ্বাস করতে পারতো না। ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জাগলো। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন: 'নরেন্দ্র আগে মনের ভুল বলতো; এখন সব মানছে।' মেকলে এবং তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত পাদ্রীসাহেবেরা দেশময় স্কুলকলেজ খুলে ভেবেছিল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মারফতে দেশটাকে আস্তে আস্তে খ্রীষ্টান বানিয়ে দেবে। ঠাকুর এসে তাদের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিলেন। যুব-সমাজকে মেকলে ধরেছিল ঢোঁড়ায় যেমন ব্যাঙ ধরে। ঠাকুর ধরলেন যেমন ক'রে জাত সাপে ব্যাঙ ধরে। সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান তরুণ চিত্তগুলি নিঃসংশয় হয়ে গেল। ঘুচে গেল তাদের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার। সংসারবন্ধন তাদের কাটলো। সাকার-নিরাকারের বাদানুবাদে ঠাকুর কোন একটা বিশেষ পক্ষ নিলেন না। বললেন, একটাতে বিশ্বাস থাকলে হ'ল। জোর দিলেন বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপরে। বললেন, 'বিশ্বাস করো, সব হয়ে যাবে।' বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যে উইলিয়াম জেমসের যে অভিযান, প্রাচ্যে ঠাকুরেরও সেই ঐতিহাসিক অভিযান। এই অভিযানের দরকার ছিল সত্যান্বেষণের ব্যাপারে বিচারবুদ্ধির উদ্ধত দাবীকে একটা সীমার মধ্যে সংযত রাখবার জন্যে। এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল সত্য আবিষ্কারের ব্যাপারে বিশ্বাসের বিপুল প্রয়োজনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

কিন্তু ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পেলে হাঁড়ির মাছ যেন গঙ্গায় তলিয়ে যায়—এই জানাই তো সব নয়। 'সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আর আনন্দ হয়। তুমি খেলে না, কিছু করলে না। বসে বসে বলছো 'সিদ্ধি সিদ্ধি'! তা হলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয়? ঠাকুর বললেন সাধনের কথা। কাঠে অগ্নি আছে, আগুনে ভাত রাঁধা হয়—এই বিশ্বাস ও জ্ঞান ভাত তৈরীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাঠে কাঠে ঘসতে হয়; তবে আগুন বেরোয়। ঠাকুর বললেন পুরুষকার চাই, খুব রোখ চাই। মিছরির রুটী সিধে ক'রে খাবো, না আড় ক'রে খাবো—এই নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি বারণ করলেন। বললেন, যেমন করেই খাও মিষ্ট লাগবে। দরকার পথে চলা। দরকার সাধন।

এইখানে আসে ব্যাকুলতার কথা। ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে, ঈশ্বর-দর্শন হ'লে রমণ-সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। মগজের বুদ্ধির কাছে এ সবই সত্য। কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্যে প্রাণ দুলে ওঠে কৈ? সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে অন্তরের মধ্যে সে ব্যাকুলতা কই? ঈশ্বর না থাকলে, ঈশ্বরকে না পেলে প্রাণে বাঁচবো না—এ পাগলামি কই? ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হ'তে হয়।' তিনি বললেন, 'ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হোলো। তার পর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।' 'মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয়কে ভালোবাসে। এই তিন জনের ভালোবাসা,

এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শনলাভ হয়।' এই ভালোবাসা, এই টান, এই অনুরাগই হোলো সকলের বড়ো কথা। নারদীয়ভক্তি-স্বত্রে আছে—ওঁ তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্। ভক্তিরই সাধনা কর। মগজ দিয়ে কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা এমন কিছু কঠিন হয়। কিন্তু মগজের জ্ঞান প্রাণকে যদি দোলাতে না পারে, হৃদয়কে যদি নাচাতে না পারে—মানুষ জোর পাবে না ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবার। কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপে' কে কবে জীবনকে নিঃশেষে বলি দিতে পেরেছে সত্যের বেদীমূলে? কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী ঠিকই বলেছিলেন: 'বুদ্ধিবৃত্তি বিচারশক্তি খুব ভালো জিনিস হইতে পারে; কিন্তু উহা বেশীদূর যাইতে পারে না। ভাবের ভিতর দিয়াই গভীরতম রহস্যসম্পদ উদ্ঘাটিত হয়।' মীরাবেনকে চিঠিতে গান্ধীজী বল্লেন: Any truth received by the brain must immediately be sent down to the heart'

কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে মরিয়া হওয়া যায় কেমন ক'রে? সব পাওয়ার জন্যে সব হারাবার পাগলামিকে রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার উপায় কি? মনের মধ্যে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা জাগানোর পথ কোথায়? 'কামিনীকাঞ্চনের জন্যে পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তাঁর জন্য একটু পাগল হও।' হায়! ঈশ্বরের জন্যে এই পাগল হ'তে পারাটাই যে সব চেয়ে মুশকিল। আমাদের মূলব্যাধি তো বাতব্যাধি। আমরা spiritually rheumatic. আমাদের জড়তা আত্মার মজ্জায় মজ্জায়। আমরা তীরে তীরেই তরী বাইতে ভালোবাসি; অকূলের ডাকে তুফানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভরসা পাইনে। এ আড়ষ্টতা, এ আলস্য, এ আরামপ্রিয়তা—এদের জয় করবার উপায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে Imitation of Christ এর লেখক বললেন: 'ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরালে সমস্ত জড়তাকে পরিহার ক'রে নব জন্ম লাভ করা যায়। লোহা আগুনে পুড়লে তবে তার মরচে চলে যায়। ঈশ্বরচিন্তার আগুনের মধ্যে মন-লোহাকে ফেলতে হবে। তবে জড়তা যাবে, তবে জীবনে রূপান্তর আসবে।' ঠাকুর বললেন: অভ্যাসযোগ! রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। এক দিনে হয় না। রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে।'

ঈশ্বর-লাভের কোন সহজ পথ আমাদিগকে তিনি দেখিয়ে দেন নি। মন্দ বৈরাগ্য নয়, তীব্র বৈরাগ্যের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন চিত্তশুদ্ধির কথা, তিনি বলেছেন নির্জন বাসের কথা, তিনি বলেছেন কামিনীকাঞ্চন-রসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় না। ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকবো, নির্জনে তাঁকে ডাকবো না, কর্ম করবো না—এতে কখনো বস্তুলাভ হবে না। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। আর এই ব্যাকুলতার জন্যে প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি, বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তি। আর মন থেকে বিষয়রস শুকিয়ে ফেলবার উপায় নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা। মহিমাচরণকে ঠাকুর বলেছিলেন: 'ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো।' এই সাধনের কথাই আধ্যাত্মিকতার চরম কথা। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' শচীশের মুখ দিয়ে বলেছেন: 'আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁহাকে পাই তো আমিই তাঁহাকে পাইবো, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।' মার্কিন কবি হুইটম্যানের কণ্ঠেও একই কথা:

Not I, not any one else can travel
that road for you,
You must travel it for yourself.

শচীশের সেই কথা—'আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না।'

ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির ব্যাপার, আর এই অনুভূতি সম্ভব পুরুষকারের রাস্তায়। সাধনকে এড়িয়ে গিয়ে ঈশ্বরলাভ অসম্ভব। আর এই সাধন বলতে ঠাকুর বারংবার বলেছেন নির্জনতা আর প্রার্থনা। নির্জনতা আর প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে আর সব হ'তে পারে কিন্তু ব্যাকুলতা আসবে না, আর ব্যাকুলতা ভিন্ন ঈশ্বর-দর্শন অসম্ভব।

আমরা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করতে বসেছিলাম। ঠাকুর বিশ্বাসকে মূল্য দিলেন। আমরা বলছিলাম গুরুর কৃপা হ'লে ঈশ্বরকে সহজেই পাওয়া যায়। ঠাকুর বললেন, বৈরাগ্যের কঠিন পথেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব; ভোগের রাস্তায় যোগ সম্ভব নয়। যে ঘরে 'আচার তেঁতুল সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে রোগ কোন কালেই সারবে না।' আর একটা কথা ঠাকুর বললেন: 'সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।' তিনি শেখালেন প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে। ভেদ-বুদ্ধিতে দেশের আবহাওয়া ছিল বিষাক্ত। তিনি উচ্চারণ করলেন ঐক্যমন্ত্র। যেখানে ঘৃণা ছিল সেখানে এলো প্রেম; যেখানে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল সেখানে এলো হৃদয়ের উদারতা। ঐক্যের মতো বৈচিত্র্যও যে পরম সত্য—এ কথা ঠাকুর যেমন ক'রে বোঝালেন এমন ক'রে আর কে বোঝাতে পারতো? জীবন উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্যরূপ ছিলো বলেই এমন ক'রে যুগকে প্রভাবিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মাতৃমন্ত্র

শ্রীমতী আলোরাণী নাগ

শিশু যবে জন্ম লয় ধরাবক্ষতলে
কাঁদে সে মায়েরে খুঁজি
ভীত অশ্রুজলে
জীবনে প্রথম বাণী তার
সেই মাতৃমন্ত্র নাম।
অসহায় শৈশবের একান্ত আশ্রয়
মধুক্ষরা আঁখিযুগ,
স্নেহমাখা করতলদ্বয়।
সন্তানের চিরশান্তি মাতৃ-অঙ্ক-পাশ
কোনো সন্দেহের সেথা নাহি অবকাশ।

তুমি চিরশিশু
মায়ে ছাড়িলে না কভু; জীবন ব্যাপিয়া
রহিলে সে স্নেহক্রোড়ে।
মনপ্রাণ দিয়া
মাতারে পূজিলে তুমি সমস্ত জীবন।
বিশ্বমায়ে মাতা বলি তুলি নিলে মাথে
আপন জননী, জায়া, স্নেহ-পরিজনে
জানিলে একত্রীভূত বিশ্বমাতা সাথে।
বিশ্বাস-উচ্ছ্বাসে
শ্যামারে আনিলে টানি ধরাবক্ষপাশে।
তুমি চিরপূজনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব।

পুণ্য গয়াধামে ছাড়ি মৌন শিলাপট
মূর্ত হলে নররূপে, ধন্য করি বঙ্গভূমি তট।
স্নিগ্ধ করি পবিত্র সুন্দর!
পুণ্য তব কল্যাণ সৌরভে
নত নেত্রে এলো তব পাদপীঠ-তলে,
দশদিক হতে জন সবে।
সবাকারে দিলে মহামাতৃমন্ত্র নাম;
হয়ে সিদ্ধকাম
শান্তি পেলো আর্তজন তব পদযুগে
লভিল আশ্রয়।

পশ্চিম পৃথিবী এলো ছুটি।
হানাহানি, মারণাস্ত্র, দ্বন্দ্ব ফেলি উঠি
এলো তব পদতলে।
তব তরে তার আত্মনিবেদন রাজে
'নিবেদিতা' ভগিনীর মাঝে।

আজিও তোমারই দয়া মাতৃসঙ্কীর্তন
আঁকড়িয়া আছে কতজন,
ভরিতেছে বিশ্বলোক
মাতৃমন্ত্রে করিয়া সহায়।

বিশ্ব আজো গায়
তোমার মহিমাগাথা।

অসংখ্য মানবে তুমি তরিলে জীবনে
অগণিত কতজন শান্তি পেল মনে
তব মাতৃ-মন্ত্র নামে।

জগতের গুরু তুমি নব-অবতার
অপরূপ সুমহান কল্যাণ-আধার।

জানাইনু তোমারে প্রণতি
তুমি চিরবন্দনীয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব!

স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম্-এ

শোপেনহাওয়ার নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: She pays the debt of life not by what she does, but by what she suffers.' স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতির উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন: তোমাদের আদর্শ সীতা। সীতা সহনশীলতার অপূর্ব প্রতিমূর্তি। এই সহনশীলতা সীতার জীবনে যে অসামান্য শক্তি ও মাধুর্য আনিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সীতার জীবন এক বেদনা-বিধুর, শুচি-শুভ্র অপরূপ আলেখ্য। ভারতের সকল শ্রুতি ও স্মৃতি যদি কোন দিন অবলুপ্ত হইয়া যায় তবুও শুধু সীতার পুণ্য জীবন-কাহিনী হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিবার অপরিমেয় ঐশ্বর্য থাকিবে। সীতার জীবনের প্রতিটি কাহিনী অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিনা সে-প্রশ্ন বড় প্রশ্ন নয়। আসল কথা, সীতা আমাদের নারীজীবনের চরম আদর্শ। তিনি প্রেম ও শুচিতার অখণ্ড মূর্তি; জীবনে অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়াও তিনি কাহারও দুঃখের কারণ হন নাই।

বিদেশে নারীজাতির আচার-ব্যবহার স্বামীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। স্বামীজী মনে করিতেন পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোক আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেখানে নারীর জীবন বহির্মুখী; পুরুষের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। আফিসে, বাজারে, স্কুলে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে গিয়া নারীর জীবনে যে ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। এই অহিতকর প্রতিযোগিতার ফলে নারী তাহার মাধুর্য হারাইয়াছে, শালীনতা-বোধ ও জীবনের মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়াছে।

পুরুষের তুলনায় নারী বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, কর্ম-শক্তিতে হীন এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রতিকূল পরিবেশের ফলেই আমরা এই ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। স্বার্থান্বেষী পুরুষের চক্রান্তের ফলেই স্ত্রীজাতি কোন কোন যুগে অনাদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। স্বামীজী মালাবার পরিক্রমার

সময় দেখিয়াছেন যে সেখানে স্ত্রীজাতি পুরুষের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল; তাহাদের শাস্ত্র-জ্ঞান সুগভীর, বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ এবং কর্মশক্তি অতুলনীয়। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিয়া স্বামীজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে অবনতির যুগে ভারতের কুচক্রী পুরোহিতগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বেদাধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত করেন এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদপাঠে অধিকারও অস্বীকার করেন। অথচ আমাদেরই শাস্ত্রে আমরা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গীর উপাখ্যান দেখি যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

স্বামীজীর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বা আত্মিক শক্তিকে বিকশিত করা। এই কথা পুরুষের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য নারীর সম্বন্ধেও তেমনি। যিনি পরাবিদ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নাই। শিক্ষার লক্ষ্য পরাবিদ্যা লাভ করা এবং স্ত্রী-পুরুষে বিভেদ কল্পনা করা এই লক্ষ্যের পরিপন্থী। শক্তিপূজার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য স্বামীজী জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং এই কথাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যিনি ঈশ্বরের সর্বব্যাপী শক্তিকে নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহার শক্তিপূজা সার্থক। ভারতের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতি করিতে হইবে। এবিষয়ে স্বামীজীর মত স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" এই শাস্ত্রবাক্য স্বামীজী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে বলিয়াছেন। স্ত্রী-লোকের জীবনের নানাবিধ সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন ইহাই স্বামীজীর সুচিন্তিত অভিমত। স্বামীজীর প্রসিদ্ধ উক্তি: "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী"—এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সোপান শুচিতা। শুচিতা ভারতীয় নারীর পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে নিহিত, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে বিজড়িত। কাজেই শুচিতার উদ্বোধন করিয়া শিক্ষার সূচনা করিতে হইবে। শুচিতা হইতে নারীর জীবনে আসিবে আত্মপ্রত্যয়; আত্ম-প্রত্যয় হইল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। নারীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি স্বামীজীর মতে হইল: ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, চারুশিল্প, বিজ্ঞান; গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, সীবন ও স্বাস্থ্য। এই বিষয়গুলির মধ্যে উপন্যাসের স্থান নাই। পূজাপদ্ধতি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় সত্য; কিন্তু অন্ধভাবে ধর্মানুষ্ঠান, পূজাপার্বণ অনুসরণ করিলে চলিবে না; এই সকল ক্রিয়াকর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু মোহমুক্ত মন লইয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মিক স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; কাজেই মানুষের মনে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মনে, এই স্বাধীনতাবোধ জাগাইবার জন্য স্বামীজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ সেবা ও আত্মিক শক্তির মহিমা যাহাতে নারীজাতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারে সেইজন্য স্বামীজী শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরাবাঈ প্রভৃতির অমর জীবনকাহিনীকে স্থান দিয়াছেন। অমূর্ত ভাবধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জীবনকাহিনীর মূল্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশী; সেইজন্যই এই পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারীকে অসহায় ও দুর্বল করিয়া রাখিবার মত পাপ আর কিছুই নাই। সেইজন্য স্বামীজীর লক্ষ্য ছিল দৈহিক শক্তিতে নারীজাতিকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। এই কথা মনে রাখিয়া তিনি স্ত্রীজাতির সামনে ঝাঁসির রানী, রানী দুর্গাবতী, অহল্যাবাঈ, রানী রাসমণি, রানী ভবানীর জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন।

স্বামীজী জাতির কাছে চাহিয়াছেন আদর্শ জননী—যাঁহারা হইবেন দৈহিক ও আত্মিক শক্তিতে শক্তিমতী, যাঁহাদের জীবনের ভিত্তি

পবিত্রতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা। এইরূপ জননীর কাছেই আদর্শ সন্তান আশা করা যাইতে পারে।

উনিশ শতকের মধ্য ও শেষ ভাগে ভারতের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী কয়েকজন ব্রহ্মচারিণীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন— যাঁহারা ত্যাগ ও সেবাকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের ধমনীতে থাকিবে শুচিতা ও আত্মিক শক্তির প্রবাহ। তাঁহারা বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রস্থানে শিক্ষিতা হইবেন সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা তাঁহাদের স্বার্থের জন্য নহে; সে শিক্ষার বীজ ছড়াইয়া দিতে হইবে সমগ্র জাতির মধ্যে। শিক্ষাকে তাঁহারা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

স্বামীজী একথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতেন যে, নারী প্রকৃতই জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি, যাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা মানুষের মনে পরাজ্ঞানের সম্মান দিতে পারে, তাহার জীবনে শক্তি ও মাধুর্য আনিতে পারে। সেইজন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন নারীজাতির জন্য মঠপ্রতিষ্ঠা করিতে; সেই মঠের সংলগ্ন বিদ্যালয়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। সে বিদ্যালয়ে বেদ, উপনিষদ্, সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কিছু ইংরেজী সাহিত্য শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। সেই সঙ্গে থাকিবে সীবন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শিশু-লালন প্রভৃতি বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা। জপ, পূজা ও ধ্যান, শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয় ও মঠ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। মঠে পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষান্তে বালিকার ভার তাহার অভিভাবক গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাকে বিবাহ দিতে পারেন। যদি কোন বালিকা আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তাহাকে ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ত্যাগ, সেবা ও সংযম হইবে এই মঠের মূলমন্ত্র।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে বিবেকানন্দের তুলনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও জন ডিউই উভয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন। শিক্ষার্থীর মর্যাদা-সম্বন্ধে উভয়েই সচেতন। স্বামীজী বহু বৎসর পূর্বে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি একটি ভাব (idea)কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে; কাজে কাজেই সকল শিক্ষার্থীকে এক ছাঁচে ঢালাই করা চলে না। স্বামীজীর মতে একটি জাতিকে যদি সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। স্বামীজীর আদর্শ সেইজন্য বহুর মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান করা; বহুর বহুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়।

রাসেল ও ডিউই উভয়েই শিক্ষার্থীর মন হইতে ভয় দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। রাসেলের মতে ধর্মের মূলে ভয়; স্বামীজীর মতে ধর্মের মন্ত্রই অভয়। রাসেল কুসংস্কারগুলিকেই ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন; স্বামীজী কুসংস্কারকে দূর করিয়া ধর্মের আসল রূপটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মিক সত্যে উদ্বুদ্ধ হইলে সকল ভয় বিদূরিত হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ জড়বাদের উপর যতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন তাহার কল্যাণ নাই—স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের ধ্বংসের শক্তি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু তাই বলিয়া পাঠ্যতালিকা হইতে বিজ্ঞানকে বাদ দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন বিজ্ঞানকে উপায়রূপেই দেখিতে হইবে, উদ্দেশ্যরূপে নয়। বিজ্ঞানকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয়হীন বীক্ষণাগারে নির্বাসন দেওয়ার ফল শুভ হইবে না; উপায়কে উদ্দেশ্যের স্থানে বসাইলে আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ স্বামীজী আমাদের সামনে তুলিয়াছেন তাহার মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা রহিয়াছে। এক তার্কিকের প্রতি ঠাকুরের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা কর্তব্য: "যদি এক কথায় বুঝতে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্কযুক্তি করে যদি বুঝতে চাও, ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যাও।" এই "এক কথা"কে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি তাহা হইলে বলা যায় যে এই কথাটি "মা"। শ্রীরামকৃষ্ণ এই একাক্ষর মন্ত্রের সাহায্যে অপূর্ব দিব্য জীবনের সন্ধান দেখাইলেন। স্বামীজী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নারী-জীবনের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিলেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র আদর্শ। নারীর মর্যাদা, নারীর শিক্ষা ও নানাবিধ উন্নয়নের জন্য স্বামীজী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার মূল্য আজিকার যুগসংক্রান্তির ক্ষণে অপরিসীম। স্বামীজির এই উক্তি অবিস্মরণীয়: "সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাব সাধন, সেই-জন্যই মাতৃভাব প্রচার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

কবীরবাণী

("কবীর কব্ সে ভয়ে বৈরাগী"—বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

প্রশ্ন

আজিকে তোমারে শুধাই কবীর
কবে হতে তুমি হ'লে বৈরাগী,
তোমার যে প্রেম বল মোরে বল
ছড়াল কোথায় কাহার লাগি ?

উত্তর

বিশ্ব প্রকাশ ছিল না যখন
যখন ছিল না গুরু ও চেলা,
কিছুই তখন লভেনি প্রসার
পুরুষ একাকী করিত খেলা—
সেই কাল হতে সন্ন্যাসী আমি
শুন ওহে, সাধু গোরখনাথ,
আমার সে প্রেম হয়েছে ধন্য
পরশি ব্রহ্মে দিবস রাত !
ব্রহ্মা যখন পরেনি কিরীট
অথবা বিষ্ণু তিলক ভালে,
শিব ও শকতি লভেনি জনম
শিখিনু যোগ সে অতীত কালে।
প্রকট আমি তো হলেম কাশীতে
চেতনা দিলেন শ্রীরামানন্দ—
অসীমের তৃষা অন্তরে ধরি
বহিয়া এনেছি মিলনানন্দ !
সহজে সহজে হইবে মিলন
উছল ভকতি জাগিবে প্রাণে,
শুন হে গোরখ—চলো আগাইয়া
অসীমের সেই চির আহ্বানে।

বেদ ও বর্তমান জীবন

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্-এ, বি-এল্, পিএইচ্-ডি

দেবানাং ভদ্রা সুমতির্ঋজুয়তাম্।
দেবানাং রাতিরভি নো নি বর্ততাম্!
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ম্
দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে॥

দেবতাদের শুভ কল্যাণবুদ্ধি, ভদ্র সুমতি ঋজু ও সরল হয়ে প্রবাহিত হোক ; দেবতাদের আশীর্বাদ ও প্রীতি আমাদিগের পরিবেশ পরিপুষ্ট করুক। আমরা যেন দেবগণের সখ্য যাচ্ঞা করি—দেবতারা আমাদের আয়ু অভিবর্ধন করুন, আমরা যেন বাঁচবার মতন বাঁচি।

অনেকে হয়ত অবাক্ হবেন, ভাববেন যে প্রাচীন গত হয়ে গেছে তার এই উজ্জীবনের বৃথা প্রয়াস কেন? বেদকে যতই সম্মান আমাদের পিতৃপুরুষেরা দিন না কেন, তার কাছে পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু আশা করা বিফল।

আমি বলব— জলদগম্ভীরস্বরে বলব— তা নয়। বর্তমান জীবনের কলকোলাহল ও সংঘর্ষের মাঝেও বেদ আমাদের দেবে চলবার পথের পাথেয়—দেবে প্রেরণা—দেবে উৎসাহ—দেবে বিশ্বাস—দেবে অতন্দ্র কর্মের বাণী—অমৃতের আশ্বাস—দিব্যজীবনের ছন্দ ও দেবজীবনের সৌরভ। সুলেখক লেভি তাঁর 'আধুনিক মানুষের দর্শন' পুস্তকে বেশ সুন্দর কথা লিখেছেন—

"If philosophy does not illuminate the practice of ordinary life, we maintion it fails in is function. It must be something drawn from the world of human affairs and guiding it. To lead a philosophy in this way from the barren wilderness of speculation into the rough and tumble of action is more than to violate the traditional meaning of philosophy. To suggest that its truth be consciously and deliberately tested by human beings in the fire of practice is to demand that, like science, it stand or fall by its active meaning for man."

আমিও সেই কথা বলব—বেদ যদি শুধু রহস্য-ভাণ্ডার হ'ত—যদি তাহা সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রয়োজনে না লাগত—তাহলে আমরা তার অলোচনা করতাম না।

তাই সর্বপ্রথম বলছি—বেদের বলিষ্ঠ জীবনবাদই তার মহিমময় বিশেষত্ব। আমাদের দেশে অনেক সময় নৈষ্কর্ম্যকে ধর্মের স্বরূপ মনে করি। ভাবি মায়াময় এই সংসারকে পরিত্যাগ করে হৃদয়কে আমরা যতই পরলোকপ্রবণ করব ততই আমরা অধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করব।

আমাদের বৈদিক পিতামহেরা এই ধরনের 'পলায়নবাদ'কে আমল দেননি—তাঁরা এই সুন্দর পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠ হয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। সেই সঞ্জীবন প্রাণবত্তার জয়গান আজ দেশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠুক নূতন দিনের সুরে—নূতন যুগের ভাষায়।

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তিং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণামরিষ্টিং তনূনাম্
স্বাদ্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥

পরমাত্মা দিন আমাদের পরম ধন। দিন আমাদের চিত্তের দক্ষতা, দিন আমাদের সৌভাগ্য। দিন আমাদের পরিপূর্ণ পুষ্টি—তাঁর আশীর্বাদে আমাদের তনু হোক নিরাময়—আমাদের বাক্ হোক স্বাদু ও

মধুময়—আমাদের প্রাত্যহিক দিনগুলি হোক উজ্জ্বল, সুখময় ও সুন্দর।

দিনগত পাপক্ষয় করে বৈতরণী পার হওয়ার আশা এ নয়। এ শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নয়। এ হল আশাতুর সুখাতুর কর্মচঞ্চল উৎসাহদীপ্ত আনন্দময় দিবসযাপনের আকাঙ্ক্ষা।

এই কর্মসুন্দর দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা তিনবেদেই আছে। ঋগ্বেদ শুধু শত শরৎ বাঁচবার প্রার্থনা করেছেন—যজুর্বেদে সেই প্রার্থনা নবতর ও মধুরতর হয়েছে—একশত শরৎ যে বাঁচব সেই একশত বৎসর চোখ দিয়ে ভাল করে দেখব—নূতন নূতন বাণী শুনব—নূতন নূতন কথা বলব—অদীন হয়ে মাথা উঁচু করে বীরের জীবনযাপন করব। অথর্ববেদ বলছেন :—

পশ্যেম শরদঃ শতম্ ॥
জীবেম শরদঃ শতম্ ॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম্ ॥
রোহেম শরদঃ শতম্ ॥
পুষেম শরদঃ শতম্ ॥
ভবেম শরদঃ শতম্ ॥
ভূয়েম শরদঃ শতম্ ॥
ভূয়সী শরদঃ শতাৎ ॥

শতোত্তর জীবন হোক আমাদের—সেই এক-শতের অধিক বৎসর আমরা যেন জীবন্মৃত হয়ে শরীরের ভার বয়ে না বেড়াই—আমাদের চাক্ষুষ ও মানস দৃষ্টিশক্তি যেন অভিবর্ধিত হয় দিনে দিনে—আমরা যেন প্রাচুর্য ও মাধুর্যে বেড়ে চলি। যদি বসে থাকি তবে আর বাঁচা কিসের—রোজ রোজ নূতন কিছু জানব ও নূতন কিছু শিখব। দিনে দিনে উর্ধ্বাভিসারের পথে হোক আমার আরোহণ—প্রত্যহই হোক আমার পরম পুষ্টি—যে পুষ্টি নবতর সম্পদে দিনে দিনে সমৃদ্ধ ও দীপ্ত হয়ে উঠছে। আমার এই দীর্ঘজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব ও শুধুই বেড়ে চলব—অগ্রগতির পথে হবে প্রাত্যহিক অভিযান।

অনুভূতির পথে অনন্ত অভ্যুদয়—এই ছিল তাঁহাদের কামনা, তাই আমাদের পিতামহেরা এমন এক চমৎকার কবিতা লিখেছেন যাহা ভাবের গভীরতায়, অভিব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষু চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ।
সংবেদং বিচ পশ্যেম ॥

হে জ্যোতির্ময় দেবতা, হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের দুটি চোখে দাও দৃষ্টিশক্তি—তোমার এই বিপুল বিশ্বের অতি বিপুল মহিমা আনন্দ ও উল্লাসে দেখব। কিন্তু শুধু দুটি চোখ ত তোমার বিশ্বজোড়া মাধুরী দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়—তাই দাও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃষ্টিশক্তি—আমি দেখব, সমগ্রতার সম্যগ্‌দর্শনও চাই, আবার বিশ্লেষণ চাই—যা কিছু দেখা তাকে তাই সমন্বয় ও বিশ্লেষণের মাঝে পরিপূর্ণ করে যেন দেখি।

বৈদিক জীবনবাদ কিন্তু শুধু বাঁচবার জন্য নয়, পৌরুষের আহ্বানেও ঝঙ্কৃত। তাঁহারা বলদাতা ইন্দ্রের নিকট বল প্রার্থনা করতেন, বীর্যবান ও বলবান হয়ে লোকোত্তর জীবনযাপন করতে চাইতেন।

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।

আমি এই পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ হব—মর্যাদায় আমি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকব। অকাল মৃত্যুকে তাঁরা ঘৃণা করতেন—শত শরৎ সবল ও আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু তাঁহাদের ঈপ্সিত ছিল। অজর হয়ে অতন্দ্র কর্ম করে মনুষ্যত্বকে ফোটাবার জন্যই ছিল তাঁহাদের সাধনা।

ভারতবর্ষ সব চেয়ে দরিদ্র দেশ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই অভাবের মাঝে প্রাচুর্য আনতে পারে একমাত্র অদম্য অধ্যবসায়, শ্রান্তিবিহীন কর্ম। কিন্তু বৃটিশের হাতে গড়া অদ্ভুত আমলাতন্ত্র সাতবৎসরেই ধ্বংস হয়ে

গেছে বলা চলে। সর্বত্রই সরকারী ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার পরিচয়।

আমাদের জনপ্রিয় নেতৃগণের উচিত ছিল—সবাইকে আহ্বান করে মহাভারত গড়বার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে—আট ঘণ্টার স্থানে ১৬ ঘণ্টা খাটতে; কিন্তু তা হয়নি। দেশের সমূহ ক্ষতি করে ডাকঘরের কাজ একদিন বন্ধ করা হয়েছে—ফলে জাতীয় জীবনে বহুকোটী টাকার লোকসান ঘটছে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারী দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করবে এই ভরসার স্থলে দেখছি একজনের স্থলে তিনজন লোক এসেছে—কিন্তু কাজ আদৌ হচ্ছে না। সর্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা। তাসের প্রাসাদের মত আমাদের স্বাধীনতা যাতে ধূলিসাৎ না হয়, তার জন্য অনবসর কর্মের প্রয়োজন। বেদ তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করেছেন :

ত্রাতারো দেবা অধি বোচতা নো
মা নো নিদ্রা ঈশত মোত জল্পিঃ।
বয়ং সোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ
সুবীরাসো বিদথমা বদেম॥

প্রগাথ কাণ্ব বলছেন :—হে পরিত্রাণকারী দেবগণ, তোমাদের গভীর আশীবাদে আমাদের ধন্য কর, আমরা যেন নিদ্রা ও গালগল্পে সময় না অপব্যয় করি। আমরা যেন সোমদেবতার প্রিয় হয়ে, সুবীর হয়ে সভাতে সুকর্ম আলোচনা করি, সুব্রতের পরিকল্পনা করি।

দেবতারা অলসকে ক্ষমা করেন না।

ইচ্ছন্তি দেবা সুন্বন্তম্
ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি।
যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ॥

দেবতারা যাজ্ঞিককে প্রীতি করেন—যাহার কর্ম লোকসেবায় ও জগৎসেবায় নিয়োজিত তাহাকেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন, স্বপ্নালু ও তন্দ্রালুকে তাঁহারা ভালবাসেন না। দেবতারা অতন্দ্র, তাই যাহারা প্রমাদকারী তাহাদিগকে তাঁহারা শাসন করেন। গীতাতেও সর্বোত্তম বেদব্যাখ্যাতা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা মানুষের মৃত্যুর কারণ।

বেদ মানুষকে ভ্রান্তি হতে জাগতে বলছেন। অনবধান হয়ে বিমূঢ় হয়ে থাকলে ধর্মলাভ হয় না—বলা যেতে পারে কিছুই লাভ হতে পারে না। শ্রান্তিহীন কর্ম, বিরামবিহীন উদ্যোগে ভারতবর্ষ আবার বেদধর্মে উদ্বুদ্ধ হোক, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

ন ঋতে শ্রান্তস্য সখায় দেবাঃ—দেবতারা পথিকেরই বন্ধু, যাত্রীরই নির্ভরস্থল—কর্মে যে শ্রান্ত নয়, ঘর্মজলে যার দেহ সিক্ত নয়, সে দেবতাদের সখ্য আশা করতে পারে না।

তাই আজ তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে আহ্বান করি—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।—ওঠো, জাগো—তোমাদের পাওনা যে ঐশ্বর্য সেই মহান সম্পদে ধনী হয়ে ওঠো। অশ্রান্ত কর্ম ভগবান নিজেই করছেন—

পশ্য সূর্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ চরৈবেতি। চলার মন্ত্রে আজ দেশ সবল হোক। আকাশে সূর্যের গতি লক্ষ্য কর। সূর্যদেব কখনও ঘুমান না—সব সময়ই তিনি শ্রম করে চলেছেন—তাঁরই মত অতন্দ্র কর্ম কর—আর চল অগ্রসর হয়ে চল।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তিনি নিজেও অতন্দ্রিত হয়ে কাজ করে চলেছেন, কারণ লোকসংগ্রহ তাঁহার কাম্য। তাই আমরা যারা আমাদের সাধের ভারতকে জগৎ-লোকসভায় বরণীয় ও মহনীয় আসনে বসাতে চাই, তারা যেন আলস্যহীন হয়ে অতন্দ্র কর্মের বন্যায় দেশকে পরিপ্লাবিত করি।

কিন্তু এই কর্ম যাতনার নিগড় নয়—ইহা আনন্দে ছন্দিত, উল্লাসে রঙীন, মধুরতায় মধুর,

অমৃতের স্পর্শে স্বাদুতম। স্বস্তিপন্থা যারা অনুসরণ করে, তারা ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করে—

পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্ বাধস্বা
মা সুচরিতে ভজ।
উদ আয়ুষা স্বায়ুষোদস্থাম্
অমৃতাঁ অনু॥

হে ভগবন্, দুশ্চরিত পাপ হতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত কর, সদাচার ও পুণ্যে আমায় নিয়োজিত কর। আমি উঠব অমৃতলোকে—এই জীবনের সাথে সাথে শোভন কর্মে, শোভন চিন্তায় শুভ যে আয়ু সেই আয়ু যাপন করে—অমৃতময় দেবজীবনের পথে আমি পরমানন্দ লাভ করব।

মানুষের আনন্দে জন্ম, আনন্দেই জীবন এবং আনন্দেই তিরোধান, তাই কর্মসুন্দর বলিষ্ঠ জীবন তার চলার সুরে সুরে মানুষকে অনন্দলোকে জাগরিত করবেই করবে। আমিত্বের প্রসারে মানুষের দৃষ্টি যখন প্রসারিত তখন সকলই মধুময় হয়ে যায়। দ্যুলোক ও ভূলোক, বনস্পতি ও ওষধি, রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, সকলই মধুরতায় মধুর হয়ে ওঠে। মধুশ্রীতে রমণীয় সাধক অনুভব করেন—পায়ের তলাকার ধূলিও সুধায় সুধাময়, দিকসকল আনন্দোৎসবে কোলাহলমুখর—সকলই অমৃতের প্রস্রবণে রসায়িত।

মানুষের বর্তমান জীবনে তাই বেদের একান্ত প্রয়োজন আছে। আণবিক অস্ত্রের ঝঞ্ঝনমুখর তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে দেখছি শুধু অশান্তি, কানে শুনছি অশ্রান্ত হাহাকার, দুঃখদুর্বহ এই জীবনে বেদ এনে দেবে পরম নির্ভয় আশ্রয়।

নিবেদিত জীবন যাপন করে আমরা কানে শুনব ভদ্র ও শোভন কথা, চোখে দেখব যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গকে করব দৃঢ় ও স্থির, তার পর জগৎহিতে উৎসর্গীকৃত ভাগবত জীবন যাপন করব।

অখিল ধর্মমূল বেদের এই শাশ্বত বাণীর আজিও একান্ত প্রয়োজন আছে—এই জীবনপন্থা যদি অনুসরণ করতে পারি, তবেই বিদ্বেষ ও হিংসার শেষ হবে, মৈত্রী ও করুণার উদ্ভব হবে।

তখনই আমরা প্রার্থনা করতে পারব—শান্তির ও সমৃদ্ধির।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ।
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি।

ভাগবত ও দিব্যজীবনের পথযাত্রী সাধকদের সাধনায় বিশ্বে আনবে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব—তখন প্রতি মানুষ সকল প্রাণীকে মৈত্রীর চোখে দেখবে—সকল প্রাণী মানুষকে মৈত্রী দান করবে—এই মৈত্রীভাবনা-তৎপর মানুষ দেখবে দ্যুলোক শান্তিতে প্রফুল্ল, অন্তরিক্ষলোক শান্তির হিল্লোলে হিল্লোলিত। পৃথিবী শান্তির বাতাসে আবৃত হোক, জলধারা শান্তির ছন্দগান করুক; ওষধি ও বনস্পতি নিরুদ্বেগ স্বস্তিতে পূর্ণ হোক, সমস্ত দেবলোক শান্তির সৌরভে সুরভিত হোক, ব্রহ্ম তাঁর পরম উপশম দিয়ে জগৎ পরিতৃপ্ত করুন। সকলই বিঘ্নহীন হোক—শান্তিজলে সবাই পূত ও পবিত্র হোক। সেই পরমা শান্তি—সেই উদ্বেগহীন একান্তনির্ভর উপশম আমাতে আসুক।

বেদবাণী তাই বর্তমানে দেবে অমৃতের বার্তা, অভয়ের শিক্ষা, সংযম ও পবিত্রতার দীক্ষা। আসুন আমরা বিনম্র শরণাগতিতে সেই অমৃতবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি।